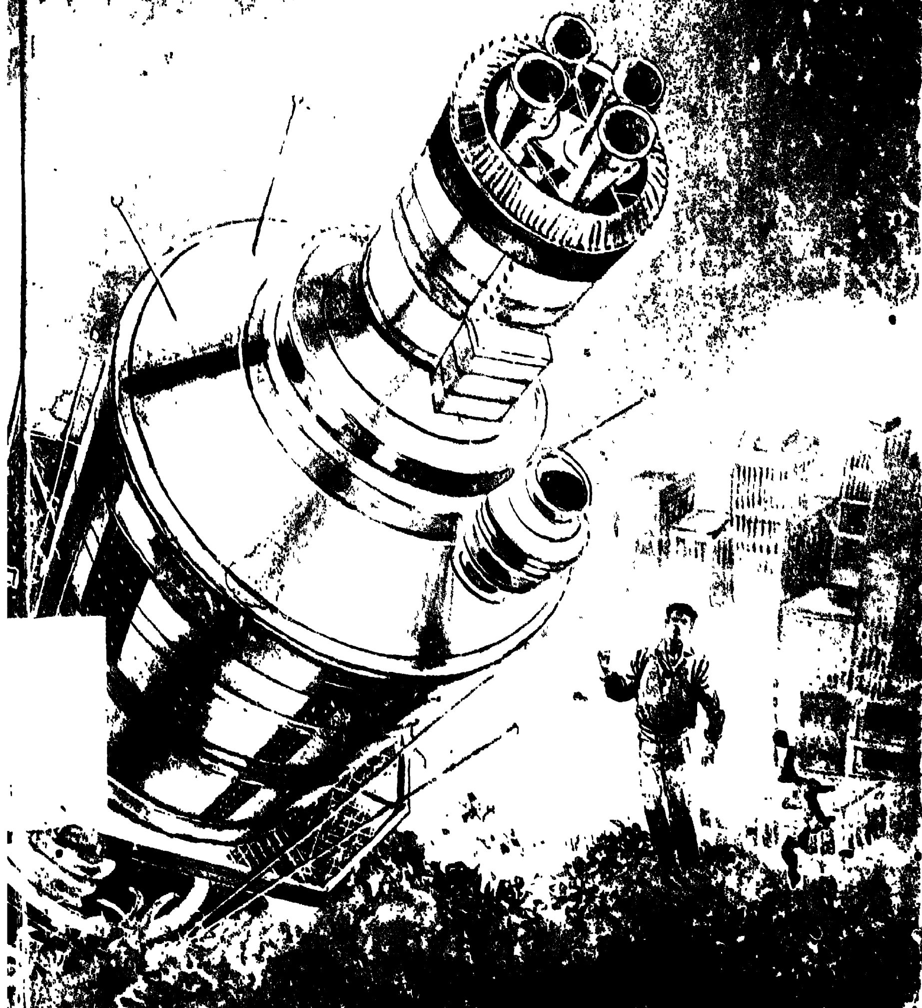
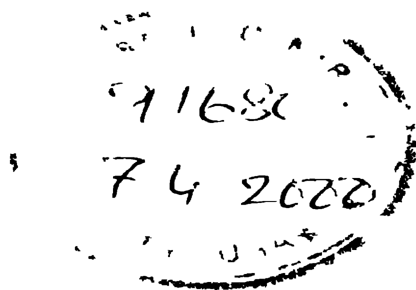
সমরেশ মজুমদার

অর্জুন সমগ্র ২



অর্জুন সমগ্র ২

সমরেশ মজুমদার





আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৫৭
প্রচ্ছদ অনুপ রায

ISBN 81-7215-746-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

সূচিপত্র



কালাপাহাড়

লাল রঙের নতুন মোটরবাইকটাকে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের অনেকেই চিনে গিয়েছে। শহরের সবাই জানে রোজ সকাল আটটায় বাইকটা কদমতলা থেকে রূপশ্রী সিনেমার সামনে দিয়ে থানাটাকে বাঁ দিকে রেখে একটু এগিয়েই বাঁ দিকে করলার ধার ঘেঁষে হাকিমপাড়ার দিকে চলে যাবে। কেউ-কেউ তো ওই যাওয়া দেখেই বুঝে নেয় এখন আটটা বাজে। মোটরবাইকটা চালাতে খুব আরাম পায় অর্জুন।

বাইকটা উপহার দিয়েছেন নন্দিনীর বাবা দিল্লির মিস্টার রায়। সেই যে নন্দিনীরা চার বন্ধু মিলে নর্থবেঙ্গলে বেড়াতে এসে ঝামেলায় পড়েছিল, তা থেকে উদ্ধার করেছিল বলে তিনি ওই উপহারটি দিয়েছেন। অবশ্যই উপহারটি এসেছিল অমলদার মারফত।

প্রত্যেক সকালে লাল বাইক চালিয়ে অমল সোমের বাড়িতে যাওয়া অভ্যেস অর্জুনের। সেখানে গিয়ে বইপত্তর ঘাঁটে, হাবুর দেওয়া চা খায়। কখনও-সখনও মেজাজ ভাল থাকলে অমলদা গল্প করেন। সত্যসন্ধানের ব্যাপারে তিনি এখন খুব সক্রিয় ভূমিকা নেন না বটে, তবে থানার নতুন দারোগা শ্রীকান্ত বক্সি সমস্যায় পড়লেই ওঁর কাছে ছোটেন।

আজ রূপশ্রী পেরিয়ে থানার সামনে আসতেই অর্জুন দেখল থানার গেটের সামনে শ্রীকান্ত বক্সি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। পাশেই নীল রঙের অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পেয়েই দারোগাবাবু হাত তুললেন, "তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি হে।" অর্জুন গতি থামাল।

শ্রীকান্ত বক্সি এগিয়ে এলেন, "আমাকে এখনই একটু বেলাকোবায় যেতে হবে। এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হরিপদ সেন। আমার কাছে এসেছিলেন অমলবাবুর ঠিকানার জন্য। থাকেন দমদম এয়ারপোর্টের কাছে। এর নাম হল অর্জুন। আমাদের শহরের গৌরব ও। অনেক রহস্য উদ্ধার করেছে। অমলবাবুর শিষ্য।"

অর্জুন নমস্কার করতেই ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করলেন। অর্জুন বলল, "ওই

গাড়িটা কি আপনার ?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "না, শিলিগুড়ি থেকে ভাড়া করেছি।"

"ও। আপনি ড্রাইভারকে বলুন আমাকে ফলো করতে।"

করলা নদীর ধার দিয়ে যেতে-যেতে পেছনে তাকিয়ে সে দেখল, গাড়িটা ঠিকঠাক আসছে। একেবারে কলকাতা থেকে কোনও ক্লায়েন্ট অমলদার খোঁজে আসছে মানে কেউ ওঁকে আসতে বলেছেন। অমলদা নিজে সক্রিয় ভূমিকা নেন না যখন, তখন তাকেই কাজটা করতে হবে। কী ধরনের কাজ তা আন্দাজে না এলেও বেশ উত্তেজনা বোধ করছিল সে। কলকাতায় যেতে হবে নাকি এ-ব্যাপারে ?

অমল সোমের বাড়ির গেটে বাইক থামিয়ে সে হাত তুলল। গেট খুলে বাইকটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। সে বলল, "এটাই অমলদার বাড়ি। আসুন আমার সঙ্গে।"

একটু এগোতেই হাবুকে দেখতে পাওয়া গেল বাগানে। মরা পাতা ছাঁটছে। ইশারায় অমলদাকে খবর দিতে বলতেই দাঁত বের করে দেখিয়ে হাবু ভেতরে চলে গেল। বসার ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় উঠে অর্জুন ভদ্রলোককে বলল, "আপনি একটু ভেতরে বসুন।"

ভদ্রলোক বললেন, "বাঃ, বেশ বড়-বড় ফুল হয়েছে তো !"

অর্জুন হাসল, "এ-সবই হাবুর কৃতিত্ব। ওর জিভ কথা বলতে পারে না কিন্তু হাত কথা বলে।"

"হাত কথা বলে ?" হরিপদ সেন মাথা নাড়লেন, "চমৎকার বললেন ভাই।"

হরিপদ সেনের বয়স ষাটের ধারেই। একটু অস্বস্তি হলেও আপনি বলার জন্য এখনই আপত্তি করল না অর্জুন। কাজ করতে গিয়ে নানান মানুষের সংস্পর্শে এসে এটুকু পরিবর্তন হয়েছে। সে হরিপদ সেনের চেহারাটা দেখল। হাওয়াই শার্ট-প্যান্ট-চশমায় বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা। পায়ে বেশ দামি জুতো। শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে রেখেছেন, মানে পকেটে ভাল টাকা আছে। লোকটার আঙুলে কোনও আংটি নেই। চেয়ারে বসার পর বোঝা গেল ডান হাতের কড়ে আঙুল অনেকখানি বাঁকা। ইনি কী করেন তা সে আন্দাজ করতে পারল না।

"আপনি এদিকে এর আগে এসেছেন ?" অর্জুন সময় কাটানোর জন্য প্রশ্ন করল।

"অনেকবার।" ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না।

বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ পাওয়া গেল। ইদানীং অমলদার খুব পছন্দ ওই চটি। ভেতরের দরজায় শব্দটা থাকতেই অমলদাকে দেখা গেল। ঝুল ফতুয়া আর পাজামা পরা। দেখা হওয়ামাত্র বললেন, "ওহে অর্জুন, তোমার-আমার

জন্য একটা ভাল খবর আছে।" তারপরেই হরিপদবাবুর ওপর নজর যাওয়া মাত্রই দুটো হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার। আমি অমল। আমার বাড়িতে আপনি এসেছেন, আগে আপনার সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল। বসুন, বসুন।" বলতে-বলতে একটি চেয়ার টেনে নিলেন তিনি। হরিপদবাবু মৃদু হেসে বললেন, "আমি আপনার নাম শুনেছি আমাদের প্রোফেসর বনবিহারী ভট্টাচার্যের কাছে। একটি অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে সাহায্যের আশায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমি।"

অর্জুন বলল, "থানার সামনে শ্রীকান্তবাবু ওঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।" অর্জুন আলাপ করিয়ে দিল।

"শ্রীকান্তকে আগেই চিনতেন ?" অমলদা জিজ্ঞেস করলেন।

"না, না। আপনি জলপাইগুড়িতে আছেন এইটুকুই জেনেছিলাম। ভাবলাম, থানায় গেলে নিশ্চয়ই আপনার ঠিকানাটা জানা যাবে।"

হরিপদবাবু দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

"আপনার সমস্যাটা কী ?" খুবই অনাগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলেন অমলদা।

"একটি মানুষের গতিবিধি বের করতে হবে আপনাকে।"

"ওঃ, সরি। এজন্য কলকাতা থেকে এতদূরে এলেন কেন ? কলকাতায় অনেক এজেন্সি আছে, যাদের বললে সাগ্রহে করে দেবে।" অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনি একটু শুনুন মিস্টার সোম। আমি জানি প্রস্তাবটা খুবই হাস্যকর শোনাবে, কিন্তু উপায় নেই। সাধারণ ডিটেকটিভ এজেন্সির পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়। প্রফেসর বনবিহারী আমাকে বললেন আপনিই ঠিক মানুষ। আমি যাঁর গতিবিধি জানতে চাই তিনি এখনকার মানুষ নন। তিনি ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।"

"অদ্ভুত। ইন্টারেস্টিং।" অমল সোম বসে পড়লেন আবার, "এতদিন জীবিত মানুষ নিয়ে কাজ করেছি ! মৃত মানুষ, তাও আবার চারশো দশ বছর আগে মৃত মানুষের কেস নিয়ে কেউ আসবেন ভাবতে পারিনি। মানুষটির নাম কি আমরা জানি ?"

"জানা স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাসের বইয়ে দু-চার লাইন প্রত্যেকেই একসময় পড়েছি। ওঁর নাম যাই হোক, ইতিহাস ওঁকে কালাপাহাড় নামে কুখ্যাত করেছে।"

"কালাপাহাড় !" অমলদাকে এমন বিস্মিত হতে অর্জুন এর আগে কখনও দেখেনি।

হরিপদ সেন কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় হাবু এল চায়ের ট্রে নিয়ে। সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ির সূর্য বেকারির তৈরি সুজির বিস্কুট। দামি কম্পানির বিস্কুটে আজকাল মন ভরছে না অমলদার। অর্জুন জানে এই বিস্কুট মাসখানেক

এ-বাড়িতে চলবে। কিন্তু চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়েও সে হরিপদ সেনকে অবাক হয়ে দেখছিল। কালাপাহাড় লোকটি সম্পর্কে সে ইতিহাসে যা পড়েছে তাতে ভয়ই হয়। ওঁর নামকরণেই সেটা বোঝা যায়। এমন একটি মানুষের গতিবিধি জানতে চারশো বছর পর কেউ উৎসুক হবেন কেন ?

অমলদার জন্য চা আসেনি। তিনি এ-সময় চা খান না। বললেন, "মিস্টার সেন, আপনি কি কলেজে-টলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়াচ্ছেন ?" মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "না, না। আমার একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে।" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "চমৎকার চা। দার্জিলিং-এর ?"

অমলদা হাসলেন, "না। এটা ডুয়ার্স অসম দার্জিলিং মিলিয়ে একটা ককটেল।"

হরিপদবাবু নিবিষ্ট মনে কয়েক চুমুক দিয়ে বললেন, "কালাপাহাড় এ-অঞ্চলে দীর্ঘকাল ছিলেন। ইতিহাস বলছে লোকটি অত্যন্ত ভয়ানক। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে তিনি খুবই নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, তখন অবশ্য জেলা হিসেবে চিহ্নিত ছিল না, উনি ঘোরাফেরা করেছেন। কিন্তু কোথায়-কোথায় ছিলেন এই ডিটেলস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা যদি সেটা বের করে দেন···।"

"কেন ?" আচমকা প্রশ্নটি বেরিয়ে এল অর্জুনের মুখ থেকে।

অমলদা মাথা নাড়লেন, "গুড। এই প্রশ্নটি আসা খুবই স্বাভাবিক। কেন আপনি এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির সম্পর্কে এত আগ্রহী ? আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র ?"

হরিপদ সেন একটু ইতস্তত করলেন, "আজ্ঞে না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। আগ্রহী হওয়ার একটা কারণ ঘটেছে। আমার ঠাকুর্দার ভাই বিয়ে-থা করেননি। তিনি থাকতেন পুরীতে। একাই। প্রায় নব্বুই বছর বয়স। আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। শেষবার পুরীতে গিয়েছিলাম বছর পনেরো আগে। হঠাৎ মাস তিনেক আগে তিনি লেখেন আমাকে সেখানে যেতে। বিশেষ দরকার। গিয়েছিলাম। দেখলাম উনি খুবই অশক্ত হয়ে পড়েছেন। মনে-মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। উনি আমাকে কিছু কাগজপত্র দিলেন। এই কাগজগুলো প্রায় দুশো বছর আগে ওঁর প্রপিতামহ লিখেছিলেন। ইনি যক্ষের মতো সব আগলে রেখেছিলেন। আমায় বললেন, ইচ্ছে হলে হদিস করতে পারিস।"

"কিসের হদিস ?"

"কাগজপত্র দেখলে আপনি বুঝবেন ব্যাপারটা। সংক্ষেপে যেটুকু জেনেছি, বলি। আমরা আসলে কর্ণাটকের মানুষ। পাল যুগে আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ আরও অনেকের সঙ্গে গৌড়ভূমিতে আসেন। তাঁরা যুদ্ধ করতে জানতেন, ফলে পালরাজাদের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে অসুবিধে হয়নি।

আপনারা নিশ্চয়ই সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন, বিজয় সেনের নাম শুনেছেন, যাঁরা সেনসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের উত্তরাধিকারী হলেন বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন। আমার পূর্বপুরুষরা এঁদের রাজত্বে ভাল মর্যাদায় ছিলেন। তারপর মহম্মদ বকতিয়ার খিলজি এলেন, মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলেও আমার পূর্বপুরুষরা রাজকর্মচারীর পদ হারালেন না। সুলেমান কিরানি এবং তার ছেলে দাউদের সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। ইনি যখন পুরী আক্রমণ করেন তখন আমার এক পূর্বপুরুষ তাঁর অনুগামী হন। কিন্তু সেখানে কালাপাহাড়ের আচরণে সন্তুষ্ট না হয়ে সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করে পুরীতেই থেকে যান। পরে আমার ঠাকুর্দা ফিরে এসেছিলেন বাংলাদেশে কিন্তু তাঁর ভাই থেকে গিয়েছিলেন। মোটামুটি এই হল বৃত্তান্ত।"

"খুবই ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এত তথ্য কি ওই কাগজপত্রে পেয়েছেন আপনি?"

"না। কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার যে পূর্বপুরুষ পুরীতে অভিযান করেছিলেন তাঁর নাম নন্দলাল সেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে। পরে আমি কিছুটা ছোট ঠাকুর্দার কাছে, কিছুটা ইতিহাস বই ঘেঁটে, আবার প্রোফেসর ভট্টাচার্যের কাছে শুনে এইটে খাড়া করেছি।" হরিপদ সেন রুমালে মুখ মুছলেন। এই না-গরম আবহাওয়াতে ওঁর ঘাম হচ্ছিল।

অমল সোম বললেন, "আপনার বংশের ইতিহাস শুনলাম। কিন্তু আপনি কেন কালাপাহাড় সম্পর্কে এতটা আগ্রহী তা বোধগম্য হচ্ছে না।"

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে উসখুস করতে লাগলেন।

অমল সোম বললেন, "দেখুন। আমি এখন সাধারণ কেস নিই না। ভাল লাগে না। যা করার অর্জুনই করে। কিন্তু এটিকে সাধারণ বলা যায় না। আপনাকে সাহায্য করতে পারি যদি আপনি কোনও কথা গোপন না করেন!"

"আমি জানি, জানি।" ভদ্রলোক রুমাল পকেটে ঢোকালেন, "আসলে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। প্রথমত, তথ্যটা ভুল হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আর কেউ জানুক সেটা আমি চাইছি না। ভুল হলেও নয়। বুঝতে পারছেন?"

অমলদা বললেন, "ডাক্তারকে কোনও রুগী রোগের কথা বললে তিনি তা পাঁচজনকে বলে বেড়ান না। আপনি যদি ভাবেন অর্ধেক জেনে কাজ করব তা হলে ভুল ভেবেছেন।"

হরিপদ সেন বললেন, "ইয়ে, ছোট ঠাকুর্দার প্রপিতামহ লিখেছেন, নন্দলাল সেন কালাপাহাড়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ এবং অসমে অভিযান করেছিলেন। এই সময় অজস্র সোনা কালাপাহাড় মাটির তলায় গোপনে সরিয়ে রাখেন। তাঁর নবাবও কিন্তু এই খবর জানতেন না। নন্দলাল মনে করতেন সেই সোনার একটা অংশ তাঁর পাওনা। কালাপাহাড় তাঁকে সেটা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে সেই সোনা উদ্ধার করা কালাপাহাড়ের পক্ষে আর

সম্ভব হয়নি। নন্দলালের মুখ থেকে তাঁর পুত্র-পৌত্ররা যা শুনে এসেছে তা হল, কালাপাহাড় যেখানে সোনা রেখেছিলেন তার চারপাশে প্রায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল, একটা বিশাল বিল আর শিবমন্দির ছিল। জায়গাটা উত্তরবঙ্গ অথবা অসমে। অসমে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ তখন তারা পুরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন। মিস্টার সোম, আমি নন্দলাল সেনের উত্তরাধিকারী। ওই সোনার একটা অংশের ওপর আমার অধিকার আছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ?"

"পারছি। কিন্তু আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন কালাপাহাড়ের এ অঞ্চলের গতিবিধির খবর জোগাড় করে দিতে। সোনা খুঁজে দিতে নয়।"

"না, না। এটা আমি আপনাকে বলতাম।" তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন হরিপদ সেন।

অমল সোম হাসলেন, "আপনি বুনো হাঁসের খোঁজে আমাকে ছুটতে বলছেন ?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই। আবার তাও নয়।"

"নয় মানে ?"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে এর পেছনে সত্যতা আছে।"

"কীরকম ?'

হরিপদ সেন পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। সেটা এগিয়ে দিলেন অমল সোমের দিকে। অমল সোম কাগজটি খুলে চোখ রাখলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে কৌতুক ফুটে উঠল, "এটি কবে পেয়েছেন ?"

"গত সপ্তাহে। তারপরেই প্রোফেসর আমাকে বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

"আপনার এই তথ্য আর কে কে জানেন ?"

"কেউ না। আমার ছোট ঠাকুর্দা আর আমি। পূর্বপুরুষরা যাঁরা জানতেন, তাঁরা অনেককাল আগে দেহ রেখেছেন।"

"আপনার বাবা জানতেন না ?"

"না। জানলেও আমাকে বলেননি। তা ছাড়া আমার ঠাকুর্দা অল্পবয়সেই চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন বলে বাবার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।"

"কিন্তু কেউ একজন জানেন, এটি তার প্রমাণ।"

"হ্যাঁ।"

"আপনার ঠাকুর্দা, আই মিন ছোট ঠাকুর্দা, এখন কেমন আছেন ?"

হরিপদ সেন মাথা নাড়লেন, "আমি চলে আসার দিন দশেক বাদে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে উনি মারা গিয়েছেন।"

"স্নান করতে গিয়ে মারা গেছেন ? উনি সমুদ্রস্নান করতেন ওই বয়সে ?"

"না। ভাল করে হাঁটতেও পারতেন না।, আমি যখন গিয়েছিলাম তখন উনি নিষেধ করেছিলেন সমুদ্রে স্নান করতে। বলেছিলেন জলে খুব ভয় ওঁর। চৈতন্যদেবের উচিত হয়নি জলের কাছে যাওয়া।"

"চৈতন্যদেব ?"

"ঠাকুর্দা চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন।"

"ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে যাননি কেন ?"

"আমি পুরী থেকে ফিরেই চণ্ডীগড় গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে। বাড়ির লোক ঠিকানা জানত না। ফিরেছিলাম দিন কুড়ি বাদে। তখন গিয়ে কোনও লাভ হত না।"

"আপনাদের পুরীর বাড়ির কী অবস্থা ? নিজস্ব বাড়ি নিশ্চয়ই !"

"তালাবন্ধ আছে। যে ঠাকুর্দাকে দেখাশোনা করত সে জানিয়েছে।"

"এই চিঠি পোস্টে এসেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মিস্টার সোম, আপনি একটু সাহায্য করুন। যদিও চারশো বছরের বেশি সময় চলে গিয়েছে, কিন্তু সোনায় তো জং পড়ে না।"

"আপনার ব্যবসার অবস্থা কেমন মিস্টার সেন ?"

"খুব ভাল নয়।"

"আপনি আজকের রাতটা এখানকার হোটেলে থাকুন। থানার কাছে 'রুবি বোর্ডিং' নামে একটা সাধারণ হোটেল পাবেন। কাল সকালে আসুন। আমি ভেবে দেখি।"

হরিপদ সেনের মুখে হাসি ফুটল, "আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। শিলিগুড়ির 'দিল্লি হোটেল' আমার পরিচিত। ওখান থেকে আসতে ঘণ্টাখানেকও লাগবে না। জিনিসপত্র সেখানেই রেখে এসেছি। কাল তা হলে আসব ?"

"বেশ। আপনার গাড়িতে ৮৮ কাগজপত্র আছে দিয়ে যান।"

"নিশ্চয়ই। আপনাকে দক্ষিণা বাবদ কত দিতে হবে এখন ?"

"দক্ষিণা পরে। আপাতত খরচ বাবদ হাজার তিনেক দেবেন। যদি কেস হাতে না নিই তা হলে আগামীকাল টাকা ফেরত পাবেন।"

হরিপদ সেন তৈরি হয়েই এসেছিলেন। পকেট থেকে একটা মোটা বান্ডিল বের করে গুনে-গুনে তিন হাজার টেবিলে রাখলেন। রেখে বললেন, "কেসটা রিফিউজ করবেন না মিস্টার সোম। প্লিজ।"

অমলদা কোনও কথা না বলে অর্জুনকে ইঙ্গিত করলেন হরিপদ সেনের সঙ্গে যেতে। বাগান পেরিয়ে গাড়ির পেছনের সিটের নীচে ফেলে রাখা একটা কাপড়ের ব্যাগ থেকে মোটা চওড়া খাম বের করে ভদ্রলোক অর্জুনের হাতে দিলেন।

অর্জুন বললেন, "এগুলো এভাবে ফেলে রেখেছেন ?"

ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে হরিপদ জবাব দিলেন, "বাজারের ব্যাগে রেখেছি

বলে কেউ সন্দেহ করবে না। আচ্ছা, আসি।"

গাড়িটা বেরিয়ে গেলে অর্জুন ভেতরে এসে অমল সোমের হাতে প্যাকেটটা দিল। তিনি সেটা নিয়ে বললেন, "বেশির ভাগ অপরাধের পেছনে কাজ করে মানুষের লোভ। ও হ্যাঁ, বিষ্টুসাহেব এখানে আসছেন। তখন খবরটা বলা হয়নি। কাল চিঠি পেয়েছি।"

"বিষ্টুসাহেব ?" চিৎকার করে উঠল অর্জুন। আনন্দে। কালিম্পং-এর বিষ্টুসাহেব। এখন আমেরিকায় আছেন। চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সে কিছু বলার আগেই অমলদা ভাঁজ করা কাগজটা এগিয়ে দিলেন, "এটা পড়ো আগে।"

কাগজটা খুলল অর্জুন। সুন্দর হাতের লেখা :

"হরিপদ সেন। যা করছ তাই করে খাও। নন্দলালের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ালে হাত খসে যাবে : কালাপাহাড়।"

॥ দুই ॥

নেতাজির স্ট্যাচুটাকে বাঁ দিকে রেখে করলা সেতুর ওপর উঠে বাইকটাকে থামাল অর্জুন। একপাশে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে রেলিঙে ভর করে নদীর দিকে তাকাল। এখন নদীর জল কচুরিপানায় ছাওয়া। আর একটু দূরে যেখানে করলা গিয়ে তিস্তায় পড়েছে, সেখানে জল স্থির হয়ে গেছে চড়া ওঠায়। এই জায়গাটা বড় ছিমছাম, নির্জন। অর্জুন একটা সিগারেট ধরাল। গত বছর ভোট দিয়েছে সে। এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক। কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের মানুষেরা এখনও কিছু ব্যাপার মেনে চলে। অর্ধ-পরিচিত বয়স্ক মানুষ দেখে অনেকেই সিগারেট লুকোয়। পরিচিতি বেড়ে যাওয়ায় অর্জুনের পক্ষে অচেনা মানুষকে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে এইরকম নির্জন জায়গা বেছে নিতে হয় সেই কারণে।

পুরো ব্যাপারটাকেই তার অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব মনে হচ্ছে। অথচ অমল সোম বললেন, "ইন্টারেস্টিং।"

কয়েকশো বছর আগে একটি অত্যাচারী সেনাপতি কোথায় কী লুকিয়ে রেখেছিল তাই খোঁজার দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে এসেছেন হরিপদ সেন। এ যেন হিমালয়ের বরফের মধ্যে থেকে একটা সুঁচ খুঁজে নিয়ে আসার মতো ব্যাপার। লোকটাকে স্বচ্ছন্দে পাগল বলা যেত, যদি না ওই চিঠিটা তিনি দেখাতেন। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, এই চিঠি হরিপদবাবু নিজেই লিখে নিয়ে আসতে পারেন ঘটনার গুরুত্ব বাড়াতে। অমলদা এটা ভাবলেন না কেন ? এমন চিঠি অন্য কাউকে দিয়ে লেখানোর বোকামি কেউ করে না, নিশ্চয়ই হরিপদ সেনও নির্বোধ নন। ভদ্রলোকের হাতের লেখার নমুনা যদি পাওয়া যেত। কিন্তু

মুশকিল হল কোনও সমস্যারই এত সহজে সমাধান হয় না।

জীবিত মানুষকে খুঁজে পেতেই হিমশিম খেতে হয়, আর এ তো মৃত মানুষ। পনেরশো আশি খ্রিস্টাব্দে যে মানুষটি মারা গিয়েছে সে কোথায় কিছু সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে পাওয়া। অর্জুন হেসে ফেলল। এই তো, কুড়ি বছরেই জলপাইগুড়ির চেহারা কত বদলে গেল। আটষট্টির বন্যার আগে শহরটার চেহারা নাকি অন্যরকম ছিল। অমলদা বলেন, তিস্তায় বাঁধ হওয়ার আগে চরে অদ্ভুত চেহারার ট্যাক্সি চলত। এসব এখন কি তারা ভাবতে পারে? অত কথা কী, জলপাইগুড়ির খেলাধুলোর জগতে যাঁর দান সবচেয়ে বেশি সেই রায়সাহেব তো মারা গিয়েছেন কয়েক বছর হল। এখন যদি তাঁকে বলা হয় রায়সাহেব, কখন কোথায় গিয়েছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আবিষ্কার কর, তা হলে কি সে সক্ষম হবে? অথচ অমলদা বলে দিলেন কাল সকালের মধ্যে কালাপাহাড় লোকটা, মানে ইতিহাসের সেই সেনাপতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে এস। কালাপাহাড় সম্পর্কে চালু ইতিহাস বইয়ে নাকি দু-চার লাইনের বেশি জানতে পারা যায় না। এখন লাইব্রেরি খোলার সময় নয়। তা হলে বাবুপাড়া পাঠাগারে গিয়ে দেখা যেত কালাপাহাড়ের ওপর কোনও বই পাওয়া যায় কি না! সিগারেটটা শেষ হল তবু অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না অমল সোম এরকম কেস নিলেন কেন! আগামীকাল সকালে যদিও দেখা করতে বলেছেন, আর সেটাই তো নেওয়ার লক্ষণ।

এই সময় ওর গৌরহরিবাবুর মনে পড়ল। স্কুলে ইতিহাস পড়াতেন। খুব পণ্ডিত মানুষ। দু'বছর আগে অবসর নিয়ে সেনপাড়ায় আছেন। অনেককাল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। অবসর নেওয়ার কথাটা সে শুনেছিল। খুব রাগী মানুষ, পড়া না করে এলে ক্ষেপে যেতেন। অর্জুন বাইক ঘোরাল।

সেনপাড়ায় গৌরহরিবাবুর বাড়িতে সে ছাত্রাবস্থায় একবার এসেছিল। আজ খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। টিনের ছাদ, গাছপালা আছে। রাস্তার দিকটা টিনের দেওয়াল তুলে একটু আব্রু রাখার চেষ্টা। গরিব মাস্টারমশাইয়ের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। অর্জুন বাইরের দরজায় তিনবার শব্দ করার পর একটি মহিলা কণ্ঠ ভেসে এলো, "কে?"

"সার আছেন? আমি অর্জুন।"

তিরিশ সেকেন্ড বাদে দরজাটা খুললেন এক প্রৌঢ়া, "ওঁর শরীর ভাল নেই।"

"ও, ঠিক আছে তা হলে।" অর্জুন ফেরার জন্য ঘুরছিল, এই সময় ভেতর থেকে গৌরহরিবাবুর গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ গো, কে এসেছে, সার বলল যেন?"

"তোমার নাম অর্জুন বললে?" প্রৌঢ়া জিজ্ঞেস করতেই সে মাথা নাড়ল।

তিনি তখন গলা তুলে সেটা জানিয়ে দিতেই গৌরহরিবাবু ভেতরে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

অর্জুন উঠোনে পা দিল। নানারকম ছোট গাছে উঠোন সাজান। টাঙানো দড়িতে কাপড় শুকচ্ছে। গলার স্বর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকের বারান্দায় পা দিল সে। দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরটিতে যে আলো ঢুকছে তাতেই গৌরহরিবাবুকে দেখা গেল। একটা খাটে শুয়ে আছেন তিনি, মুখে হাত চাপা দিয়ে। অর্জুন বলল, "সার, আপনি অসুস্থ ?"

হাত সরালেন গৌরহরিবাবু, "অর্জুন মানে, আমার ছাত্র যে গোয়েন্দা হয়েছে ?"

অর্জুন হাসলো, "আমি বলি সত্যসন্ধানী।"

"ভাল শব্দ। গর্ব হয়। বুঝলে হে। তোমরা যারা নাম করেছ তাদের জন্য গর্ব হয়। অসুস্থ, মানে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস। চোখে কম দেখি। এখন আলো পড়লে কষ্ট হয়। তা কী ব্যাপার বাবা ? আমার কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন ?" চোখ বন্ধ করেই প্রশ্ন করলেন গৌরহরিবাবু। অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। ঠিক কীভাবে প্রশ্নটা করবে বুঝতে পারছিল না। তাছাড়া শুধু স্বার্থের প্রয়োজনে সে এসেছে এটা জানাতেও খারাপ লাগছিল।

অর্জুন বলল, "আপনি অসুস্থ, আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।"

"কথা বলতে তো কোনও অসুবিধে নেই। চোখ বন্ধ রাখতে হবে এই যা।"

"আমি একটু সমস্যায় পড়েছি। ইতিহাসে কালাপাহাড় নামে একটি মানুষের কথা পড়েছিলাম। আপনার কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।"

"কালাপাহাড় ? দাউদ খাঁয়ের সেনাপতি। পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে মারা যান।"

"হ্যাঁ। ওঁর সম্পর্কে বিস্তারিত খবর কোথায় পাব ?"

"বিস্তারিত জানতে হলে অনেক বই পড়তে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' নামে একটা বই বেরিয়েছিল, এখানে তো পাবে না। এই উত্তরবাংলায় কালাপাহাড়ের আনাগোনা ছিল। মনে করে তোমাকে আমি একটা বই-এর লিস্ট তৈরি করে দেব যা পড়লে অনেকটাই জেনে যাবে। এই কালাপাহাড়ের আসল নাম কী জান ?"

"উনি আগে হিন্দু ছিলেন।"

"হ্যাঁ। তখন হয় রাজকৃষ্ণ, রাজচন্দ্র নয় রাজনারায়ণ, এই তিনটির একটি হল ওঁর আসল নাম। লোকে জানতো রাজু বলে। মুসলমান ঐতিহাসিকরা দাবি করেছিলেন যে, উনি আফগান। এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। অসমে গেলে দেখবে লোকে ওঁকে পোড়াকুঠার, অথবা কালাকুঠার বলে চেনে। আমাদের কী অবস্থা, চারশো বছর আগের ঘটনাতে কত ধোঁয়াশা

ছড়িয়ে আছে।"

অর্জুন আজকাল পকেটে একটা ছোট্ট ডায়েরি রাখে। তাতেই গৌরহরিবাবুর বলা নামগুলো নোট করে নিচ্ছিল। গৌরহরিবাবু একটু ভেবে নিলেন, "রাজু ব্রাহ্মণের ছেলে। কিন্তু শাস্ত্র ছেড়ে অস্ত্র চালাতে সে পারদর্শী হয়ে উঠল। ছেলের এই মতিগতি তার বাবার পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তখন বাংলার নবাব সুলেমান কিরানি। কিন্তু ছোট-ছোট নবাবের সংখ্যাও বেশ। এরা নামেই নবাব, আসলে জায়গিরদার ধরনের। সুলেমান কিরানিকে কর দিত। এই রকম এক জায়গিরদারের মেয়ের প্রেমে পড়ল রাজু। মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণতনয়ের সম্পর্ক হলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া চারশো বছর আগে হতে পারত তা অনুমান করতে পার নিশ্চয়ই।" হঠাৎ থেমে গেলেন গৌরহরিবাবু। কিছু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "বাঙালির ইতিহাসটা তুমি জান তো?"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। সে যেটুকু জানে তা গত দুশো বছরের। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ এ-দেশের দখল নেওয়ার পরে যা ঘটেছিল সেই ঘটনাগুলো। স্বীকার করল সে। গৌরহরিবাবু হাসলেন, "না, এতে সঙ্কোচ করার কিছু নেই। তোমরা জান না সেটা আমাদের লজ্জা। আমরা ইতিহাস বইয়ে রাজা নবাবের গল্প লিখি। তাই পাঠ্য হয়। কিন্তু নিজেদের কথা আলাদা করে তোমাদের পড়াইনি। আমরা আবেগে চলি। ইতিহাস খুবই বাস্তব।"

অর্জুন চুপচাপ রইল। কালাপাহাড়ের কথা জানতে এসে কেন বাঙালির ইতিহাস শুনতে হবে এই প্রশ্ন করা যায় না। তবে বাঙালি হিসেবে নিজেদের ইতিহাসটা নিশ্চয়ই জানা দরকার।

গৌরহরিবাবু বললেন, "আগে যাদের আদি অস্ট্রেলীয় বলা হত এখন তাদের ভেড্ডিড বলা হয়। এরাই ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। লম্বা মাথা, চওড়া নাক, কালো রং আর মধ্যম আকার। এখনও বাঙালিদের মধ্যে ভেড্ডিডদের কিছু শব্দ চালু আছে, গ্রামের হাটে গেলে শুনবে এক কুড়ি পান, দু' কুড়ি লেবু। হাত-পায়ের আঙুল মিলিয়ে এই কুড়ি শব্দটি ভেড্ডিডদের দান। অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী মানুষেরা এককালে এ-দেশের নদনদী পাহাড় আর জায়গার যে নামকরণ নিজেরা করেছিল এখনও আমরা তাই বলি। যেমন কোল দব-দাক বা দাম-কাক থেকে কপোতাক্ষ বা দামোদর নদ। দা বা দাক মানে জল।

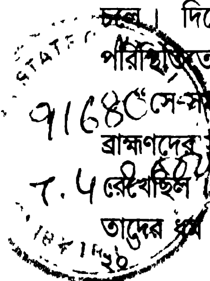
"বাংলা নামটা এল কোত্থেকে? আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরি বইয়ে বলেছেন বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাংলা হয়েছে। আল মানে বাঁধ। জলের দেশে বাঁধ দরকার হয়। তাই বাংলা। বাংলাদেশে একসময় অনেক মানুষের ভিড়। বঙ্গ, গৌড়, পুন্ড্র, রাঢ়। বঙ্গের নাম মহাভারতে আর বৃহৎসংহিতায় পাওয়া যায়। আমি এসব বেশি বললে তুমি হয়তো বিরক্ত

হবে। ওই চারটি ভাষার মানুষ চারটি জায়গা জুড়ে ছিল যা পরে সমগ্র বাঙালি জাতির মাতৃভূমি বলে চিহ্নিত হয়েছে। আগে ছিল সব টুকরো-টুকরো। এ ওর ভাষা বুঝত না। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক এসে মুর্শিদাবাদ থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একটা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেহারা দেন। শশাঙ্কের পর তিনটে জনপদ হল। পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় এবং বঙ্গ। পাল আর সেনরাজারা সমস্ত বাংলাদেশকে গৌড় নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব হয়নি। তিনটে কমে দুটোতে এসে ঠেকেছিল। গৌড় এবং বঙ্গ।

“শশাঙ্কের পর এ-দেশে মাৎস্যন্যায় চলেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা ভাষার মানুষ এখানে এল। এমনকী কাশ্মীরের রাজা মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য পর্যন্ত গৌড় আক্রমণ করে বিজয়ী হন। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। বাংলার অন্য রাজারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী। শশাঙ্ক সম্ভবত হর্ষবর্ধনের জন্যই বৌদ্ধধর্মবিরোধী। এর পরে গোপালদেব এসে মাৎস্যন্যায় দূর করেন। শুরু হল পাল বংশ। আজকের বাঙালি জাতির গোড়াপত্তন হয়েছে এই যুগেই। অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। সেই অর্থে বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের বেশি নয়।”

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “আমাদের ইতিহাস মাত্র হাজার বছরের ?”

“হ্যাঁ। তাও ধাপে-ধাপে এগিয়েছে। লক্ষ্মণসেনরা ছিলেন কর্ণাটকের মানুষ। ওঁর পূর্বপুরুষ পালরাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকপুরুষ থাকার ফলে এখানকার মানুষ হয়ে যান শেষ পর্যন্ত। তা আজকের বাঙালির অনেকের পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। তারপর মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি লক্ষ্মণসেনকে ঢাকার কাছে লক্ষ্মণাবতীতে পাঠিয়ে এদেশ দখল করে নিলেন। পালেদের সময় এদেশে বৌদ্ধরা এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব খুব সীমায়িত ছিল। পাঠানরা ক্ষমতা পাওয়ার পর এদেশে যারা কিছুটা নির্যাতিত তারা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মুসলমান হলেন। কেউ-কেউ চাপে পড়ে বা অতিরিক্ত সুবিধে পাওয়ার জন্যও ধর্মবদল করেন। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এইসব ধর্মান্তরিত মানুষকে হিন্দু বাঙালি সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু নবাবের ভয়ে সরাসরি কোনও ব্যবস্থাও নিতে পারেনি। সামাজিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের দুটি ধারা পৃথকভাবে বয়ে চলল। দিনে-দিনে এ-দেশীয় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এইরকম পরিস্থিতিতে রাজু বা রাজকৃষ্ণ ধর্মান্তরিত হন।



“সে-সময় হিন্দু থেকে মুসলমান অথবা বৌদ্ধ হওয়া খুব সহজ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্কীর্ণতা অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য হিন্দুধর্মে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। পাঠানদের এদেশের মানুষ সাধারণত শত্রু বলেই মনে করত। তাদের ধর্ম যেসব স্বদেশি গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষমা করার উদারতা এদের ছিল

না।

"ধর্মান্তরিত রাজু তাই বিতাড়িত হল। তার পরিবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সে বাধ্য হল। পরবর্তীকালে রাজুকে আবার ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করেনি। মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নির্মমভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই আচরণ তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। স্বভাবতই হিন্দুবিদ্বেষী হতে তার বেশি দেরি হয়নি। রাজু ক্রমশ নবাবের সৈন্যদলে বিশিষ্ট হয়ে উঠল। নবাবি সৈন্য যখন কোনও অভিযান করত তখন তার লক্ষ ছিল সেই অঞ্চলের মন্দির ভাঙা, বিগ্রহ চূর্ণ করা আর হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালানো। আর এই কারণেই লোকে তার নামকরণ করল কালাপাহাড়।"

কালাপাহাড়ের প্রসঙ্গে চলে আসায় অর্জুন খুশি হল। এতক্ষণ সে একটু বিষণ্ণ ছিল। ইংরেজ বা ফরাসিরা নাকি হাজার-হাজার বছর ধরে নিজেদের সভ্য করেছে, রোমানদের সংস্কৃতিও সেইরকম। কিন্তু বাঙালির নিজস্ব কোনও সংস্কৃতি হাজার বছরের বেশি নয়, এটা ভাবতে তার খুব খারাপ লাগছিল।

গৌরহরিবাবু একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, "কালাপাহাড় সুলেমান কিরানি এবং পরে ওঁর ছেলে দাউদের সেনাপতি হয়েছিলেন। ওদিকে অসম আর এদিকে কাশী এবং ওড়িশার প্রায় কোনও মন্দির কালাপাহাড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। বোঝা যাচ্ছে এই অঞ্চল জুড়ে ওর গতিবিধি ছিল। গল্পে আছে, মন্দির ধ্বংস করার আগে কালাপাহাড় সৈন্যদের দূর থেকেই কাড়ানাকাড়া বাজাতে বলত।

"কালাপাহাড় ওড়িশা-অভিযান করে পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে। তখন রাজা মুকুন্দদেব পুরীতে। মুকুন্দদেবের পরাজয় হয়। ওঁর ছেলে গৌড়িয়া গোবিন্দকে পদানত করে কালাপাহাড় পুরীর মন্দির ধ্বংস করতে যায়। পাণ্ডারা এই খবর পেয়ে জগন্নাথদেবের মূর্তি নিয়ে গড় পারিকুদে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। কালাপাহাড়ের হাত থেকে তবু সেই মূর্তি রক্ষা পায়নি। জগন্নাথদেবের মূর্তি পুড়িয়ে সে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। কালাপাহাড়ের অনেক আগে তিনশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে রক্তবাহু নামে একজন পুরী আক্রমণ করেছিল কিন্তু তখন পাণ্ডারা জগন্নাথদেবকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

"আকবরনামায় আছে দাউদের বিদ্রোহী স্বভাবের জন্য মুগল সম্রাট সেনাপতি মুনিম খাঁকে পাঠায় তাকে বন্দি করতে। কালাপাহাড় দাউদের সেনাপতি হিসেবে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। একসময় সে কাক্‌সাল নামে একটি জায়গাও অধিকার করে। কিন্তু পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে কালাপাহাড় মারা যায়।

"একজন বাঙালি হিসেবে কালাপাহাড় আমাদের ইতিহাসের প্রথম দিকে সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে লোকটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ব্রাহ্মণরা ওকে হিন্দুবিদ্বেষী করেছিল। সেই মানুষ আজ

কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটি রহস্য আমাকে খুব ভাবায়। আমি অনেককে চিঠি লিখেছিলাম। কেউ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তুমি শুনতে চাও ?”

“বলুন।” অর্জুন এখন এই কাহিনী-রসে প্রায় ডুবে গিয়েছে।

“কালাপাহাড় ওড়িশা অভিযান করে পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে। তার ঠিক বত্রিশ বছর, মাত্র বত্রিশ বছর আগে এক বাঙালি মহাপুরুষের পুরীতে মৃত্যু হয়। তিনি শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে গিয়েছিলেন পনেরোশো দশ খ্রিস্টাব্দে। তখন পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর ভক্ত হন। পরে যখন চৈতন্য পুরীতে পাকাপাকি বাস করছেন তখন রাজা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও কাজ করতেন না। পনেরোশো কুড়ির পর থেকে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস আর তিনি মহাপুরুষের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন। রাজার এক ভাই গোবিন্দ বিদ্যাধর পাণ্ডাদের ক্ষেপিয়ে তুললেন। তাদের বোঝানো হল রাজা জগন্নাথের চেয়ে চৈতন্যকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। যে চৈতন্য জাত বিচার করল না, রাজা যদি তাঁর শিষ্য হন তা হলে জগন্নাথের মন্দির তো অপবিত্র হয়ে যাবে। পুরীতে তখন কিছু বৌদ্ধসঙ্ঘ ছিল। রাজার ভাই তাঁদেরও ক্ষেপিয়ে তুললেন চৈতন্যের বিরুদ্ধে। রাজা না-জগন্নাথ না-বৌদ্ধসঙ্ঘ কারও দিকে নজর দিচ্ছেন না, শুধু চৈতন্য নামে নবদ্বীপ থেকে আসা লোকটির মায়ায় ভুলে আছেন, এই তথ্য অনেককেই ক্রুদ্ধ করল। গোবিন্দ বিদ্যাধর গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

“চৈতন্যদেব জগন্নাথে লীন হননি, সমুদ্রে ভেসে যাননি। তা হলে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যেত। শুধু তিনি নন, তাঁর পার্ষদদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। পনেরোশো তেত্রিশের উনত্রিশে জুন দুপুর থেকে রাত্রের শেষ ভাগ পর্যন্ত জগন্নাথদেবের মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল। চৈতন্যদেবকে সপার্ষদ সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর তাঁরা উধাও। রাজা এই অন্তর্ধানের তদন্ত করতে চেয়েও সফল না হয়ে কটকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যুবরাজকে পাঠিয়েছিলেন। যুবরাজ মাস-চারেকের মধ্যেই নিহত হন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক এবং পাণ্ডাদের শত্রু হিসেবে প্রচার করে যাঁর লাভ হত সেই রাজার ভাই গোবিন্দ বিদ্যাধরের সিংহাসন দখল করার বাসনা পূর্ণ হয়নি।

“নবদ্বীপে নিশ্চয়ই এই খবর পৌঁছেছিল। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ হয়ে লীন হয়ে গেছেন, এই বিশ্বাস অনেকেই করেননি। পুরী অভিযানের আগে কালাপাহাড় গিয়েছিল নবদ্বীপে। অদ্ভুত ব্যাপার, সে সেখানকার মন্দিরের ওপর তেমনভাবে ক্রুদ্ধ হতে পারেনি। সেই প্রথম সে জানতে পারে চৈতন্য নামের একটি মানুষ হিন্দ-মুসলমানকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। মুসলমানকে

আলিঙ্গন করেছেন। কোনও ভেদাভেদ রাখেননি। এই তথ্য কি কালাপাহাড়ের হৃদয়ের ক্ষতকে শান্ত করেছিল ? তার নিজের অভিজ্ঞতার বিপরীত ছবি দেখে সে কি চৈতন্য সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল ? তার কানে কি চৈতন্যের অন্তর্ধানের খবর পৌঁছেছিল ? পাণ্ডাদের রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন চৈতন্য, এইরকম ধারণা করেই কি সে প্রতিশোধ নিতে পুরী অভিযান করেছিল ? মাত্র বত্রিশ বছর পরেই আর-এক বাঙালির এই অভিযান কি শুধুই রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা ? কালাপাহাড় অন্য জায়গার মন্দির ধ্বংস করেছে। কিন্তু জগন্নাথের মন্দির পাণ্ডাদের দখলে বলে কোন প্রতিশোধের ইচ্ছায় বিগ্রহ পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল ? কেউ উত্তর দিতে পারেননি। যদি আমার সন্দেহ সত্যি হয় তাহলে কালাপাহাড়ের চরিত্রের আর-একটি দিকে আলো পড়বে। আমরা নতুনভাবে বিস্মিত হব।"

এই সময় সেই প্রৌঢ়া দরজায় এসে দাঁড়ালেন, "তুমি অনেকক্ষণ কথা বলেছ। আর নয়।"

গৌরহরিবাবু হাসলেন, "প্রিয় বিষয়, পুরনো ছাত্র !"

"তা হোক। দরকার থাকলে না হয় পরে আসবে।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "সার, আমি চলি। দরকার হলে পরে আবার আসব।"

গৌরহরিবাবু শুয়ে-শুয়েই হাত নাড়লেন। তাঁর চোখ বন্ধ। প্রায় দৃষ্টিহীন এই ইতিহাস-প্রেমিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অতীত দেখে যান চুপচাপ, অর্জুনের তাই মনে হল।

লাল মোটরবাইকে চেপে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অর্জুন হেসে ফেলল। হরিপদ সেন চেয়েছিলেন কালাপাহাড় উত্তর বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ছিলেন এবং সেখানে ওই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এমন জায়গা আছে কি না যেখানে সোনাদানা পুঁতে রাখা সম্ভব, তা খুঁজে বের করে দিতে। সারের সঙ্গে কথা বলে তার ধারে কাছে যাওয়া গেল না। শুধু কালাপাহাড় সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা ছবি পাওয়া গেল, আর সেইসঙ্গে বাঙালির ইতিহাস। অবশ্য অমল সোম শুধু এইটুকুই চেয়েছিলেন।

কদমতলার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে সে অবাক। হাবু রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অমলদার এই স্বাস্থ্যবান বোবা-কালা কাজের লোকটিকে খুব ভালবাসে অর্জুন। তাকে দেখামাত্র হাবু হাত-পা নেড়ে মুখ বেঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল অমলদা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বোঝামাত্র হাবুকে পেছনে বসিয়ে মোটরবাইক ঘুরিয়ে হাকিমপাড়ার দিকে ছুটে গেল অর্জুন।

॥ তিন ॥

হাবু সম্পর্কে অর্জুনের একটা কৌতুহল আছে। অনেকদিন ধরে দেখে আসছে সে এই লোকটাকে। অমলদা কোত্থেকে ওকে পেয়েছিলেন, কেমন করে হাবু এতসব শিখে গেল, তা কখনওই গল্প করেননি। আজকাল অমলদা অনাবশ্যক কথা বলেন না। হাবুর গায়ে ভীষণ জোর, বুদ্ধি মাঝে-মাঝে খুলে যায়, কিন্তু বোবা-কালা মানুষটি অমলদার পাহারাদার ওরফে রাঁধুনি ওরফে মালি ওরফে সবকিছু হয়ে দিব্যি রয়ে গেছে। মোটরবাইকের পেছনে বসে হাবু শক্ত হাতে তাকে ধরে আছে এখন। ওকে আঙুল আগা করতে বলে কোনও লাভ নেই, হাবু শুনতেই পারে না।

সনাতন নামের সেই লোকটা যখন অমলদার বাড়িতে এসেছিল তখন মোটেই খুশি হয়নি হাবু। তখন সনাতন যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। লোকটা সত্যি অদূর ভবিষ্যৎ দেখতে পেত। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল কে জানে। অমলদা সনাতনকে কোত্থেকে জোগাড় করেছিলেন তাও রহস্য। হাকিমপাড়ায় ঢুকে মোটরবাইক যখন বাঁক নিচ্ছে তখন পিঠে মৃদু টোকা মারল হাবু। অর্জুন বাইকটাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করাতেই টপ করে নেমে পড়ল হাবু। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল ?"

যে মানুষ ওর সঙ্গে কথা বলছে তার ঠোঁটনাড়া দেখতে পেলে হাবু যেন বুঝতে পারে। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে হাত নেড়ে ওপাশের দোকানগুলো দেখিয়ে হাঁটা শুরু করল। অর্থাৎ কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরবে। অনেকদিন আগে অর্জুন একবার অমলদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "বোবা-কালা একজন মানুষের সঙ্গে থাকতে অসুবিধে হয় না ?" অমলদা মাথা নেড়েছিলেন, "আমার খুব সুবিধেই হয়। বাড়িটা নিস্তব্ধ থাকে। নিজের মনে কাজ করতে পারি। অনবরত কারও বকবকানি শুনতে হয় না।"

গেটের সামনে পৌঁছে ব্রেক কষল অর্জুন। অনেকখানি ঘষটে গিয়ে দাঁড়াল বাইকটা। মাঝে-মাঝে তার ইচ্ছে হয় সার্কাসের বাইকওয়ালার মতো কোনও ছোট নালা বাইক নিয়ে টপকে যেতে। এখনও ঠিক সাহসটা আসছে না।

গেট খুলে পা বাড়াতেই অমলদার হাসির শব্দ শোনা গেল। বেশ প্রাণখোলা হাসি। অনেককাল অমলদাকে এভাবে হাসতে শোনা যায়নি। আর-একটু এগোতে একটা গলা কানে এল, "তার মানে নিরোর সময় বাঙালি বলে কোনও জাত ছিল না ? ইস, এখন নিজেকে একেবারে যাকে বলে ভুঁইফোড়, তাই মনে হচ্ছে।"

এই গলা ভোলার নয়। বসার ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় উঠে দরজায় দাঁড়াতেই বিষ্টুসাহেবকে দেখতে পেল অর্জুন। পা ছড়িয়ে বসে আছেন। রোগা বেঁটেখাটো মানুষটাকে এখন আরও বুড়ো দেখাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দরজার

দিকে তাকাতেই তিনি চিৎকার করলেন, "আরে, তৃতীয় পাণ্ডব, এ যে একেবারে নবীন যুবক, ভাবা যায় ?"

অর্জুন ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে প্রণাম করল, "কেমন আছেন ?"

বিষ্টুসাহেব দু' হাতে বাতাস কাটলেন, "নতুন শক্তি পেয়েছি হে। আমেরিকানরা আমার শরীরের যেসব জায়গা রোগের কামড়ে বিকল, তা ছেঁটেকেটে বাদ দেওয়ার পর আর কোনও প্রবলেম নেই।" নিজের বুকে হাত দিলেন তিনি, "বাইপাস সার্জারি।"

অর্জুনের খুব ভাল লাগছিল। সে বিষ্টুসাহেবের পাশে গিয়ে বসল। তার চোখের সামনে এখন কালিম্পং-এর দিনগুলো, লাইটার খুঁজতে আমেরিকায় যাওয়া আর বিষ্টুসাহেবের হাসিখুশি মুখ ক্রমশ রোগে পাণ্ডুর হয়ে যাওয়া ছবিগুলো ভেসে গেল। বিষ্টুসাহেব যে আবার এমন তরতাজা কথা বলবেন তা কল্পনা করতে পারেনি সে। অমলদা বললেন. "অর্জুনকে তো দেখা হয়ে গেল, এবার খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম করুন। অনেকদূর পাড়ি দিতে হয়েছে আপনাকে।"

মাথা নাড়লেন ছোট্টখাট্টো মানুষটি। একমুখ হাসি নিয়ে চুপ করে রইলেন খানিক। তারপর বললেন, "নো পরিশ্রম। জে এফ কে থেকে হিথরো পর্যন্ত ঘুমিয়ে এসেছি। হিথরোতে কয়েক ঘণ্টা চমৎকার কেটেছে। হিথরো থেকে দিল্লি নাক ডাকিয়েছি। দিল্লিতে এক রাত হোটেলে। উত্তেজনায় ভাল ঘুম হয়নি অবশ্য। আব দিল্লি থেকে বাগডোগরা আসতে ঘুমের প্রশ্নই ওঠে না। দেশের মাটিতে ফেরার উত্তেজনার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা করাই চলে না। এখন আমি একটুও ক্লান্ত নই।"

"আপনি একাই এতটা পথ এলেন ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ইচ্ছে ছিল তাই, কিন্তু আর-একজনকে বয়ে আনতে হল।" বিষ্টুসাহেব চোখ বন্ধ করলেন, "মেজর এসেছেন সঙ্গে। তিনি গিয়েছেন কালিম্পঙে।"

"অ্যাঁ, মেজর এসেছেন।" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অর্জুন।

হঠাৎ অর্জুনের গায়ে হাত বোলালেন বিষ্টুসাহেব, "নাঃ, এই ছেলেটা দেখছি একদম বড় হয়নি। সেই ফ্রেশনেশটা এখনও ধরে রেখেছে। বড় হলেই মানুষ কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। এবার ক'দিন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে, কেমন ?"

জমিয়ে আড্ডা বলে কথা! অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে। অমলদা, বিষ্টুসাহেব, মেজর ও সে। কতদিন পরে এক জায়গায় হওয়া যাবে! সে জানত মেজর আসছেন দিন-দুয়েকের মধ্যেই। এখানে ওঁরা কয়েকদিন থাকবেন।

বেলা বাড়ছিল। বিষ্টুসাহেবের ইচ্ছে ছিল অর্জুন এখানেই খেয়ে নিক। কিন্তু অমলদাই আপত্তি করলেন। বাড়িতে বলা নেই, অর্জুনের মা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে থাকবেন। তাই বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে অর্জুন বিকেলে

চলে আসুক।

বিষ্টুসাহেব ভেতরে চলে গেলে অমলদা বললেন, "যাও, আর দেরি কোরো না। ও হ্যাঁ, কিছুটা আশা করি এগিয়েছ এর মধ্যে!"

"হ্যাঁ। ইতিহাস জানলাম। তবে আলগা-আলগা।"

"পাঁচশো বছরের আগে যাওয়ার দরকার নেই। শ্রীচৈতন্যদেব থেকে শুরু করো। ওই সময় কেউ তো ইতিহাস লিখব বলে লেখেনি।"

"আপনি মোটামুটি বাঙালির ইতিহাসটা জানেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"যেটুকু না জানাটা অপরাধ সেটুকুই জানি।" অমলদা হাসলেন, "অর্জুন, তুমি তোমার ক'জন পূর্বপুরুষের নাম জান?"

অর্জুন মনে করার চেষ্টা করল। বাবা-ঠাকুর্দার নাম ধর্তব্যের মধ্যে আসছে না। বাবার ঠাকুর্দার নাম সে জানে। মা বলেছিলেন বাড়িতে একটা কাগজে চৌদ্দপুরুষের নাম নাকি লিখে রেখেছিলেন বাবা। তিনি মারা যাওয়ার পর সে আর ওই কাগজপত্র দেখেনি। তাই পূর্বপুরুষ বলতে তার আগের তিন পুরুষেই এখন তাকে থেমে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ এটা মনে হতে লজ্জা করল অর্জুনের। আমরা বাহাদুর শা'র পূর্বপুরুষের নাম জানি অথচ নিজের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে উদাসীন। বাবার লেখা কাগজটা যদি না পাওয়া যায়, মায়ের যদি সেসব মনে না থাকে তাহলে তাদের বংশের অতীত মানুষগুলো চিরকালের জন্য অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন।

অমলদা বললেন, "ঠিকই, জেনে রাখা ভাল, কিন্তু দরকার পড়ে না বলে তিন-চার পুরুষের বেশি খবর রাখি না। চার পুরুষ মানে একশো বছর। কালাপাহাড় ছিলেন তোমার কুড়ি পুরুষ আগে। ব্যাপারটা তাই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। বিকেলে এসো, এ-ব্যাপারে কথা বলা যাবে।"

মোটরবাইকে উঠে অর্জুনের হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। এই যে আমরা পুরুষ-পুরুষ করি, কেন করি? কেন বাবা-ঠাকুর্দাকে ধরে প্রজন্ম মাপা হচ্ছে এবং তাকে পুরুষ আখ্যা দেওয়া হবে? মা-দিদিমাকে ধরে নারী শব্দটাকে পুরুষের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন? আজ যখন ছেলেমেয়ে সমান জায়গায় এসে গিয়েছে তখন মেয়েরা এই পুরুষ-মাপা প্রথাটার বিরুদ্ধে কথা বলতেও তো পারে!

দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বাইক নিয়ে বের হল অর্জুন। জলপাইগুড়ির ইতিহাস জানেন এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া দরকার। তার ছেলেবেলায় চারুচন্দ্র সান্যাল নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি মারা গিয়েছেন, যাঁর নখদর্পণে এসব ছিল বলে সে অমলদার কাছে শুনেছে। রূপশ্রী সিনেমার সামনে এসে সে বাইক থামাল। জগুদা আর-এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ভদ্রলোকের মুখে দাড়ি, কাঁধে ব্যাগ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে। তাকে দেখে জগুদা হাত তুললেন। মালবাজার ঘুরে এখন জগুদার অফিস শিলিগুড়িতে। ডেইলি

প্যাসেঞ্জারি করেন। এই অসময়ে এখানে কোনও প্রশ্ন করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না সে।

জগুদা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, "এই যে, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আপনাকে বলেছিলাম। এরই নাম অর্জুন, আমাদের শহরের গর্ব। বিলেত আমেরিকায় গিয়েছিল সত্যসন্ধান করতে। আর ইনি হলেন ত্রিদিব দত্ত। মন্দির নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। কলকাতার কলেজে পড়ান।"

মন্দির নিয়ে গবেষণা করার কথা শোনামাত্র অর্জুনের মনে পড়ল কালাপাহাড়ের কথা। কালাপাহাড় তো একটার-পর-একটা মন্দির ভেঙেছেন। ইনি নিশ্চয়ই সেসব খবর রাখেন। সে নমস্কার করল। ত্রিদিববাবু বললেন, "আমরা এখানকার দেবী চৌধুরানির তৈরি মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই ভাই তোমার কথা ইনি বলছিলেন।"

"আমার কথা কেন?"

"এ-দেশে মন্দিরের সঙ্গে অপরাধের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই কিছুকাল আগেই ডাকাতরা ডাকাতি করার আগে কালীর মন্দিরে পুজো দিতে যেত। সেই প্রসঙ্গে অপরাধ নিয়ে আলোচনা করতে করতে অপরাধ-সাহিত্য থেকে গোয়েন্দাদের কথা এসে গেল। আমি ভাবতে পারছি না জলপাইগুড়ির মতো শহরে কেউ শুধু এই কাজ করে কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে? এখানে কেস কোথায়?"

"অপরাধী তো সব জায়গায় থাকে।" অর্জুন বলতে-বলতে দেখল ভদ্রলোকের কাঁধের কাপড়ের ব্যাগের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট লাঠির ডগা দেখা যাচ্ছে। লাঠিটা বেশ চকচকে এবং গোল।

জগুদা বললেন, "চললে কোথায় অর্জুন?"

"একটু ইতিহাস খুঁজতে। জগুদা, জলপাইগুড়ির ইতিহাস ভাল কে জানেন?"

"মলয়কে বলতে পারো। ওরা এসব নিয়ে থাকে।" এই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল সামনে। জিপটাকে অর্জুন চেনে। ভাড়া খাটে। জগুদা বললেন, "হাতে সময় থাকলে আমাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারো।"

"কোথায় যাচ্ছেন?"

"জল্পেশের মন্দির দেখতে। ত্রিদিববাবু এর আগেও ওখানে গিয়েছেন কিন্তু আর-একবার ওঁর যাওয়া দরকার।"

অর্জুন মনে করতে পারছিল না আজ সকালে মাস্টারমশাই কালাপাহাড় সম্পর্কে বলতে গিয়ে জল্পেশের মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছিলেন কি না। কিন্তু কালাপাহাড় যদি এই অঞ্চলে থেকে থাকেন তা হলে ওই মন্দির নিশ্চয়ই তাঁর চোখে পড়েছিল। জল্পেশের মন্দির তো আরও প্রাচীন।

নিরালার পাশে মোটরবাইক রেখে অর্জুন জিপে উঠে বসল। এখন তিনটে

বাজে। হয়তো ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। কিন্তু অর্জুনের মনে হচ্ছিল একবার যাওয়া দরকার। হাসপাতালের সামনে দিয়ে রায়কতপাড়া পেরিয়ে জিপ ছুটছিল। ত্রিদিববাবু এবং জগুদা ড্রাইভারের পাশে বসেছিলেন। পেছনে বসে পিছলে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে। অর্জুন চুপচাপ ভাবছিল। রাজবাড়ির গেটের সামনে দুটো. ছেলে হাতাহাতি করছে। তাদের ঘিরে ছোট্ট ভিড়। তারপরেই জিপ শহরের বাইরে। তিস্তা ব্রিজ সামনে। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল সে অতীত নিয়ে বড্ড বেশি ভাবছে। অথচ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন বর্তমানের কালাপাহাড় নামক এক অজ্ঞাত মানুষের কাছ থেকে যে হুমকি দেওয়া চিঠি পেয়েছেন তার কোনও হদিস নেওয়া হচ্ছে না।

হরিপদ সেন তাঁর পিতামহের-প্রপিতামহের কিছু কাগজপত্রের প্যাকেট অমলদাকে দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে কী লেখা আছে তা অমলদা এখনও বলেননি। আজকাল সব ব্যাপারেই অমলদার উৎসাহ এমন তলানিতে এসে ঠেকেছে যে, হয়তো এখনও খুলেই দেখেননি ওগুলো। আগামীকাল হরিপদবাবু শিলিগুড়ি থেকে আবার আসবেন অমলদার বাড়িতে। সেই সময় অমলদা তাঁকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর তা হলে তো সব কাজ চুকে যাবে। অর্জুনের মনে হল আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। এখনই হাতড়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। জিপ ততক্ষণে তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে দোমহানির দিকে ছুটছে। দু'পাশে মাঠের মধ্যে দিয়ে পিচের রাস্তাটা বেঁকে গেছে ঘোড়ার পায়ের নালের মতো। মানুষজনের বসতি খুব কম। বাইপাস ছেড়ে জিপ ঢুকল বাঁ দিকে। শহর থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে জল্পেশের মন্দিরে সে আগেও এসেছে। এ-সবই তার চেনা। মন্দিরে কোনও শিবের মূর্তি নেই, আছে অনাদিলিঙ্গ। কেউ বলেন কোচবিহারের মহারাজ প্রাণনারায়ণ একটি স্তম্ভের মাথায় গাভীদের দুধ ছড়িয়ে দিতে দেখে এখানে এই মন্দির স্থাপন করেন।

অর্জুন প্রসঙ্গটা তুলতেই ত্রিদিববাবু বললেন, "খুব গোলমেলে ব্যাপার। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত সন্দেহ করেছেন এটি এক বৌদ্ধমন্দির ছিল। মেলার সময় ভোট-তিব্বত থেকে ঘোড়া কুকুর কম্বল নিয়ে বৌদ্ধরা এখানে আসতেন। জল্পেশ্বর নামে এক রাজার কথাও শোনা যায় যিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে কেউ দাবি রেখেছে। আসামের ঐতিহাসিকরা বলেন ভিতরগড়ের পৃথুরাজারই নাম জল্পেশ্বর, যিনি বখ্‌তিয়ার খিলজিকে পরাজিত করেছেন। ভদ্রলোক মারা যান ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে। তার মানে মন্দিরের আয়ু প্রায় আটশো বছর। মাটির ভেতর থেকে শিবলিঙ্গ উঠে এসেছে ওপরে। পঞ্চাশ বছর আগে মন্দিরে সংস্কারের সময় একটা পরীক্ষা চালানো হয়। বোঝা যায় লিঙ্গটি সাধারণ পাথর নয়, উল্কাপিণ্ড। আকাশ থেকে খসে মাটিতে ঢুকে পড়ে। এই আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে এখানকার মানুষ এঁকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করতে

শুরু করে।”

“এই উল্কাপিণ্ডটা কবে পড়েছিল ?”

“সময়টা ঐতিহাসিকরা আবিষ্কার করতে পারেননি।”

জিপ থামল একটা অস্থায়ী হাটের মধ্যে। বোঝা যায় সপ্তাহে এখানে হাট বসে, এখন চালাগুলো ফাঁকা। মন্দিরের সামনে হাতির মূর্তি। ত্রিদিববাবু বললেন, “হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে হাতি খুব একটা মেলে না। সম্ভবত এক সময় এখানে হাতির উপদ্রব হত। পাথরের হাতি তৈরি করে পাহারায় বসিয়ে তাদের ভয় দেখানোর পরিকল্পনা হয়েছিল।”

জল্পেশ্বর মন্দিরের ভেতর অর্জুন ঢুকেছে। অতএব সেদিকে তার কোনও আগ্রহ ছিল না। ত্রিদিববাবু আর জগুদা চলে গেছেন তাঁদের কাজে। অর্জুন দেখল মন্দিরের পাশেই লম্বা বারান্দার একতলা ব্যারাকবাড়ি। সেখানে সম্ভবত দূরের ভক্তরা এসে ওঠেন। মানুষজন খুব কম। মন্দিরের এপাশে একটি পুকুর। সে ভাল করে দেখল। মন্দিরের গায়ে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় কি না। কিছুই চোখে পড়ল না।

পুকুরের ধারে এসে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল অর্জুন, কিন্তু সামনে নিল। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসছেন। তাঁর পায়ে খড়ম, শরীরে সাদাধুতি লুঙ্গির মতো পরা, গলায় রুদ্রাক্ষ এবং মুখে পাকা দাড়ি। তিনি হাসলেন, “আহা, মন চেয়েছিল যখন, তখন খাও। আমাকে দেখে সঙ্কোচ কেন ?”

অর্জুন আরও লজ্জা পেল। সে প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিল। সন্ন্যাসীর মুখে বেশ স্নিগ্ধ ভাব, “মন্দিরে না গিয়ে এখানে কেন ?”

“এমনিই। মন্দিরের চেহারা দেখছিলাম। আপনি এখানে অনেকদিন আছেন ?”

“দিন গুনিনি। তবে আছি !”

“এই মন্দিরে কবে শেষবার সংস্কারের কাজ হয় ?”

“হৈমন্তীপুরের কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত সংস্কার করেন, তাও অনেকদিন হয়ে গেল। সময়ের হিসেব বাবা আমার গুলিয়ে যায়।”

“আচ্ছা, আপনি কি জানেন কালাপাহাড় এই মন্দিরের ওপর আক্রমণ করেছিলেন ?”

সন্ন্যাসী হাসলেন, “এ-কথা কে না জানে ! মন্দিরের চুড়োটা এ-রকম ছিল না। কালাপাহাড় তখনকার চুড়ো ভেঙে ফেলেছিলেন। কিন্তু ভগবানের কোনও ক্ষতি করেননি। শোনা যায় মন্দিরের ভেতরেও তিনি ঢোকেননি।”

“আপনি কালাপাহাড় সম্পর্কে কিছু জানেন ?”

“আরে, তুমি বাবার মন্দিরে এসে কালাপাহাড় সম্পর্কে জানতে চাইছ কেন ? মজার ছেলে তো ! কালাপাহাড়ের শক্তি ছিল, ক্ষমতাও ছিল, সেইসঙ্গে অভিমান এবং অপমানবোধ প্রবল। ব্রাহ্মণরা ওঁকে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। এসব আমার

শোনা কথা। এই জল্পেশের অনেক বৃদ্ধ মানুষ তাঁদের পিতা-পিতামহের কাছে শোনা কালাপাহাড়ের গল্প এখনও বলেন। তিনি এলেন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে। তাতে পাঠান যেমন আছে, তেমন এ-দেশের হিন্দুরাও। দেবাদিদেব নাকি তাঁকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন যে, তিনি মন্দিরের ভেতরে পা বাড়াতে পারেননি। তুমি থাক কোথায় ?"

"তোমাকে আমার কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কী দেওয়া যায় ?"

সন্ন্যাসীর মুখ থেকে কথা বের হওয়ামাত্র পাশের নারকোল গাছ থেকে একটা নারকোল খসে পড়ল মাটিতে ধুপ করে। সন্ন্যাসী সেটা কুড়িয়ে নিলেন, "বাঃ, এইটেই নাও। নাড়ু করে খেয়ো।"

নারকোল হাতে ধরিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। অর্জুন হতভম্ব। এটা কী হল ? একেই কি অলৌকিক কাণ্ড বলে ? সে পুকুরের দিকে তাকাল। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল এবং শিবমন্দির। হরিপদ সেন যে জায়গাটার কথা বলেছিলেন তা তো জল্পেশ্বর হতে পারে। যদিও এখন চারপাশে কোনও জঙ্গল নেই। কিন্তু পাঁচশো বছর আগে থাকতেও তো পারে। আর তখনই তার মনে পড়ল অমলদার সতর্কবাণী, প্রমাণ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে শুধু নির্বোধরাই আসতে পারে।

॥ চার ॥

কাল জলপাইগুড়িতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছিল। জল্পেশ্বর মন্দির দেখে ত্রিদিববাবু গিয়েছিলেন জটিলেশ্বর মন্দির দেখতে। ফলে দেরি হয়ে গেল বেশ। জটিলেশ্বর জল্পেশ মন্দির থেকে মাত্র চার মাইল দূরে। অথচ এর কথা শহরে এসে তেমন শোনা যায় না। শহরে ফিরে আসার সময় ত্রিদিববাবু বললেন, "জল্পেশ মন্দিরের আকৃতি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। দেখেছেন, মুসলিম সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে ওর নির্মাণে। অথচ মূল মন্দিরের কাছে বাসুদেব মূর্তি বা ক্ষয়ে যাওয়া গণেশ মূর্তি দেখলে বোঝা যায় পালবংশের সময়েই মন্দির তৈরি। তখন তো মুসলিম সংস্কৃতি এ-দেশে আসেনি।"

অর্জুন কানখাড়া রেখেছিল। কালাপাহাড় এই মন্দিরের ক্ষতি করার পর যখন সংস্কার করা হয়েছিল তখনই কি ওই পরিবর্তন এসেছিল ? ত্রিদিববাবুকে সে-কথা বলতে তিনি বললেন, এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা নেই।

রাত হয়ে গিয়েছিল বলেই সে অমলদার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। বাড়ি ফিরে দেখল বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। রাস্তা থেকেই দেখল কেউ একজন বসে আছেন। এখন মাঝে-মাঝেই তার কাছে মানুষজন সমস্যা নিয়ে আসেন। মা তাঁদের বসতে বলেন তার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে। দরজায়

দাঁড়াতেই সে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। চল্লিশের কোঠায় বয়স, শরীর একটু ভারী হলেও সুন্দরী না বলে পারা যায় না। জামাকাপড়ে এবং ভঙ্গিতে বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের মহিলা বলেই মনে হয়।

ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি অর্জুনবাবু ?"

"হ্যাঁ।" কাঠের টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসল সে।

"ও। আমি এক্সপেক্ট করিনি আপনি এত অল্পবয়সী।"

"বলুন, কেন এসেছেন ?"

"আমি মিস্টার অমল সোমের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় ঘন্টাদেড়েক অপেক্ষা করছি।"

"আপনার সমস্যা কী ?'

"হৈমন্তীপুর চা-বাগানটা আমাদের। আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে বাগানে খুব গোলমাল হয়েছিল। শ্রমিক বিক্ষোভ, মারামারি। তখন বাগান বন্ধ করে দিতে হয়। এর পরে আমার স্বামী মারা যান। সমস্তটা বুঝে নিতে আমার সময় লাগে। তারপর সরকার এবং ইউনিয়নের সঙ্গে অনেক কথা বলে আমি বাগান খুলেছিলাম। অনেকদিন বন্ধ থাকায় লেবাররা কাজের জন্য অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু এই সময় বাগানে নানারকম রহস্যময় ঘটনা ঘটতে লাগল।"

"কীরকম ঘটনা ?"

"আমার বাগানের পাশে নীলগিরি ফরেস্ট। খুব গভীর জঙ্গল। কুলি লাইন ওদিকেই। কাজের জন্য যখন কুলিরা ফিরে আসছে তখন পর-পর তিন রাত্রে তিনজন খুন হয়ে গেল। কে খুন করেছে, কেন করেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

"পুলিশের বক্তব্য কী ?"

"পুলিশ! কোনও কূলই পাচ্ছে না তারা। অথচ আমার বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যারা এসেছিল তাদের অনেকেই আমার বাগান ছেড়েছে। নতুন কাজের লোকের আসার সম্ভাবনা নেই। এমন চললে আমাকে বাধ্য হয়ে বাগান বিক্রি করে দিতে হবে। কিন্তু আমি সেটা চাইছি না। আমার স্বামীর পূর্বপুরুষেরা ওই বাগান তৈরি করেন। বুঝতেই পারছেন।"

"আপনার নাম ?"

"মমতা দত্ত।"

"অমলদাকে ঘটনাটা বলেছেন ?"

"হ্যাঁ। উনি বললেন অন্য একটি কেস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আপনাকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে। পুলিশের ওপর আমি পুরো ভরসা করতে পারছি না।"

"হৈমন্তীপুর চা-বাগানটা ঠিক কোথায় ?"

"হাসিমারার কাছে।"

"দেখুন, এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না আপনাকে। আগামিকাল সকালে একটা কেস নিয়ে আলোচনা আছে। সেটা যদি না নেওয়া হয় তা হলে অবশ্যই আপনার ব্যাপারটা দেখব। কিন্তু ওই কেস নেওয়া হলে একদম সময় পাব না।"

মমতা দেবী খুবই বিমর্ষ হলেন। তিনি জানালেন, তাঁর টেলিফোন এখনও চালু আছে এবং খবর যা হোক, তা অর্জুন কাল দুপুরের মধ্যেই জানিয়ে দেবে। অর্জুন অবাক হয়ে শুনল ভদ্রমহিলা গাড়ি নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে মাঝপথে বাসে চেপে জলপাইগুড়িতে এসেছেন, যাতে কেউ যদি অনুসরণ করতে চায় তা হলে বিভ্রান্ত হবে। আজ রাত্রে এখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কাল সকালে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাবেন। তাঁর ধারণা প্রতিপক্ষ সবসময় নজর রাখছে। অর্জুন তাঁকে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রিকশার ব্যবস্থা করল। ভদ্রমহিলা যাওয়ার আগে বারংবার অনুরোধ করলেন তাঁকে সাহায্য করতে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অর্জুনের মনে হল অতীতের পেছনে না ছুটে বর্তমানের সমস্যা সমাধান করা অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। কবে কখন কোথায় কালাপাহাড় তার লুটের সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছে এবং সেটা উদ্ধার করে হরিপদ সেনকে তুলে দিতে হবে—এমন অসম্ভব ব্যাপার নিশ্চয়ই অমলদা করতে চাইবেন না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অমলদা ভদ্রলোকের কাছে অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছেন। বেশির ভাগ কেসেই এটা উনি করেন না। অ্যাডভান্স নিলে কাজটা করবেন বুঝেই নেন। কালাপাহাড়ের সোনা খোঁজা মানে অন্ধকারে হাতড়ানো। হৈমন্তীপুর চা-বাগানের হত্যা রহস্যের তো একটা মোটিভ দেখা যাচ্ছে। মমতা দেবীকে বাগানছাড়া করা। ওই পথে এগোলে হত্যাকারীদের সন্ধান পেতে তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বাগানটা অনেকদিন বন্ধ ছিল। পাশেই নীলগিরি জঙ্গল। কুলিরা যখন আসতে শুরু করল তখন তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশি ছিল না। তাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কোনও দল যদি দু-চারজনকে হত্যা করে আবার জঙ্গলে ফিরে যায় তা হলে আতঙ্ক ছড়াতে বেশি দেরি হবে না।

সকালে বাইক চালিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়েই অর্জুন অমল সোমের বাড়িতে চলে এল। অমলদা এবং বিষ্টুসাহেব বাগানেই চেয়ার পেতে বসে চা খাচ্ছিলেন। বিষ্টুসাহেব চিৎকার করে বললেন, "সুপ্রভাত। কাল দুপুরের পর আর দর্শন পেলাম না কেন ?"

ইতিমধ্যে হাবু তৃতীয় চেয়ারটি নিয়ে এল। বসে পড়ল অর্জুন, "কাল বিকেলে জল্পেশের মন্দিরে গিয়েছিলাম। আচমকাই।"

"জল্পেশের মন্দির ? আহা, গেলে হত সেখানে।" বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন।

অমল সোম বললেন, "গেলেই হয়। আছেন তো ক'দিন।"

অর্জুন দেখল অমলদা এটুকু বলেই চুপ করে গেলেন। এটাই অস্বস্তিকর। কিন্তু বিষ্টুসাহেবই তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, "ওই যে, কাল এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, কোনও চা-বাগানের মালিক যেন…।"

অর্জুন দেখল অমলদা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে বলল, "হ্যাঁ, উনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আপনি কেসটা শুনেছেন অমলদা ?"

"হ্যাঁ। ভদ্রমহিলার দুশ্চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

"আমরা কি কেসটা নিতে পারি ?"

"সময় পাওয়া যাবে না।"

"কেন ?"

"তুমি তো জান, আজকাল সাধারণ ঘটনা আমাকে একদম টানে না। বরং ওই হরিপদ সেনের ব্যাপারটা ক্রমশ আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে। ওঁর দেওয়া কাগজপত্তরগুলো পড়লাম। এই কেস নিয়ে কাজ করা যায়।"

অর্জুন বলল, "ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোলমেলে।"

"ঠিকই। তাই আমাকে টানছে। অর্জুন, তুমি কি মনে কর কালাপাহাড়ের মতো একজন ক্ষমতাবান লোক সবাইকে দেখিয়ে একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে সোনা-মুক্তো পুঁতে রাখবে ? যখন তার জানাই আছে যুদ্ধের প্রয়োজনে কাশী থেকে কামাখ্যা ঘুরে বেড়াতে হয় ? লোকটা নিশ্চয়ই তার নবাবকে লুকিয়ে ওগুলো সরাতে চেয়েছে ! কালাপাহাড়কে এতটা বোকা আমার কখনওই মনে হয়নি।"

অর্জুনের একটু অস্পষ্ট ঠেকল, "কিন্তু হরিপদবাবু বলে গেলেন যে নন্দলাল সেন জানতেন কোথায় কালাপাহাড় ওসব লুকিয়েছেন।"

"কথাটা হরিপদবাবুকে তাঁর ছোটঠাকুর্দা বলেছেন। তিনিও নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বপুরুষদের মুখে শুনে থাকবেন। কথা হল, এতদিন এঁরা চুপ করে বসে ছিলেন কেন ? পুরী থেকে অনেক আগেই তো অভিযান করতে পারতেন ওঁরা।"

অর্জুনের মনে হল অমলদা ঠিক কথাই বলছেন। বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "ওই কাগজপত্রে কিছু পেলেন ?"

"হ্যাঁ। সেইটেই ইন্টারেস্টিং। ওগুলো আসলে নন্দলাল সেনের জীবনের বৃত্তান্ত। তাঁর নিজের লেখা নয়। যিনি লিখেছেন তিনি। কর্ণাটিকী শব্দ জানেন। ইচ্ছে করেই হয়তো মানেটাকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কর্ণাটিকী আমিও জানি না। যেটুকু বোঝা গেল তাতে নন্দলাল কালাপাহাড়ের পুরী অভিযানের পর একেবারে নিঃশব্দে সরে যান দল থেকে। হয়তো কালাপাহাড়ের অত্যাচার তাঁর আর সহ্য হয়নি। এই দল-ছাড়ার আগে তিনি

অনুমতিও নেননি। কালাপাহাড় হয়তো নন্দলালের ওই ধৃষ্টতা মেনে নিত না যদি তাকে জরুরি প্রয়োজনে পুরী থেকে চলে না আসতে হত।"

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কালাপাহাড়ের সম্পর্কে সব কিছু জেনেছেন ? মানে যেটুকু জানা সম্ভব ?" অমলদা হাসলেন, "খুব বেশি কিছু নয়। তুমি যা জেনেছ, তাই। গতকাল বিকেলে আমরা বেড়াতে-বেড়াতে তোমার মাস্টারমশাই-এর কাছে গিয়ে শুনলাম তুমি আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছ। ভদ্রলোক সারাজীবন ইতিহাস নিয়ে আছেন, অনেক কিছু জানেন। কিন্তু তাঁর জানাতেও বিস্তর অনুমান আছে।"

"আপনি কীভাবে কেসটা শুরু করবেন ?"

"এখনও ভাবিনি। কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে।"

"কালাপাহাড়ের অতীত, মানে জন্মবৃত্তান্ত··· !"

"এইখানে একটা কথা।" অমলদা হাত তুলে থামালেন, "ধরো, কোনও মানুষ খুন হলেন। অপরাধী কে সেটা আন্দাজ করতে পারছ। কিন্তু তার গতিবিধি জানবার জন্য কি তুমি তার বাল্যকাল হাতড়াবে ?"

"না, তা নয়। কিন্তু তার অভ্যেস বা সংস্কার জানবার জন্য পেছনের দিকে হয়তো যেতে হতে পারে। আপনি বলছেন কালাপাহাড় কোনও সাক্ষী রেখে ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখবে না। তা হলে নন্দলাল সেটা জানলেন কী করে ? জানলেও নিজের অংশ নেননি কেন ?"

"দুটো কারণ থাকতে পারে। কালাপাহাড় যে সম্পত্তি পরে ব্যবহার করবে বলে লুকিয়েছিল তা যদি নন্দলালের জানা থাকে তা হলে কালাপাহাড়ের মৃত্যুর পরেই ওঁর মনে হতে পারে এবার ওই সম্পত্তি বেওয়ারিশ, আর কেউ যখন জানে না তখন আমি ভাগ নিই। তা হলে ভাগ কেন ? পুরোটাই তো নিতে পারতেন। মুগল ফৌজের তোপে কালীগঙ্গার ধারে কালাপাহাড় মারা যায়। তবু হরিপদবাবুর দেওয়া কাগজপত্রে পাচ্ছি—নন্দলাল অংশের কথা বলছেন। কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে। ধরা যাক, তখনই বা তার কিছু পরে নন্দলাল দলত্যাগ করেন। এর প্রায় পনেরো বছর পরে কালাপাহাড় মারা যায়। ততদিন নন্দলাল পুরীতেই আত্মগোপন করে থাকতে পারেন। কিন্তু কালাপাহাড় মারা যাওয়ার পরে তো নিজেই যেতে পারতেন ধনসম্পদ উদ্ধার করতে !"

অমল সোম চোখ বন্ধ করলেন, "নন্দলাল যাননি। হয় তিনি অসুস্থ ছিলেন, নয় অন্য কারণ ছিল। নন্দলালের কথা যিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনিও অংশের কথাই বলেছেন। তা হলে কি আর কেউ নন্দলালের সঙ্গী ছিল ?"

বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন, "বাঃ। চমৎকার। দুটো কারণ বলছিলেন, আর-একটা কী ? একটা না হয় অসুস্থতা অথবা অন্য কোনও সঙ্গীর জন্যই যেতে পারেননি ভদ্রলোক।"

অমলদা বললেন, "দ্বিতীয় কারণ খুব সোজা। কালাপাহাড়ের একার পক্ষে অত ধনসম্পদ লুকোনো সম্ভব ছিল না। সেইজন্য বিশ্বস্ত অনুচর নন্দলালকে সঙ্গে নিয়ে সেটা করেছেন। তারপর হয়তো আশ্বাস দিয়েছিলেন কিছুটা অংশ পরে দেবেন। কিন্তু পুরী আক্রমণের পরে ভদ্রলোকের মনে অনুতাপ আসে। তিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করেন। ওরকম মনের অবস্থায় লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি সম্পর্কে মনে ঘৃণা জন্মানো অস্বাভাবিক নয়। তাই তিনি কালাপাহাড় মারা যাওয়ার পরেও উদ্ধারের চেষ্টা করেননি। কিন্তু ঘটনাটা ছেলে বা নাতিকে বলেছিলেন। তাঁরাই লেখার সময় ধনসম্পত্তির উল্লেখ করে নিজেদের অংশ দাবি করে বসে আছে। কিন্তু ততদিনে এ-দেশের রাজনৈতিক চরিত্র ঘন-ঘন বদল হচ্ছে। নন্দলালের বংশধরদের পক্ষে ইচ্ছে থাকলেও উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। আর নন্দলাল তাঁদের বিস্তারিত বলেও যাননি।"

এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত বছর পরে আমরা জায়গাটা বের করব কী করে ?"

অমলদা হাত নেড়ে হাবুকে ডাকলেন। ইশারায় কাপ-প্লেট তুলে নিতে বললেন। তারপর চোখ বন্ধ করলেন, "কালাপাহাড় কেন ধনসম্পত্তি লুকিয়েছিল ? তার তো প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল। নিশ্চয়ই সে চায়নি ওগুলোর কথা অন্য লোক জানুক। এই অন্য লোক সম্ভবত বাংলার নবাব দাউদ খাঁ, কালাপাহাড় যাঁর সেনাপতি। অভিযান করে সেনাপতি যা লুঠ করবে তা অবশ্যই নবাবের প্রাপ্য। যতই প্রতাপশালী সেনাপতি হোক, নবাবের কাছে কালাপাহাড়কে জবাবদিহি করতেই হত। কোনও একটা অভিযান করে রাজধানীতে ফেরার পথে কালাপাহাড় ওগুলো লুকিয়ে রাখে। নন্দলালের বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয় জায়গাটা এই উত্তরবঙ্গ। কারণ দাউদ খাঁর রাজধানী ছিল মালদহের তাণ্ডা নামে একটা শহরে। এবার ব্যাপারটা একটু সহজ হয়ে গেল। মালদহে ফেরার পথে উত্তরবঙ্গ যদি পড়ে তা হলে কালাপাহাড় অসম অভিযান করেই ফিরছিল এবং সেটা পুরী অভিযান করার ঠিক আগে। তা হলে ওর ওই ফেরার পথ ধরে আমাদের এগোতে হবে।"

ঠিক এই সময় একটা জিপ এসে গেটের সামনে থামল। অর্জুন দেখল জিপ থেকে থানার দারোগা শ্রীকান্ত বক্সি নামছেন। সে এগিয়ে গেল। শ্রীকান্তবাবু গেট খুলে কাছে এসে বললেন, "মিস্টার সোম, আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এসেছি। স্রেফ রুটিন কাজ।"

অমলদা বললেন, "স্বচ্ছন্দে।"

"হরিপদ সেন গতকাল আপনার কাছে এসেছিলেন। কী কথা হয়েছে ?"

"কী ব্যাপার ? আপনি আমার ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত কথা জানতে চাইছেন কেন ?"

শ্রীকান্ত বক্সি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, "আজ সকালে হরিপদবাবুকে তাঁর

হোটেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ একটু আগে জানাল।”

অমলদা চমকে উঠলেন, “সে কী ! হরিপদবাবু মারা গিয়েছেন ?”

শ্রীকান্ত বক্সি মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ। ওঁকে খুন করা হয়েছে।”

আক্ষেপে আকাশে হাত ছুঁড়লেন অমলদা, “ইস। ভদ্রলোককে বললাম জলপাইগুড়ির কোনও হোটেলে থাকতে, কিন্তু কথাটা শুনতেই চাইলেন না।”

“আপনি কি ওঁর কথা শুনে কিছু আন্দাজ করেছিলেন ?”

“না। উনি আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেটা নেব কি না তা ভাবতে একদিন সময় নিয়েছিলাম। ইন ফ্যাক্ট আপনার বদলে এখন হরিপদবাবুকেই আশা করেছিলাম। আজ সকালে ওঁকে জানিয়ে দিতাম ওঁর প্রস্তাবে আমি রাজি। শিলিগুড়ি থেকে যাওয়া-আসা না করে আমি তাই ওঁকে জলপাইগুড়িতেই থাকতে বলেছিলাম।”

“উনি রাজি হননি ?”

“না, বললেন সেখানে জিনিসপত্র রেখে এসেছেন। অথচ···।”

“উনি কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ?”

হাত নাড়লেন অমলদা। খুব হতাশ দেখাচ্ছিল তাঁকে, “সেটা কি আমি বলতে বাধ্য ?”

“হয়তো ওঁর খুনের কোনও ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি। ইন ফ্যাক্ট, ওঁর হোটেলের ঘরে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছে যার জন্য শিলিগুড়ি পুলিশ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে।”

অমলদা একটু চিন্তা করলেন, “উনি আমাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে গিয়েছিলেন, ওঁর কাগজপত্রও আমার কাছে। কিন্তু আমার সন্দেহ ওঁর কাছে আরও কিছু ছিল যা আমাকে বিশ্বাস করে দিতে পারেননি। যা হোক, ওঁকে যখন ক্লায়েন্ট বলে ভেবেছি তখন ওঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা আমার নৈতিক কর্তব্য। মিস্টার বক্সি, উনি আমার কাছে এসেছিলেন গুপ্তধন উদ্ধার করার সাহায্য চাইতে।”

“গুপ্তধন ?” শ্রীকান্ত বক্সি হতভম্ব।

“আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পত্তি যা ঠিক কোথায় আছে তিনি জানেন না।”

“তা হলে খুঁজবেন কী করে ?”

“সেই কারণেই ওঁর কাছে একদিন সময় চেয়েছিলাম।”

“আচ্ছা ! তা হলে হত্যাকারী এই গুপ্তধনের খবর জানত !”

“মনে হচ্ছে তাই।” অমলদা উঠে দাঁড়ালেন, “আমরা একবার শিলিগুড়িতে যেতে চাই। ওঁর হোটেলে। সাহায্য করবেন ?”

“নিশ্চয়ই। আমিও যাচ্ছিলাম। আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।”

"আপনি কেন যাচ্ছিলেন ?"

"পুলিশের কাজ মশাই। ছুটোছুটিই তো আমাদের চাকরি।"

বিষ্টুসাহেব বাড়িতেই থেকে গেলেন। অর্জুন আর অমল সোম দারোগাবাবুর জিপে উঠে বসতেই চাকা গড়াল। অর্জুনের মনে পড়ল গতকাল হরিপদবাবু এই সময় বেঁচে ছিলেন। এই বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন। আজ তিনি নেই। কে সেই লোক যে একজন অংশীদার কমিয়ে দিল ?

॥ পাঁচ ॥

প্রচণ্ড শব্দ করে জিপটা নড়ে উঠে গড়াতে-গড়াতে থেমে গেল। হরিশ ড্রাইভার আফসোসের গলায় বলল, "পাংচার হো গিয়া।"

শ্রীকান্ত বক্সি জিজ্ঞেস করলেন, "স্টেপনি ঠিক আছে তো ?"

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, "রিপেয়ারমে দিয়া থা, নেহি মিলা আজ।"

শ্রীকান্ত বক্সি খিঁচিয়ে উঠলেন, "এত দায়িত্বজ্ঞানহীন কেন তোমরা ? স্টেপনি ছাড়া কেউ গাড়ি বের করে ?" তারপর অমলদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখুন তো কাণ্ড। এই সময় আমি যদি কোনও ক্রিমিনালকে তাড়া করতাম, তা হলে কীরকম বোকা বনতাম ?"

অমলদার দেখাদেখি অর্জুনও জিপ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল। জায়গাটা শিলিগুড়ি থেকে বেশি দূরে নয় এবং একেবারে ফাঁকা মাঠের গায়ে তারা দাঁড়িয়ে নেই। কিছু একতলা ঘর-বাড়ি এবং একটি বড় দোকান চোখে পড়ছে। ওই দোকানের পান্তুয়া এ-অঞ্চলে খুব বিখ্যাত। দোকানের সামনে একটি কালো অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। অমলদা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "এখান থেকে তো আর বাসে চড়া যাবে না, আগেরটায় যা অবস্থা দেখলাম, আপনাকে দেখে কেউ যদি লিফট দেয় তা হলে মুশকিল আসান হতে পারে।"

শ্রীকান্ত বক্সি রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটা মারুতি আসছে। দারোগাবাবু হাত দেখালেন। মারুতি থামল। তিনজন বসে আছেন ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে। আরোহীরা জানতে চাইলেন গাড়ি থামাবার কারণ। দারোগাবাবু কারণটা জানালেন। স্পষ্টতই বোঝা গেল একজন মানুষের জায়গা ওই গাড়িতে হতে পারে। অমলদা দারোগাবাবুকে বললেন আগে চলে যেতে। শিলিগুড়ির থানায় কথা বলে তিনি যেন সোজা হোটেলে চলে যান। শ্রীকান্ত বক্সির তেমন ইচ্ছে ছিল না কিন্তু অমলদা দ্বিতীয়বার বলার পরে আর আপত্তি করলেন না। মারুতি বেরিয়ে গেলে অমলদা বললেন, "এস, একটু পান্তুয়া খাওয়া যাক।"

রাস্তায় আর কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছিল না। ওরা পান্তুয়ার দোকানে ঢুকে দেখল খদ্দের দু'জন। লোক দুটো চা খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে চাপা গলায়

কথা বলছে। কাঠের টেবিল-বেঞ্চির ফাঁক গলে অর্জুন বসতেই শুনল অমলদা চারটে করে পান্তুয়া দিতে বললেন। ইদানীং অমলদা চায়ে পর্যন্ত নামমাত্র চিনি খান। চারটে পান্তুয়া অর্জুনের পক্ষেই বেশি বেশি হয়ে যাবে। কিন্তু সে কিছু বলল না।

দুটো বড় প্লেটে পান্তুয়া এলে জিভে জল এল অর্জুনের। যেমন আকার তেমন লোভনীয় চেহারা। অমলদা প্রথমটা শেষ করে হঠাৎ দু'হাত দূরে বসা লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা তো শিলিগুড়িতে যাচ্ছেন, তাই না ?"

লোক দুটো কথা থামিয়ে এদিকে তাকাল। যার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে সে জিজ্ঞেস করল "কী করে বুঝলেন ?" লোকটার ঠোঁটে তখন সিগারেট চাপা রয়েছে।

"গাড়িটা তো আপনাদের ?"

ফ্রেঞ্চকাট বাইরে দাঁড় করানো গাড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"ওটা শিলিগুড়ির দিকে মুখ করে আছে, শিলিগুড়ি থেকে এলে উলটোমুখো থাকত।"

ফ্রেঞ্চকাট হাসল, "বাঃ, আপনার নজর তো খুব। হ্যাঁ, শিলিগুড়িতেই যাচ্ছি। কিন্তু কেন ?"

অমলদা বললেন, "এখান থেকে বাসে ওঠা যায় না, একটু লিফট চাইছি।"

এবার দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করল, "ওই পুলিশের জিপটাতে আপনারা ছিলেন না ?"

"হ্যাঁ। লিফ্‌ট নিচ্ছিলাম, খারাপ হয়ে গেল।"

"আপনারা পুলিশ ?"

"না, না। বললাম না, লিফট নিচ্ছিলাম।"

ফ্রেঞ্চকাট কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটি বলল, "ঠিক আছে, হিল ভিউ হোটেলের সামনে নামিয়ে দেব।"

"বাঃ, তাতেই হবে।"

কথাবার্তা শুনতে শুনতে অর্জুনের পান্তুয়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অমলদা দ্বিতীয়টিতে আর চামচ বসাননি। অর্জুনের প্লেট খালি দেখে ইশারা করলেন বাকি তিনটে সে খেতে পারে। অর্জুন মাথা নাড়ল, "অসম্ভব। আমার পেট ভর্তি হয়ে গিয়েছে।"

অমলদা উঠে দাঁড়ালেন। আটটা পান্তুয়ার দাম মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অর্জুনও চলে এল তাঁর সঙ্গে। লোক দুটোর যেন চা খাওয়া শেষ হচ্ছিল না।

হঠাৎ অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুন, তোমার কী মনে হয়, হরিপদবাবু

কেন খুন হলেন ?”

“যে লোকটা শাসিয়েছিল সে-ই খুন করেছে।”

“কিন্তু কেন ?”

“ওই সম্পত্তির লোভে।”

“কিন্তু তুমি যাকে সম্পত্তি বলছ তা কোথায় আছে কেউ জানে না। হরিপদবাবুকে খুন করে খুনি এখনই লাভবান হচ্ছে না। তাই না ?”

“হয়তো হরিপদবাবু কিছু জানতেন, যা জানলে খুনি কালাপাহাড়ের সম্পত্তি খুঁজে পেতে পারে। কিংবা ওঁরা দুজনেই একটা সূত্র জানতেন। খুনি হরিপদবাবুকে সরিয়ে দিয়ে নিজের খোঁজার পথ নিষ্কণ্টক করল।”

“তা হলে আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসে হরিপদবাবু সূত্রটা বললেন না কেন ? আমাদের ওপর তিনি আস্থা রাখতেই চেয়েছিলেন।”

“হয়তো প্রথম আলাপেই বলতে চাননি। এমন হতে পারে আজ এলে বলতেন।”

“উঁহু। এত হয়তোর ওপর নির্ভর করা চলে না। তা হলে খোঁজার পথটা গোলকধাঁধা হয়ে যাবে। আরও স্পেসিফিক কিছু বলো।”

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল, “এখনই কিছু মাথায় আসছে না।” অমলদা গাড়িটার সামনে এগিয়ে গেলেন। গাড়ির ডিকির ওপর কাঁচা হাতে কেউ এস. আই. এল. লিখেছে। হয়তো কোথাও পার্ক করা ছিল, কোনও বাচ্চাছেলে আঙুলের ডগায় অক্ষর তিনটে লিখেছিল। এখন তার ওপর আরও ধুলো পড়ায় বেশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। অমলদা বললেন, “গাড়িটা গতকাল শিলিগুড়িতে ছিল। আজ যদি জলপাইগুড়ি থেকে আসে তা হলে বুঝতে হবে ভোরেই শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়েছিল।”

অর্জুন বুঝতে পারছিল না অমলদা হঠাৎ এই গাড়ি নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে উঠলেন কেন ! তার মনে হল আজকাল অমলদা অকারণে সব ব্যাপার মাথায় নেন।

এই সময় লোক দুটো বেরিয়ে এল। চারপাশে তাকিয়ে দেখে দ্বিতীয়জন স্টিয়ারিং-এ বসল। পেছনের দরজা খুলে দিয়ে ফ্রেঞ্চকাট সামনের আসনে গিয়ে কাচ নামাতে লাগল। অমলদার পাশাপাশি পেছনের সিটে বসে অর্জুন দেখল দ্বিতীয় লোকটির বাঁ কান একটু ছোট। লতি প্রায় নেই বললেই চলে।

গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করল “আপনারা শিলিগুড়িতে কাজে যাচ্ছেন ?”

“হ্যাঁ।” অমলদা স্বাভাবিক গলায় বললেন, “ব্যবসার কাজে।”

“কিসের ব্যবসা ?”

“বিনা মূলধনে যা করা যায় !”

“স্ট্রেঞ্জ ! মূলধন ছাড়া ব্যবসা করছেন ? উকিল-ডাক্তারদেরও তো এক সময়

কয়েক বছর খরচা করতে হয় ডিগ্রি পেতে। জলপাইগুড়িতেই থাকেন ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। কয়েক পুরুষ।”

এবার ফ্রেঞ্চকাট বলল, “কলকাতায় বাস করে জানতামই না যে, জলপাইগুড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত বেশি। আমার তো বেশ ভাল লাগছে।” কথাগুলো বলেই সিগারেট ধরাল।

দ্বিতীয় লোকটি হাসল, “শিলিগুড়ির নেই ভাবছেন ? এই যে শিলিগুড়ি, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম ? শিলিগুড়ি নামটা কী করে হল ? লেপচাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের লড়াই। সেই ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে লেপচারা পাহাড় থেকে নেমে সমতলে শিবির গেড়েছিল। পরাজিত হয়েও ব্রিটিশরা আবার সৈন্য জোগাড় করে যখন ফিরে আসছে তখন একজন লেপচা সেনাপতি চিৎকার করে আদেশ দিলেন, ‘শ্যালিগ্রি’। শ্যালিগ্রি লেপচা শব্দ। মানে ধনুকে ছিলা পরাও। এই শ্যালিগ্রি থেকে শ্যালগিরি এবং শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ি।”

অর্জুনের মজা লাগছিল। জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির লোকেরা পরস্পরকে সব সময় একটু নীচে রাখতে ভালবাসে। এ-ব্যাপারে বেশ রেষারেষি আছে অনেকদিন ধরেই। জলপাইগুড়ির লোকের চেষ্টায় শিলিগুড়ির মুখে বিশাল রেল স্টেশন তৈরি হলেও তাই নাম রাখতে হলো নিউ জলপাইগুড়ি। এই দ্বিতীয় লোকটি নিশ্চয়ই শিলিগুড়ির অনেকদিনের বাসিন্দা। ফ্রেঞ্চকাট তো নিজেকে কলকাতার লোক বললই। কয়েক মিনিটেই রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল। হিল ভিউ হোটেলের সামনে গাড়িটা থামলে অমলদা নেমে পড়ে অনেক ধন্যবাদ দিলেন ড্রাইভার ভদ্রলোককে। তিনি মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

একটা রিকশা নেওয়া হলো। শিলিগুড়িকে রিকশার শহর বললে ভুল বলা হবে না। প্রায় গায়ে-গায়ে অতি দ্রুত গতি নিয়ে রিকশাগুলো যেভাবে ছুটোছুটি করে তাতে হৃৎপিণ্ড ধড়াস-ধড়াস করে। মহানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে অমলদার পাশে বসে অর্জুন হোটেলের দিকে চলেছিল। অমলদা বসে আছেন গম্ভীর মুখে। বাঁ দিকে নতুন তৈরি বাস টার্মিনাস। এখন ফাঁকাই বলা যায়। আর-একটু গেলেই সিনক্লেয়ার হোটেল, তারপরেই দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা, অর্জুনদের অত দূরে যেতে হলো না। ডান দিকের একটা সাধারণ হোটেলের সামনে অমলদা রিকশা থামালেন। হোটেলটির দরজায় দুটো সেপাই দাঁড়িয়ে আছে লাঠি হাতে। ভাড়া মিটিয়ে রিকশা ছেড়ে দিয়ে অমলদা এগিয়ে যেতেই অর্জুন অনুসরণ করল।

হোটেলে ঢোকার মুখে সেপাইরা বাধা দিল। একজন বলল, “হোটেল বন্ধ আছে।”

“আমরা জলপাইগুড়ি থেকে আসছি। শিলিগুড়ির ও. সি. সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।”

"তা হলে থানায় যান। আমাদের ওপর অর্ডার আছে কাউকে ঢুকতে না দেওয়ার।"

"ম্যানেজারবাবু আছেন ?"

"না। ওঁকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

অমলদা অর্জুনের দিকে তাকালেন, "এখানেও একই সমস্যা। বিশল্যকরণীর জন্য গোটা গন্ধমাদন পর্বত তোলা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। শ্রীকান্ত বক্সি এসে পড়েছেন।"

অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শ্রীকান্ত বক্সি একটা পুলিশের জিপ থেকে নামছেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন অফিসার নেমে এলেন। লোকটি রোগাটে, চোয়াল বসা, মাথার চুল অল্প, পঞ্চাশের ওপর বয়স। ইনিই সম্ভবত শিলিগুড়ির ও. সি.। এমন চেহারার মানুষ খুব সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হন।

"আপনারা কীসে এলেন ?" শ্রীকান্ত বক্সি জিজ্ঞেস করলেন।

"দুই ভদ্রলোক অনুগ্রহ করে পৌঁছে দিলেন।" অমলদা সহাস্যে জবাব দিলেন।

"আপনিই বোধহয় এখানকার ও. সি. ? আমার নাম অমল সোম, এই ছেলেটির নাম অর্জুন।"

শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আপনি আমাদের তলব করেছেন। নিশ্চয়ই কথা বলব, কিন্তু তার আগে আমরা কি সেই ঘরটিতে যেতে পারি যেখানে হরিপদবাবু খুন হয়েছেন ?"

শিলিগুড়ি দারোগা বললেন, "কেন যেতে চাইছেন ওখানে ?"

"হরিপদবাবু আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন।"

"হুম। শ্রীকান্ত, তুমি কী বলো ?" শিলিগুড়ির ও. সি. এবার মুখ ফেরালেন।

শ্রীকান্ত বক্সি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "মিস্টার সোম সাহায্য করলে এই কেস দু'দিনেই সলভ্‌ড হয়ে যাবে রায়দা। তা ছাড়া উনি যা বলছেন তা করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে।"

"যুক্তিসঙ্গত মানে ? উনি গোয়েন্দা হতে পারেন কিন্তু এই কেসে উনি একজন...মানে, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ ! চলুন ওপরে। তবে আমিও সঙ্গে থাকব।" শিলিগুড়ির ও. সি., যাঁর পদবি রায়, হাত নেড়ে সেপাইদের সরে যেতে বললেন।

॥ ছয় ॥

দোতলার যে ঘরটিতে হরিপদবাবু ছিলেন তার দরজায় তালা দেওয়া। হোটেলে কোনও লোকজন নেই। এমনকী কর্মচারীদেরও দেখা যাচ্ছে না। রায়বাবুর পকেটে চাবি ছিল। তিনিই দরজা খুললেন। জানলা বন্ধ। তাই আলো জ্বালা হল প্রথমে। শ্রীকান্ত বক্সি জানলা খুলে দিলেন। মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে একটা ডাবলবেড, চাদর ছাড়া। টেবিলে কিছু কাগজপত্র, ব্যাগ ছড়ানো আছে। অমলদা বললেন, "বডি নিয়ে যাওয়ার পর ভাল করে খুঁজে দেখা হয়েছে?"

রায়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী খুঁজব? ক্লু? কোনও দরকার নেই। লোকটা ওই দরজা দিয়েই ঢুকেছিল। হরিপদ সেন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। চুপচাপ ভেতরে ঢুকে সোজা ওঁর পিঠে দশ ইঞ্চি শার্প সরু ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। কাজ শেষ করে ওই দরজা দিয়েই চলে গেছে।"

অমলদা চট করে শ্রীকান্ত বক্সির দিকে তাকালেন। তিনি তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। অমলদা বললেন, "এ-কথা তো আপনি আমাকে জলপাইগুড়িতে বলেননি?"

"আমি তো তখন পুরো ঘটনাটা জানতাম না।"

অমলদা একটু ভাবলেন, "ভদ্রলোক, মানে খুনি ওই দরজা দিয়ে ঢুকলেন কী করে? হরিপদবাবু কি দরজা খুলে রেখে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন?"

"ঠিক তাই।" রায়বাবু বললেন, "অনেক লোক হোটেলে এলেও কেয়ারলেস হয়ে থাকে।"

মাথা নাড়লেন অমলদা, "হরিপদবাবুর সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আলাপ হলেও আমি জোরগলায় বলতে পারি, তিনি দরজা খুলে ওইভাবে শুয়ে থাকার মানুষ নন।"

রায়বাবু একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে খুনি ঢুকল কী করে?"

"সেটা নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে।" কথাগুলো বলতে-বলতে অমলদা পুরো ঘরটা একবার পাক মেরে এলেন। তাঁর নজর ঘরের মেঝের ওপর ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেওয়াল আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ঘরের সমস্ত হাতের ছাপ নিয়ে নিয়েছেন মিস্টার রায়? নিলে আমি আলমারিটা খুলতে পারি। আমাকে যখন একজন পার্টি করেছেন তখন এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হচ্ছে।"

রায়বাবু বললেন, "ফিঙ্গার প্রিন্টের লোককে সন্ধের আগে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অমলদা বললেন, "তা হলে রুমাল ব্যবহার করছি।"

পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে ডান হাতে নিয়ে তার আড়ালে আঙুল ঢেকে আলমারি খুললেন অমলদা। হ্যাঙারে এক-জোড়া শার্ট-প্যান্ট ঝুলছে। নীচের তাকে একটা খোলা ফাইল। ফাইলটা সম্ভবত সাদা ফিতেয় বাঁধা ছিল। ফিতেটা ছেঁড়া। হাঁটু গেড়ে বসে ফাইলের কাগজপত্র দেখতে-দেখতে অমলদা বললেন, "একেবারে লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে। অর্জুন, তুমি ততক্ষণে বাথরুমটা দেখে এসো।"

রায়বাবুকে অমলদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে অর্জুন বাঁ দিকের দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকল। শুকনো বাথরুম। একটা নীল তোয়ালে ঝুলছে। আয়নার নীচে নতুন সাবানকেসে অল্প ব্যবহার করা সাবান ছাড়া আর কিছু নেই। বাথরুমে কোনও সন্দেহজনক জিনিস চোখে পড়ল না। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল অমলদা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ার। একটা সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ে আছে। মাঝখানের অ্যাসট্রেতে গোটা দুয়েক সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। অমলদা বললেন, "মিস্টার রায়, পোস্টমর্টেম যিনি করবেন তাঁকে বলবেন যেন পরীক্ষা করে দ্যাখেন হরিপদবাবুর সিগারেটের নেশা ছিল কি না। এটা খুব কড়া সিগারেট। শখে পড়ে যারা সিগারেট খায়, তাদের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।"

রায়বাবু অ্যাসট্রেটাকে সযত্নে সরিয়ে রাখলেন। অর্জুন দেখল ভদ্রলোকের চোখ-মুখের পরিবর্তন হয়েছে। বেশ সম্ভ্রমভাব ফুটে উঠেছে। টেবিলে আর কিছু পেলেন না অমল সোম। কিন্তু টেবিলের নীচে ঝুঁকে কিছু-একটা দেখেই সোজা হলেন। চারপাশে আর-এক-বার নজর বুলিয়ে বললেন, "আপনি বললেন এ-ঘরের কোনও জিনিসে হাত দেওয়া হয়নি, তাই না?"

"নিশ্চয়ই।" রায়বাবু মাথা নাড়লেন।

"হরিপদবাবুর চটি কিংবা জুতো কোথায়?"

এতক্ষণে খেয়াল হলো অর্জুনেরও। এতক্ষণ শুধু সে লক্ষ করছিল খুনি কোনও ক্লু রেখে গিয়েছে কি না। সে-কারণেই হরিপদবাবুর ব্যবহৃত জিনিসের প্রতি নজর ছিল না।

ঘরের কোথাও ভদ্রলোকের চটি বা জুতো খুঁজে পাওয়া গেল না।

অমলদা বললেন, "ব্যাপারটা তো খুবই অস্বাভাবিক। খুনি ওঁকে খুন করে যেতে পারে কিন্তু চটি বা জুতো নিয়ে যাবে কেন? গতকাল আমি হরিপদবাবুর পা দেখেছি। এমন কিছু মূল্যবান বস্তু ছিল না। আর ভদ্রলোক নিজে ওই প্রয়োজনীয় জিনিস দুটো বাইরে ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবেন এটা ভাবা যাচ্ছে না।"

রায়বাবু বললেন, "সত্যি তো, ওগুলো গেল কোথায়?"

অমলদা বললেন, "আপনার লোকজনকে বলুন একটু খুঁজে দেখতে। এই

হোটেলের আশেপাশে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের ডাস্টবিন বা রাস্তা থেকে যারা বাতিল জিনিসপত্র কুড়োয়,তাদের জানিয়ে রাখুন।"

অমলদা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "হোটেলের কর্মচারীদের জেরা করে কিছু জানতে পারলেন ?"

রায়বাবু মাথা নাড়লেন "ডিটেলসে জিজ্ঞেস করিনি। এমনিতে সবাই বলছে কেউ কিছু জানে না।"

"আমি একটু কথা বলার সুযোগ পাব ?"

"তা হলে তো আপনাকে থানায় যেতে হয়।"

"যেতে তো হবেই। আপনি আমাদের জেরা করবেন বলেছিলেন।"

রায়বাবু জিভ বের করলেন, "ছি-ছি। ওভাবে বলবেন না। হরিপদবাবুকে জীবিত অবস্থায় আপনি দেখেছিলেন, উনি হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কীভাবে জলপাইগুড়িতে গিয়ে আপনাকে মিট করবেন, তাই আপনার একটা স্টেটমেন্ট নেওয়া আমার কর্তব্য।"

"সেটা অবশ্যই নেওয়া উচিত।"

হোটেলটিকে আবার তালাবন্ধ করে রায়বাবু ওঁদের নিয়ে জিপে উঠলেন। রাস্তায় কোনও কথা হল না। থানায় গিয়ে রায়বাবু ওঁদের সমাদর করে বসালেন। নিজের চেয়ারে বসেই পুলিশি গলা ফিরে পেলেন যেন, "হরিপদ সেনকে আপনি আগে চিনতেন ?"

"না কস্মিনকালেও নয়।" অমলদা মাথা নাড়লেন।

"উনি সেই কলকাতা থেকে আপনার কাছে কেন এলেন ?"

"গুপ্তধনের খোঁজে।"

"মানে ?" রায়বাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"ওঁর পূর্বপুরুষ কালাপাহাড়ের সহচর ছিলেন। কালাপাহাড় উত্তর বাংলার কোথাও অনেক সোনা-হিরে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। ওঁর পূর্বপুরুষ সেটা জানতেন। হরিপদবাবু চেয়েছিলেন আমরা সেটা উদ্ধার করে দিই। এই অনুরোধই তিনি করেছিলেন।"

"কোথায় ওগুলো পোঁতা হয়েছিল তিনি আপনাকে জানিয়েছিলেন ?"

"না। তিনি জানতেন না।"

"স্ট্রেঞ্জ ! উত্তর বাংলার কোথায় খুঁজবেন আপনি ? পাগল নাকি ?"

"তবু আমি কেসটা নিয়েছিলাম। এ-ব্যাপারে ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে সাহায্য পেতাম।"

"দেখুন মিস্টার সোম, আপনার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"প্রথমত গল্প নয়, ঘটনা। বিশ্বাস করানোর দায়িত্ব আমার নয়।"

"বেশ। তারপর কী হল ?"

"আমি ওঁকে আজ দেখা করতে বলেছিলাম।"

"উনি শিলিগুড়িতে থাকতে গেলেন কেন ? জলপাইগুড়িই তো ভাল ছিল।"

"সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন শিলিগুড়িতেই উনি ভাল থাকবেন। মনে হচ্ছে, মানে এখন অনুমান করছি, শিলিগুড়িতে কারও সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক ছিল, যেটা আমাকে বলেননি।"

"কার সঙ্গে ?"

"সম্ভবত যে লোকটি ওঁকে খুন করেছে তার সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।"

হঠাৎ রায়বাবুর যেন কিছু মনে পড়ল। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হরিপদবাবুর পূর্বপুরুষ কার সহচর বললেন ?"

অমলদা বললেন, "কালাপাহাড়।"

"অদ্ভুত ব্যাপার ? কালাপাহাড় মানে সেই ঐতিহাসিক চরিত্র ?"

"হ্যাঁ।"

রায়বাবু উঠে একটা আলমারির পাল্লা খুললেন। বাঁ দিকের তাক থেকে একটা খাম বের করে তা থেকে একটা কাগজ টেনে আনলেন। বেশ রহস্যময় মুখ করে এগিয়ে এসে কাগজটাকে টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন।

একটা প্যাডের পাতার গায়ে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। পাতাটা কোঁচকানো। বোঝা যাচ্ছে ওই কাগজ দিয়ে কিছু মোছা হয়েছিল। প্যাডের পাতায় কেউ অনেকবার "কালাপাহাড়" শব্দটা লিখে গেছেন নানান ঢঙে। তার ওপর শুকনো রক্ত চাপা পড়েছে।

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কাগজটাকে কোথায় পাওয়া গিয়েছে ?

"হরিপদবাবুর শরীরের ওপরে।"

"আপনি তখন যে বললেন ঘরের কোনও জিনিস সরানো হয়নি ?"

"এটাকে জিনিসের মধ্যে ধরিনি। আমি কিন্তু হরিপদবাবুর ব্যবহৃত জিনিসের কথা বলেছিলাম।"

"ছুরিটা কোথায় ?"

"ছুরি ?"

"যেটা দিয়ে ওঁকে খুন করা হয় ?"

"সেটা তো খুনি নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এই কাগজটা দিয়েই ছুরি মুছেছে।"

"এখনও পোস্টমর্টেম হয়নি। আপনি কী করে তখন বললেন দশ ইঞ্চির ছুরি ছিল ?"

"এতদিন পুলিশের চাকরি করছি, উন্ড দেখে আন্দাজ করতে পারব না ?"

চুপ করে রইলেন অমলদা খানিক। তারপর বললেন, "প্যাডের কাগজটা

অবশ্যই হরিপদবাবুর। খুনি ছুরি মুছতে প্ল্যান করে পকেটে কাগজ নিয়ে আসবে না। কিন্তু ঘরের কোথাও আমি প্যাড দেখতে পাইনি। সেটা গেল কোথায়।"

রায়বাবু মাথা নাড়লেন, "ঠিক কথা! এটা আমার মাথায় আসেনি।"

শ্রীকান্ত বক্সি এতক্ষণ বেশ চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, "আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম অমলবাবুর এ-ব্যাপারে দারুণ মাথা খোলে।"

অমলদা হাত নাড়লেন, "আমাকে কি আর কো'নও প্রশ্ন করবেন।"

"না। তবে, হ্যাঁ। আপনি কালাপাহাড়ের নাম বললেন। ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু এই কাগজে সেই নামটা লেখা থাকবে কেন?"

"হয়তো হরিপদবাবু লিখেছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে।" অমলদা হাসলেন, "মাথায় যেটা ঢোকে সেটা আমরা অনেকেই অন্যমনস্ক অবস্থায় কলমে ফুটিয়ে তুলি। তবে দেখতে হবে ওই কাগজের রক্ত এবং হাতের লেখা হরিপদবাবুর কি না।"

"রক্তটা ওঁর কি না বের করতে অসুবিধে হবে না। হাতের লেখা মেলাব কী করে?"

"হোটেলের খাতায় নিশ্চয়ই ওঁর হস্তাক্ষর পাওয়া যাবে। তাকিয়ে দেখুন বাংলার সঙ্গে ইংরেজি অক্ষরেও কালাপাহাড় লেখা হয়েছে। ক্যাপিটাল লেটারে যখন নয় তখন লেখাতে কিছুটা মিল পাওয়া যাবেই। যাক, এবার আমাকে হোটলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন।" অমলদা উঠে দাঁড়ালেন।

॥ সাত ॥

হোটেলের যেসব কর্মচারীকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল অমল সোম তাদের জেরা করলেন। গতকাল হরিপদবাবুর কাছে কারা এসেছিলেন, হরিপদবাবুর ঘর থেকে কোনও আওয়াজ শোনা গিয়েছিল কিনা, মৃতদেহ কীভাবে আবিষ্কৃত হল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর যা পাওয়া গেল তাতে কোনও কাজ হল না। লোকগুলো এত ভয় পেয়েছে যে, কোনও কথাই বলতে চাইছে না। কিংবা ওদের কিছুই বলার নেই। হত্যাকাণ্ড সকলের অগোচরে ঘটে গেছে। অর্জুনেরও মনে হল এমনটা ঘটা অসম্ভব নয়। হত্যাকারী সবাইকে জানিয়ে নিশ্চয়ই হরিপদবাবুর ঘরে ঢুকবে না।

থানার বড়বাবুর ঘরে ফিরে এসে অমলদা ঘড়ি দেখলেন। তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি মিসেস দত্তকে কোনও কথা দিয়েছ?"

মিসেস দত্ত! অর্জুন ঠাওর করতে পারল না। তার অবাক-হওয়া মুখের

দিকে তাকিয়ে অমল সোম বললেন, "হৈমন্তীপুর চা-বাগানের এখন যিনি মালিক।"

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল অর্জুনের। ভদ্রমহিলাকে আজ দুপুরের মধ্যেই জানানোর কথা হয়েছিল কেসটা নেওয়া হবে কি না। কিন্তু সকাল থেকে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যে, ওঁর কথা মাথায় ছিল না। অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকাল। হৈমন্তীপুর চা-বাগানের কেসটা অমলদা নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন তাকে। তা হলে হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ তুললেন কেন? সে বলল, "আমরা তো ওঁর কেস নিচ্ছি না, তাই না?"

অমলদা কথা শেষ করার ভঙ্গিতে বললেন, "সেটাও তো ওঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। তুমি একটা ফোন করে ওঁকে জানিয়ে দাও।"

দু'জন পুলিশ অফিসার চুপচাপ শুনছিলেন কথাবার্তা। শ্রীকান্ত বক্সি হাত বাড়িয়ে টেবিলের কোণে রাখা টেলিফোন দেখিয়ে দিলেন। শিলিগুড়ি থেকে হৈমন্তীপুর চা-বাগানে টেলিফোনে কথা বলতে হলে জলপাইগুড়ি এক্সচেঞ্জ হয়ে লাইন পেতে হবে। সেসব চেষ্টা করে যখন হৈমন্তীপুর চা-বাগানের কাছে টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে পাওয়া গেল তখন অর্জুন জানতে পারল মিসেস দত্তের বাংলো বা ফ্যাক্টরির টেলিফোন কোনও সাড়া দিচ্ছে না। সেখানকার অপারেটার জানালেন হৈমন্তীপুর চা-বাগানের টেলিফোন লাইন কাজ করছে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে অর্জুন অমল সোমকে ঘটনাটা জানাল।

অমল সোম গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর শ্রীকান্ত বক্সির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এলাকা যদিও নয় তবু আপনি কি হৈমন্তীপুর টি এস্টেটের ব্যাপারটা জানেন?"

শ্রীকান্ত মাথা নাড়লেন, "শ্রমিক বিক্ষোভে বন্ধ ছিল। শেষপর্যন্ত বাগানটা খোলা হয়েছে বলে শুনেছি। কাল জানলাম দু-একটা খুন হয়েছে সেখানে।"

"পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না?"

শ্রীকান্ত বক্সি হাসলেন, "পুলিশ তো ম্যাজিসিয়ান নয়। নিশ্চয়ই খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। কোনও কোনও সমস্যার তো চট করে সমাধান হয় না।"

অমল সোম এবার অর্জুনকে বললেন, "ব্যাপারটা আমার খুব ভাল লাগছে না। তুমি এখনই হৈমন্তীপুরে চলে যাও। ভদ্রমহিলা যেসব আশঙ্কা করছিলেন তাই ঘটতে শুরু হয়েছে। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাও করা হতে পারে। তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে?"

আজ অর্জুনের পকেটে টাকা ছিল না। সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়নি। অমল সোম তাকে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন, "এদের কাছে তো কিছুই জানা গেল না তাই শিলিগুড়ি থেকে ফিরতে আমার সন্ধে হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলাকে খবরটা দিয়েই তুমি জলপাইগুড়িতে ফিরে যেয়ো।" অমল সোম পুলিশ অফিসারদের দিকে ঘুরে তাকালেন, "আমরা কি এবার একটু

চা খেতে পারি ?”

অর্জুন থানা থেকে বেরিয়ে এল। হরিপদ সেনের হত্যারহস্য খুব সহজে সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না। অমলদার মুখ দেখে মনে হল তিনি এখন পর্যন্ত অন্ধকারেই আছেন। আর যেহেতু হরিপদবাবু আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছেন তাই এই রহস্য সমাধান না করা পর্যন্ত অমলদা গম্ভীর থাকবেন। কিন্তু অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না এইভাবে তাড়াহুড়ো করে অমলদা তাকে কেন হৈমন্তীপুরে পাঠাচ্ছেন ? ভদ্রমহিলাকে সে বলেছিল আজকে জানাবে। সেটা আগামিকাল হলে এমন কিছু ক্ষতি হত না। হৈমন্তীপুরে না গিয়ে অমলদার সঙ্গে শিলিগুড়িতে থেকে হরিপদবাবুর আসামিকে খুঁজে বের করার চেষ্টাতেই অনেক বেশি আনন্দ ছিল ! কালাপাহাড়ের উত্তরাধিকারী নবীন কালাপাহাড়ের মোকাবিলা তো এখানেই হবে। অর্জুন ঘড়ি দেখল। এখন সেবক-মালবাজার হয়ে হাসিমারা দিয়ে হৈমন্তীপুরে পৌঁছে আর ফেরার বাস পাওয়া যাবে না। সন্ধের মুখেই ওদিকে বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অর্জুন ঠিক করল মিনিবাসে জলপাইগুড়ি ফিরে গিয়ে তার নিজের মোটর বাইক নিয়ে হৈমন্তীপুরে যাবে। একটু এগিয়ে সে দেখল থানার কাছে মিনিবাস স্ট্যান্ডে কোনও বাস নেই। দেরি করা চলবে না বলে সে রিকশা নিয়ে চলে এল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি হাইওয়েতে। এবং তখনই একটা ধাবমান ট্যাক্সি থেকে কেউ বিকট গলায় 'অর্জুন' বলে চিৎকার করে উঠল।

অবাক হয়ে অর্জুন দেখল একটা ওয়াই মার্কা অ্যাম্বাসাডার কোনও মতে ব্রেক কষতে-কষতে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই কোনও চেনালোক, যিনি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন। গাড়িটা এবার ব্যাক করছে। কাছাকাছি পৌঁছেই দরজা খুলে যিনি লাফিয়ে নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর কথা কল্পনাতেও আসেনি। দু' হাতের চাপে ততক্ষণে হাঁসফাঁস অবস্থা অর্জুনের। মেজর কিন্তু নিঃশব্দ নন। গাড়ি থেকে নামামাত্র সমানে চিৎকার করে যাচ্ছেন, “এই যে মিস্টার থার্ড পাণ্ডব, কী সারপ্রাইজ, আঃ, কতদিন পরে দেখলাম আমাদের গ্রেট ডিটেকটিভকে, লম্বা হয়েছে, উঁহু, একটুও মোটা হওনি, দ্যাটস ফাইন, অমলবাবুর খবর কী ?”

কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লম্বা-চওড়া দাড়িওয়ালা মানুষটির মুখে সরল হাসি দেখল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, “আপনি কেমন আছেন ?”

“খুব ভাল। যাকে বলে ফার্স্ট ক্লাস। একটু বুড়ো হয়েছি, এই যা।” বলে আকাশ-ফাটানো হাসলেন। অর্জুনের মনে হল এই মানুষটি একইরকম রয়েছেন। সেবার কালিম্পং থেকে শুরু করে আমেরিকা-ইউরোপে সে মেজরের সঙ্গে দিনের পর দিন থেকেছে। মেজরকে দেখলেই মনে হত হার্জের আঁকা ক্যাপ্টেন হ্যাডক রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এবার দাড়িতে সাদা ছোপ লেগেছে একটু বেশি পরিমাণে, এই যা।

ট্যাক্সিতে বসে অর্জুন বলল, "বিষ্টু সাহেবের কাছে খবর পেয়েছিলাম আপনি এদেশে এসেই কালিম্পঙে চলে গিয়েছেন। কাজ হয়েছে ?"

"কাজ ? কাজের জন্য তো আমি যাইনি। ওখানকার একজন লামা আমাকে চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর পেটে একটা অসুখ হয়েছে। এখানকার ওষুধে কাজ দিচ্ছে না তাই আমায় ওদেশি ওষুধ এনে দিতে লিখেছিলেন। সেটাই দিয়ে এলাম।" মাথা নাড়লেন মেজর, "এখন ক'দিন রেস্ট নেব, যাকে বলে অখ, অখ—।"

"অখণ্ড বিশ্রাম।" অর্জুন সাহায্য করল।

"ঠিক। মাঝে-মাঝে একটা বাংলা শব্দ ভীষণ বিট্রে করে। তোমাদের হাতে কোনও কাজ নেই তো ? গুড। কী ? মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললে না কি।" চোখ বড় করলেন মেজর।

অর্জুন হাসল, "আমরা এখন তিনটে কেসে জড়িয়ে পড়েছি।"

"তিন-তিনটে ? কোনও গোয়েন্দা একসঙ্গে তিনটে কেস করে না। আমি তো অন্তত পড়িনি। ইভ্‌ন শার্লক হোমস ! তিনটে ডিফারেন্ট কেস !"

"না। দুটো গায়ে-গায়ে। একটা আলাদা।"

"ইন্টারেস্টিং। বলে ফ্যালো ব্যাপারটা।" কথাটা বলেই মেজর সোজা হয়ে সামনের সিটের দিকে তাকালেন। সেখানে ড্রাইভার আপনমনে গাড়ি চালাচ্ছে। লোকটি নেপালি। সম্ভবত মেজর কালিম্পং থেকেই তাকে ভাড়া করেছেন। মেজর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপ ইংলিশ জানতা হ্যায় ?"

"ইয়েস স্যার।" লোকটি মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল।

"হিন্দি তো জানতা হ্যায়। বেঙ্গলি ? বাংলা ?"

"অল্প-অল্প।"

"ডেঞ্জারাস। তা হলে তো থার্ড পার্সনের সামনে আলোচনা করা যাবে না অর্জুনবাবু। কী করা যায় ?" মেজরকে খুব চিন্তিত দেখল।

অর্জুন এতক্ষণ ড্রাইভারের অস্তিত্ব খেয়াল করেনি। কিন্তু তার মনে হল মেজর একটু বেশি চিন্তা করছেন। কালিম্পঙের একজন নেপালি ড্রাইভারের কোনও স্বার্থ থাকতে পারে না কালাপাহাড়ের বাসে। কিন্তু মেজর যেভাবে গম্ভীর মুখে এখন বসে আছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনি সত্যিই তৃতীয় ব্যক্তির সামনে মুখ খুলতে চান না। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা খুব মজাদার হয়ে দাঁড়াল। গাড়ি চলছে জলপাইগুড়ির দিকে কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। মেজর গম্ভীর হয়ে রাস্তা দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এবার তাঁর নাকডাকা শুরু হয়ে গেল। সেইসঙ্গে ড্রাইভারও মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। কথা বন্ধ করা মাত্র কোনও মানুষ এমন চট করে গভীর ঘুমে ঢুকে যেতে পারে তা মেজরকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অমল সোমের বাড়ির সামনে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হল। সুটকেস নামিয়ে মেজর হাত-পা আকাশে

ছোঁড়ার চেষ্টা করলেন, "একটু সময় নিয়ে স্নান করা যাবে, কী বল ?"

"আপনি স্নান করুন। বিষ্টুসাহেব নিশ্চয়ই এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। হাবুদা আছে। আমাকে এখনই বাইক নিয়ে ছুটতে হবে হৈমন্তীপুরে।"

"সেটা কোথায় ?"

"এখান থেকে প্রায় একশো কিলোমিটারের বেশি দূরে একটা চা-বাগান।"

"বাট হোয়াই ? যাচ্ছ কেন ?"

"ওই যে তখন বললাম, তিন-তিনটে কেসের কথা। এটি তার একটা।"

মেজর গেট খুলে সুটকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই হাবুকে দেখা গেল। হাবু বাগানে দাঁড়িয়ে মেজরকে দেখছিল সম্ভবত। তার মুখের ভঙ্গি সুখকর নয়। মেজরকে হাবু অপছন্দ করছে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম হাবু ? গুড। সুটকেসটা ভেতরে রাখো। বিষ্টুসাহেব কী করছেন ? অমলবাবু কোথায় ?"

পাশে দাঁড়িয়ে অর্জুন বলল, "আপনি বোধহয় ভুলে গিয়েছেন হাবুদা কানে শোনে না এবং কথাও বলতে পারে না। অমলদা এখন শিলিগুড়িতে।"

"শিলিগুড়িতে কেন ?"

"ওই কেসের ব্যাপারেই ওখানে গিয়েছেন।"

"আশ্চর্য ! তখন থেকে কেস-কেস করছ অথচ ঘটনাটা বলছ না !"

"কী করে বলব ? আপনি তো ঘুমোচ্ছিলেন।"

"ঘুমোচ্ছিলাম ? আমি ? ইম্পসিব্‌ল। চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ড্রাইভারটা ছিল, তাই আমরা আলোচনা করিনি। কিন্তু এই হাবুচন্দ্রের সঙ্গে তোমরা কম্যুনিকেট কর কী করে ?"

"আপনি সব ভুলে গেছেন। হাবুদা ঠিক বুঝে নেয়। তা হলে আপনি বিশ্রাম করুন। হাবুদা, ইনি বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে থাকবেন। স্নান-খাওয়ার ব্যবস্থা করো।" কথা বলার সঙ্গে আঙুলের ইঙ্গিতে বক্তব্য বুঝিয়ে অর্জুন তার নিজের বাইকটার দিকে এগিয়ে গেল। মেজর কয়েক পা হেঁটে হাবুর হাতে সুটকেস ধরিয়ে দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। অর্জুন ইঞ্জিনে স্টার্ট দেওয়ামাত্র বললেন, "তোমার হাত পাকা তো ? আমার আবার বাইকে উঠতে খুব নার্ভাসি-নার্ভাসি লাগে !"

"আপনি উঠবেন মানে ?" অর্জুন অবাক।

"অদ্ভুত প্রশ্ন তো !" মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন, "উনি যাবেন একশো কিলোমিটার দূরে কেস করতে, আর আমি এখানে বসে সজনের ডাঁটা খাব ? তাছাড়া তিন-তিনটে কেসের গল্প এখনও শোনা হয়নি।"

মেজর বাইক নাচিয়ে পেছনের সিটে বসে বললেন, "পেছনের চাকার হাওয়া ঠিক আছে তো ?"

অর্জুন কাতর চোখে তার বাইকের চাকা দেখল। এই লাল বাইকের ওপর

তার খুব মায়া। কাউকে হাত দিতে দেয় না। মেজরের ভারী শরীর বইলে বাইকটার ক্ষতি হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে। তবু শেষ চেষ্টা করল, "আপনি স্নান করে বিশ্রাম নেবেন বলেছিলেন!"

"বিশ্রাম আমার কপালে নেই ভাই। চল।"

অগত্যা চাকা গড়াল। পেছনের ভার খানিকক্ষণ বাদেই সয়ে গেল অর্জুনের। মেজর এবার তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরেছেন। অর্জুন তাঁকে সহজ হয়ে বসতে বলায় তিনি রেগে গেলেন, "নিজে মাথায় হেলমেট পরেছ, আমার মাথা খালি, ছিটকে পড়লে কী হবে ভেবে দেখেছ? হ্যাঁ, এবার বল, হৈমন্তীপুর নাকি ছাই, সেখানে কী হচ্ছে?"

বাইকে স্পিড বাড়িয়ে তিস্তা ব্রিজের দিকে যেতে যেতে অর্জুন হাওয়ার ওপর গলা তুলে বলল, "খুন হচ্ছে।"

॥ আট ॥

লাল বাইকটা ছুটে যাচ্ছিল ডুয়ার্সের সুন্দর চওড়া পথ ধরে। গয়েরকাটা বীরপাড়ার মোড় হয়ে যখন অর্জুনরা জলদাপাড়ার জঙ্গলের গায়ে পৌঁছল তখন সূর্যদেব পাততাড়ি গোটাতে ব্যস্ত। ব্যাক সিটে মেজর এখন অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে আছেন। সারাটা পথ আর মুখ খোলেননি। খুন হওয়ার গল্পটা শোনার পর থেকেই তিনি চুপচাপ। ভুল হল, ঠিক চুপচাপ নন তিনি, ঠোঁট বন্ধ করে সমানে একটা সুর বের করে যাচ্ছেন নাকের ফুটো দিয়ে। কানের কাছে সেটা খুব শ্রুতিকর নয় কিন্তু অর্জুন সেটা সহ্য করেছিল। পুরনো দিনের বাংলা গান থেকে আরম্ভ করে আধুনিক ইংরেজি গান, কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

অর্জুনের অস্বস্তি শুরু হল মাদারিহাট টুরিস্ট বাংলো ছাড়ানোর পর থেকেই। দিনে-দিনে ফিরে না এলে অস্বস্তিটা যাবে না। অথচ সেটা যে আর সম্ভব নয় তা এখন বোঝা যাচ্ছে। এসব অঞ্চলে সন্ধের মুখেই হাতি বেরিয়ে আসে জঙ্গল ফুঁড়ে। সেটা নিয়েও সে ভাবছে না। যাদের এড়াতে মিসেস মমতা দত্ত নিজের গাড়ি ছেড়ে অন্যভাবে জলপাইগুড়িতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাদের নিয়েই এখন চিন্তা। অবশ্য এখন সে একা নেই, মেজর সঙ্গে থাকায় কিছুটা সাহস পাওয়া যাচ্ছে। অর্জুন বাইকের গতি আরও বাড়াল।

পথে কোনও বাধা পাওয়া যায়নি। হাসিমারার মোড়ে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়েছিল। মোড় বলেই গতি কমাতে বাধ্য হয়েছিল অর্জুন। এবং তখনই সে ভানুদাকে দেখতে পেল। লম্বা পেটা শরীর। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজার। বছরখানেক আগে অমল সোমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ভদ্রলোক। না, কোনও প্রয়োজনে নয়। গল্প শুনে আলাপ করে

গিয়েছিলেন। দারুণ মানুষ। এডমণ্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্টের ওপর তলায় উঠে ছবি তুলেছেন প্রচুর। সেই সময় বরফের কামড়ে পায়ের কয়েকটা আঙুল ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। এক সময় একটি ইংরেজি দৈনিকের চাকুরে ছিলেন। এডমন্ড সাহেবের বইয়ে ওঁর তোলা প্রচুর ছবি আছে। সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান মানুষটি এখন চা-বাগানের ম্যানেজার। অর্জুন তাঁর গাড়ির পাশে নিজের বাইক দাঁড় করাল।

মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেয়েই ভানুদা চিৎকার করলেন, "আরে সাহেব যে! এদিকে কী ব্যাপার?" একগাল হাসলেন ভদ্রলোক।

বাইক দাঁড় করাতেই মেজরও জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি পৌঁছে গিয়েছি?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এখনও কিছুটা পথ বাকি। আসুন এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ভানুদা, ইনি মেজর, আমাদের খুব কাছের মানুষ, সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছেন। আর ইনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, টি প্ল্যান্টার, এডমণ্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্ট গিয়েছিলেন।"

বাইকে বসেই মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কতটা?"

"মানে?" ভানুদা জানতে চাইলেন।

"কতটা উঠেছেন?"

"সামান্যই। মাত্র বাইশ হাজার ফুট।"

"গুড। এবার যখন নর্থ পোলে আমার জাহাজডুবি হল তখন ভেবেছিলাম এভারেস্টের ওপরে নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হবে না। কেমন ঠাণ্ডা?"

"প্রচণ্ড। কিন্তু কোথায় জাহাজডুবি হয়েছিল বললেন?"

"নর্থ পোলে। বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানকার পেঙ্গুইনদের ছবি তুলব এমন ইচ্ছে ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন একটা আমেরিকান গোঁয়ার। চার্লি বলে ডাকতাম। হাজারবার বলেছিলাম, কুয়াশায় যখন চারপাশ ঢাকা তখন আর এগিয়ো না। শুনল না কথা। চোরা বরফে ধাক্কা খেলাম। আইসবার্গ। ব্যস। ডুবল। লাইফ জ্যাকেট পরে ওই ঠাণ্ডায় পাক্কা আট ঘণ্টা খাবি খেয়েছি জলে। হেলিকপ্টার এসে না তুললে আপনার সঙ্গে আলাপ হত না।"

কথা শুনতে-শুনতে ভানুদা এতখানি মুগ্ধ যে, তাঁর গলায় সেটা ফুটে উঠল, "আরে কী আশ্চর্য, আপনাকে তো ছাড়ছি না। চলুন আমার বাগানে।"

মেজর মাথা নাড়লেন, "না, নামতে পারব না।"

"মানে?"

"এতক্ষণ বাইকে বসে শরীর জমে গিয়েছে। এখন নেমে দাঁড়ালে আর উঠতে পারব না। এইভাবে এতক্ষণ বসা যে কী পরিশ্রমের! সেটা ভুলতে গান গাইছিলাম। শরীরের সব কব্জা এখন একেবারে আটকে গিয়েছে।"

"এই বাইকে আপনাকে উঠতে হবে না। আমার গাড়িতে পা ছড়িয়ে

বসুন।"

এবার অর্জুন আপত্তি করল, "ভানুদা, আমি একটা জরুরি কাজে হৈমন্তীপুর চা-বাগানে যাচ্ছি। এখন আপনার ওখানে যাওয়া যাবে না।"

"হৈমন্তীপুর?" চমকে উঠলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, "সেখানে কেন?"

"মিসেস মমতা দত্তকে একটা খবর দিতে।"

"হৈমন্তীপুরের এখনকার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা আছে তো?"

"কিছুটা আছে।"

"গতকালও মিসেস দত্তের বাবুর্চি খুন হয়েছে।"

হঠাৎ মেজর বলে উঠলেন, "অ্যানাদার খুন? তা হলে তো আমাদের সেখানে যেতে হচ্ছেই। নো মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়, এর পরের বার আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

ভানুদা হাত নাড়লেন, "জাস্ট এ মিনিট। সন্ধে হয়ে এসেছে। আমার মনে হয় আজকের রাতটা আমার ওখানে কাটিয়ে কাল সকালে গেলেই ভাল হবে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "তাহলে কথার খেলাপ হয়ে যাবে। মিসেস দত্তকে আমি কথা দিয়েছি আজই খবর দেব। আপনি কি কিছু আশঙ্কা করছেন?"

"হ্যাঁ। বাগানে ঢোকার আগেই বিরাট নীলগিরি ফরেস্ট। একটার পর একটা খুন হচ্ছে সেখানে। তা হলে চল, লোকাল থানায় তোমাদের নিয়ে যাই। ওদের এসকর্টকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।"

"কিন্তু থানায় যাওয়াটা এই মুহূর্তে ঠিক কাজ হবে না। আপনি যাদের ভয় পাচ্ছেন তাদের নজর নিশ্চয়ই থানার ওপরেও আছে।"

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "বাইকটাকে এখানে রেখে তোমরা আমার গাড়িতে ওঠো। তিনজনেই যাই।"

মেজর চটপট বলে উঠলেন, "দ্যাটস নট এ ব্যাড আইডিয়া।"

এই সময় একটা পুলিশের জিপকে দেখা গেল। সম্ভবত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি দেখেই দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন, "কেমন আছেন সার?"

ভানুদা হাত নাড়লেন, "ভাল। কী খবর?"

জিপে বসেই দারোগা উত্তর দিলেন, "এই চলছে। এমন একটা চাকরি মশাই যে, একটু শান্তিতে থাকার জো নেই।"

ভানুদা জিজ্ঞেস করলেন, "হৈমন্তীপুরে শুনলাম গত রাত্রেও মার্ডার হয়েছে?"

"আর বলবেন না। আজ ভোরে নাকি একটা অ্যাম্বাসাডার এসেছিল এ তল্লাটে, শিলিগুড়ি থেকে। খবরটা পেয়ে ছুটোছুটি করলাম কিন্তু কোনও লাভ হল না। হৈমন্তীপুরে ঢোকার মুখে যে সাঁকোটা ছিল সেটা কেউ উড়িয়ে দিয়েছে। গাড়ি যাচ্ছে না আর। মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে বাগানটা বিক্রি করে

দিয়ে যেতে হবে।" দারোগাবাবু বললেন।

"ওঁকে আপনারা প্রোটেকশন দিচ্ছেন না?"

"কাকে দেব? আমাদের না জানিয়ে হুটহাট জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছেন। এঁরা কারা?" দারোগার চোখের দৃষ্টি ঘুরল।

"আমার বন্ধু।" ভানুদা জানাতেই দারোগা হাত নেড়ে চলে গেলেন।

অর্জুন এবার জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন? আপনার গাড়ি তা হলে হৈমন্তীপুরে ঢুকবে না। সাঁকো থেকে বাংলো কতদূর?"

"মাইলখানেক তো বটেই।" মনমরা হয়ে 'গলেন ভানুদা।

"তা হলে আমরা চলি। এখন সাঁকোর নীচে জল থাকার কথা নয়। বাইকটাকে পার করাতে পারব। ফেরার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।"

অগত্যা যেন রাজি হতে বাধ্য হলেন ভানুদা, "বেশ। রাত ন'টা পর্যন্ত তোমাদের জন্য আমি অপেক্ষা করব। খুব চিন্তায় ফেলে দিলে ভাই।"

অর্জুন আর অপেক্ষা করল না। মেজর বললেন, "এই নামে একজন অ্যাক্টর ছিলেন না? খুব হাসাতেন?"

"হ্যাঁ। সেটা প্রথম দর্শনে ওঁকে বলেছিলেন অমলদা। শুনে ভানুদা জবাব দিয়েছিলেন, কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন? উনি জিনিয়াস, আমি ওয়ান অব দ্য ম্যান।" অর্জুনের কথা শুনে মেজর এমন হেসে উঠেছিলেন যে, বাইকটা জোর নড়ে উঠল। মেজর বললেন, "সরি।"

একটু বাদেই হেডলাইট জ্বালাতে হল। রাস্তা নির্জন। দু'পাশে বাড়িঘরও নেই। হাসিমারা ছাড়াবার পরেই কেমন জঙ্গুলে আবহাওয়ায় এসে গিয়েছিল ওরা, এবার সেটা গভীর হল। হঠাৎ মেজর অর্জুনের পিঠে টোকা মারলেন। অর্জুন ঘাড় না ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলছেন?"

মেজর গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কানের কাছে মুখ এনে, "তোমার সঙ্গে রিভলভার আছে তো? গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নাও।"

অর্জুন স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল, "আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই।"

"যাচ্চলে।" মেজর ককিয়ে উঠলেন।

"আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?"

"নো, নেভার। সেবার হার্লেমে মারপিট করেছিলাম খালি হাতে। ভয় আমি পাই না হে। তবে সাবধানের তো মার নেই। আর কত দূর? আমার দুটো পা এমন অবশ হয়ে গিয়েছে যে, ও দুটো আছে কিনা তাই বুঝতে পারছি না।"

মেজরের গলার স্বর শুনে অর্জুনের মায়া হল। ভারী শরীর নিয়ে একভাবে বসে থাকা সহজ কথা নয়। কিন্তু এই মানুষটাই কী করে তা হলে আফ্রিকা, নর্থ পোলে অথবা তিব্বতে অভিযান করে বেড়ান? মাঝে-মাঝে মনে হয় মেজর

সমানে গুল মেরে যাচ্ছেন, কিন্তু বিষ্টুসাহেব বলেছেন ওঁর সবচেয়ে বড় গুণ কখনওই মিথ্যে কথা বলেন না।

অর্জুন নজর রাখছিল। প্রত্যেক চা-বাগানের সামনে নাম লেখা বোর্ড থাকে। সেটা থেকেই হৈমন্তীপুরের হদিস পেতে হবে। হঠাৎ দারোগার কথাটা মনে এল। সকালে তিনি একটা অ্যাম্বাসাডারের খোঁজ করেছিলেন ? কোন অ্যাম্বাসাডার ? ভদ্রলোক বিশদে বলেননি। আজ সকালে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে মিষ্টির দোকানে যেটা দাঁড়িয়ে ছিল, অমলদার অনুরোধে যে-গাড়িটা তাদের লিফট দিয়েছিল সেইটে কি ? শিলিগুড়িতে পৌঁছবার পর এ নিয়ে অমলদার সঙ্গে কথা বলার আর সুযোগ হয়নি। তবু ব্যাপারটা মনে বিঁধতে লাগল। পরক্ষণেই সে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। হৈমন্তীপুরের কেসটা যখন সে নিচ্ছে না তখন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ ?

বাইকের হেডলাইটের আলো সাইনবোর্ডের ওপর পড়তেই অর্জুন গতি কমিয়ে বলল, "আমরা এসে গিয়েছি।" মেজর পেছন থেকে বললেন, "কোথায় এলাম ? চারপাশে তো অন্ধকার !"

ততক্ষণে রাস্তাটা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। পিচের রাজপথ থেকে একটু নুড়িতে ভরা পথ নেমে গিয়েছে বাঁ দিকে। চা-বাগানের রাস্তা যেমন হয়। অর্জুন বাঁ দিকে বাইক ঘোরাল। মেজর বলে উঠলেন, "ভাঙা ব্রিজটাকে খেয়াল কর। উঃ কী অন্ধকার রে বাবা। সেবার নিউ ইয়র্কে এক ঘণ্টার জন্য পাওয়ার চলে গিয়েছিল। ঠিক এমন অন্ধকার হয়েছিল সেখানে। অমন ঘটে না বলে কেউ তো বাড়িতে মোমবাতি পর্যন্ত রাখে না।"

গতি কম ছিল। মিনিট দেড়েক যাওয়ার পর সাঁকোটাকে দেখা গেল। কাঠের সাঁকো। বড়জোর হ ্ পনেরো হবে। ঠিক মাঝখানের কাঠগুলো উধাও। গাড়ি যাওয়া-আসা অসম্ভব, কিন্তু অর্জুনের মনে হল সার্কাসের বাইক ড্রাইভাররা ওই ফাঁকটুকু বাইক নিয়ে লাফিয়ে যেতে পারে। হেডলাইটের আলোয় সাঁকোর নীচেটা দেখল অর্জুন, তারপর বলল, "এবার আপনাকে নামতে হবে। বাইকটাকে নীচে নামাতে হবে।"

একদম ইচ্ছে ছিল না মেজরের। গাঁইগুঁই করে তিনি কোনও রকমে নীচে নেমে চিৎকার করে বসে পড়লেন। বোঝা যাচ্ছিল পায়ে বিন্দুমাত্র জোর নেই। একনাগাড়ে বসে-বসে ও দুটোতে ঝিঁঝি ধরে গেছে। অর্জুন হেসে বলল, "মোটর বাইকের পেছনে বসে আপনার এই অবস্থা ! আর ভাবুন তো, কালাপাহাড়ের কথা ? ভদ্রলোক দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতেন।"

খিঁচিয়ে উঠলেন, "ইঃ, আমাকে কালাপাহাড় দেখিও না। আমি কি ওরকম লোক ? অদ্ভুত তুলনা।"

মেজরের পা ঠিক হতে যে সময় লাগল তার মধ্যে অর্জুন দেখে নিল সাঁকোর

নীচে দিয়ে কোনওমতে বাইকটাকে পার করা সম্ভব হবে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই, জল নেই। কয়েকটা বড় বোল্ডার পড়ে আছে শুকনো হয়ে। মাঝে মাঝে বাইকটাকে দু'হাতে তুলতে হবে এই যা। পায়ে-পায়ে শুকনো ঝোরাটা পার হয়ে আবার রাস্তায় উঠতেই ওরা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। আওয়াজ লক্ষ করে তাকাতেই অন্ধকারের মধ্যেই একটা ছায়ামূর্তিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। মেজর চিৎকার করলেন, "অ্যাই কে ? হু আর ইউ ?"

অর্জুন মোটর বাইকের হেডলাইট ঘুরিয়ে লোকটির পেছনটা দেখতে পেল এক ঝলক। চট করে পাশের চা-বাগানের মধ্যে মিলিয়ে গেল সে।

মেজর বললেন, "লোকটা কে হে ? পালাল কেন ওভাবে ?"

"হয়তো গার্ড দিচ্ছিল। আমরা এসেছি এই খবর দিতে গেল।"

"কাকে ?"

"সেটাই তো জানি না।"

অর্জুন আবার বাইক চালু করল। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "উঠতে হবে ?"

"না হলে যাবেন কী করে ? হাঁটবেন ?"

"হাঁটা আমাকে দেখিও না তৃতীয় পাণ্ডব ? এক রাত্রে সাহারায় আমি কুড়ি মাইল হেঁটেছিলাম। ঠিক আছে, উঠছি।" বাইকে উঠে তিনি বললেন, "ভানুবাবুর প্রস্তাবটা খারাপ ছিল না। আজ রাত্রে ওঁর বাড়িতে রেস্ট নিয়ে কাল সকালে এলে হত।"

"পরিশ্রমই হয়নি যখন, তখন রেস্ট নেওয়ার কী দরকার ?"

মেজর নাক দিয়ে যে শব্দটা করলেন তাতে কথাটা যে খুব অপছন্দের, তা বোঝা গেল।

অন্ধকার চিরে হেডলাইটের আলো এগিয়ে যাচ্ছিল। রাত্রে বাগানের চেহারা ভাল বোঝা যাচ্ছে না বটে কিন্তু রাস্তার ওপর যেভাবে শুকনো ডালপালা ছড়ানো আছে, তাতেই স্পষ্ট, ইদানীং যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। একটু বাদে বাগানের ফ্যাক্টরি এবং অফিসগুলো নজরে এল। কোথাও আলো নেই। একটি মানুষকেও কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না।

অর্জুন দু'বার হর্ন দিল। তারপর এগিয়ে গেল সামনে। ডান দিকে বাঁক নিতেই আচমকা একটি আলোকিত বাংলা চোখে পড়ল। অনুমান করা গেল এটিতেই মমতা দত্ত থাকেন। বাংলোয় বিদ্যুৎ আছে। টেলিফোন মৃত কিন্তু বিদ্যুতের লাইন যদি ঠিক থাকে তা হলে আর সব জায়গা অন্ধকার কেন ?

গেট বন্ধ। ভেতর থেকে তালা দেওযা। অর্জুন হর্ন দিল। মমতা দত্তের নিজস্ব কর্মচারীরা নিশ্চয়ই পাহারায় থাকবেন কিন্তু তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অর্জুন আরও কয়েকবার হর্ন দিল। মেজর নেমে দাঁড়ালেন। গেটের সামনে গিয়ে চিৎকার করলেন, "বাড়িতে কেউ আছেন ? আমরা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি !"

বাড়িটা ছবির মতো নিশ্চল রইল।

অর্জুন বলল, "আপনি বাইকটার কাছে থাকুন, আমি ভেতরে ঢুকছি।"

"ভেতরে ঢুকবে কী করে ? গেট তো বন্ধ।"

"গেটটা টপকাতে হবে। আলো জ্বলছে যখন, তখন মানুষ নিশ্চয়ই ভেতরে আছে।"

বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে অর্জুন এগিয়ে গেল। গেটের উচ্চতা ফুট ছয়েকের। খাঁজে পা দিয়ে সে শরীরটাকে ওপরে তুলে লাফিয়ে নামল নীচে। দু'পাশে বাগান, মাঝখানে গাড়ি চলার পথ। সেই পথ ধরে বাংলোর দিকে এগোতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাংলোর গাড়িবারান্দার নীচে সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে আছে একটা শরীর। রক্তের ধারা বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধে গেছে পাশে।

॥ নয় ॥

এই ভর সন্ধেতেই বাগানে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। এক বুক নির্জনতা নিয়ে বাংলোটা স্থির হয়েছে গায়ে আলো মেখে, যার সিঁড়িতে পড়ে আছে একটি মানুষ। মৃত। অর্জুন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে মেজর গলা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ? তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? বেল-টেল বাজিয়ে কাউকে ডাকো!"

গেট পর্যন্ত দূরত্ব অনেকখানি। মৃতদেহ পড়ে থাকার খবরটা দিতে হলে সেখানে ফিরে যেতে হয়। অবশ্যই এতে নার্ভাস হবে। অর্জুন হাত তুলে ইশারায় তাঁকে থামতে বলে এগিয়ে গেল। মৃতদেহের বেশ খানিকটা দূর দিয়ে সিঁড়ির ওপর উঠে আবার ফিরে তাকাল। অন্তত ঘণ্টা চারেক আগে খুন হয়েছে লোকটা। শরীর থেকে বেরনো রক্তের ধারায় ইতিমধ্যে মাছি জাতীয় পোকামাকড় এসে বসেছে। লোকটার পরনের পোশাক বলে দিচ্ছে মিসেস মমতা দত্তের এই বাড়ির পাহারাদার ছিল সে। এখন মৃতদেহ পরীক্ষা করার সময় নয়। যদিও রক্ত এখন চাপ বেঁধে গেছে তবুও খুনি যে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে তার নিজেরও বিপদ। ভেতরে ঢোকার দরজাটা খোলা। সেখানেও আলো জ্বলছে।

এই ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যজনক। এখন যে সময়, তাতে ঘণ্টা-চারেক আগে তো রীতিমত দিনের আলো থাকার কথা। সেইসময় যদি খুন হয়ে থাকে তা হলে সন্ধের পর এ-বাড়ির আলো জ্বালল কে ? মিসেস দত্ত বাড়িতে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এই খুনের কথা পুলিশকে জানাবার চেষ্টা করতেন। তা হলে কি মিসেস দত্তকেও খুন করে গিয়েছে আততায়ী ? অর্জুনের কেমন শীত শীত

করছিল আচমকাই। কিন্তু মিসেস দত্ত সত্যি খুন হয়েছেন কি না তা না জেনে ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। সে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘরটি ড্রইং রুম নয়, বোধহয় মালিকের সঙ্গে যেসব মানুষ আচমকা দেখা করতে আসতেন, তাঁদের এখানেই অপেক্ষা করতে হত। এ-ঘরেও আলো জ্বলছে। অর্জুন গলা তুলল "বাংলোয় কেউ আছেন ?"

আওয়াজটা এত জোরে ছিল যে, বাংলায় কোনও লোক থাকলে সাড়া না দিয়ে পারবে না। অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল কেউ কিংবা কারা তাকে আড়াল থেকে লক্ষ করে যাচ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে কিছু করার থাকবে না। এমন নিরস্ত্র অবস্থায় আর এগোনো ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে।

কিন্তু কোথাও কোনও শব্দ হল না। এবার অর্জুনের মনে হল আততায়ী মৃতদেহ সাজিয়ে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারে না। খুনি যত শক্তিশালী হোক না কেন, খুন করার পর নিজের নিরাপত্তার কথা সে নিশ্চয়ই চিন্তা করবে। ব্যাপারটা এইভাবে ভাবতে পেরে অর্জুনের বেশ ভাল লাগল। সে দ্বিতীয় ঘরটিতে প্রবেশ করল। এটিকে সুন্দর ছিমছাম ড্রইংরুম বলা যায়। সোফা থেকে শুরু করে অন্যান্য আসবাবে রুচির ছাপ আছে। যদিও দেওয়ালে ঝোলানো হরিণের জোড়া শিং এবং বাঘের মুণ্ডুসমেত ছাল চোখে বড্ড লাগছিল। এই ঘরটি দেখলে মনেই হবে না বাড়িতে কোনও মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে।

পাশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল অর্জুন। চা-বাগানের মালিক এবং ম্যানেজাররা যে যথেষ্ট আরামে বাস করেন তা এইসব বাংলোয় এলে বোঝা যায়। পায়ের তলার কার্পেট পুরনো হলেও যথেষ্ট নরম। সিঁড়ির ওপরও আলো জ্বলছিল। প্রথম শোওয়ার ঘরে কেউ নেই। দ্বিতীয়টি লণ্ডভণ্ড। বিছানার চাদর থেকে টেবিল-চেয়ার কিছুই স্বস্থানে নেই। অর্থাৎ এখানে ঝামেলাটা হয়েছিল। সেটা কার সঙ্গে ? লাগোয়া বাথরুমের দরজাটাও খোলা। উঁকি মেরে দেখে গেল ঘরটা ফাঁকা।

তিন-তিনটে ঘর এই বাংলোর ওপরতলায়। দেখা হলে অর্জুনের স্পষ্ট ধারণা হল মিসেস দত্ত এ-বাংলো থেকে আগেই বেবিয়ে গিয়েছিলেন, নয়তো আততায়ীরা তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত সেই সময় দরোয়ানটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, আততায়ীদের পরিচয় পাওয়ার মতো কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

অর্জুন নীচে নেমে এল এবং তখনই টেলিফোনের কথা মাথায় এল। ওপরেও দুটো রিসিভার দেখেছে সে। নীচে সিঁড়ির গায়ে আর একটি। রিসিভার তুলেই বুঝতে পারল লাইন কেটে রাখা হয়েছে। এ-বাড়ির সঙ্গে বাইরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

ঠিক তখনই বাইরে মোটর বাইকের হর্ন বেজে উঠল। একটানা কয়েকবার। নিশ্চয়ই তার দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে মেজর বাইকের হর্ন বাজাচ্ছেন। অর্জুন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। দরোয়ানের মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে বাগানের মাঝখানের রাস্তা ধরে এগোতেই দেখতে পেল গেটের ওপরে মেজরের পাশে আরও দুটো মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনের একজন মহিলা।

তাকে দেখতে পেয়েই মেজর চিৎকার করলেন, "কী করছিলে ভেতরে ? এ-বাংলোয় ডাকাত পড়েছিল। এরা এখানে কাজ করে, ভয়ে পালিয়েছিল।"

গেটের কাছে পৌঁছে অর্জুন দুটি মদেশিয়া নারী পুরুষকে দেখতে পেল। পুরুষটির বয়স হয়েছে, নারী মাঝবয়সী। দু'জনের চেহারায় ভয় স্পষ্ট। অর্জুন তাদের জিজ্ঞেস করল, "এই গেটের চাবি কোথায় তোমরা জান ?"

মাঝবয়সী নারী বলল, "দরোয়ানকো পাশ হ্যায়।"

"তোমরা কোন দিক দিয়ে বেরিয়েছিলে ?"

"তখন এই গেট খোলা ছিল।" নিজের ভাষায় বলল বৃদ্ধ।

"বাংলোয় তখন কে কে ছিল ?"

"আমরা দু'জন, মেমসাব আর দরোয়ান।" বৃদ্ধ জবাব দিল।

"তোমরা পালালে কেন ?"

এবার নারী জবাব দিল, "ওরা আমাদের শাসাল, না পালালে খুন করে ফেলবে। চারজন লোক ছিল। বিরাট চেহারা। মুখে কাপড় বাঁধা। হাতে বন্দুক। দেখে বহুত ভয় লাগল। মেমসাহেব ওপর থেকে বলল, আমার কিছু হবে না, তোরা পালা। তাই জান্ বাঁচাতে আমরা পালিয়েছিলাম।"

"দরোয়ান কী করছিল ?"

দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বৃদ্ধ বলল, "নিশ্চয়ই বাংলোয় ছিল। আমি দেখিনি।"

"এই গেটের চাবি কার কাছে পাওয়া যাবে ?"

"দরোয়ানের কাছে।"

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দূরের সিঁড়ির দিকে তাকাল। এখান থেকে অবশ্য দরোয়ানের মৃত শরীর দেখা যাচ্ছে না। এই সময় মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "গেটটা খোলা যাচ্ছে না ? ওরা কেউ নেই ? হোয়াট ইজ দিস ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি গেট টপকে ভেতরে আসতে পারবেন !"

মেজর মুখ তুলে গেটের উচ্চতা দেখলেন, "এমন কিছু ব্যাপার নয়। সেবার উগান্ডায় এর চেয়ে উঁচু গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকতে হয়েছিল সারারাত। দেখা যাক।" এক-পা এগিয়ে থেমে গেলেন তিনি। বুড়ো আঙুলে পেছনে দাঁড় করানো বাইকটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চোর-ডাকাতের জায়গায় ওটাকে এভাবে ফেলে যাব ?"

অর্জুন বুঝল গেট টপকাবার ঝুঁকি মেজর নিতে চাইছেন না। সে মাথা নাড়ল, "এটা ঠিক কথা। অবশ্য আপনি ভেতরে এসেই বা কী করতেন ? তার চেয়ে বরং চলুন, যাওয়ার পথে থানায় খবরটা দিয়ে যাই।" মেজর হাসলেন, বোঝা গেল এই প্রস্তাবে তিনি খুশি।

অর্জুন গেটে পা দিতেই বৃদ্ধ বলে উঠল, "মেমসাব নেহি হ্যায় ?" নারী চেঁচিয়ে উঠল আচমকা, "ইয়ে নেহি হো সেকতা। মেমসাব অবশ্যই বাংলোয় আছেন। আমি তালা খুলছি। চল, ভেতরে গিয়ে দেখি।" কথাগুলো হিন্দি-ঘেঁষা মাতৃভাষায় বলল।

অর্জুন দেখল নারী মাথার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে একটা কিছু বের করে আনল। তারপর গেটের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে তালাটাকে তুলে ধরে ফুটোর মধ্যে সেটাকে ঢুকিয়ে সাবধানে ঘোরাতে লাগল। সম্ভবত মাথার কাঁটা দিয়ে সে তালা খোলার চেষ্টা করছে। এখন ওর চোখে-মুখে যে জেদ তা কেন ডাকাত পড়ার সময় ছিল না, কেন ওরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। মিনিট তিনেকের চেষ্টায় কাজ হল। খোলা তালাটা বৃদ্ধ সযত্নে নিয়ে গেট খুলতে নারী দৌড়ে গেল বাংলোর দিকে। অর্জুন বাধা দেওয়ার আগেই তার চিৎকারে বাগানের গাছপালায় বসা পাখিরা ডানায় শব্দ করে উড়ল। বৃদ্ধ এবং মেজর ছুটে গিয়েছিলেন চিৎকার শুনে। অর্জুন ধীরে পা ফেলে গেট থেকে বেরিয়ে বাইকটাকে ধরল। আর এখানে দাঁড়াবার কোনও মানে হয় না। সে যাঁকে খবরটা দিতে এসেছিল তিনি নেই। দরোয়ান-খুনের খবরটা থানায় পৌঁছে দিয়ে না হয় ভানুদার বাগানে চলে যাবে। ঘড়িতে এখন রাত গড়াচ্ছে।

সে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে হেডলাইট অন করা মাত্র মেজরের বিশাল শরীরটাকে দু'হাত তুলে ছুটে আসতে দেখল। মেজর চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকছেন।

মেজর কাছে এসে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তুমি তো ডেঞ্জারাস ছেলে। একটা লোক ওখানে খুন হয়ে পড়ে আছে তা এতক্ষণ বলনি ?"

অর্জুন বলল, "গেট বন্ধ ছিল। আপনি শুনলে আরও আপসেট হতেন। চলুন।"

"চলুন ? যাব মানে ? মিসেস দত্তকে খুঁজে বের করতে হবে না।"

"উনি এই বাংলোয় নেই।"

"না। উনি আছেন। ডাকাতরা কাউকে সঙ্গে নিয়ে যায়নি।"

"কে বলল এ-কথা ?"

"মেয়েটা বলছে। ও চা-বাগানের ভেতরে লুকিয়ে থেকে ডাকাতদের চলে যেতে দেখেছে। বুড়োটা বলছে এই বাংলোর পেছন দিক দিয়ে আর-একটা যাওয়ার পথ আছে।"

অর্জুন বাইকটাকে নিশ্চল করে আবার বাংলোর দিকে এগোল। সে যখন জিজ্ঞেস করেছিল তখন বৃদ্ধ কিংবা নারী এসব কথা জানায়নি। তার মনে হয়েছিল খুনটুন করে চলে যাওয়ার সময় ডাকাতরা গেটের ভেতরের দিকে তালা দিয়ে গেছে যাতে কেউ চট করে না ঢুকতে পারে। পেছনের দরজার কথা তার মাথায় আসেনি।

সিঁড়িতে দরোয়ানের মৃতদেহের পাশে ওরা নেই। প্রথম ঘরটিতে বৃদ্ধ একা দাঁড়িয়ে আছে। নারী দৌড়ে ওপাশের একটা ঘর থেকে বের হল। সে চেঁচিয়ে জানাল নীচের তলায় মেমসাহেব নেই। নারী সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে গেল।

মেজর বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "পেছনের দরজাটা কোথায় ?"

বৃদ্ধ একটু নড়েচড়ে উঠল, যেন নিজেকে সামাল দিল। দরোয়ান খুন এবং মেমসাহেব নিখোঁজ হওয়ায় বেচারা খুব মুষড়ে পড়েছে। একতলার কিচেনের পাশ দিয়ে খানিকটা এগোতেই একটা দরজা দেখা গেল। এপাশটায় মালপত্র রাখার ঘর। খোঁজার সময় অর্জুন এদিকে না এলেও একটু আগে নারী এই জায়গাগুলো ভাল করে খুঁজে গেছে।

ওরা বাংলোর পেছনে নেমে এল। এদিকে হয়তো একসময় তরিতরকারির বাগান ছিল। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শুধু কিছুটা খোলা জমির পরেই যে চা-বাগান শুরু হয়ে গেছে বোঝা গেল। বৃদ্ধ বলল, "ওখানে তারের বেড়ার মধ্যে একটা ছোট গেট আছে।"

মেজর সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা ভাল টর্চ থাকলে কিছুটা খোঁজাখুঁজি করা যেত। কী বল অর্জুন ?"

এই সময় তার কথা শেষ হওয়ামাত্র দোতলা থেকে একটা আর্ত চিৎকার ছিটকে উঠল। তারপরেই নারী তার নিজস্ব ভাষায় অনর্গল কিছু চেঁচিয়ে বলতে লাগল। শোনামাত্র বৃদ্ধ যেভাবে ছুটে গেল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। এক পলকেই তার সব জড়তা উধাও।

দোতলায় পৌঁছে অর্জুন দেখল নারী মিসেস দত্তের শোয়ার ঘরের দেওয়ালে একটা লম্বা টুল লাগাবার চেষ্টা করছে। ওদের দেখামাত্র সে জানাল একটু আগে সিলিং-এর ওপর থেকে একটা গোঙানি ভেসে এসেছে। সে নিশ্চিত, মেমসাব ওখানে আছেন।

মাথার ওপরে কাঠের সিলিং। আপাতদৃষ্টিতে সেখানে ওঠার কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারল যেদিকে নারী টুল রেখেছে সেইদিকেই সিলিং-এর অংশটি ঠিকঠাক বসেনি। নারীকে সরে আসতে বলে সে টুলের ওপর উঠে সিলিংটায় চাপ দিতে সেটা সরে গেল। সিলিং এবং ছাদের মধ্যে অন্তত চার ফুটের ব্যবধান। দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে ওপরে তুলতেই সে ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছেন।

অর্জুন চাপা গলায় ডাকল "মিসেস দত্ত, এখন আর কোনও ভয় নেই, আপনি নীচে নেমে আসুন।"

ভদ্রমহিলাকে একটু কেঁপে উঠতে দেখা গেল, কিন্তু তিনি দুটো হাত মুখ থেকে সরালেন না। সিলিং-এর ভেতরে তেমনভাবে ঘরের আলো ঢুকছিল না। অর্জুন আবার ডাকল, "মিসেস দত্ত, আমি অর্জুন। আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন। মনে পড়ছে? আসুন, ধীরে-ধীরে নীচে নামুন।"

ঠিক সেইসময় বাংলোর বাইরে মোটর বাইকের আওয়াজ হল। অর্জুন চমকে উঠে মেজরকে বলল, "জানলা দিয়ে দেখুন তো আমাদের বাইকটা কিনা।"

॥ দশ ॥

মেজর চিৎকার করতে-করতে বাইরে ছুটে গেলেন। রেগে গেলে মেজরের মুখে অদ্ভুত কথার খই ফোটে, কিন্তু আজকের শব্দাবলী অর্জুন কখনও শোনেনি। এই অবস্থায় কারও হাসা উচিত নয় বলেই সে গম্ভীর হওয়ার ভান করল। "কে তুই? আমি কাতলা মাছ আর তুই বাচ্চা পুঁটি, তা কি জানিস!" মেজরের গলা তখনও ভেসে আসছিল।

এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কেউ যদি তার মোটর বাইকটা নিয়ে উধাও হয় তা হলে বিপদের শেষ থাকবে না। সে মিসেস দত্তের দিকে তাকাল। যেটুকু আলো এখানে চুঁইয়ে এসেছে তাতে ভদ্রমহিলাকে রীতিমত অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ভয়ে নার্ভাস হয়ে একদম কুঁকড়ে গিয়েছেন উনি। শরীর কাঁপছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে আসা হাসির ধাক্কায় বাংলোটা যেন কেঁপে উঠল। একটা হেঁড়ে গলার সঙ্গে আর-একটি ভদ্র হাসির শব্দ হল। পায়ের শব্দ কাছে এল। মেজর চিৎকার করে বললেন, "দ্যাখো-দ্যাখো কে এসেছে! মিস্টার ব্যানার্জি নিজের বাইক নিয়ে চলে এসেছেন আর আমরা ভাবছিলাম কেউ তোমারটা চুরি করে পালাচ্ছে।"

অর্জুন কোনওমতে নেমে আসতেই ভানু ব্যানার্জির মুখোমুখি হলে সে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি? এখানে আসবেন তা তখন তো বলেননি?"

"নাঃ। পরে ঠিক করলাম। তোমরা যেভাবে এলে তাতে মন সাড়া দিচ্ছিল না।"

"আপনি নিশ্চয়ই সিঁড়ির গোড়ায় মৃতদেহটাকে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। মিসেস দত্ত কোথায়?"

"আততায়ীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই মনে হয় উনি ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এইভাবে বসে থেকে সম্ভবত খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এক্ষুনি নামানো দরকার ওঁকে।" অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র ভানুবাবু এগিয়ে গেলেন।

মিনিট চারেকের চেষ্টায় সবাই মিলে মিসেস দত্তকে নামাতে পারল। ভদ্রমহিলা দাঁড়াতে পারছেন না। চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ভানু ব্যানার্জি বললেন, "একটু গরম দুধ খাইয়ে দেওয়ার দরকার।" তিনি বৃদ্ধ কর্মচারীটিকে মদেশিয়া ভাষায় কিছু বলতেই সে ছুটে গেল। নারী তার সঙ্গী হল। একটু বাদেই গরম দুধ এসে গেল, সঙ্গে পানীয়। চা-বাগানের মালিক অথবা ম্যানেজারের বাংলোয় এসব সচরাচর থাকেই। ভানু ব্যানার্জির নির্দেশমতো দুধে সামান্য পানীয় মিশিয়ে নারী মিসেস দত্তকে খাইয়ে দিল একটু একটু করে। ভদ্রমহিলা এবার চোখ বন্ধ করে নিশ্বাস ফেললেন। ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

সোফায় পা ছড়িয়ে বসে মেজর বললেন, "এখন তো সমস্যা বাড়ল। দরজায় একটা ডেডবডি আর ভেতরে হাফডেড ভদ্রমহিলা। কী করা যায়?

অর্জুন চিন্তা করছিল, এক্ষুনি পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার। অন্তত মৃতদেহটাকে ওঁরা নিয়ে যাবেনই। আর মিসেস দত্তকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত অথবা কোনও ডাক্তারকে এখানে আনতে হবে।

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "ওঁর যা অবস্থা তাতে গাড়ি ছাড়া নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই বাগানের ডাক্তার এবং ক্লার্করা তো অনেকদিন চলে গিয়েছেন। এক কাজ করি, আমি বাইকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। থানায় খবর দিয়ে আমার বাগানের ডাক্তারকে তুলে নিয়ে ফিরে আসছি। ততক্ষণ ভদ্রমহিলা শুয়ে থাকুন।"

মেজরের সম্ভবত প্রস্তাবটা পছন্দ হল না। তিনি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "আপনি চলে যাবেন? আমার আবার ডেডবডিতে ভীষণ অ্যালার্জি আছে।"

ভানু ব্যানার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যালার্জি? আপনি শব্দটা ঠিক বলছেন?"

হাত বোলান বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন মেজর, "হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি ভয় পাচ্ছি? নো, নেভার। এই তো বছর পাঁচেক আগে একেবারে নরখাদকদের দেশে গিয়েছিলাম। একটা গ্রামে ঢুকে দেখি চারদিকে মানুষের কাটা মুণ্ডু। বডিটা খেয়ে নিয়ে মুণ্ডুগুলি সাজিয়ে রেখেছে স্মারকচিহ্ন হিসাবে। আমি ভয় পেয়েছি? নো। তবে খারাপ লেগেছে। খুব খারাপ। কেন জানেন?"

কেউ প্রশ্ন করল না। মেজর একটু অপেক্ষা করে বললেন, "মানুষের কাটা মুণ্ডু প্রিজার্ভ করলে সেগুলো ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায়। এই যে আমার এতবড় মাথাটা একসময় ছোবড়া ছাড়ানো নারকোলের মতো হয়ে যাবে।"

ভানু ব্যানার্জি ওঁর এই পরিচয় জানতেন না। সসঙ্কোচে বললেন, "আমি খুব দুঃখিত। আপনাকে আমি কিন্তু একটুও আঘাত করতে চাইনি।"

মেজর উঠে দাঁড়ালেন, "ওকে, ওকে! অর্জুন চলো, আমরা তিনজনই বেরিয়ে পড়ি। যে কারণে তুমি এসেছিলে সেটা তো এখন বাহুল্য হয়ে গেছে। তাই না?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ভানুদা আপনি আর দেরি করবেন না।"

ভানু ব্যানার্জি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে মেজর আবার সশব্দে বসে পড়লেন। একটু বাদে বাইকের শব্দ হল এবং একটু একটু করে মিলিয়েও গেল। হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি একটানা কতদিন না খেয়ে থেকেছেন?"

মেজর হাতটা ওপরে তুলে পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দিলেন। "গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে বেড়াতে গিয়ে পড়ে পা ভেঙেছিল। একাই ছিলাম। দু'-পাশে পাহাড়, খাদ্যের মধ্যে আমি আর শনশন হাওয়া। সঙ্গের খাবার দু'দিনেই শেষ। তার পাঁচদিন পরে একটা হেলিকপ্টার এসে আমাকে উদ্ধার করে।"

"তাহলে আজকের রাত্রে না খেলে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।"

"খাব না কেন? যদি এখানে থাকিও, কোনও অসুবিধে নেই। এদের কিচেনে খাবারের স্টক তো খারাপ নেই।"

মেজর কথা শেষ করতেই বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল, "মেমসাহেব বোলাতা হ্যায়।"

অর্জুন তড়াক করে উঠে বেডরুমের দিকে ছুটল। মেজর পেছনে।

মিসেস মমতা দত্ত এখনও শুয়ে আছেন, তবে ইতিমধ্যে তাঁর মুখে রক্ত ফিরে এসেছে কিছুটা। অর্জুন সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দুর্বল গলায় বললেন, "সরি।"

"না, না। ঠিক আছে। আপনি কথা বলবেন না। আমরা ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করেছি। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন," অর্জুন বলল।

"ঘুম আসবে না। আমি আর পারছি না। এবার আমাকে সারেন্ডার করতেই হবে। আমার জন্য একটার পর একটা লোক খুন হয়ে যাচ্ছে...।" এক ফোঁটা জল চোখের কোল থেকে উপচে নেমে এল গাল বেয়ে।

অর্জুন বলল, "আপনি এত ভেঙে পড়বেন না। ডাক্তার আসুক, তিনি অনুমতি দিলে আমরা কথা বলব। নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত করা যাবে।"

মিসেস মমতা দত্ত চোখ বন্ধ করতে অর্জুন ফিরে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে মেজর কথাবার্তা শুনছিলেন। সঙ্গী হয়ে মাথা দুলিয়ে বললেন, "খুব স্যাড ব্যাপার।"

এখন ঘড়িতে রাত ন'টা। বাড়ির সব দরজা খোলা। আততায়ীরা যদি আবার ফিরে আসে তা হলে এবার যা ইচ্ছে তাই করে যেতে পারে। কোনও রকম প্রতিরোধের ব্যবস্থা এখানে নেই। মিসেস দত্ত কোন সাহসে এখানে একা আছেন তাই বুঝতে পারছিল না অর্জুন। সে উঠে সদর দরজা বন্ধ করতে

গেল। অন্তত ভেতরে ঢোকাটা যেন সহজ না হয়। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সে অস্বস্তিতে পড়ল। লোকটার মৃতদেহ সিঁড়িতে পড়ে আছে। মৃত হলেও মানুষ তো! ওকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করতে তাই অস্বস্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা উপেক্ষা করল অর্জুন।

ফিরে আসামাত্র মেজর বললেন, "পেছনের দরজাটা বন্ধ করা উচিত।" অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর কিচেনের পাশ দিয়ে পেছনে চলে এল। দরজাটা খোলাই ছিল। স্পষ্টত এদিক দিয়েই আততায়ীরা পালিয়েছে। মিসেস মমতা দত্তের সঙ্গে কথা বললে লোকগুলোর পরিচয় জানতে অসুবিধে হবে না। এই হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করতে পুলিশের কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। যারা চায় না মিসেস মমতা দত্ত বাগান আঁকড়ে পড়ে থাকুন, তারাই কাজটা করিয়েছে। অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল এই কেসে কোনও আকর্ষণ নেই। সে কয়েকপা হেঁটে অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াল। বাংলোটাকে এখন আলোর জাহাজ বলে মনে হচ্ছে। যারা টেলিফোনের লাইন কেটেছে, তারা দয়া করেই আলোটাকে রেখে দিয়েছে। চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে বাংলোর এই আলোটা যেন বড্ড চোখে ঠেকছে।

হঠাৎ মাথার ভেতরে দ্বিতীয় একটা চিন্তা চলকে উঠল। আততায়ী কি সত্যি বাইরের লোক? একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির কথা ভানু ব্যানার্জিকে বলেছিলেন পুলিশ অফিসার। যে অ্যাম্বাসাডারটিকে শিলিগুড়ির পথে দেখে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন অমল সোম, তার মালিকদের কি হাত আছে এইসব খুনজখমে? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? হরিপদ সেনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওই অ্যাম্বাসাডার গাড়িটির সম্পর্ক থাকতে পারে বলে একটা আলাদা ধারণা তৈরি হয়েছিল সে-সময়। অর্জুনের গায়ে ক‍াঁটা ফুটল। হৈমন্তীপুর এবং শিলিগুড়ির মধ্যে একই দল চলাফেরা করছে না তো! হরিপদ সেনের কালাপাহাড় রহস্য তা হলে তো অন্যদিকে বাঁক নেবে।

অমলদা বলেন, 'কখনও আগ বাড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না। ভাল সত্যসন্ধানী নিজের কল্পনাকে পেছনে বাখেন, তা না হলে পথ ভুল হতে বাধ্য।' এতকিছু ভাবার তাই কোনও মানে হয় না। বাংলোর দিকে পা বাড়াবার আগে অর্জুনের মনে পড়ল সেই লাইনগুলো, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিবমন্দির, হৈমন্তীপুরে এসব আছে নাকি? এই বাংলোর দুই কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেই তা অবশ্য জানা যাবে। সে পেছনের দরজাটা বন্ধ করতেই দেখল বৃদ্ধ কিচেনে ঢুকছে। সে হাত তুলে লোকটাকে দাঁড়াতে বলে কাছে এগিয়ে গেল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মেমসাহেব কি ঘুমিয়েছেন?"

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে না বলল।

অর্জুন লোকটিকে দেখল, "তুমি কতদিন আছ এই বাগানে?"

"আমার জন্মই এখানে। আমার ঠাকুর্দাকে দালালরা ধরে এনেছিল

হাজারিবাগ থেকে।"
"সেখানে তুমি গিয়েছ ?"
"না। কেউ নেই তো, কাউকেও চিনি না। গিয়ে কী হবে।"
"এই বাগানের চারপাশে যে জঙ্গল, তা তোমার ছেলেবেলায় ছিল ?"
"এখন কী জঙ্গল দেখছেন, ছেলেবেলায় কেউ ওই জঙ্গলে ঢুকতেই সাহস পেত না।"
"এই জঙ্গলের মধ্যে কোনও বিল আছে ?"
"বিল ?" বৃদ্ধ ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।
"বিল মানে বড় পুকুর, জলাশয়...।" ঠিক প্রতিশব্দ পাচ্ছিল না অর্জুন, না পেয়ে বলল, "সাহেবরা যাকে লেক বলে।"
"লেক ? না, না, এখানে লেক থাকবে কী করে। আমি তো কোনওদিন দেখিনি। জঙ্গলে দুটো ঝরনা আছে, শীতকালে শুকিয়ে যায়।" বৃদ্ধ এবার বুঝতে পারল।
হতাশ হল অর্জুন। কালাপাহাড়ের সম্পত্তি তো বিলের পাশে থাকার কথা। সে আর কথা বলল না। বাইরের ঘরে পৌঁছে দেখল মেজর দু'পা ছড়িয়ে সোফায় চিত হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। মুখ হাঁ করা। চট করে মনে হবে বীভৎস এক মৃতদেহ। নাক ডাকছে না। সে গলায় শব্দ করে সোফায় বসতেই মুখ বন্ধ হল। পা গুটিয়ে নিয়ে মেজর চোখ বন্ধ করেই বললেন, "একটু ভাবছিলাম।"
অর্জুন হাসি চাপল, "আগে আপনার এমন ভাবার সময়ে প্রচণ্ড নাক ডাকত।"
"এখন ডাকে না। হেঁ হেঁ। নাক ডাকা বন্ধ করার একটা কায়দা বের করেছি।"
"সে কী ? আপনি তো মিরাক্যাল করেছেন। পৃথিবীতে কেউ এর ওষুধ জানে না।"
"ওষুধ আমিও জানি না। কায়দা জানি।" মেজর কাঁধ নাচালেন।
"আরে, বলুন বলুন। বিশাল আবিষ্কার এটা।"
"সরি। এটা আমার ব্যাপার।"
অর্জুন হাল ছেড়ে দিল। যার একবার নাক ডাকে তার বাকি জীবনে নিঃশব্দে ঘুম হয় না। এই নাক ডাকা নিয়ে কতরকমের অশান্তি হয়। মেজরের বীভৎস নাক ডাকা সে এর আগেও শুনেছে। এখন তো দিব্যি নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছিলেন। সে ঠিক করল পরে একসময় মেজরের মুড ভাল থাকলে কায়দাটা জেনে নেবে।
অর্জুন বলল, "পাশেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল। একটা বিলের সন্ধান পেলে ভাল হতো।

"বিল ? মাই গড। বিল নিয়ে কী হবে।"

"কালাপাহাড়ের সম্পত্তি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বিলের ধারে শিবমন্দিরের কাছে লুকোনো আছে। শুনলাম এখানে কোনও বিলই নেই।"

"যত্তসব বাজে কথা।" মেজর দাড়িতে হাত বোলালেন, "লোকটা যেখানে মন্দির পেত সেখানেই হাতুড়ি চালাত। অসম থেকে ওড়িশা কোনও মন্দির আস্ত রাখেনি। আর সেই লোক একটা শিবমন্দিরের গায়ে সম্পত্তি লুকোবে ? ইম্পসিবল।"

ব্যাপারটা ভাবেনি অর্জুন। সত্যি তো! কালাপাহাড় মন্দির ধ্বংস করতেন। তিনি কেন বেছে বেছে একটা শিবমন্দিরের পাশে ধনসম্পদ লুকোতে যাবেন ? মেজরকে ভাল লাগল অর্জুনের। সহজ সত্যিটা সে এতক্ষণ ভুলে ছিল, যা মেজর অনায়াসে বলে দিলেন।

এই সময় বাইরে ইঞ্জিনের শব্দ হল। সেইসঙ্গে জানালার কাচে আলো এসে পড়ল। অর্জুন উঠে দেখল তিন-চারটে আলো এগিয়ে এসে গেটের সামনে থামল। মেজর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চাপা গলায় বললেন, "ডাকাতগুলো ফিরে এল নাকি ?"

ততক্ষণে ভানুদাকে দেখতে পেয়েছে অর্জুন। দ্রুত এগিয়ে সদর দরজা খুলতেই তিনটে বাইক আর একটা অটো রিকশা সিঁড়ির নীচে পৌঁছে গেল। থানার দারোগা বাইকে বসেই জিজ্ঞেস করলেন, "ডেডবডিটা কোথায় ?"

অর্জুনের খেয়াল হল। সে মুখ নামিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল মৃতদেহটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এমনকী দারোয়ানের শরীর থেকে যে রক্ত বেরিয়ে সিঁড়িতে চাপ হয়েছিল, তাও উধাও।

ভানুদা বাইক দাঁড় করি: ছুটে এলেন, "ডেডবডিটাকে কি সরিয়েছে কোথাও।"

"না। আমরা জানিই না। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পরে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছিলাম। তখন তো ওখানেই পড়ে ছিল।"

অর্জুন হতভম্ব।

দারোগা নেমে এলেন, "স্ট্রেঞ্জ ! আপনারা বলতে চান মৃতদেহ হেঁটে অদৃশ্য হল ?"

ভানুদা ঝুঁকে সিঁড়িটা দেখলেন, "ভেজা কাপড় দিয়ে কেউ জায়গাটা মুছেছে।"

অর্জুন বাগানের দিকে তাকাল। ওরা যখন সব বন্ধ করে বসেছিল তখন আততায়ীরা নিঃশব্দে মৃতদেহ সরিয়েছে। কিন্তু একটা ভারী শরীরকে বয়ে নিয়ে যেতে অন্তত দু'জন মানুষ দরকার। তাদের পক্ষে এত অল্প সময়ে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু সে বাংলোর পেছনে দাঁড়িয়েছিল তাই ওদের পক্ষে সামনের গেট দিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অর্জুন দারোগাকে বলল, "প্লিজ ! আমার সঙ্গে চলুন। ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি এখনও।"

তৎক্ষণাৎ ছোট দলটা গেটের দিকে ছুটল। মেজর দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, "আই অ্যাম হোল্ডিং ফোর্ট, বুঝলে ? একজনের তো পেছনে থাকা দরকার !"

অর্জুন জবাব দিল না। দারোগাবাবুর হাতে শক্তিশালী টর্চ ছিল। তিনি ভানুদার সঙ্গে আরও দু'জন সেপাইকে নিয়ে এসেছেন। শুধু অটোওয়ালা চুপচাপ অটোতে বসে রইল। পাঁচজনের দলটা গেট পেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই টর্চের আলোয় রক্তের দাগ দেখতে পেল। পথের পাশে পাতার ওপর টকটকে রক্ত পড়ে আছে। দারোগা উল্লসিত। বাঁ দিকে নেমে পড়লেন। আরও কিছুটা যাওয়ার পর দ্বিতীয় জায়গায় রক্ত দেখা গেল। দারোগা গম্ভীর গলায় বললেন, "ওরা এদিক দিয়েই গেছে। বি অ্যালার্ট।"

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। দারোগা তার মুখে টর্চ ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এটা নিশ্চয়ই মানুষের রক্ত নয়।"

"তার মানে ?" দারোগা বিরক্ত হলেন।

"দারোয়ান মারা গিয়েছে অনেকক্ষণ। তার শরীর থেকে টাটকা রক্ত এখন এভাবে পড়তে পারে না। আমাদের বিভ্রান্ত করতে কেউ রক্তজাতীয় কিছু ছড়িয়ে দিয়েছে।" অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল, "ভানুদা আপনি কি ডাক্তার আনতে পারেননি ?"

ভানুদা মাথা নাড়লেন, "গিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক অসুস্থ। তাই অটো নিয়ে এসেছি ওঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডাক্তার থাকলে বলতে পারত এটা আদৌ রক্ত কিনা।"

৷৷ এগারো ৷৷

এই সময় শেয়াল ডেকে উঠল। চা-বাগানে শেয়াল কিছু নতুন নয়, কিন্তু একসঙ্গে অনেক প্রায় কুকুরের মতো একনাগাড়ে চিৎকার করার ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

দারোগা কান খাড়া করে কিছুক্ষণ শুনে বললেন, "খুব বেশি দূরে নয়। লেটস গো।"

ভানু ব্যানার্জি একটু আপত্তি করলেন, "শেয়াল ডাকছে বলে যেতে চাইছেন কেন ?"

দারোগা হাঁটতে-হাঁটতেই বললেন, "অনেক সময় শেয়ালেরা কুকুরের মতো আচরণ করে। বাংলাদেশের গ্রামে অনেকে শেয়াল পুষেছে বলে শুনেছি।

ডেডবডি নিয়ে ওরা যদি পালাতে চায় তা হলে শেয়ালগুলো হাঁকাহাঁকি করতেও পারে।"

কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে বাগানের মধ্যে কিছুটা যাওয়ার পরেও মৃত দেহের কোনও হদিস পাওয়া গেল না। প্রথমত, রাত্রে যে-কোনও জিনিস লুকিয়ে রাখা বেশ সহজ। দ্বিতীয়ত, এই বিশাল চা-বাগানের মধ্যে অনুসন্ধান চালাতে গেলে প্রচুর লোকবল দরকার। ওরা বাংলোয় ফিরে এল। এবার ভানু ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, "মিসেস দত্ত কেমন আছেন?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "অনেকটা ভাল। কথা বলতে চাইছিলেন, আমি রাজি হইনি। কিন্তু ভানুদা, দ্বিতীয় কোনও ডাক্তারকেও পেলেন না?"

ভানু ব্যানার্জি অস্বস্তিতে পড়লেন, "আমাদের এদিকে ওই একটাই অসুবিধে। একটু বাড়াবাড়ি রকমের অসুখ হলেই ছুটতে হয় জলপাইগুড়ি, নয় শিলিগুড়ি। পুরো বাগান নির্ভর করে থাকে একজন ডাক্তারের ওপর। যাহোক, গাড়ি আছে ভাঙা ব্রিজের ওপাশে। মিসেস দত্তকে কোনওমতে টেম্পোতে করে বাগানের পথটুকু পার করে নিতে হবে। তোমার কী মনে হয়, টেম্পোতে বসতে পারবেন না?"

ভানু ব্যানার্জি অন্যমনস্ক হয় স্কুটার ট্যাক্সিকে টেম্পো বলছেন কিন্তু অর্জুনের মনে হলো টেম্পো বলাটাই ঠিক। ওইরকম নড়বড়ে সবল বস্তুটিকে ট্যাক্সির মর্যাদা দেওয়া বাড়াবাড়ি। অর্জুন জবাব দিল, "বোধ হয় পারবেন।"

বাংলোর দরজা ইতিমধ্যে বন্ধ। তিন-চাকার যানটিতে ড্রাইভার নেই। দরজায় ধাক্কা মারতে বৃদ্ধ এসে সেটাকে খুলল। ঘরে ঢুকে অর্জুন অবাক। একটা টুলের ওপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে মেজর চোখ বন্ধ করে খেয়ে যাচ্ছেন। এখন বিশাল ডিমের ওমলেট পড়ে আছে প্লেটে। সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "আপনি খাচ্ছেন?"

মেজর চোখ খুললেন, "ম্যাডামকে দুঃখ দিতে পারি না। তিনি অতিথিসেবা করতে চান। তা ছাড়া শেষ কখন খেয়েছি তা তুমি জান।" ওমলেট কাটলেন মেজর, "ডেডবডি পাওয়া গেল?"

ভানু ব্যানার্জি মাথা নাড়লেন, "না।"

"অ্যাঁ? ওয়ার্থলেশ, পুলিশ ফোর্স ভাই এ-দেশের। একটা মৃতদেহ পালিয়ে গেল, তাকেও ধরতে পারলেন না!"

দারোগা উত্তপ্ত হলেন, "আপনি একটু সংযত হয়ে কথা বলুন।"

মেজর আধচেবানো ওমলেট মুখে নিয়ে বললেন, "কেন? হোয়াই? হোয়াট ইজ ইওর কনট্রিবিউশন? আপনি এখানকার ইনচার্জ। এই বাগানে পর-পর এত খুন হয়ে গেল, আপনি কী করেছেন? একজন অসহায় মহিলা এখানে একা পড়ে আছেন তাঁর নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা করেছেন? বলুন! খুন হওয়ার পরেও তো আপনাদের দেখা যায় না। যায়?"

দারোগা সোজা মেজরের প্রায় নাকের ডগায় পৌঁছে গেলেন, "হু আর ইউ ?"

মেজর একটু পেছনে হেলে বসলেন, "মানে ?"

"এই সব প্রশ্ন করার আপনি কে ? আমি কী করছি না-করছি তার জবাবদিহি আপনাকে দেব কেন ? আমাকে অপমান করার জন্য আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি তা জানেন ? যত দোষ নন্দ ঘোষ ? এই বিশাল জঙ্গল আর চা-বাগানের কোনখানে কে খুন হল তা আমি থানায় বসে হাত গুনে বলতে পারব ? খবর পেয়ে আমরা ছুটে আসি না ? না জেনেশুনে যা-তা বলে যাচ্ছেন ?"

ভানু ব্যানার্জি হাত তুললেন, "ঠিক আছে, শান্ত হোন আপনারা। এটা ঝগড়া করার সময় নয়। মিসেস দত্তকে নিয়ে যেতে হবে।"

মেজর মাথা নাড়লেন। তারপর দারোগাকে বললেন, "আপনি একটু সরে দাঁড়ান তো ! লেট মি ফিনিশ মাই ডিনার। গুড।" মুখে ওমলেট তুললেন, তিনি, "কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, একজন পুলিশ অফিসার ডেডবডি খুঁজে পাবে না।"

দারোগা খিঁচিয়ে উঠলেন, "আমাকে কী ভেবেছেন ? ট্রেইন্ড ডগ ? গন্ধ শুঁকে ডেডবডির কাছে পৌঁছে যাব ? মিস্টার ব্যানার্জি, এই লোকটাকে আপনি একটু বলে দিন আমার সঙ্গে যেন উলটোপালটা কথা না বলে।"

ভানু ব্যানার্জি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিসেস দত্ত কি ঘুমোচ্ছেন ?"

"নেহি।"

"তা হলে বল, একটু দেখা করব।"

বৃদ্ধ ওপরে চলে গেল। মেজর খাওয়া শেষ করলেন। পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললেন, "জান মধ্যম পাণ্ডব, সিক্সটি সেভেনে মেক্সিকোর জঙ্গলে একটা ঘোড়াকে সাবাড় করে দিয়েছিল মাংসখেকো পিঁপড়ের দল। সন্ধেবেলায় যে ঘোড়াটাকে আমরা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম, সকালে উঠে দেখি দড়িতে তার কঙ্কালটা বাঁধা রয়েছে। তুমি ভাবতে পাব ব্যাপারটা ?"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "হ্যাঁ। এরকম একটা ঘটনার কথা যেন আমি কোথায় পড়েছি।"

মেজরের দিকে তাকিয়ে দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি মেক্সিকোর জঙ্গলে— মানে ?"

অর্জুন জানাল, "উনি পৃথিবীর সব দেশেই অভিযান করেছেন। একবার উত্তর মেরুতে জাহাজডুবি থেকে বেঁচে গিয়েছেন।"

দারোগা হতভম্ব। স্পষ্টতই তাঁর চোখে মুখে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা ফুটে উঠছিল।

মেজর সেদিকে লক্ষই করলেন না। বললেন, "ধরো, কাল সকালে

দরোয়ানের ডেডবডি পাওয়া গেল। তবে শুধু কঙ্কালটি আছে। এমন তো ঘটতেই পারে।"

সঙ্গে-সঙ্গে দারোগা সোজা হলেন, "না। পারে না। এখানে ওইসব মাংসখেকো পিঁপড়ে থাকে না। ম্যানইটারও নেই।"

"তা হলে নেকড়ে নেই, হায়েনা নেই চিতা নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।" মেজর কথা শেষ করতেই বৃদ্ধ ফিরে এল। না এলে আবার গোলমাল পাকাত। বৃদ্ধ এসে জানাল মেমসাহেব অপেক্ষা করছেন।

মেজর উঠলেন না। বাকিরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। দরজায় নারী দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে সে মিসেস মমতা দত্তের মাথার পাশে সরে গেল।

মিসেস দত্ত বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখের স্বাভাবিক চেহারা এখনও ফিরে আসেনি। মহিলাকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং নীরক্ত মনে হচ্ছিল। দারোগা বললেন, "নমস্কার মিসেস দত্ত। খানিক আগে আমি খবরটা পেলাম।"

মিসেস দত্ত মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট ঈষৎ কাঁপল। কিন্তু কথা বললেন না।

ভানু ব্যানার্জি এগিয়ে গেলেন সামান্য, "মিসেস দত্ত, পুরো ব্যাপারটার জন্য আমরা খুব দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে এখনই কোনও ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। একটা ব্যবস্থাও হয়েছে। আপনি কি ধীরে-ধীরে নীচে নামতে পারবেন ?"

এবার খুব দুর্বল গলায় মিসেস দত্ত বললেন, "আমি কোথাও যাব না!"

ভানু ব্যানার্জি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "আমি আপনার সেন্টিমেন্টের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, এইসময় আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন।"

মিসেস দত্ত হাত নেড়ে না বলে নিশ্বাস ফেললেন।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। এবার বলল, "আপনি কি কথা বলার মতো অবস্থায় আছেন ?"

মিসেস দত্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, "আপনি— আপনারা কি আমার কেস নেবেন ?"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। জলপাইগুড়ি থেকে সে অমলদার নির্দেশে এসেছিল মিসেস দত্তকে জানিয়ে দিতে যে, কেস নিতে পারছে না। কিন্তু এখানে এসে পরিস্থিতি যেভাবে বাঁক নিয়েছে তাতে না বলতে বিবেকে লাগল। সে বলল, "হ্যাঁ। আপনি যা চাইছেন তা হবে।"

ভদ্রমহিলাকে এবার একটু শান্ত বলে মনে হল। তিনি বললেন, "আমার দরোয়ানের মৃতদেহ কি খুঁজে পাওয়া গেল ?"

দারোগা বললেন, "না ম্যাডাম। এই রাত্রে চা-বাগানের মধ্যে বেশি খোঁজাখুজি সম্ভব হল না। আমি কাল সকালে আরও লোক নিয়ে এসে

ভালভাবে সার্চ করব।"

মিসেস দত্ত চোখ বন্ধ করে বড় নিশ্বাস ফেললেন, "আপনারা কিছুই পারবেন না। আমাকে এইভাবে পড়ে-পড়ে মার খেতে হবে।"

কথাটা এমন স্বরে বললেন যে, ঘরে বিষাদের ছায়া ছড়াল। অর্জুন বুঝল এর পরে কথা এগোলে মিসেস দত্ত মেজরের কথাগুলোই বলে ফেলবেন। সেক্ষেত্রে দারোগা ব্যাপারটাকে খুবই অপছন্দ করবেন। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই দারোগা একটা চেয়ার টেনে বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন, "আপনি যখন বলছেন কথা বলতে পারবেন, তখন কর্তব্যের প্রয়োজনেই কয়েকটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন আজ এখানে একটা খুন হয়েছে এবং আততায়ীরা কাছে-পিঠেই আছে। এই ঘটনার অন্যতম সাক্ষী আপনি। আশা করি আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন।"

"হুঁ।"

"ব্যাপারটা কখন ঘটেছিল ?"

"দুপুরে। দুটো নাগাদ।"

"কতজন লোক ছিল ?"

"ছ-সাতজন।"

"আপনার বাংলোর দরজা বন্ধ ছিল না ?"

"ছিল। কিন্তু ওরা ডাকাডাকি করতে আমি দরোয়ানকে পাঠিয়েছিলাম ব্যাপারটা কী জানার জন্য। ওরা ভদ্রভাবে ঢুকেছিল। কিন্তু সিঁড়ির মুখেই দরোয়ানের সঙ্গে মারপিট শুরু করে দেয়। আমরা কোনও মতে সদর দরজা বন্ধ করে দিই। আমি বুঝতে পারি ওরা আমার সন্ধানে এসেছে। তাই এদের বলি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে। এরা আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। অনেকদিন আছে। প্রথমে আমাকে একা রেখে যেতে চায়নি। আমি বাধ্য করি। তারপর ওপরে উঠে যাই।" মিসেস দত্ত হাঁপাতে লাগলেন।

দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা বাংলোয় ঢুকল কীভাবে ?

"পেছনের দরজা দিয়ে। এরা যেদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করার কথা সে-সময় আমার খেয়াল হয়নি।"

"বাংলোয় ঢুকে ওরা আপনাকে খুঁজে পায়নি। কেন ?"

"সিলিঙের ওপর একটা চোরাকুঠুরি আছে। নীচে থেকে চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু ওখানে সোজা হযে বসে থাকা খুব শক্ত। আমি কোনওমতে ওখানে উঠে গিয়েছিলাম। ওরা আমাকে খুঁজতে বাংলো তোলপাড় করে শেষ পর্যন্ত ভাবল আমিও পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছি।"

"এই লোকগুলোর কাউকে চেনেন ?"

মিসেস দত্ত একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, "কারও নাম জানি না।"

"মুখ দেখলে আবার চিনতে পারবেন ?"

"হ্যাঁ পারব। কিছুদিন হল ওরা এই বাগানে ঘোরাফেরা করছে। যাতায়াতের পথে এদের দু-একজনকে আমি দেখেছি।"

"ওরা কখন চলে গেল ?"

"ঘণ্টাখানেকের পর আর গলা শুনিনি।"

"আপনি নেমে এলেন না কেন ?"

"মৃত্যুভয়ে। ওই এক ঘণ্টায় আমার নার্ভ চলে গিয়েছিল। ওখানে বসে থাকা যায় না। শুতে পারছিলাম না ইঁদুরের জ্বালায়। সামান্য শব্দ হলে আমি ধরা পড়ে যেতাম। ওইভাবে মাথা গুঁজে বসে থাকতে-থাকতে আমার শক্তি চলে গিয়েছিল। আমার ভয় করছিল ওরা হয়তো কাছেপিঠে আমার জন্য ওত পেতে আছে।"

"হুঁ। এই লোকগুলোর কাউকে চেনা যায় এমন কোনও চিহ্ন বলতে পারেন ?"

"আমি ওদের দেখেছি জানলা দিয়ে। দূর থেকে। বাংলোয় ওরা যখন ঢুকেছিল তখন আমি চোরাকুঠুরিতে। সেখান থেকে ওদের দেখতে চাইলে আমার ডেডবডিও আপনারা খুঁজে পেতেন না। ওঃ ভগবান!" ভদ্রমহিলা আবার চোখ বন্ধ করলেন।

দারোগা এবার উঠে দাঁড়ালেন, "আমি আপনার কর্মচারী দু'জনকে জিজ্ঞেস করব। তুমি নীচে এসো।" নারীর উদ্দেশে শেষ কথাগুলো বলে দারোগা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। নারী এবং ভানু ব্যানার্জি দারোগাকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু অর্জুন দাঁড়িয়ে রইল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল দারোগা ঠিকঠাক প্রশ্ন করলেন না। আর ভদ্রমহিলাও প্রশ্নের জবাবে কোনও বাড়তি কথা বললেন না। সে নির্জন ঘরের সুবিধে নেওয়ার জন্য দারোগার চেয়ারটিতে গিয়ে বসল।

ভদ্রমহিলা তাকালেন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি নিশ্চিত যে, ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন নেই ?"

"আমার শরীর বেশ খারাপ। কিন্তু আমি কোথাও যাব না।"

অর্জুন একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি এতক্ষণ যা বললেন শুনেছি। কিন্তু এমন কথা কি কিছু আছে যা আপনি ওঁকে বলেননি ?"

"কী কথা ?"

"আমি জানি না। এমনিই জিজ্ঞেস করছি।"

"আমার মনে পড়ছে না।"

"মনে করে দেখুন। তা হলে আমাদের তদন্তে সুবিধে হবে।"

"ওরা এতদিন আমাকে ভয় দেখিয়েছে। বাগানের লোককে খুন করেছে।

ওরা ভেবেছিল ভয় পেয়ে আমি বাগান বিক্রি করে দেব। কিন্তু তাতেও যখন কাজ হল না তখন ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবার সরাসরি খুন করতে চায় আমাকেই। আজ দারোয়ানকে খুন করল, কাল আমাকে করবে।"

"এই ওরা কারা ?"

"জানি না। টেলিফোন চালু ছিল যখন, তখন প্রথম অনুরোধ, পরে হুমকি দিত।"

"লোকগুলোর কি মুখ বাঁধা ছিল ?"

"না। নর্মাল পোশাক। কিন্তু ওদের কয়েকজন বাংলায় কথা বলছিল না।"

"কী ভাষায় বলছিল ?"

"মনে হল ওড়িয়া ভাষায়।"

অর্জুন অবাক। উত্তরবঙ্গের এইসব এলাকায় ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা খুবই কম। ব্যাপারটা অদ্ভুত। সে জিজ্ঞেস করল, "দারোগাবাবুকে আপনি একটা কথা বলেননি। অবশ্য উনিও জিজ্ঞেস করেননি। ওরা যখন বাংলোয় ঢুকেছিল তখন আপনি চোরা কুঠুরিতে। কিন্তু বাংলোয় ঢোকার পর ওরা যেসব কথা বলেছিল তা তো আপনার শোনার কথা। কী বলছিল ওরা ?"

ভদ্রমহিলা মনে করার চেষ্টা করে বললেন, "প্রথমে খুব রাগারাগি করছিল। জিনিসপত্র ভাঙচুর করছিল হয়তো। আমি শব্দ পাচ্ছিলাম। যারা ওড়িয়া ভাষায় কথা বলছিল তাদেব সব কথার মানে আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমাকে না পাওয়ার পব ওরা হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করছিল। একজনের কথা কানে এল—যে করেই হোক মালিকানকে খুঁজে বের করতেই হবে। ও বেঁচে থাকলে সব কাজ শুরু করতে পারছে না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী কাজ ?"

"জানি না। ওরা নাকি চা-বাগানের গায়ে ভাঙা মন্দির দেখতে পেয়েছে। ওইরকম বলছিল।"

মহিলার কথা শেষ হতেই অর্জুন যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে লাফিয়ে উঠল।

॥ বারো ॥

এখন মধ্যরাত। অন্ধকারে ডুবে থাকা অকেজো এই চা-বাগানের শেডট্রিগুলো থেকে মাঝে-মাঝেই অদ্ভুত ডাক ভেসে আসছে। কৃষ্ণপক্ষের এমন রাতেও সব শান্ত হয়ে গেলে আকাশ থেকে একরকম মায়াবী আলো চুপিসারে নেমে আসে পৃথিবীতে। ঘন চায়ের লিকারে আধা চামচ দুধের মতো

মিলে যায় সবার অজান্তে। দোতলার জানলায় বসে অর্জুন এইরকম দৃশ্যাবলী দেখে যাচ্ছিল। এই ঘরের একমাত্র খাটে পা ছড়িয়ে শুয়ে মেজর সশব্দে ঘুমোচ্ছিলেন। আজ রাত্রে তাঁর এখানে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। প্রতিবাদে কাজ না হওয়ায় বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন, খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাববেন, একবার ডাকলেই উঠে পড়তে দেরি করবেন না। অর্জুনের মনে হল বাইরের পৃথিবীর সব শান্তি একা মেজরই ধ্বংস করতে পারেন। একসময় অর্জুন আর পারল না জানলা ছেড়ে এসে মেজরকে জাগাতে হল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেজর বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। অর্জুন বলল, "আপনার নাক থেকে এমন শব্দ বেরোচ্ছে যে, পাশে বসে থাকা যাচ্ছে না।"

"তোমাকে বসে থাকতে কে বলেছে ?" রাগী গলা মেজরের।

অর্জুন কাঁধ ঝাঁকাল, "আপনি বলেছিলেন নাক না ডাকার কি একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা কাজে লাগাতে পারলে ঘুমোন, নইলে প্লিজ, জেগে থাকুন। এরকম গর্জন শুনলে সিকি মাইলের মধ্যে কোনও লোক আসবে না।"

ঘরের কোণে একটা ছোট্ট ডিমবাতি জ্বলছিল। মেজর খাট থেকে নেমে সংলগ্ন টয়লেটে ঢুকলেন। জলের শব্দ হল। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, "দ্যাখো অর্জুন, যে ব্যাপারে মানুষের কোনও হাত নেই সেই ব্যাপারে তাকে দায়ী করা উচিত নয়। একজন চোখে দেখতে পান না, একজন হাঁটতে পারেন না ভাল করে। এমন মানুষকে ভাল বাংলায় কী বলা হয়ে থাকে ?"

"প্রতিবন্ধী।"

"গুড। আমিও তাই। যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমার শরীর থেকে যে শব্দ বের হয় তার জন্য এই আমি কি দায়ী ?"

"তাহলে নাক ডাকা বন্ধ করার কোনও কৌশল আপনি জানেন না ?"

"জানি। কিন্তু এক কৌশলে দু'দিন কাজ দেয় না।"

অর্জুন হেসে ফেলল। তারপর জানলায় ফিরে গেল। মেজর বললেন, "আমি তোমার মতলব কিছুই বুঝতে পারছি না। মিসেস দত্তকে নিয়ে ওরা সবাই চলে গেল আর তুমি কেন জিদ ধরলে আজকের রাতটা এখানে থেকে যেতে ?"

অর্জুন-চাপা গলায় বলল, "অসুবিধা কী ? আপনার খাওয়া হয়ে গেছে, বাংলোর ভেতরটাও বেশ আরামদায়ক।"

"আর আমাদের সঙ্গে তো কোনও অস্ত্র নেই !"

"একজন মহিলাকে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল তারা দু'জন পুরুষকে ভয় পাবেই।"

"ওই আনন্দে থাক। যে দারোয়ানটাকে ওরা খুন করেছে সে যেন পুরুষ

ছিল না। তাছাড়া তুমি যখন এই কেস নিচ্ছ তা তখন খামোকা থেকে যাওয়ার কী দরকার ছিল। মিস্টার ভানু ব্যানার্জির সঙ্গে চলে গেলেই হত। এত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিসেস দত্তও শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন।" মেজর আরও কথা বলতেন কিন্তু তিনি অর্জুনকে নিঃশব্দে হাত তুলে ইশারা করতে দেখলেন। তাঁর রোমাঞ্চ হল। চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ আসছে নাকি ?"

অর্জুন হাত নামিয়ে নিল, জবাব দিল না। মেজর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে অর্জুনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডিমবাতির আলোয় চোখ অভ্যস্ত থাকায় প্রথমে কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না। বাইরেটা ঘন অন্ধকার মনে হল তাঁর হতাশ হয়ে আবার ফিরে গেলেন ঘরের মাঝখানে। বিড়বিড় করে বললেন, "নিজেকে কেমন বন্দি-বন্দি মনে হচ্ছে।"

আকাশি আলোয় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া চোখে অর্জুন ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পেল। গেটের ওপাশে ঝুঁকে পড়ে কিছু করছে। তারপরেই নজরে এল, একজন নয়, আরও সঙ্গী আছে। এরা সবাই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ওখানে কিছু করছে। মাঝে-মাঝে পাশের জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে লোকগুলো। জঙ্গলে ঢুকতেই সরু আলো জ্বলতে দেখল অর্জুন। ওরা টর্চ জ্বেলে কিছু খুঁজছে।

অর্জুন নিঃশব্দে জানালা ছেড়ে চলে এল। মেজর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সামনে এসে নিচু গলায় বলল, "আপনি ফোর্ট সামলান। আমি একটু ঘুরে আসছি। যদি কাল সকালের মধ্যে না ফিরি তাহলে অমলদাকে খবর দেবেন।"

"তোমাকে একা ছাড়ব ভেবেছ ? আমি কি এমনি এমনি রয়ে গেছি ?"

"না। আপনার যাওয়া চলবে না। দু'জনের কিছু হলে সারা পৃথিবী জানতে পারবে না !"

"মাই গড। তা হলে তোমার যাওয়ার দরকার কী ? এই কেস তো তুমি নিচ্ছ না।"

অর্জুন কোনও উত্তর না দিয়ে নীচে নেমে এল। মিসেস দত্তের কাজের মানুষ দু'জন বাংলোর একতলাতেই শুয়ে আছে। বেরতে হলে দরজা বন্ধ করার জন্য ওদের ডাকা দরকার। কিন্তু শব্দ করার ঝুঁকি নিল না অর্জুন। পেছনের দরজা খুলে সে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। দরজাটাকে যতটা সম্ভব চেপে বন্ধ করার চেষ্টা করল।

আকাশ নীল। প্রচুর তারা সেখানে। তাদের শরীর থেকে আলো চুঁইয়ে আসছে। অর্জুন পেছনের বাউন্ডারি ডিঙিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। হঠাৎই একটা হতচ্ছাড়া প্যাঁচা চিৎকার করে মাথার ওপরের ডাল থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে জঙ্গল ছেড়ে চা-বাগানের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল অর্জুন। গুড়ি মেরে সে অনেকটা ঘুরে বাংলোর গেটের দিকটায় চলে এল। কান পাতল। কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। সে আর

একটু এগোতেই গাছের ডালে আঘাত পেল। সামান্য শব্দ হল, কিন্তু সেই সময় কাছেপিঠে একটা শেয়াল গলা ছেড়ে ডেকে উঠতেই শব্দটা চাপা পড়ে গেল। অর্জুন নিজের কাঁধে হাত বোলাল। আর তখনই পাতা মাড়াবার আওয়াজ কানে এল। কেউ খুব কাছাকাছি হাঁটছে। সে চা-গাছের মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসে রইল। গাছের তলার ফাঁক দিয়ে হাত পাঁচেক দূরে সরু টর্চের আলো পড়তে দেখল সে। আলোটা ইতস্তত ঘুরে যেখানে স্থির হল সেখানে একটা ছোট্ট পাতাওয়ালা আগাছা লাল হয়ে আছে। তারপরেই একটা হাত সেই আগাছাটাকে মাটিসুদ্ধু উপড়ে নিল। আলো নিভে গেল এবং আওয়াজ ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল।

ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। ওরা ফিরে এসেছে রক্তের নাম করে যা ছড়িয়েছিল তার চিহ্ন মুছে ফেলতে। অর্থাৎ অত্যন্ত সাবধানী মানুষের বুদ্ধি ওদের নিয়ন্ত্রিত করছে। চা-বাগানের গলিতে হাঁটলেই পাতা মাড়াবার শব্দ হবেই। অর্জুন প্রায় বুকে হেঁটে বাগানের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল। হাত-কুড়ি যাওয়ার পর সে লোকগুলোকে দেখতে পেল। মোট চারজন। একজনের হাতে একটা ব্যাগ। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কিছু বলল। তারপরই একজন একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাংলোর দিকে ছুঁড়ে মারল। পাথরটা দোতলার জানালার কাচে লাগতেই সেটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে মেজরের আকাশ ফাটানো চিৎকার ভেসে এল, "কে? কে ছোঁড়ে ঢিল? ঢিল ছুঁড়লে পাটকেল খেতে হয় তা জানিস? মেরে একেবারে হুতুম প্যাঁচা করে দেব শয়তানের নাতিদের। বদমাশ, মস্তানি হচ্ছে আমার সঙ্গে? সাহস থাকে তো সামনাসামনি এসে লড়।"

চ্যাঁচামেচি চলছিল বটে কিন্তু স্বরের ভেতর যে ভয়ার্ত ভাব, তা অর্জুনের কান এড়িয়ে যাচ্ছিল না। লোকগুলো চাপা গলায় হেসে উঠল। একজন হিন্দিতে বলল, "ওরা আজ বাংলো ছেড়ে বের হবে না। চল।"

হেলতে-দুলতে ওরা হাঁটা শুরু করল। এখন আর জঙ্গুলে পথে নয়, চওড়া যে রাস্তা হাইওয়ে থেকে ভাঙা সাঁকো পেরিয়ে বাংলোয় পৌঁছেছে সেটি ধরে ওরা হাঁটতে লাগল। এই রাস্তা ধরে ওদের অনুসরণ করা বিপজ্জনক। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত থাকলে পেছন ফিরলেই ওরা তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু পাশের চা-বাগান এত ঘন যে, ওদের সঙ্গে তাল রাখা যাবে না সেখান দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলে। বাধ্য হয়ে অর্জুন ঝুঁকি নিল। ওদের বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে দিয়ে ও নিঃশব্দে অনুসরণ শুরু করল। যেহেতু নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ায় লোকগুলো নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে হাঁটছিল তাই ওদের ঠাওর পেতে অসুবিধে হচ্ছিল না অর্জুনের।

এক সময় ওরা রাস্তা ছেড়ে চা-বাগানের মধ্যে নামল। সুবিধে হল অর্জুনের। সে সঙ্গে-সঙ্গে ওদের সমান্তরাল আর-একটি গলিতে নেমে পড়ল।

এদিকে চা-গাছ অব্যবহারে বেশ লম্বা হয়ে গিয়েছে। ফলে চমৎকার একটা আড়াল পেয়ে যাচ্ছে সে। ওরা এই পথে কোথায় যাচ্ছে? অর্জুন খুব কৌতূহলী হয়ে পড়ছিল।

মিনিট দশেক সতর্ক হাঁটার পরে ওরা একটা হাঁটু-জলের নদীর ধারে পৌঁছে গেল। পাহাড়ী নদী। জলে স্রোত আছে। অর্জুন দেখল ওদের একজন ব্যাগ উপুড় করে সংগৃহীত পাতা-ঘাস জলের স্রোতে ফেলে দিল। রক্তের সব চিহ্ন জল গ্রাস করে নিল তৎক্ষণাৎ।

চা-বাগানের শেষ এখানেই, এই নদীর পারে। ওপারে জঙ্গলের শুরু। লোকগুলোকে নদীর পাড় ধরে এবার নীচে এগোতে দেখা গেল। এবার ওদের অনুসরণ করতে হলে নদীর গায়ে ফাঁকা জায়গায় আসতেই হবে। ভোর হতে এখনও বেশ দেরি, অন্ধকারের আড়ালে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে লাগল অর্জুন। ব্যবধান যা, তাতে ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে না থাকলে তাকে দেখতে পাবে না! অসতর্ক মানুষ তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অনেক দৃশ্য দেখতে পায় না। এক্ষেত্রে ওরা তো কাজ সফলের আনন্দে বিভোর।

এবার নদী একটু সঙ্কীর্ণ এবং তার ওপরে বাঁশের সাঁকো দেখা গেল। সেই সাঁকো বেয়ে লোকগুলো ওপারের জঙ্গলে ঢুকে গেল। এখানে জল বেশি নয়। যদি সাঁকোর ওপরে কেউ এদের অপেক্ষায় থাকে তাহলে সহজেই সাঁকোয় উঠলে তাকে দেখতে পাবে। এমনও হতে পারে লোকগুলো অনুমান করেছে কেউ পেছনে আছে তাই সাঁকোয় ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে। সে ঝুঁকি না নিয়ে জলে নামল। গুটিয়ে নেওয়ায় প্যান্টের প্রান্ত হাঁটু পর্যন্ত থাকলেও জল মাঝে-মাঝেই স্পর্শ করতে লাগল। জুতো ভিজছে কিন্তু কিছু করার নেই। নদীটা পেরিয়ে সে জঙ্গলে এসে দাঁড়াল। লোকগুলো ঢুকেছে হাত কুড়ি তফাত দিয়ে। তাদের কোনও অস্তিত্ব এখন নেই। এদিকের জঙ্গল বেশ গভীর এবং হাঁটার পক্ষে নিতান্তই খারাপ।

মিনিট দশেক অন্ধকারে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত একটা পায়ে-চলা পথ পেল অর্জুন। সে অনুমান করল এই পথেই লোকগুলো এগিয়েছে। এই জঙ্গল অবশ্যই নীলগিরি ফরেস্টের একটা অংশ। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের কথা প্রায়ই শোনা যায় এই জঙ্গলে। একেবারে খালি হাতে এগোন ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে মানুষ এখানে নিয়মিত যাওয়া-আসা করে। হিংস্র মানুষের চেয়ে কোনও জন্তু হিংস্রতর হতে পারে না।

হঠাৎ চোখে আলো এল। অর্জুন পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকল। মিনিট তিনেক চলার পর একটা খোলা চত্বর নজরে এল। জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু, তাঁবুর বাইরে কারবাইডের গ্যাসের আলো জ্বলছে গোটা চারেক। পাতার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করল পাশাপাশি আরও গোটা তিনেক ছোট তাঁবু আছে।

মূল তাঁবু থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এল। যে লোকগুলোকে সে অনুসরণ

করে এখানে পৌঁছেছে তাদের দেখতে পাওয়া গেল। খুব বিনীত ভঙ্গিতে কথা শুনছে। তাঁবু থেকে বের হওয়া নতুন দু'জন মানুষ ওদের পিঠ চাপড়াল। এবার কাজ সেরে আসা লোকগুলো ছোট তাঁবুর দিকে চলে গেল। অর্জুন দেখল দু'জন কর্তাব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কথা বলে আবার তাঁবুর ভেতর ফিরে গেল। এবার সব শান্ত। শুধু গ্যাসের আলো দপদপ করে জ্বলছে। কোথাও কোনও পাহারাদার আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। না থাকাটাই অস্বাভাবিক। যারা এত পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে তারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাববে না এমন হতেই পারে না। আর এগিয়ে যাওয়া বোকামি হবে, অর্জুন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। মচমচ শব্দ হচ্ছে শুকনো পাতায় পা পড়ায়, মাঝে মাঝেই সে থেমে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে এল। জন্তুজানোয়ার তাড়ানোর জন্য মানুষ ওই গলায় আওয়াজ করে। যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে খোলা চত্বরটাকে ঘুরে দেখল অর্জুন। জঙ্গলের মাঝখানে চমৎকার জায়গা বেছেছে এরা। ইতিমধ্যে নদীর দিকের পথ দিয়ে আরও চারজন লোক এসেছে। তারা বড় তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে সাহেব বলে ডাকার পর একজন কর্তা বেরিয়ে এসেছে। অর্জুন শুনল লোকটা রিপোর্ট করছে ডেডবডিটাকে নদীর জলে চুবিয়ে ভাল করে পাথর দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ভেসে যাওয়ার কোনও চান্স নেই।

কর্তাটির গলার স্বর জড়ান। অদ্ভুত হিন্দি উচ্চারণে লোকটা বলল "খুব ভাল কাজ হয়েছে, কিন্তু তোমাদের এখানে এখন কে আসতে বলেছে। যে জায়গায় ডিউটি দেওয়া হয়েছে সেখানে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।"

"সাহেব, এখন বাগানে কোনও মানুষ নেই। পুলিশ চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ভয়ে কেউ বাগানে ঢুকবে না, তাই ভাবলাম খবরটা দিয়ে আসি।"

"তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। যা ভাববার আমরা ভাবব। যাও।" কর্তা আবার তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল। অর্জুনের মনে হল লোকগুলো এমন ব্যবহার আশা করেনি। তাঁবুর কাছ থেকে কিছুটা সরে এসে তারা একটু গজরাল, তারপর নদীর দিকে চলে গেল।

এবার ফেরা উচিত। ভোর হতে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক বাকি আছে। ভানু ব্যানার্জি অনেক করে বলেছিলেন মিসেস দত্তের সঙ্গে বাগান থেকে চলে যেতে। না গিয়ে ভাল লাভ হল। অন্তত দরোয়ানের মৃতদেহের হদিস আর তাঁবুগুলোর অস্তিত্ব অজানা থাকত তা হলে। অর্জুন ডালপালা সরিয়ে হাঁটতে লাগল। তাঁবু ছেড়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর তার মনে হল সে দিক ভুল করেছে। নদীর দিকে যাওয়ার বদলে সে উল্টো দিকে চলে এসেছে। এখানে গাছের তলায় আগাছা বেশি। সে যত হাঁটছে তত ওপরের ডালে বসা বানরেরা হইচই শুরু করে দিয়েছে। এবং তখনই সে টিন পেটানোর শব্দ শুনতে পেল।

দু-তিনটে টিন একসঙ্গে পেটানো হচ্ছে।

এই ঘন জঙ্গলে মানুষ টিন পেটায় জন্তুজানোয়ার তাড়াতে। কিন্তু এত গভীরে এই অসময়ে মানুষ কী করছে? জঙ্গলে যারা চুরি করে কাঠ কাটতে আসে তারা নিজেদের অস্তিত্ব এভাবে জানাবে না। চোরা শিকারীরাও নিঃশব্দে থাকে। মাথার ওপর ঘুম-ভাঙা বানরের দল কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। অর্জুন তাদের এড়াতেই টিনের শব্দ লক্ষ করে এগোল। খুঁটিমারি রেঞ্জে থাকার সময় সে জেনেছিল বাঘজাতীয় হিংস্র পশু এলে বানরেরা এভাবে সারা জঙ্গলকে জানিয়ে দেয়। বানরের চিৎকারে পাখিদেরও ঘুম ভেঙেছে। মুহূর্তেই সমস্ত নৈঃশব্দ্য ভেঙে বাজার হয়ে গেল জঙ্গলটা। অর্জুন অসহায়ের মতো তাকাল। সে বুঝতে পারল, যারা টিন পেটাচ্ছে তারা বানরের চিৎকার শুনে ভুল করছে। জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার জন্য সে দ্রুত পা চালাল। বানরগুলো পেছন ছাড়ছে না। এ-ডাল থেকে আর এক ডাল অন্ধকারেই লাফাতে লাগল তারা। অর্জুন টিনের আওয়াজ যেখানে হচ্ছে সেখানে পৌঁছে যেতেই গুলির শব্দ শুনল। আকাশ কাঁপিয়ে সেই শব্দ জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেই সব চিৎকার আচমকা থেমে গেল।

একটা মানুষের হাসি শোনা গেল। সে হিন্দিতে বলল, "টিন পেটালে আজকাল কাজ হয় না। শেরগুলো সব চালাক হয়ে গেছে। গুলির আওয়াজে এবার ভাগবে।"

দ্বিতীয় গলা প্রতিবাদ করল, "সাহেব গুলি ছুঁড়তে মানা করেছিল কিন্তু!"

"বাঘ খেয়ে গেলে সাহেব আমাদের বাঁচাবে? যা শুয়ে পড়, এখন আর কোনও ভয় নেই। আমি জেগে আছি।"

অর্জুন আর-একটু এগোল। তারপরেই তার চোখের সামনে এই অন্ধকারেও দৃশ্যটি অস্পষ্ট ভেসে উঠল। অনেকটা জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি খোঁড়া হচ্ছে। প্রায় পুকুরের আদল নিয়ে নিয়েছে জায়গাটা। পুকুরের গায়ে তাঁবু পড়েছে। মনে হচ্ছে শ্রমিকরা সেখানেই রাত্রে থাকে। একটি লোককে বন্দুক হাতে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। অন্ধকারে তার নাক-চোখ বোঝা যাচ্ছে না।

অর্জুনের চোয়াল শক্ত হল। তাহলে ব্যাপারটা এই। আসল কাজটি হচ্ছে এখানে। এবং বোঝাই যাচ্ছে কাজটি এখনও সফল হয়নি। কিন্তু চারপাশে নেহাতই জঙ্গল, গভীর জঙ্গল। লোকগুলো মাটি খুঁড়ে করছেটা কী?

ধীরে ধীরে সে সরে এল। অনেকটা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এক কোমর জল পেরিয়ে সে চা-বাগানে পৌঁছল যখন, সূর্যদেব তখন জঙ্গলের মাথায় উঠে বসেছেন। বাংলোয় পৌঁছতে কোনও বাধা পাওয়া গেল না। গেট খুলে ভেতরে ঢোকার সময় সে ভটভটির আওয়াজ শুনতে পেল। আড়াল খুঁজতে যাওয়ার মুখে সে মোটরবাইকে বসা ভানু ব্যানার্জিকে দেখতে পেল। ভানুবাবু

হাত তুললেন। তারপর কাছে এসে বাইক থামিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কী অবস্থা ? প্যান্ট ভিজে কেন ? কোথায় গিয়েছিলে ?"

অর্জুন বলল, "তার আগে আপনি বলুন হঠাৎ এত ভোরে ফিরে এলেন কেন ?"

"অস্বস্তিতে। তোমাদের এখানে ফেলে রেখে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

"কোনও সমস্যা হয়নি তো ?"

"সমস্যা নয়, সমাধানের দিকে একটু এগোন গিয়েছে।"

হঠাৎ ভানু ব্যানার্জি চিৎকার করে থামতে বললেন তাকে। বাইক থেকে নেমে এসে ঝুঁকে পড়ে ভানু ব্যানার্জি অর্জুনের পা থেকে টেনে-টেনে যেগুলো ফেলতে লাগলেন সেগুলো ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে। অর্জুন জোঁকগুলো দেখল। অনেক রক্ত খেয়ে গেছে অসাড় করে। ভানু ব্যানার্জির জুতোর চাপেও মরছে না। ওদের জন্য নুন দরকার।

॥ তেরো ॥

সুভাষিণী চা-বাগানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলোয় বসে চা খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল। মিসেস ব্যানার্জি মমতা দত্তর যত্ন নিয়েছেন। এখন কিছুদিন ঘুম আর বিশ্রাম। এই অবস্থায় তাঁর উচিত চা-বাগানের চিন্তা ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে যাওয়া। কিন্তু তিনি তাতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, চা-বাগানটাও তো নিজের, স্বামীর ভালবাসা উদ্যম মেশানো স্মৃতি। তাকে ছেড়ে তিনি কোথাও গেলে শান্তি পাবেন না। মিসেস ব্যানার্জি ইচ্ছেটাকে সম্মান করেছেন। ঠিক হয়েছে কিছুদিন ভদ্রমহিলা এই বাংলোতেই থাকবেন। আজ সকালে এখানে এসেই অমল সোমকে টেলিফোনে খবর দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ির থানায় ফোন করে বলা হয়েছে ওঁকে জানাতে।

মেজর চা শেষ করে বললেন, "আমি আমার সব কথা উইথড্র করছি। এই কেস আমাদের নেওয়া উচিত। তবে এইবেলাটা শরীর রেস্ট চাইছে।"

অর্জুন মেজরকে দেখল। 'আমাদের নেওয়া উচিত' মানে উনি নিজেকে একজন সত্যসন্ধানী হিসাবে ধরে নিয়েছেন। সে কোনও কথা বলল না।

মেজরের মেজাজ চড়া হল, "হোয়াই চুপচাপ ? আমরা কি কাওয়ার্ড ?"

"আপনাকে কেউ কাওয়ার্ড ভাবতে সাহস পাবে না। কাল রাত্রে ঢিল খাওয়ার পর যেভাবে আপনি চেঁচাচ্ছিলেন, বাপস।" অর্জুন মন্তব্য করল।

"ওরা কাওয়ার্ড, তাই ঢিল মারছিল, সামনাসামনি এলে দেখিয়ে দিতাম।" মেজর বেতের চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন।

ভানু ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি মিস্টার সোমের জন্য অপেক্ষা করছ ?"

অর্জুন ঘড়ি দেখল, "ঠিক তা নয়। ওঁর এখানে পৌঁছতে দুপুর হয়ে যাবে। আমি ভাবছিলাম লোকাল থানাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়।"

"কী ব্যাপারে ?"

"এঁদের শক্তি সম্পর্কে ? আমাদের প্রতিপক্ষ খুব তৈরি।"

"তুমি কাল রাত্রে যা দেখেছ তা এখনও থানায় জানাওনি।"

"জানাইনি। তার কারণ এতবড় একটা ব্যাপার ওখানে একদিনে ঘটেনি। আর সেটা যদি পুলিশ না জানে তা হলে অস্বস্তি হয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিট অফিসাররা জঙ্গলে ঘোরে। তাদের চোখেও পড়বে না তা বিশ্বাস করতে পারছি না। তারা কেন পুলিশকে জানায়নি ? আমি দেখেছি এটা যদি থানায় বলি তা হলে ওদের কাছে খবর যে পৌঁছে যাবে না তাই বা বিশ্বাস করব কীভাবে ?"

"কিন্তু পুলিশ ছাড়া আমরা তো ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না।" ভানু ব্যানার্জিকে চিন্তিত দেখাল। এবং তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। ভানু ব্যানার্জি রিসিভার তুললেন, "হ্যালো, ব্যানার্জি স্পিকিং, ও আপনি, বলুন। হ্যাঁ, ওঁরা আজ সকালেই আমার এখানে চলে এসেছেন। মিসেস দত্ত ভাল আছেন। তাই নাকি ? না, না, আমরাই চলে যেতে পারি। নিশ্চয়ই।" একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "নিশ্চয়ই, নিন।" রিসিভারটা তিনি অর্জুনের দিকে এগিয়ে বললেন, "মেঘ না চাইতেই জল।"

ব্যাপারটা না বুঝেই বিসিভারে হ্যালো বলল অর্জুন। সঙ্গে-সঙ্গে ওপারে অমল সোমের গলা বাজল, "কী ব্যাপার হে, কোনও খবর না দিয়ে ওখানে বসে আছ !"

"আরে আপনি ? কোত্থেকে বলছেন ?"

"লোকাল থানা থেকে। কাল রাত্রে ফিরলে না, কোনও খবর নেই দেখে আজ সকালে এস. পি-র সঙ্গে হৈমন্তীপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। তোমার মা ভাবছেন খুব, কবে যে একটু দায়িত্বজ্ঞান হবে !" অমল সোমের গলার বিরক্তি এবার আর চাপা রইল না।

অর্জুনকে সেটাকে উপেক্ষা করল, "বিশ্বাস করুন, কোনও উপায় ছিল না। একটু আগে হৈমন্তীপুর থেকে ফিরেই আপনাকে খবর দেওয়ার জন্য জলপাইগুড়ির থানায় ফোন করেছি।"

"ঠিক আছে, মিস্টার ব্যানার্জিকে বল, আমরা আসছি।" লাইন কেটে দিলেন অমল সোম।

মিনিট চল্লিশেক পরে অর্জুন তার অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয়বার জানাল। প্রথমবার বলতে হয়েছিল ভানু ব্যানার্জি এবং মেজরকে। এখন ওঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অমল সোম এবং এস. পি.। থানার দারোগাকে সঙ্গে আনেননি ওঁরা।

অর্জুন থামলে এস. পি. বললেন, "অদ্ভুত। এ তো সিনেমার চেয়ে সাঙ্ঘাতিক। আমাদের নাকের ডগায় এমন সব কাণ্ড চলছে আর কিছুই জানতে পারিনি ?"

অমল সোম বললেন, "হৈমন্তীপুর চা-বাগানে একটার পর একটা খুন কেন হচ্ছে, কেন বাগান বন্ধ, তা নিয়ে কি কখনও ভেবেছেন এস. পি. সাহেব ?"

এস. পি. একটু থিতিয়ে গেলেন, "আসলে শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে এরকম হয় এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল। আমাদের ফোর্স এখানে করছেটা কী ?"

অমল সোম বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, একবার ডি. এফ. ও-র সঙ্গে কথা বলা দরকার। জঙ্গল এলাকাটা তাঁর। বোঝাই যাচ্ছে নীচের তলার কর্মচারীরা ওঁকে কোনও খবর দেননি। তবু...।" ভানু ব্যানার্জি সঙ্গে-সঙ্গে অপারেটরকে বললেন জলপাইগুড়ি শহরে ডি. এফ. ও-কে ধরতে। একটু সময় নিয়ে অপারেটর জানালেন, ডি. এফ. ও. শহরে নেই, হলং বাংলোয় আছেন। সেখানকার টেলিফোন কাজ করছে না। অমলবাবুর অনুরোধে ভানু ব্যানার্জি একটা চিঠি লিখে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। সুভাষিণী চা-বাগান থেকে মাদারিহাট হলং-বাংলো মিনিট কুড়ির রাস্তা।

কেউ কিছুক্ষণ কথা বলছিল না। অথচ মেজর ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই একটা চাপা উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়েছেন। মেজরই কথা বললেন প্রথমে, "ওরা কোন ভাষায় কথা বলছিল অর্জুন ? মানে ওদের পরিচয় জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি।"

"হিন্দিতে বলছিল।"

"মাই'গড। এ তো জাতীয় ভাষা।" নিঃশ্বাস ফেললেন মেজর, "কিছুই ধরা যাবে না।"

এস. পি. বললেন, "প্রথমে আমরা ডেডবডিটাকে উদ্ধার করব। জলে পড়ে থাকলে খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "ভুল হবে। আমরা যদি সরাসরি নদীতে গিয়ে মৃতদেহ তুলে নিয়ে আসি তা হলে ওরা অ্যালার্ট হয়ে যাবে। ওরা বুঝবে আমরা ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অর্থাৎ ওরা যেখানে মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছে সেখানে তো কেউ চট করে খুঁজবে না। তা হলে আমরা জানলাম কীভাবে ?"

ভানু ব্যানার্জি সমর্থন করলেন, "ঠিক কথা। ওদের স্পাই সব জায়গায় আছে।"

অমল সোম বললেন, "সেইটেই মুশকিল। আমি ভেবে পাচ্ছি না বাইরে থেকে এসে কিছু মানুষ কীভাবে এমন নেটওয়ার্ক তৈরি করল। আমি একবার মিসেস দত্তের সঙ্গে কথা বলতে চাই ব্যানার্জি সাহেব।"

ভানু ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন। এস. পি. জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আসতে

পারি ?”

“আসুন। তবে আপনাদের ওপর ওঁর আস্থা কম বলে জেনেছি।”

অমল সোম ভানু ব্যানার্জিকে অনুসরণ করলেন। একটু ইতস্তত করে এস. পি. ওঁদের পেছনে এগোলেন। অর্জুনের ব্যাপারটা ভাল লাগল না। অমল সোম এক্ষেত্রে তাকে সঙ্গে যেতে বলতে পারতেন। সে অতখানি পরিশ্রম করল আর মাঝখানে এসে অমল সোম তাকে উপেক্ষা করছেন। চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে তার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। গত রাত্রের ক্লান্তি আচমকা গ্রাস করল তাকে। আধঘণ্টা সময় কীভাবে কেটে গেছে সে জানে না।

কাঁধে হাতের স্পর্শে জোর করে চোখ মেলল সে, অমলদা হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, “খুব টায়ার্ড হয়ে আছ। একটু বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নাও।”

অর্জুন সোজা হয়ে বলল, “নাঃ ঠিক আছে।” সে দেখল ঘরে এখন সবাই উপস্থিত। এমনকী, একজন নতুন ভদ্রলোক এসেছেন, মানুষটাকে সে দু-একবার দূর থেকে দেখেছে, এই জেলার ডি. এফ. ও.।

অমল সোম বললেন, “তুমি ঠিক বলছ তো ?”

“হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।”

“গুড। শোন, আমি এখন জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি।”

অর্জুন হতভম্ব, “ফিরে যাচ্ছেন মানে ?”

“আর এখানে কিছু করার নেই। এস. পি. সাহেব আছেন,, ডি. এফ. ও. এসে গিয়েছেন, তুমি আছ। জাস্ট ওদের আক্রমণ করে কব্জা করা। এর জন্য আমি থেকে কী করব। বুঝলে ?” অমল সোম খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন।

“কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল।”

“ও। ঠিক আছে, এস, আমরা বারান্দায় গিয়ে কথা বলি।” অমল সোম কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা বারান্দায় চলে গেলেন। অর্জুনের এটা খারাপ লাগল। এত লোক এখানে দাঁড়িয়ে, অন্তত বলে যাওয়া উচিত ছিল। সে বারান্দায় এসে বলল, “ওঁদের না বলে এভাবে বেরিয়ে এলেন।”

“না বলে মানে ? ওহো ! আমরা কেউ এখানে ভদ্রতা করতে আসিনি। মিসেস দত্ত আমাদের ক্লায়েন্ট। তাঁর কাজ করতে এসেছি। কী বলছিলে বল !”

“হৈমন্তীপুর চা-বাগানকে ঘিরে এই যে ব্যাপারটা চলছে তার পেছনে অন্য কারণ আছে। মিসেস দত্ত আমাকে বলেছেন যে তিনি ওদের মুখে জঙ্গলে মন্দিরের কথা শুনেছেন। আমি নিজে দেখেছি ওরা বিরাট জায়গা খুঁড়ে ফেলেছে।”

“তাতে হলটা কী ?”

“আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, হয়তো কালাপাহাড়ের সম্পত্তি খুঁজতে এরা এসেছে। একটা প্যানিক তৈরি করে বাগানটাকে ডেজার্টেড করে রাখলে

ওদের কাজের সুবিধে হয় এবং তাই হচ্ছে।" অর্জুন ব্যস্ত গলায় বলল।

"তুমি 'হয়তো' শব্দটা ব্যবহার করলে না?"

"হয়তো? হ্যাঁ, মানে অনুমান করছি— ।"

"অনুমান তো প্রমাণ নয় অর্জুন। এর আগেও একথা তোমায় বলেছি।"

"কিন্তু লোকগুলো পাহারাদার নিয়ে জঙ্গলের ভেতর মাটি খুঁড়তে যাবে কেন?"

"সেটা ওরাই জানে। তুমি কি কোনও মন্দির অথবা বিল দেখেছ?"

"বিল এদিকে নেই। কালাপাহাড়ের সময়ে যদি থেকে থাকে তা হলে চা-বাগান তৈরির সময় তা বুজিয়ে ফেলা হতে পারে।"

"মন্দির?"

"না, দেখিনি। অত রাতে অন্ধকারে ভাল করে কিছুই দেখা যায়নি। মন্দির থাকলেও আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু মিসেস দত্তের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ওরা মন্দিরের কথা বলেছে যখন, তখন সেটা থাকবেই।"

"ঠিক আছে। আজ তোমরা দিনের আলোয় যাচ্ছ, থাকলে দেখতেই পাবে।"

"অমলদা, আপনি প্রথম থেকেই এমন ডিসকারেজ করছেন কেন?"

"প্রথম থেকে আবার কী করলাম।" অমল সোম হাসলেন, "আমাদের দু'জনের উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা। তুমি একটা সত্যি কিছুতেই ভাবতে পারছ না যে, কালাপাহাড় কোথায় কোন বনের বিলের ধারে মন্দিরের গায়ে মাটির নীচে তার সম্পত্তি লুকিয়েছিল তা এই লোকগুলো জানবে কী করে? খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার চেয়েও ব্যাপারটা কঠিন। আমি যে কাগজপত্র দেখেছি তাতে কোনও নির্দিষ্ট এলাকার কথা বলেনি। হরিপদ সেন মনে করেছিলেন উত্তর বাংলাই সেই জায়গা। তা উত্তর বাংলায় তো জঙ্গলের অভাব নেই। ওঁর প্রতিপক্ষ কী করে এই বৈকুণ্ঠপুরকে শনাক্ত করল? যুক্তি দাও।"

অর্জুন জবাব দিতে পারল না। হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষ এমন সুনির্দিষ্ট খবর পেল কী করে? সে মাথা নাড়ল, "আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন কিন্তু ওরা ওইরকম লুকিয়ে-চুরিয়ে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে কেন?"

"এর উত্তরটা ওখানে না গেলে পাওয়া যাবে না। বেশ, তুমি যখন চাইছ তখন আমি তোমাদের সঙ্গী হচ্ছি। আমার কাছে মৃত কালাপাহাড়ের সম্পত্তি থেকে জীবিত কালাপাহাড়কে খুঁজে পাওয়া অনেক বেশি জরুরি।" অমল সোম ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

"জীবিত কালাপাহাড়?" পেছন-পেছন আসার সময় প্রশ্ন করল অর্জুন।

"হরিপদবাবুকে হুমকি দেওয়া চিঠির কথা ভুলে গেলে কী করে!"

ঘরে ঢুকে অমল সোম বললেন, "নাঃ, যাওয়া হল না, আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি সঙ্গী হচ্ছি।"

এস. পি. গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। বললেন, "আমি ডি. এফ. ও-র সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। কিছু লোক জঙ্গলের মধ্যে জোর করে জায়গা দখল করে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে। অবশ্যই এটা অন্যায়। এই অপরাধে আমরা ওদের গ্রেপ্তার করতেও পারি। কিন্তু হৈমন্তীপুর চা-বাগানের খুনগুলোর সঙ্গে ওদের জড়াবার কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই। আর ওরা তো রয়েছে চা-বাগানের সীমার বাইরে।"

অমল সোম বললেন, "ঠিক কথা। তা হলে ওদের জঙ্গল দখল করার অভিযোগেই গ্রেপ্তার করুন। পুরো দলটাকেই আমাদের চাই।"

"কিন্তু কী লাভ হবে। কোর্টে তুললেই বেল নিয়ে যাবে। এটা নন বেলেবল অফেন্স নয়।"

"কোর্টে তোলার আগে আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব, তাই যথেষ্ট।"

ঠিক হল সাঁড়াশি আক্রমণ হবে। হৈমন্তীপুর চা-বাগান, নদী পেরিয়ে একদল ঢুকবে। অন্যদল আসবে বিপরীত দিকের জঙ্গল পেরিয়ে। ডি. এফ. ও-কে অর্জুন জায়গাটার আন্দাজ দিতে তিনি ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন জঙ্গলের কোন অংশ দিয়ে ঢুকতে হবে। অর্জুনের অনুমান, ওদের দলে অন্তত জনা পনেরো মানুষ আছে। এরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র, সতর্ক। যেভাবে ওরা মৃতদেহ সরিয়েছে তাতে দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এদের কব্জা করতে হলে অন্তত কুড়িজন সেপাই চাই। এস. পি. এই অঞ্চলের দুটো থানার অফিসারকে নির্দেশ দিলেন। বেশ সাজসাজ আবহাওয়া শুরু হয়ে গেল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযানে যেতে চাইলেন। অমল সোম আপত্তি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজার। অন্য একটি চা-বাগানের সমস্যায় আপনি জড়াচ্ছেন কেন?"

"সমস্যাটা আমার বাগানেও ছড়াতে পারে মিস্টার সোম। তা ছাড়া যে মানুষ হিমালয়ে ওঠে সেই মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযানে না গিয়ে কি পারে?"

"বেশ। তা হলে এক কাজ করা যাক। এস. পি. সাহেব, আপনি প্রথমেই হৈমন্তীপুরে যাওয়া-আসার পথটাকে সিল করুন। ওখানকার সাঁকো ভাঙা। মোটর বাইক ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। এত লোকের জন্য বাইক জোগাড় করা সম্ভবও না। আপনি জনা দশেক সেপাই নিয়ে বাগান পেরিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যান। মিস্টার ব্যানার্জি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। আমি ডি. এফ. ও-র সঙ্গে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঢুকছি বাকিদের নিয়ে।"

এই প্রথম মেজর কথা বললেন, "অর্জুন কোন দলে যাচ্ছে?"

"ও আমার সঙ্গে যাবে।" অমল সোম জানালেন।

"আর আমি?" চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন মেজর।

"আপনি হেডকোয়ার্টার্সে থাকুন। মানে এখানে। একজনের তো পেছনে থাকা দরকার।"

॥ চোদ্দো ॥

ডি. এফ. ও. যে আন্দাজ দিয়েছিলেন তাতে বৈকুণ্ঠপুর চা-বাগানের গা-ঘেঁষা জঙ্গলের উলটো দিকের কাছাকাছি সরকারি রাস্তা অন্তত মাইল তিনেক দূরে। জঙ্গলের মাঝখানে সিঁথির মতো পিচের পথ চলে গিয়েছে। দিনে চারবার বাস যায় এই পথে।

ডি. এফ. ও-র জিপে ওরা যে-জায়গায় নামল সেখানে শুধু ঝিঁঝির ডাক আর গাছের ঘন ছায়া। গাছগুলো যেন আকাশছোঁয়া গা জড়িয়ে অজস্র পরগাছা ঝুলে থেকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে। ডি. এফ. ও-র সঙ্গে ওই অঞ্চলের রেঞ্জার ছিলেন। দু'জন বিট অফিসার আর জনা আটেক সেপাই। জানা গিয়েছিল দুটো থানায় হাতের কাছে এখন পনেরোজনের বেশি সেপাই পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ সশস্ত্র পনেরোজনের সঙ্গে লড়াই হবে এ-পক্ষের পনেরোজনের। অর্জুনের হাতে কোনও অস্ত্র নেই। ডি. এফ. ও. অথবা অমলদা সঙ্গে কিছু রেখেছেন কি না তা অর্জুনের জানা নেই।

গাড়ি থেকে নেমে ডি. এফ. ও. বললেন, "ওই যে দেখুন, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের জিপ অথবা কন্ট্রাক্টারদের লরি যাওয়ার কাঁচা পথ আছে। ইচ্ছে করলে ওই পথ ধরে আমরা আরও মাইল দুয়েক এগিয়ে যেতে পারি।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। কারণ গাড়ির শব্দ বেশি দূরে না যাওয়াই ভাল।"

অতএব জিপগুলো জঙ্গলে ঢুকল। এই দিনদুপুরেও কেমন গা-ছমছম-করা ভাব জঙ্গলের ভেতরে। দু'পাশের ডালে বসে বানর আর পাখিরা সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে। জিপ চলছিল ধীর গতিতে, কারণ এদিকের রাস্তা খুবই অসমান। মাঝে-মাঝেই বানরগুলো সাহস দেখিয়ে রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ছিল। ডি. এফ. ও. হেসে বললেন, "এদের সাহস দেখছি খুব বেড়ে গিয়েছে।"

অমল সোম বললেন, "রোজ আপনাদের জিপ দেখছে, সাহস তো বাড়বেই।"

ডি. এফ. ও. বলল, "আমাদের জিপ রোজ এদিকে আসে না।"

ঠিক মাইলখানেক যাওয়ার পর ডি. এফ. ও. জিপ থামাতে বললেন। এদিকে জঙ্গল আরও ঘন। একটা মাঝারি কাগজ সামনে রেখে তাতে কয়েকটা রেখা এঁকে বললেন, "এই জায়গাটা আমরা জানি। আর অর্জুনবাবুর কথা ঠিক হলে এধারে আমাদের পৌঁছতে হবে। মাইল দেড়েক পথ। অবশ্য পথ করে

নিতে হবে।"

অমল সোম ঘাড় নাড়লেন, "ঠিক আছে। জিপগুলো এখানেই থাক। আমরা দুটো দলে এগোব। আমি আর অর্জুন পাঁচ মিনিট আগে রওনা হচ্ছি। আপনি বাকিদের নিয়ে আসুন। ওদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে যদি আমাদের দেখা না পান তাহলে একটু অপেক্ষা করবেন। আমি তিনবার শিস দেব। শিস শুনলে আপনারা চার্জ করবেন।"

ডি. এফ. ও. মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, "কিন্তু আমরা পৌঁছবার আগেই যদি এস. পি. ওপাশ থেকে অ্যাটাক শুরু করেন?" অমল সোম ঘড়ি দেখলেন, "না। ওঁকে আমি একটা সময় দিয়েছি। তার আগে উনি বাংলো ছেড়ে নদীর দিকে এগোবেন না। আমি চেষ্টা করব একই সময়ে দু'দিক থেকে আক্রমণ করতে। আপনি বাকিদের নির্দেশ দিন যাতে নিঃশব্দে এগোতে পারে।"

ডি. এফ. ও-র সঙ্গে সশস্ত্র মানুষেরা রয়েছে কিন্তু অর্জুন জানে না অমল সোমের সঙ্গে কোনও অস্ত্রও আছে কি না। সে নিজে তো নিরস্ত্র। কিন্তু অমলদা ইঙ্গিত করামাত্র সে এগিয়ে চলল। লতানো ডালপাতা সরিয়ে অমল সোম ক্ষিপ্রগতিতে এগোচ্ছিলেন। অর্জুনের মনে হল বয়স অমলদাকে একটুও কাবু করতে পারেনি। শ'খানেক গজ যাওয়ার পর অমল সোম দাঁড়ালেন। কান পেতে কিছু শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই পায়েচলা পথ আছে, একটু খোঁজো তো! এভাবে জঙ্গল ফুঁড়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। পেলে জোরে শিস দেবে।"

কথাটা নিজেই বলবে বলে ভাবছিল অর্জুন। ওরা এখন বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অমল সোম এবার ডান দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, সে বাঁ দিকে। প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হচ্ছে যাতে জোঁক না ধরে। একটু বাদে পেছন ফিরে তাকিয়ে অমল সোমকে দেখতে পেল না অর্জুন। এদিকটায় বোধহয় বানরেরা নেই, শুধু পাখির ডাকের সঙ্গে ঝিঁঝি পাল্লা দিচ্ছে। মিনিট দশেক জঙ্গল ভেঙে কাহিল হয়ে পড়ল সে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে চারপাশে তাকাল। হঠাৎ মনে হল চারপাশের এই সহজ সবুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া আর ঠাকুরঘরের পবিত্র আবহাওয়ায় ধূমপান করা একই ব্যাপার। শহরের দূষিত পরিবেশে যে চিন্তাটা মাথায় আসে না এখানে প্রায় আদিম পরিবেশে সেটা প্রকট হওয়ায় অর্জুন প্যাকেটটা পকেটেই রেখে দিল।

কয়েক পা এগিয়ে যেতে সরসর আওয়াজ হল। একটা সাদা খরগোশ জুলজুল করে তাকে দেখছে। অর্জুন একটু ঝুঁকতেই সেটা বিদ্যুতের মতো পাশের গর্তে ঢুকে পড়ল। এগিয়ে চলল সে। এই জঙ্গলে একসময় বাঘেরা সংখ্যায় বেশি ছিল। এখনও কিছু আছে, তবে সচরাচর তাদের দেখা যায় না।

কিন্তু বাইসন, বুনো শুয়োর, চিতা আর হাতির সংখ্যা প্রচুর। সে যে এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাতে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু জিপে আসার সময় ডি. এফ. ও. বলেছেন সাধারণত দিনের বেলায় এই অঞ্চলে হিংস্র জন্তুদের দেখা বড় একটা পাওয়া যায় না।

হঠাৎ চোখের সামনে আট ফুট চওড়া একটা পথ ভেসে উঠল। জঙ্গল কেটে এই পথ করা হয়েছে কিন্তু অযত্নের ছাপ রয়েছে সর্বত্র। পথটা চলে গিয়েছে জঙ্গলের আরও ভেতরে। অর্জুন পথটার ওপর এসে দাঁড়াল। এবং তখন তার নজরে এল গাড়ির চাকার দাগ। সে ঝুঁকে দেখল। এই পথে প্রায়ই গাড়ি চলে, একটা দাগ রীতিমতো টাটকা। এই পথ নিশ্চয়ই হাইওয়ে থেকে বেরিয়েছে। ওরা যে পথ দিয়ে জিপে করে জঙ্গলে ঢুকেছে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও সংযোগ নেই। সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে এই পথ ধরে একবার পিছিয়ে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছিল কোথায় প্রবেশ পথ। সে জোরে শিস দিল দু'বার।

মিনিট তিনেকের মধ্যে আরও কয়েকবার শিস দেওয়ার পর অমল সোমের দেখা পাওয়া গেল। রাস্তায় পা দিয়ে তিনি বললেন, "বাহ। সুন্দর। আমি ভেবেছিলাম লোকগুলো এত কষ্ট করে তো রোজ যাওয়া-আসা করতে পারে না। প্রয়োজনেই মানুষ পথ করে নেয়। ওরাও নিয়েছে। ভাল, খুব ভাল।"

"রাস্তাটা কোত্থেকে বেরিয়েছে দেখা কি দরকার ?"

"পেছনে তাকিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাদের সঙ্গীরা ততক্ষণে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু কথা হল যারা সমস্ত চা-বাগানে জাল বিছিয়ে রেখেছে তারা এমন একটা রাস্তা কি বিনা পাহারায় রাখবে ?"

সন্দেহ হচ্ছিল অর্জুনেরও. কিন্তু পাহারাদাররা কাছেপিঠে থাকলে ঘন জঙ্গলের আড়াল তাদের নিশ্চিন্তে রেখেছে। হাঁটা শুরু করে অমল সোম বললেন, "আমাদের ডি. এফ. ও. সাহেব নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন, বুঝেছ ? তাঁর জঙ্গলে বাইরের লোক গাড়ি চড়ার রাস্তা বানায় অথচ তিনি কিছুই জানেন না।"

অর্জুন অমল সোমকে একবার দেখল। আজকাল অমলদা এমন করে সাধারণ কথা বলেন যে, মনেই হয় না উনি অতবড় সত্যসন্ধানী। অমলদার কী বয়স বাড়ছে ? নইলে সব জেনেশুনেও তিনি সুভাষিণী বাগান থেকে চলে যেতে চাইছিলেন কেন ? কথাটা সে না বলে পারল না। অমল সোম হাসলেন, "এখন তো তেমন কিছু কাজ নেই। ঘিরে ধরে আটক করা। তাই চলে যেতে চেয়েছিলাম। পরে মনে হল লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য থাকা যেতে পারে। এত জায়গা থাকতে ঠিক এখানেই যে কালাপাহাড় তার সম্পদ লুকিয়েছে এই খবরটা পেল কী করে ? নিশ্চয়ই ওর ইতিহাস ভাল জানা আছে। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে।"

হঠাৎ একটা তীব্র বাঁশির শব্দ শোনা গেল। ফুটবল ম্যাচের শেষ বাঁশির চেয়েও দীর্ঘ। তারপরেই গুলির শব্দ। খুব কাছেই। সেইসঙ্গে মানুষের আর্তনাদ। অমলদা চাপা গলায় বললেন, "চটপট কোনও গাছে উঠে পড়।"

হাতের কাছে যে গাছ তার সারা গায়ে এত শ্যাওলা যে, হাত দিতেও ঘেন্না হয়। সে দ্রুত রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়ল। ওপাশে গুলির শব্দ এবং সেইসঙ্গে মানুষের চিৎকার চলছে। দুপদাপ পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। অর্জুন আর-একটু এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে। ডি. এফ. ও. সাহেব সমেত পুরো বাহিনী, যারা তাদের সঙ্গে এ-পথে এসেছিল, তারা করুণ মুখে দাঁড়িয়ে। ওদের ঘিরে রেখেছে জনা আটেক অস্ত্রধারী। একজন বন্দিদের হাত বাঁধার কাজে ব্যস্ত। ওদের নেতা বলে যাকে মনে হচ্ছিল সে ডি. এফ. ও-কে একটার-পর-একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছে। ডি. এফ. ও. মাঝে-মাঝে জবাব দিচ্ছেন।

একসময় বাঁধাব কাজ শেষ হয়ে গেলে বন্দিদের লাইন করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। অর্জুন দেখল আরও দু'জন লোক পাহারায় থেকে গেল। ডি. এফ. ও. কী করে ধরা পড়লেন। ওঁর সঙ্গীরা অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগই পেল না ? অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু আপাতত তাদের দলগত শক্তি কমে গেল। এবার এস. পি. ওপাশ থেকে আক্রমণ করলে ওরা স্বচ্ছন্দে এদিক দিয়ে পালাতে পারবে। হঠাৎ হাত কুড়ি দূরের জঙ্গলটাকে একটু নড়তে দেখল সে। পাহারাদারদের নজর সেদিকে নেই। অর্জুন অনুমান করল সোম ওই দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এবং এভাবে এগোনোর মানে হল ওই লোক দুটোর মুখোমুখি হওয়া।

পাহারাদারদের একজন বিড়ি ধরাবার জন্য বন্দুক দুই পায়ের মাঝখানে রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল। দ্বিতীয়জন মুখ তুলে গাছের ডাল দেখছিল। দেখতে-দেখতে বলল, "আজ রাত্রের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। ওরা কী করে চলে এল বল তো ?

প্রথমজন বিড়ি ধরিয়ে বলল, "জানি না। কিন্তু এটা আমার ভাল লাগছে না। ওরা যদি কাল এই সময়ে আসত তা হলে ভাল হত। আমাদের কাউকে পেত না।"

"সব ক'টাকেই তো ধরা হয়েছে। কাল অবধি থাক বন্দি হয়ে।"

"সব ক'টাই যে ধরা পড়েছে তা কে বলতে পারে !"

"যাবে কোথায় ? এগোতেই নজরে পড়ে যাবে।"

"পিছিয়ে আবার থানায় খবর দিতেও তো পারে।"

"তুমি ভাই বড্ড বেশি ভয় পাও। রোজগার করতে গেলে অত ভয় পেলে চলে না। আজকের রাতটা কাটলেই সব চুকে যাবে যেখানে সেখানে।" লোকটা কথা শেষ করল না। অর্জুন এগোচ্ছিল। এবং সে চকিতের জন্য

অমল সোমকে দেখতে পেল।

প্রায় একই সময়ে দু'জন আক্রমণ চালাল। লোক দুটো কিছু বোঝার আগেই মাটিতে পড়ে গেল। দু'জনেই অসতর্ক ছিল। ওদের উপুড় করে শুইয়ে ঘাড়ের পাশে মৃদু আঘাত করতেই চেতনা হারাল। এর পর খুব দ্রুত ওদের পোশাক ছিঁড়ে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে বাকিটা দিয়ে হাত এবং পা বেঁধে ফেলা হল। অমলদাকে অনুসরণ করে অর্জুন তার শিকারকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল ঝোপের মধ্যে।

কাজ শেষ করে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে হচ্ছে ওরা রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিয়েছে?"

"কী জানি। এরা তো কোনও প্রতিরোধ তৈরি করতে পারল না!"

"তা হলে ডি. এফ. ও-র বাহিনীকে ধরল কী করে? খোঁজ নিয়ে দ্যাখো এরা নিশ্চয়ই এক্স-পুলিশম্যান। এই রাজ্যের না হলে পাশের রাজ্যের। চল।"

বোঝা যাচ্ছে এতবড় জঙ্গলের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখার মত পাহারাদার এদের নেই। অমলদা ঘড়ি দেখছিলেন। এমনিতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। এস. পি-র আক্রমণের সময় থেকে তাঁরা বেশ পিছিয়ে পড়েছেন। তবু অর্জুনের একটু ভাল লাগছিল। এতক্ষণ ছিল খালি হাতে, এখন লোক দুটোর অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। সবসুদ্ধ চারটে গুলি বন্দুক পিছু বরাদ্দ হয়েছিল বোধহয়। এরা ডি. এফ. ও-র বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেনি বলে বাঁচোয়া।

যে পথে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই পথটাই ধরেছিলেন অমলদা। প্রায় কাছাকাছি আসার পর তিনি বললেন, "তুমি ডান দিকে এগোও। ওই গাছটায় উঠে বসো। আমরা এস. পি. সাহেবের জন্য অপেক্ষা করি। আমি বাঁ দিকে আছি।"

সময় চলে যাচ্ছিল। অর্জুন ঘড়ি দেখল। এস. পি. সাহেবের যে সময়ে আসার কথা তার থেকে প্রায় কুড়ি মিনিট ঘড়ির কাঁটা বেশি ঘুরে গেছে। ব্যাপারটা কী ঘটেছে সে বুঝতে পারছিল না। গাছের যে ডালটায় সে বসে ছিল, তার অনেকটাই পাতায় ছাওয়া। বসতেও আরাম লাগছে। কিন্তু গত রাত্রের পরিশ্রমের পর এইরকম আরামদায়ক জায়গায় বসে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকি নেওয়া হবে। ঘুম এগিয়ে আসছে গুড়ি মেরে। সেটা টের পেতেই অর্জুন নিজেকে সবল করার জন্য আর-এক ধাপ ওপরে উঠল। বেকায়দায় শরীর রাখলে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। এবার তার দৃষ্টি গাছের মাথা ছাড়াতে পেরেছে অনেকটাই। প্রথমেই দূরে সরু ফিতের মত জল চোখে পড়ল। চা-বাগানের গা ঘেঁষে যে নদীটা চলে গিয়েছে, যেটা পার হয়ে এই জঙ্গলে সে এসেছিল সেটা অনেক নীচে বাঁক নিয়েছে। সে চোখ সরাল। অনেকটা ন্যাড়া জায়গা, কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পাশে দুটো গাড়ি, একটা জিপ অন্যটা অ্যাম্বাসাডার। অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে জিপ

আর অ্যাম্বাসাডার মানে ওটাই শত্রু শিবির। জায়গাটা মোটেই দূরে নয়। মানুষগুলোকে এখান থেকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না। অমল সোম যেদিকে আছেন সেখান থেকে এই দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। অর্জুনের ইচ্ছে হল গাছ থেকে নেমে অমল সোমকে ডেকে এনে দৃশ্যটা দেখায়। সে আর-একটু নজর সরাতেই চোখ ছোট হয়ে এল। ওটা কী ? মন্দির-মন্দির মনে হচ্ছে। গাছের আড়ালে কি মন্দিরের চূড়ো ? আবছা হলেও খানিকক্ষণ লক্ষ করার পর আর সন্দেহ রইল না। শ্যাওলা পড়ে-পড়ে প্রায় কালচে হয়ে গিয়েছে মন্দিরের চূড়ো। না, আর সন্দেহের অবকাশ নেই। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিব মন্দির। তাজ্জব ব্যাপার হল আজ দেশের সবরকমের জঙ্গল বনবিভাগের নখদর্পণে। বনবিভাগ নিশ্চয়ই জানে কোথায় কী আছে। এই মন্দিরের অস্তিত্ব তাঁদের অবশ্যই জানা আছে। কিন্তু ডি. এফ. ও-র সঙ্গে আলোচনার সময় বোঝা গিয়েছিল ব্যাপারটা তিনি জানেন না। হয়ত বেশিদিন এ-জেলায় আসেননি অথবা জঙ্গলের কোনও প্রান্তে একটা ইটের চূড়ো আছে কি নেই তা তাঁকে জানানোর প্রয়োজন অধস্তন কর্মচারীরা মনে করেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল এই মন্দির খুঁজে বের করা। হরিপদ যে অনুমান করেছিলেন কালাপাহাড় তাঁর সম্পদ উত্তর বাংলায় লুকিয়ে রেখে গেছেন। কোচবিহারের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের পর সেটা সম্ভব বলে মনেই হতে পারে। কিন্তু উত্তর বাংলা মানে কয়েকশো মাইল জুড়ে জঙ্গল আর মন্দিরের পর মন্দির। ধীরে-ধীরে অর্জুন নীচে নেমে এল। এবং তখনই পায়ের আওয়াজ কানে এল। কেউ পাতা মাড়িয়ে আসছে। যদিও এখন সে সশস্ত্র তবু মুখোমুখি হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যতটা সম্ভব নিজেকে গাছের আড়ালে রেখে সে শুনল শব্দটা খুব কাছ দিয়েই তাকে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে লোকটি চলেছে সে খুব নিশ্চিন্ত, কিছু খোঁজার তাগিদ তার নেই। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল অর্জুন। খানিকটা দূরত্ব রেখে সে অনুসরণ শুরু করল, শব্দটির সঙ্গে পা মিলিয়ে।

মিনিটখানেক হাঁটাব পরেই লোকটাকে দেখা গেল। কাঁধে একটা লাঠি নিয়ে খোশ মেজাজে হেঁটে চলেছে। একে পেছন থেকে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে মোটেই অন্য বন্দুকধারীদের মতো মনে হল না। বরং চেহারায় এ-দেশীয় মানুষের ছাপ স্পষ্ট।

লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। এপাশ-ওপাশে তাকাল। তারপর নিচু হয়ে এগিয়ে চলল। ওর এগোবার ভঙ্গিতে যথেষ্ট সতর্ক ভাব ফুটে উঠেছে এবার। আর তখনই গুলির শব্দ শুরু হয়ে গেল। শব্দ ভেসে আসছে নদীর দিক থেকে। পোর্টেবল লাউড স্পিকারে এস. পি-র গলা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। এদিক থেকে গুলি ছোঁড়া এখনও শুরু হয়নি।

অর্জুন দেখল গুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে-যেতে এইসব শব্দ কানে যাওয়া মাত্র হকচকিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়েছে। দু'পাশে আগাছার ঝোপ থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সে যে আর নড়ছে না এটাও ঠিক। অর্জুনের মনে হল লোকটা এই দলের কেউ নয়। অথচ বাইরের লোক জঙ্গলের এত গভীরে স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসেই বা কী করে ? নিশ্চয়ই এটা ওর প্রথম আসা নয়। অন্যদিন যখন এসেছে তখন বাধা পায়নি কেন ? গোলমাল লাগছে এখানেই।

হঠাৎ অর্জুন ভূত দেখল যেন। নাকি অর্জুনকে ভূত বলে মনে হল লোকটার। যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসতেই সে দেখল একজন মানুষ বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে হাঁটু মুড়ে বসে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দিল। তার গলায় দিশি ভাষা। সে কিছু জানে না। তাকে ছেড়ে দিলে সে সোজা নিজের ঘরে ফিরে যাবে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী ?"

"মাংরা।"

"এখানে কী করতে এসেছ ?"

লোকটা চুপ করে রইল। এবার ওদিকে প্রত্যাঘাত শুরু হয়েছে। গুলিগোলার শব্দ খুব কাছেই এগিয়ে এসেছে। এই শব্দে লোকটা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। অর্জুন হাতের বন্দুক ছেড়ে হুকুম করল, "তুমি যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চল।"

"নেহি নেহি। আমাকে ছেড়ে দাও।" লোকটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছে।"

"তুমি যদি আমার কথা শোন তা হলে বেঁচে যাবে। নইলে—। চল।"

লোকটা সম্ভবত তার মতে. করে পরিস্থিতিটা বুঝল। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে হাঁটা শুরু করল গুড়ি মেরে। অর্জুন বুঝতে পারছিল না এতটা পথ সহজভাবে এসে ও এখান থেকে গুড়ি মারা শুরু করেছিল কেন ? ও কি বুঝতে পেরেছিল কেউ অনুসরণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে চলার ধরন বদলেছিল ? এটা ঠিক হলে...।

অর্জুন দেখল একটা বড় পাথর দু'হাতে সরাচ্ছে লোকটা। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সেটা সরতেই বেশ বড় সুড়ঙ্গ স্পষ্ট নজরে এল।

॥ পনেরো ॥

সুড়ঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা এবার অর্জুনের দিকে তাকাল। অর্জুন ইশারা করতে সে মাথা নুইয়ে ভেতরে ঢুকল। একটু বাদে তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। যে-কোনও সুড়ঙ্গের মতো এর ভেতরটা বেশ অন্ধকার। কোনওরকম আলোর সাহায্য ছাড়া ওখানে পা বাড়াতে ঠিক সাহস হচ্ছিল না অর্জুনের। সুড়ঙ্গের মুখ যদি ওপাশে কোথাও থাকে তা হলে এই লোকটি, যার

নাম মাংরা, স্বচ্ছন্দে এই সুযোগে পালিয়ে যেতে পারবে। অবশ্য ওকে ধরে রেখেই বা তার কী লাভ !

অর্জুন ইতস্তত করছিল। গুলিগোলা চলছে ওপাশে। অবিরাম শব্দ বাজছে। যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে নির্জন জঙ্গল। অর্জুন সুড়ঙ্গের দিকে তাকাল। এটা কে বানিয়েছে ? এরাই ? যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে নতুনের চেহারা নেই। হঠাৎ কাছাকাছি মানুষের উত্তেজিত গলা শোনা গেল। লোকগুলো এদিকেই আসছে। কোনও পথ না পেয়ে অর্জুন দ্রুত সুড়ঙ্গে নামল। নেমেই মনে হল লোকগুলো এখানে এলেই সুড়ঙ্গটাকে দেখতে পাবে। ইঁদুরের মতো অবস্থা না হয় তখন ! পেছন থেকে মাংরার গলা পেল অর্জুন, "পাথরটা টেনে আনুন মুখে, জলদি।"

অতএব বন্দুক রাখতে হল। সুড়ঙ্গের মুখে রাখা পাথরটাকে কোনও মতে টেনে এনে আড়াল তৈরি করতেই ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। এক বিঘত দূরের কোনও জিনিস দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন হাতড়ে-হাতড়ে বন্দুকটাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল। পেতে মনে সামান্য ভরসা এল। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় ?"

"এখানে বাবু।" তৎক্ষণাৎ সাড়া পাওয়া গেল।

"আমার দিকে এগোবার চেষ্টা একদম করবে না।"

"আপনার দিকে যাব কেন ? আপনি বরং আমার পেছনে আসুন।"

অর্জুন ঢোক গিলল, "দাঁড়াও। তোমার পেছনে যাব যে, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটা টর্চ যদি সঙ্গে থাকত !"

"টর্চ কেনার পয়সা কোথায় পাব বাবু। আমার এখানে হাঁটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার চোখ ঠিক সয়ে নেবে।" লোকটা হাসল।

কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না অথচ কথা হচ্ছে। মাটির ওপরে কী ঘটছে তা এখানে দাঁড়িয়ে বোঝার উপায় নেই। অবশ্য দাঁড়ান শব্দটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। কোমর অনেকখানি ভেঙে মাথা নুইয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে এখন। অর্জুন দেখল এখন অন্ধকার যেন আগের চেয়ে অনেক পাতলা কিন্তু দেখে পথ চলার মতো নয়। একটা মানুষের আদল কি তার সামনে ফুটে উঠছে ? সে ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই সুড়ঙ্গটা ভাল চিনতে কী করে ?"

লোকটা হাসল, "এখনকার কথা নাকি ? সেই ছেলেবেলা থেকে চিনি। জঙ্গলে খেলা করতে এসে একদিন খুঁজে পেয়েছিলাম।"

"সুড়ঙ্গটা কোন্‌দিকে গিয়েছে ?"

"মন্দিরে।"

"মন্দির মানে শিবের মন্দির ?" অর্জুনের গলার স্বর প্রতিধ্বনিত হল।

"কী জানি। দেবতা-টেবতা কিন্তু নেই ওখানে।" লোকটা যেন পিক্ করে থুতু ফেলল।

"এখানে যে সুড়ঙ্গ আছে তা তোমাদের গ্রামের সবাই জানে?"

"না। আমরা দুই বন্ধু জানতাম।"

"সে কোথায়?"

"মরে গিয়েছে। সাপের কামড়ে। এখানে আসার সময়ে।"

"কবে?" অর্জুনের শরীর শিরশির করল। এখানে এখনও সাপ থাকা আশ্চর্যের নয়।

"সে অনেকদিন আগের কথা। আমি আর কাউকে বলিনি।"

"কেন?"

"বললেই তো সবাই জেনে যাবে। এটা আর আমার থাকবে না।"

"তোমার থাকবে না মানে?"

"এই গুহাটা এখন আমার একার।" এবার লোকটার গলা বেশ গম্ভীর শোনালো।

"তুমি এখানে কী কর?"

"মালপত্তর রাখি।"

"কীসের মালপত্তর?"

"সেটা বলা যাবে না।" লোকটার হাসি শোনা গেল। "তবে এখন তো বন্দুক দেখিয়ে আপনি জেনে গেলেন।"

"তুমি কি চুরিচামারি করো?"

লোকটা কোনও জবাব দিল না। প্রশ্নটা করেই অর্জুনের মনে হল, না করাই ভাল ছিল। লোকটা তাকে পছন্দ করছে না। এর ওপর সে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে বুঝে যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে তা হলে এই অন্ধকারে সে কিছুই করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অর্জুন একটু হাসার চেষ্টা করল, "তুমি এখানে রোজ আস?"

"না। দরকার পড়লে আসি।"

"এখানে কিছু বাইরের মানুষ আস্তানা গেড়েছে। তারা তোমাকে বাধা দেয়নি?"

"দিয়েছিল। আমাকে বলেছে এদিকে না আসতে।"

"তারপরে?"

"আমার দরকার পড়ে তাই আসি। ওরা বললেই শুনব কেন?"

"আজকেও তো বাধা দিতে পারত।"

"দিলে চলে যেতাম। কালও ফিরে গিয়েছি।"

"এরা এখানে কতদিন আছে?"

"এক মাস হয়ে গেল।"

"তোমাদের গ্রামের সবাই জানে ?"

"জানবে না কেন ? মোড়লকে টাকা দেয় কাজ করার জন্য।"

"ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন জানে ?"

লোকটা হাসল, "আপনার পিঠে একটা পিঁপড়ে হাঁটলে আপনি জানবেন না।"

অর্জুন বুঝল লোকটা একেবারে বোকা নয়। আর এখানকার চারপাশের মানুষদের হাতে রেখে দলটা কাজ চালাচ্ছে, এটা বোঝা গেল। এবার লোকটা বলল, "চলুন, আমি আগুন জ্বালিয়ে নিচ্ছি। এখানে কয়েকটা শুকনো ডাল আমি রেখে গিয়েছিলাম—।" ফস করে দেশলাই জ্বালল লোকটা। একটু খুঁজতেই বেঁটে-বেঁটে কয়েকটা ডাল পেয়ে গেল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাঠি খরচ করে সেগুলো ধরাল, তারপর এগোতে লাগল।

বাতাসের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। নাকে ডালপোড়া গন্ধ ভেসে আসছে। অর্জুন ছায়ামাখা কাঁপা আলোয় লোকটিকে অনুসরণ করছিল। এবড়োখেবড়ো পথ। কুঁজো হয়ে চলার জন্য কোমরে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। মিনিট তিনেক হাঁটার পর লোকটা দাঁড়াল। অর্জুন দেখল সামনে দুটো পথ। সুড়ঙ্গ দু'দিকে চলে গিয়েছে। লোকটা বলল, "ওইদিকে গেলে মন্দিরের গায়ে পৌঁছে যাওয়া যায়। এদিকটায় আমি মাল রাখি। আপনি কি এবার আমাকে যেতে দেবেন ?"

"কোথায় যাবে তুমি ?"

"আমার জিনিস নিয়ে বেরিয়ে যাব।"

"বেরিয়ে যাবে কোথায় ? বাইরে গোলাগুলি চলছে।"

"আমার কিছু হবে না।" লোকটা হাসল, "আচ্ছা, আপনি কোন দলে ?"

"যারা অন্যায় করে তাদের বিরুদ্ধে।"

"তার মানে, পুলিশ ?"

"আমি পুলিশ নই।"

"সেটা অবশ্য আপনাকে দেখেও বোঝা যায়। তা হলে বলি।"

"তোমার ওই পথটা আমি দেখব।"

"পথ তো বেশি নেই। একটুখানি।" লোকটা ভাবল খানিক, "শুনুন আপনি যদি আমাকে বাধা দেন তা হলে আমি ছেড়ে দেব না।"

"আমি কিছুই করছি না।"

লোকটা এবার বাঁ দিকে এগোল। তিন-পা যেতেই সুড়ঙ্গ শেষ। সামনে পাথরের পাঁচিল। লোকটা আর একটা ডাল ধরাল। তারপর এক কোণে রাখা একটা বস্তা তুলে নিল। অর্জুন সেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী আছে ওর ভেতর ?"

"জিনিস।"

"কী জিনিস?"

লোকটা অস্বস্তিতে পড়ল। তার এক হাতে মশালের মতো ধরা আগুন, অন্য হাতে বস্তাটা। হঠাৎ বেশ কাতর গলায় বলল, "মাসখানেক আগে এক জোতদারের ঘর থেকে কিছু বাসন চুরি করে এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। হাওয়া ঠাণ্ডা হতে নিয়ে যাচ্ছি।"

"তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।"

"তারপর?"

অর্জুন হকচকিয়ে গেল। আগুনের ছোঁয়ায় লোকটির মুখ কেমন রহস্যময়। অর্জুন বলল, "অন্যায় করেছ, তোমার জেল হবে। সেটাই শাস্তি।"

"তারপর?"

"মানে?"

"জেল থেকে একদিন ছাড়া পাব। পেয়ে কী করব?"

"কাজকর্ম করবে।"

"সেটা পেলে তো এখনই করতাম।" বলে লোকটা সোজা এগিয়ে এল অর্জুনের দিকে। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুহূর্তেই তৈরি হয়ে গেল অর্জুন, কিন্তু তার গা ঘেঁষে লোকটা নির্বিকার মুখে বেরিয়ে গেল। আলো এবং বস্তা হাতে কুঁজো হয়ে হেঁটে গেল যে দিক দিয়ে তারা এতক্ষণ এসেছিল সেই পথে। লোকটা অন্যায় করছে। কিন্তু অর্জুন ভেবে পেল না সে কী করতে পারে। ওই অন্যায়ের জন্য গুলি করা যায় না। পেছনে ধাওয়া করে ওকে আটকে যে পুলিশের হাতে তুলে দেবে সেই পরিস্থিতি এখন নেই। কিন্তু একটা লোক যে এমন নির্বিকার মুখে অন্যায় করে যেতে পারে একটুও পাপবোধে পীড়িত না হয়ে, তা একে না দেখলে সে ভাবতে পারত না। হঠাৎ চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। লোকটার চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আলো চলে গেছে। তার মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিরশির করে উঠল। লোকটা তাকে ফাঁদে ফেলে গেল না তো? অন্ধকার সুড়ঙ্গে রেখে দিয়ে ও সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে চলে যেতে পারে। নাকে এখন ডালপোড়া গন্ধ লাগল। তার মানে অক্সিজেন দ্রুত কমে আসছে। নতুন বাতাস ঢোকার যদি কোনও পথ না থাকে তা হলে এখানে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে। অর্জুন দ্রুত লোকটাকে অনুসরণ করতে চাইল। কিন্তু কয়েক পা যেতেই অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ল একপাশে। হাতের বন্দুকটা সশব্দে আছাড় খেল পাথরে। উঠে বসল সে। হাঁটুতে বেশ চোট লেগেছে পড়ার সময়। তার মাথায় এখন একমাত্র চিন্তা, এই সুড়ঙ্গ থেকে বের হতে হবে। সাপ দূরের কথা, একটা বিছে যদি এই অন্ধকারে তাকে কামড়ায় তা হলেও সে কিছুই দেখতে পাবে না। মিনিটখানেক

হাতড়ে-হাতড়ে সে বন্দুকটাকে খুঁজে পেল। পড়ে যাওয়ার পর এটি কী অবস্থায় আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন স্থির করল সে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। অতটা পথ অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। লোকটা বলেছিল তারা সুড়ঙ্গের এই মুখের কাছেই চলে এসেছে আর একটু হাঁটলে মন্দিরের গায়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে। অন্তত লোকটা সেইরকমই বলেছিল।

বন্দুকটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করল অর্জুন। এতে পথ চলতে বেশ সুবিধে হচ্ছে। তার বুকে একটা ভয় চাপা ছিলই। যদি সুড়ঙ্গের দুটো মুখই বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে এখানে সারাজীবন যক্ষের মতো বন্দি হয়ে থাকতে হবে। এই ভয়টাই যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে নিয়ে চলেছিল অর্জুনকে। ইতিমধ্যে দু-দু'বার আছাড় খেতে হয়েছে তাকে। মুখে মাকড়সার জাল জাতীয় কিছু জড়িয়েছে। অদ্ভুত এক ধরনের পচা গন্ধ নাকে আসছে। যে লোকগুলো কালাপাহাড়ের সম্পদ অন্বেষণে এখানে এমন পাকা ব্যবস্থা করে জাঁকিয়ে বসেছে তারা যে এই সুড়ঙ্গের সন্ধান এখনও পর্যন্ত পায়নি সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পেলে এইরকম আদিম গন্ধ এখানে থাকত না। কিন্তু পেল না কেন এইটে ভাবতে অবাক লাগছে। আছাড় খেয়ে হাঁটুতে বেশ ব্যথা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। অর্জুন খুব ধীর সতর্ক হয়ে হাঁটছিল। এবং হঠাৎ তার চোখে একফালি আলো স্নিগ্ধতা ছড়াল। খানিকটা দূরে একটা ফাঁক গলে সুড়ঙ্গের মধ্যে সেই আলো এসে পড়েছে। পায়ের তলায় টুকরো পাথর। সহজভাবে হাঁটা যাচ্ছে না। মাথার ছাদ ক্রমশ আরও নীচে নেমে এসেছে। তারই মধ্যে দ্রুত জায়গাটা অতিক্রম করতে গিয়ে অর্জুন আচমকা পাথর হয়ে গেল। একেবারে কাছ থেকেই ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ আসছে। প্রচণ্ড রেগে যাওয়া সেই প্রাণী সাপ ছাড়া কিছু নয় এটুকু বুঝতে সময় লাগল না। এই অবস্থায় সামান্য নড়াচড়া মানে সাপটির ছোবল শরীরে নেওয়া। আবার দাঁড়িয়ে থাকলেই যে সাপটি নির্লিপ্ত হয়ে ছেড়ে দেবে এমন ভরসা কোথায়? অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল। আলোর ফালি আর দূরে নয়। তাই এখানে অন্ধকার তেমন জমাট বেঁধে নেই। চোখ শব্দ অনুসরণ করতেই বিশাল ফণাটাকে দেখতে অসুবিধে হল না। সাপটা মাটি ছেড়ে প্রায় সুড়ঙ্গের ছাদ পর্যন্ত ফণা তুলে দুলছে। ছোবল মারার ঠিক আগের ভঙ্গি এটা। মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চলে যাওয়াব মতো দ্রুত কেউ বলল আক্রমণ কর এবং একইসঙ্গে বন্দুক ধরে রাখা হাতটা সচল হল। ট্রিগার নয়, লাঠির মতোই ব্যবহার করল অর্জুন এবং সেই একইসঙ্গে সাপটা ছোবল বসাল। বন্দুকের যেখানে তার মুখ ঘষটে গেল তার আধ ইঞ্চি দূরেই অর্জুনের আঙুল ছিল। যত দ্রুতই হোক অর্জুনের আগেই সাপটা দ্রুততম হতে পেরেছিল।

সাপটাকে ছিটকে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিল বন্দুকের আঘাত।

সমস্ত শরীরে বরফের কাঁপুনি নিয়ে অর্জুন কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। ওই আঘাত সামলে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না বলেই বোধহয় ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে উবু হয়ে বসল। তার চোখ সুড়ঙ্গের ভেতর দিকে, এবার বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল। সাপটা যদি এগিয়ে আসতে চায় তা হলে সে সরাসরি গুলি করবে। এখন অনেকখানি জায়গা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

প্রায় মিনিট তিনেকের অপেক্ষা বিফলে গেল। সাপটার ফিরে আসার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। অর্জুন এবার সুড়ঙ্গের মুখের দিকে তাকাল। ওপাশে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। সে আলো আসার পথটা ধরে চাপ দিল। একটুও নড়ল না জায়গাটা। লোকটা বলেছিল মন্দিরের পাশে গিয়ে উঠেছে এই সুড়ঙ্গ। ওপাশে যুদ্ধের ফল কী হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। যদি লোকগুলো জিতে থাকে প্রথম রাউন্ডে, তা হলে শিবমন্দির তো তাদের দখলেই থাকবে। কিন্তু এখানে অনন্তকাল এভাবে বসে থাকা যায় না। বন্দুকের বাঁট দিয়ে আলো আসার পথটাকে আঘাত করতে লাগল অর্জুন। একটু-একটু করে ফাঁকটা বড় হচ্ছে। অর্জুনের শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। ওপাশে একটা বড় পাথর রয়েছে। সেটাকে কিছুতেই সরান সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয় দফায় চেষ্টা করার পর যেটুকু ফাঁক হল তাতে কোনওমতে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ওপাশে কী আছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অর্জুন এগিয়ে যেতেই কানে মানুষের গলা ভেসে এল। আওয়াজটা আসছে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে। সে চটপট শরীরটাকে তুলে বাইরে নিয়ে আসতেই পাথরটা নড়ে আবার সুড়ঙ্গের মুখে সরে এসে আটকে গেল। ওঠার সময় ওটি ফিরে এলে আর দেখতে হত না। এবং তখনই অর্জুনের খেয়াল হল তা‍ বন্দুক সুড়ঙ্গের মধ্যেই পড়ে আছে।

॥ ষোলো ॥

বন্দুকের জন্য আবার সুড়ঙ্গে নামাটা বোকামি হবে। অর্জুন চারপাশে তাকাতেই মন্দিরটাকে দেখতে পেল। ডালপালার অজস্র পাতায় চাপা পড়ে গেছে। সেই প্রাচীন মন্দিরের মতোই সরু ইঁটের গাঁথুনি। তার অনেক জায়গায় ভাঙনের চিহ্ন স্পষ্ট। অর্জুন ধীরে-ধীরে এগোল। কালাপাহাড় যদি এখানে এসে থাকে তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই মন্দির তার হিংসার শিকার হয়নি। কিন্তু কেন ?

মন্দিরটি আকৃতিতে খুব বড় নয়। তবে কয়েকশো বছর আগে মূল মন্দির চত্বর কতখানি ছিল সেটা এখন আন্দাজ করা মুশকিল। এখানে ধারে কাছে কোনও বিল তো দূরের কথা জলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। উত্তরবাংলার এই প্রান্তে বিল দেখা যায় না বললেই চলে। ভৌগোলিক কারণেই সেটা সম্ভব হয়ে

ওঠেনি। সেই সময় ছিল কিনা তাও বোঝা মুশকিল। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা মন্দির আছে এই খবর যখন স্বয়ং ডি. এফ. ও. জানেন না তখন— সব জেনেশুনে হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষের এখানে আসার পেছনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট যুক্তি আছে। মন্দিরের মুখটায় এসে দাঁড়াতেই গুলির শব্দ কানে এল। সুড়ঙ্গে ঢোকার সময় যেরকম ঘন-ঘন গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল এখন আর সেটা হচ্ছে না। এই প্রায়-বন্ধ-হওয়া আওয়াজ বলে দিচ্ছে ওদিকে যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। আপাতত কোন পক্ষ জিতল সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন দেখল মন্দিরে কোনও দরজা নেই। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, কারণ কোনও জানলাও নেই। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সম্ভবত একসময় বারান্দা ছিল। এখন সেটা মাটির সমান রেখায় নেমে এসেছে। অর্থাৎ পুরো মন্দিরটাই বসে গিয়েছে।

ভেতরে ঢোকার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওরা। কিন্তু একেবারে খালি হাতে প্রায় অন্ধকার প্রাচীন ঘরে ঢুকতে সাহসও হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা গাছের মোটা ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে নিল সে। ওটাকে মেঝেতে ঢুকে আওয়াজ করতে-করতে মন্দিরের মুখটায় দাঁড়াতেই অনেকখানি চোখে পড়ল। সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকেই সে চারপাশে তাকিয়ে নিল। না, কোনও মানুষ অথবা জন্তু এখানে নেই। বরং মেঝেটা বেশ পরিষ্কার করা। এরকম বন্ধ জায়গায় একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ থাকা স্বাভাবিক ছিল যেটা একেবারেই নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল মেঝেতে কিছু চিকচিক করছে। কয়েক পা হেঁটে সেটি কুড়িয়ে নিতেই স্পষ্ট হল এখানে নিয়মিত লোকজন আসে। নইলে বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট এখানে পড়ে থাকত না। হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষ কি এই মন্দিরটাকে থাকার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করত ? তা হলে তো অন্যান্য অনেক কিছুই চোখে পড়ত। অর্জুন ভাল করে ঘুরে-ঘুরে ঘরটাকে দেখল। হাঁটার সময় লাঠিটাকে নিজের অজান্তে মেঝেতে ঠুকছিল। হঠাৎ কানে আওয়াজ যেতেই সে চমকে মুখ নামাল। শব্দটা অন্যরকম লাগছে। খুব জোরে ঠুকতেই মেঝেটা নড়ে গেল। অর্জুন উবু হয়ে বসে আবিষ্কার করল হাত দুয়েক চওড়া একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম মেঝেতে সেঁটে রাখা হয়েছে। তার ডান কোণে চাপ না পড়লে ওটা কিছুতেই নড়বে না। সে ধীরে-ধীরে চাপ দিতে লাগল। চাপ যত বাড়ছে তত বিপরীত দিকের প্ল্যাটফর্ম ওপরে উঠে আসছে। ওটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে গর্তটা চোখে পড়ল ভালভাবে।

একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নীচে। সিঁড়ির চেহারাটা সম্পূর্ণ নতুন। ঠিক এই সময় মন্দিরের গায়েই গুলির আওয়াজ হল। চমকে উঠল অর্জুন। প্ল্যাটফর্মটা কোনওমতে বন্ধ করেই সে এক লাফে মন্দিরের অন্ধকার কোণে গিয়ে দাড়াল লাঠিটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে।

লোকটা ছিটকে মন্দিরে ঢুকল। তাড়া খাওয়া বাঘের মতো দেখাচ্ছিল

তাকে। ডান হাতের রিভলবার দরজার দিকে তাক করে সে ধীরে-ধীরে ঘরের ভেতর এগোচ্ছিল। অর্জুন দেখল এর সমস্ত মনোযোগে বাইরের শত্রু আছে। দরজাটাকে খেয়াল রেখে লোকটা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের বাইরে কারও ছায়া দেখেই লোকটা একটা গুলি ছুড়ল। ইতিমধ্যে সে প্ল্যাটফর্মের বাঁ দিকে পৌঁছে গিয়েছে। জুতো দিয়ে আঘাত করল সে ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে চাপ পড়লে প্ল্যাটফর্ম সোজা হয়। আর সময় নষ্ট না করে লোকটা সিঁড়িতে পা দিল। নামবার সময় একটু বেকায়দায় নামতে হচ্ছে কিন্তু দরজা থেকে চোখ আর রিভলবার সরাচ্ছে না। অর্জুন লোকটার শরীরকে নীচে নেমে যেতে দেখছিল। হঠাৎ তার ইন্দ্রিয় সজাগ হতেই সে বিদ্যুতের মতো দেওয়াল ছেড়ে এগিয়ে এসে লোকটার কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত করল। লোকটির কাঁধ তখন মেঝে থেকে সামান্যই উঁচুতে ছিল। আঘাত লাগা মাত্র তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। সেই সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয়বার আঘাত করল অর্জুন। উত্তেজনায় এবারের আঘাত কাঁধের নীচে পড়তেই লোকটা আচমকা এগিয়ে গেল। তার হাত প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়তেই সেটা চট করে নীচে নেমে এসে মাথায় আঘাত করল। লোকটার শরীর এখন সিঁড়ি এবং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আটকে গেছে। অর্জুন রিভলবারটা তুলে নিল। প্ল্যাটফর্মটাকে এক হাতে সোজা করতেই বোঝা গেল লোকটা এখন অজ্ঞান হয়ে আছে। ওকে টেনে ওপরে তোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এসে এপাশের দেওয়ালে লাগল। অর্জুন তড়াক করে লাফিয়ে আবার উল্টো দিকের দেওয়ালে চলে গেল। এই গুলি কারা ছুঁড়ছে ? লোকটা যখন প্রতিপক্ষ এবং তার উদ্দেশ্যেই গুলি ছোড়া হচ্ছে তখন চিৎকার রে জানান দেওয়া দরকার। ভুল করে ওরা তাকেই গুলি করতে পারে। সাধারণ সেপাইরা তো এই অবস্থায় তাকে চিনতে পারবে না। হঠাৎ ঠক করে আওয়াজ হতেই অর্জুন দেখল প্ল্যাটফর্মটা নীচে নেমে আগের মতো বসে গেছে। না জানা থাকলে ওটাকে আর আলাদা করে চেনা মুশকিল। তার মানে লোকটা এরই মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে পালিয়েছে।

অর্জুন চিৎকার করল, "গুলি ছুঁড়ো না। আমি অর্জুন।"

বাইরে থেকে কোনও সাড়া এল না। চারধারে এখন নিস্তব্ধ।

কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, যারা বাইরে বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে তারা দেখামাত্রই গুলি করবে। এস. ডি. পি. এফ. ও., ভানুদা অথবা অমল সোম না আসা পর্যন্ত সে চট করে ওদের বোঝাতে পারবে না। অর্জুন প্ল্যাটফর্মটার দিকে তাকাল। সুড়ঙ্গ কোথায় আর এই প্ল্যাটফর্ম কোথায়! নাকি দুটোর মধ্যে সংযোগ রয়েছে ? সে বুঝতে পারছিল না কী করবে। লোকটা যদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেই সুড়ঙ্গটাকে পেয়ে যায় তা হলে ধরা মুশকিল হবে। তার মনে পড়ল সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসার সময় ভেতরে কিছু মানুষের গলার স্বর শুনতে

পেয়েছিল।

"ভেতরে যিনি আছেন বেরিয়ে আসুন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।" চিৎকার ভেসে আসতেই অর্জুন স্বস্তি পেল। সে সমানে গলা তুলে বলল, "আমি অর্জুন। গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করুন।"

কথাগুলো শেষ হওয়ামাত্র পায়ের শব্দ হল। অর্জুন এস. পি. সাহেবের মুখ দেখতে পেল, পেছনে বন্দুক হাতে সেপাইরা। এস. পি. বললেন, "মাই গড। এখানে কী করছেন ?"

"আর কী করব ? আপনার সেপাইরা যেভাবে গুলি ছুড়ছেন যে পেছোতে পারছি না।"

"তা আপনি যদি ওদের আক্রমণ করে এখানে পালিয়ে আসেন তা হলে ওরা ছেড়ে দেবে কেন ? ইট্‌স নট ডান। ওদের দেখে ভুল হওয়ার কথা নয়।"

"আমি ওদের দেখে গুলি ছুঁড়িনি।"

"মিথ্যে কথা বলছেন। ওরা সবাই আমাকে জানিয়েছে, যে গুলি ছুঁড়ছিল সে ওই মন্দিরের ভেতর এসে লুকিয়েছে।" এস. পি. চারপাশে তাকালেন, "এখানে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। যেসব উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটছে তাতে কারও ওপর বিশ্বাস রাখা মুশকিল। আপনাকে এক উপযুক্ত কৈফিয়ত দিতে হবে।"

অর্জুনের হাসি পাচ্ছিল। সে বলল, "ওদের জিজ্ঞেস করুন আমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেখেছে কি না ! তোমরা কি আমাকে দেখেছ ?"

সে নিজেই প্রশ্নটা করল। সেপাইরা একটু থতমত খেল। দুজন বলল দেখেছে, দুজন জানায় বুঝতে পারছে না। অর্জুন কিছু করার আগে বাইরে কথাবার্তা শোনা গেল। সে ডি. এফ. ও. সাহেবের গলা পেল, "আজব ব্যাপার ! এখানে এরকম মন্দির আছে তা আমাকে কেউ জানায়নি ! এত বড় ষড়যন্ত্র চলছিল এখানে। এস. পি. সাহেব কোথায় ?"

এস. পি. মন্দির থেকে বেরতেই অর্জুন তাকে অনুসরণ করল। এস. পি-র দেখা পাওয়া মাত্র ডি. এফ. ও. বলে উঠলেন, "আমার ডিপার্টমেন্টের যারা ওদের সাহায্য করেছে বলে প্রমাণ পাচ্ছেন তাদের স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করতে পারেন।"

"সরাসরি প্রমাণ পাওয়া খুব মুশকিল, তবে দু'জনকে ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই করা গেছে আর তৃতীয়জন হলেন উনি। অবশ্য আপনার ডিপার্টমেন্টের লোক নন।" আঙুল তুলে অর্জুনকে দেখালেন এস. পি., "আমার লোকের ওপর গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে এই মন্দিরের ভেতরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।"

হঠাৎ ভানু ব্যানার্জির গলা শোনা গেল, "অসম্ভব, মিথ্যে কথা। অর্জুন এমন কাজ করতেই পারে না। আপনি ভুল বলছেন।"

এস. পি. হাসলেন, "আমার সেপাইদের জিজ্ঞেস করুন।"

ভানু ব্যানার্জি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন অমনি অর্জুন হাত তুলে বাধা দিল। সে এবার সেপাইদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, "যে লোকটা তোমাদের ওপর গুলি ছুঁড়ে এই মন্দিরে ঢুকেছে তার চেহারার সঙ্গে আমার কোনও মিল আছে ?"

একজন সেপাই বলল, "ভাল করে লোকটাকে দেখার সুযোগ পাইনি আমি।"

"লোকটার পোশাক দেখেছ ?"

"হ্যাঁ। শার্ট-প্যান্ট।"

অর্জুন দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল, "কোট-প্যান্ট।"

অর্জুন এবার এস. পি.-র দিকে তাকাল, "বুঝতে পারছেন, উত্তেজনার সময় ওরা কী লক্ষ করেছে। ওই মন্দিরে আমি আগেই ঢুকেছিলাম। ওরা যাকে দেখেছে সে পরে ঢুকেছিল।"

এস. পি. বললেন, "ওয়েল। তা হলে লোকটা গেল কোথায় ? এরা বলছে কেউ মন্দির থেকে বের হয়নি। আর কোনও দরজা নেই মন্দিরের যে, বেরিয়ে যেতে পারে। আর ওরকম একটা খুনি আপনাকে দেখে ছেড়ে দিল ! বিশ্বাস করতে বলেন ? তা ছাড়া, ওই রিভলবারটা আপনি কোথায় পেলেন ? এখানে যখন এসেছিলেন তখন কি ওটা আপনার সঙ্গে ছিল।"

ডি. এফ. ও. বললেন, "কারেক্ট। আসার সময় আপনি বারংবার বলছিলেন খালি হাতে আসাটা ঠিক হচ্ছে না।"

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবল। তারপব জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার সোম কোথায় ?"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "মিস্টাব সোমকে আমরা দেখতে পাইনি।"

"এদিকের অবস্থা কী ?"

"এরা সবাই অ্যারেস্টেড। শুধু চাইদের ধরা যায়নি।"

অর্জুন বলল, "এস. পি. সাহেব, কাল রাত্রে এদের কার্যকলাপ আবিষ্কার করার পর আমি আপনাদের সমস্ত ব্যাপার জানাই। যদি আমি আপনার লোকের ওপর গুলি ছুঁড়ব তা হলে সেটা করব কেন ?"

"প্রশ্নটা তো আপনাকেই করছি।" এস. পি. খুব কায়দা করে হাসলেন।

"উত্তরটা দেওয়ার আগে আমার কথামতো কাজ করুন।" অর্জুন মন্দিরের ভেতরে দলটা নিয়ে এল, "দু'জন সেপাইকে এখানে পোস্ট করুন। এটা একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম। খুললে নীচে যাওয়া যায়। যদি কেউ এখান দিয়ে বেরতে চায় তাকে অ্যারেস্ট করতে অসুবিধা হবে না।" অর্জুন দেখিয়ে দেওয়ামাত্র এস. পি. প্ল্যাটফর্ম তোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠিক জায়গায় চাপ না পড়ায় সেটা উঠল না।

ভানু ব্যানার্জি বলে উঠলেন, "লোকটা কি এখান দিয়েই পালিয়ে গেছে ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আমাকে দেখতে পায়নি। পেছন থেকে ওকে

আমি আঘাত করেছিলাম। পালাবার আগে রিভলবারটা পড়ে গিয়েছিল।"

এস. পি. খুব উত্তেজিত, "তাই বলুন। চলুন এটা খোলা যাক।"

অর্জুন বাধা দিল, "না। আসুন আমার সঙ্গে।"

সে দলটাকে নিয়ে এল যে-পথে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেইখানে। পাথরটা এখনও সুড়ঙ্গের মুখ আড়াল করে রেখেছে। অর্জুন বলল, "দু'জনকে এখানে পোস্ট করুন। এটাও বেরবার একটা মুখ। আমাদের এবার যেতে হবে মূল মুখটায়।"

এস. পি. তৎক্ষণাৎ চারজন সেপাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দু'জায়গায় পাহারা দিতে আদেশ করলেন। অর্জুন মনে করার চেষ্টা করছিল ঠিক কোন জায়গা থেকে সে আদিবাসী লোকটিকে অনুসরণ করে সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল। মাটির ভেতরটা ছিল অন্ধকারে ঢাকা। তার সঙ্গে ওপরের প্রকৃতির কোনও মিল নেই। জায়গাটা চিনতে তার অসুবিধা হচ্ছিল।

মিনিট কুড়ি ঘোরাঘুরি করে অর্জুন ঠাওর করতে পারল। সে এস. পি.-কে বলল, "যদি এর মধ্যে ওরা বেরিয়ে না গিয়ে থাকে তা হলে তৃতীয় মুখটায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি।"

ওরা জঙ্গল সরিয়ে এগোতেই শিসের আওয়াজ শুনতে পেল। এই শিস অর্জুনের চেনা। সে পাল্টা শিস দিল। একটু বাদেই অমল সোম বেরিয়ে এলেন জঙ্গলের আড়াল থেকে। তাঁর পেছনে সেই আদিবাসী লোকটি। অর্জুনকে দেখে মুখ নিচু করল সে।

এস. পি. উত্তেজিত হলেন, "আপনি এখানে? আর আপনাকে খুঁজছি আমরা।"

"কেন? কোনও জরুরি দরকার ছিল?" অমল সোম স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলেন।

"আশ্চর্য। আমবা এদের গ্রেফতার করতে এসেছি, তাই না?"

"ঠিকই। সেটা তো করা হয়ে গেছে। অর্জুন, তুমি কি অন্য মুখগুলো বন্ধ করেছ?

"হ্যাঁ। দুটো মুখে লোক রাখা হয়েছে।"

"ভাল। আশা করব চতুর্থ মুখ নেই।"

ডি. এফ. ও. বলে উঠলেন, "মানে?"

"কার্বঙ্কলের মতো ব্যাপার হলে আরও মুখ থাকত। এদিকটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। এস. পি. সাহেব, এখন আপনার আসল অপরাধীরা মাটির তলায়।"

অমল সোম হাসলেন, "এবার ওদের বের করতে হবে।"

অর্জুন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে জানতে চাইল "অমলদা, আপনি কখন সুড়ঙ্গের হদিস পেলেন?"

"তুমি যখন এর সঙ্গে ঢুকলে তখনই। তারপর এ একা বেরিয়ে এল এবং তিনজন মানুষ ভেতরে ঢুকে গেল পড়ি কি মরি করে। আমি তখন এই লোকটির সঙ্গে ভাব জমালাম। খুবই সাধারণ ব্যাপার।"

"সুড়ঙ্গটা কত বড় ?" এস. পি. জানতে চাইলেন।

"অর্জুন বলতে পারবে।" অমলদা অর্জুনের দিকে তাকালেন।

অর্জুন জবাব দিল, "অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে বেশ বড়।"

"এরকম একটা গোপন আস্তানা ওরা তৈরি করে রেখেছে আমি ভাবতে পারছি না।"

"তৈরি তো এখন হয়নি। কালাপাহাড় করেছিলেন। কয়েকশো বছর হয়ে গেল। কিন্তু ওদের বের করতে হবে। ওহে, তোমরা কী করে গর্ত থেকে খরগোশ ধর ?"

অমল সোম লোকটিকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল ধোঁয়া দিয়ে কাজটা করে তারা। অমল সোম হাসলেন, "বাঃ। সরল ব্যাপার। অর্জুন, আমি তোমাকে গোড়া থেকেই বলে এসেছি এই কেস খুব সরল। নিন, আপনারা ধোঁয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই লোকটি সুড়ঙ্গের মুখ দেখিয়ে দেবে। ততক্ষণে আমরা একটু চারপাশে ঘুরে আসি। এসো অর্জুন, আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।" অমলদা পা চালালেন।

॥ সতেরো ॥

অমল সোমের সঙ্গে এতদিন ঘনিষ্ঠভাবে থেকেও তাঁর অনেক আচরণের ঠিকঠাক ব্যাখ্যা অর্জুন এখন পায়নি। এই মুহূর্তে সেটাই মনে হল। লোকগুলোকে ধরার ব্যাপারে আর কৌতূহলই যেন নেই তাঁর। এস. পি. সাহেবরা কাজে লেগে গেলেন। অর্জুন আর ভানু ব্যানার্জি অমল সোমকে অনুসরণ করল।

সেই বিশাল খাদ, যেটা গতরাতে অর্জুন দেখে গিয়েছিল, তার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। কিছু সেপাই জনাদশ-বারো লোককে একটা জায়গায় দড়ি দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনটে মৃতদেহ চোখে পড়ল। অর্জুনের মনে হল এদের দু'জনকে গতরাতে সে দেখেছে। খাদটা, যেটা খোঁড়া হয়েছে, সেটা মন্দিরের কাছেই। অমল সোম সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "অর্জুন, এতবড় একটা কর্মকাণ্ড এখানে দিনের পর দিন চলেছে, আর কর্তারা কেউ খবর পেলেন না, এদেশেই এটা সম্ভব। কিন্তু লোকটির বুদ্ধি আছে।"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গার খোঁজ এরা পেল কী করে ?"

"পেয়েছে তো দেখতে পাচ্ছি। হরিপদ সেন যেটা জানতেন না এরা তা

জানত। কিন্তু মন্দির থেকে এতদূরে কেন ? সুড়ঙ্গের কথা ওরা জানত। মন্দিরের গায়েই সুড়ঙ্গ। কালাপাহাড় নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গের ভেতরেই সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তা হলে এখানে খাদ খোঁড়া কেন ?" অমল সোম যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

অর্জুন বলল, "এখানে কোনও বিল নেই অমলদা।"

"সেটাও রহস্য। কিন্তু ওরা জায়গা নির্বাচন করতে ভুল করেছে এটা কিন্তু মানতে পারছি না।"

অমল সোম খাদের মধ্যে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে এসে বললেন, "ধারণাটা ঠিক। এখানে একসময় জল ছিল। মাটির এত নীচে গুগলি আর শামুক চাপা পড়ে সচরাচর থাকে না। তোমার কি ধারণা ওরা গুপ্তধন পেয়ে গেছে ?"

অর্জুন বলল, "ওরা আজই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাবার কথা ভেবেছিল। আগামিকাল কাউকেই পাওয়া যেত না। তার মানে ওরা কাজ শেষ করেছিল।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "কাজ শেষ হয়ে গেলে এখানে পড়ে থাকার লোক এরা নয়। খোদ কর্তা ওগুলো নিয়ে আগে হাওয়া হয়ে যেতেন। চলো, মন্দিরের ভেতরে যাই।" অমল সোম এগোতে লাগলেন। দূরে জঙ্গলের মাথায় ধোঁযা দেখা গেল। ওরা মন্দিরের ভেতর ঢুকে সেপাইদের দেখতে পেল। পাহারা দিচ্ছে।

অমল সোম মন্দিরের ইট পরীক্ষা করে বললেন, "কালাপাহাড় নবদ্বীপের মন্দির স্পর্শ করেননি। এটির প্রতি অনুগ্রহ হল কেন তাঁর ? কোচবিহারের রাজাকে হারিয়ে এখানে এসে—, উঁহু, কেমন যেন হিসাব মিলছে না। তিনি কি নন্দলাল সেনের অনুরোধ রেখেছিলেন ? অবশ্য হতে পারে। মন্দির গুঁড়িয়ে দিলে সম্পদ লুকিয়ে রাখার জায়গাটা পরে চেনা যাবে না, তাই—।"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "যে-লোক অমন ছিল সে কেন মন্দিরের গায়ে সম্পদ লুকোতে যাবে ?"

অমল সোম বললেন, "মানুষটি বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি জানতেন কেউ ভাবতেও পারবে না অত সম্পদ মন্দিরের গায়ে কালাপাহাড় রেখে যেতে পারে। এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে কিছু যদি থেকে থাকে তা হলে ওই সুড়ঙ্গেই আছে।"

অমল সোম কথা শেষ করা মাত্র কাঠের প্ল্যাটফর্মে শব্দ হল। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্মটা ধীরে-ধীরে ঘুরছে। গর্তটা চোখে পড়ল। তারপর একটা হাত, মাথা সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেপাইরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনে-হিঁচড়ে তাকে বাইরে বের করে আনা মাত্র নীচে থেকে গলা ভেসে এল, "কী হল শরৎ ? এনি প্রব্লেম ?"

শরৎ নামের লোকটাকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছিল। নীচে থেকে কাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। লোকটা আর থাকতে পারছিল না। অর্জুন এখানে দাঁড়িয়েই ধোঁয়ার গন্ধ পেল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই আরও একজন বন্দি হল। ওদের মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। ভানু ব্যানার্জি এবং সেপাইরা তৃতীয়জনের অপেক্ষায় রইলেন।

বন্দী দু'জনের দিকে তাকিয়ে মনে হল এরা বেশ দুধে-ভাতে ছিলেন। হাত বেঁধে মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওঁদের। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মধ্যে কার উপাধি সেন ?"

লোক দুটো নিজেদের দিকে তাকাল। অর্জুন দেখল যে-লোকটিকে সে আঘাত করেছিল সে এদেরই একজন। অমল সোম ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "জবাব দিন।"

"আমরা কেউ সেন নই।" একজন উত্তর দিল।

"সেন কোথায় ?"

"নীচে।"

"আপনারা ওঁর পার্টনার ?"

"হ্যাঁ।"

"সম্পত্তি পেয়েছেন ?"

"না।"

"সে কী ! এত খোঁড়াখুঁড়ি, খুনোখুনি— ।"

লোক দুটো চুপ করে রইল। অমল সোম বললেন, "চুপ করে থেকে কোনও লাভ হবে না। আপনারা একের-পর-এক খুন করেছেন এখানে। জায়গাটা আদিম করে তুলো. .লন। এস.পি. সাহেব ঠিক সেই কাজটা করতে পারেন। কালাপাহাড়ের সম্পত্তি কোথায় ?"

একজন বলল, "নিরাপদ জায়গাটা ঠিক বেছেছিল, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।"

"নিরাপদ কে ? যিনি মাটির নীচে আছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারা শিলিগুড়িতে যাওয়ার সময় আমাদের লিফট দিয়েছিলেন মনে পড়ছে ? গুড। হরিপদ সেনকে খুন করে কে ?"

"আমি জানি না।"

"বাজে কথা, বিশ্বাস করি না।"

"আমরা যাওয়ার আগে খুন হয়েছিল হরিপদ সেন।"

"নিরাপদ সেন কোথায় ছিল তখন ?"

"শিলিগুড়িতে।"

"সে আপনাদের কিছু বলেনি ?"

"না। তবে হরিপদ খুব বাগড়া দিচ্ছিল, অথচ ওর কোনও রাইট নেই কালাপাহাড়ের সম্পত্তির ওপর। সেটা আছে নিরাপদর।"

"কেন ? হরিপদর দাদু তাঁকে অধিকার দিয়েছেন।"

"মিথ্যে কথা। হরিপদর যিনি দাদু তিনি নিরাপদরও দাদু। তিনি আমাদের এই জায়গার কথা বলেন, হরিপদকে বলেননি।"

"আপনারা বলছেন এই জায়গার কথা তিনি জানতেন ?"

"হ্যাঁ। কারণ তিনি নিজে এসে কয়েকবার খুঁজে গিয়েছেন, পাননি। ওঁর বাবাও এসেছিলেন। নন্দলাল সেনের প্রতিটি বংশধর এসে ফিরে গিয়েছে বিফল হয়ে। এবার আমরা তাই তৈরি হয়ে এসেছিলাম।"

"আপনারা কিছু পাননি ?"

"না। কারণ কিছুই ছিল না এখানে।"

"মানে ?"

"গতরাতে আমরা আবিষ্কার করি সম্পদ এখানে নেই! দশটা লোহার বাক্স পাওয়া গিয়েছে ওই খাদে। ভাঙাচোরা, মাটিতে পোঁতা ছিল কয়েকশো বছর ধরে। নিরাপদর ঠাকুরদা লোহার বাক্সের কথা বলেছিলেন।"

"কে নিয়েছে সম্পদগুলো ?"

"নিরাপদ বলছে স্বয়ং কালাপাহাড় নিয়ে গেছে। পুরীতে নন্দলাল সেন উধাও হয়ে যাওয়ার পর লোকটা বোধহয় সন্দেহ করেছিল।"

"এর কোনও প্রমাণ আছে ?"

"না, নেই। তবে লোহার বাক্সগুলো দেখলে বোঝা যায় ওগুলো কয়েকশো বছর মাটির নীচে পোঁতা ছিল।"

"ওই জায়গাটা আপনারা খুঁড়লেন কী করে ?"

"কাগজে লেখা ছিল, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিবমন্দির, মন্দির থেকে কুড়ি হাত দূরে বিলের ভেতরে ডুবতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে আমরা কোথায় বিল ছিল জেনেছি।"

অমল সোম অর্জুনের দিকে তাকালেন। হরিপদ সেন যে-কাগজ দিয়েছিলেন তাতে শেষ লাইনটা ছিল না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "হৈমন্তীপুর বাগানে এমন ত্রাস কেন সৃষ্টি করলেন। এত খুন কেন করতে হল ?"

"ওটা নিরাপদর প্ল্যান। ও বাগানটাকে কিনতে চেয়েছিল কাজের সুবিধা হবে বলে। মিসেস দত্ত বিক্রি করতে চাননি। বাগান চালু থাকলে এত নিঃশব্দে কাজ করা যেত না। কিন্তু কোনও লাভ হল না।" লোকটা নিশ্বাস ফেলল।

"আপনার নাম কী ?"

"শরৎচন্দ্র রায়।"

"আপনার ?"

"গৌরাঙ্গ দাস।"

"নিবাস?"

"পুরী।"

ঠিক এই সময় মন্দিরের ভেতরের সেপাইরা চিৎকার করে উঠল। অর্জুন ছুটল। আর তারপরেই গুলির শব্দ। মন্দিরে ঢুকে অর্জুন দেখল, প্ল্যাটফর্মটা খাড়া হয়ে আছে আর সেখান থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সেপাইরা নাক চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল একজন নীচ থেকে ওপরে আসতে চাইছিল। কিন্তু চিৎকার করতেই সে আবার নীচে নেমে গিয়েছে এবং তারপরেই গুলির শব্দটা ভেসে আসে।

ঘণ্টাখানেক বাদে ধোঁয়া বন্ধ হলে সেপাইরা নিরাপদ সেনের মৃতদেহ নীচে থেকে তুলে নিয়ে এল। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারা। নিজের মাথায় নিজেই গুলি করেছেন তিনি।

অমল সোম অপেক্ষা করতে চাইলেন। নদী পার হয়ে গেলে বেশি হাঁটতে হবে বলে আবার জঙ্গল-পথ ধরতে চাইলেন না। কিন্তু ভানু ব্যানার্জি কষ্টটা করতে দিলেন না। তিনি এর মধ্যে নিরাপদের জিপ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। জঙ্গলের আড়ালে সেটা লুকানো ছিল। ডি.এফ. ও. এবং এস.পি. সাহেব বন্দি এবং মৃতদের ব্যবস্থা করতে থেকে গেলেন পেছনে।

সুভাষিণী চা-বাগানে যাওয়ার পথে জিপটা চালাচ্ছিলেন ভানু ব্যানার্জি। অমল সোম চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। হঠাৎ ভানু ব্যানার্জি বলে উঠলেন, "এত করে কী লাভ হলো?"

চোখ বন্ধ অবস্থায় অমল সোম বললেন, "যারা করে তারা এটা বুঝতে চায় না। এটাই ঘটনা। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী?"

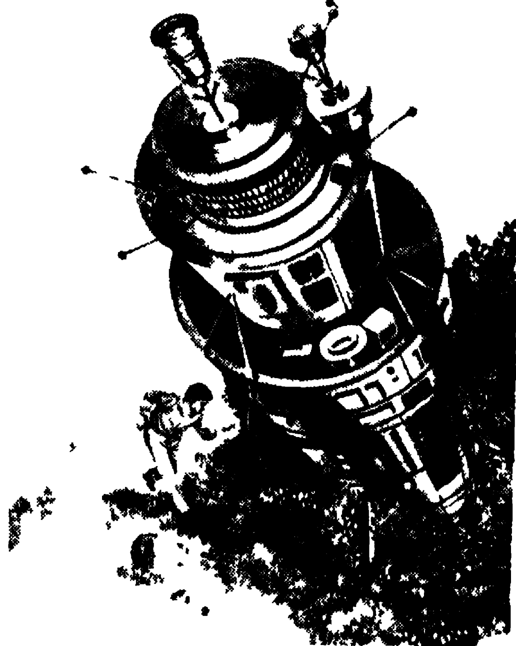
"হরিপদ সেন আমাকেও বিশ্বাস করেননি। উনি চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছিলেন। আসল বাটপাড়ি কে করেছে বুঝতে পারছ?"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "নিরাপদ সেন?"

"না। কালাপাহাড়। লোকটা কাউকেই বিশ্বাস করত না। এই বেচারারা কয়েকশো বছর ধরে সেটাই বুঝতে পারেনি।" অমল সোম আবার চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ। অর্জুন দেখল নীলগিরির জঙ্গল ক্রমশ পেছনে চলে যাচ্ছে।

অর্জুন বেড়িয়ে এল

সমরেশ মজুমদার



অর্জুন বেড়িয়ে এলো

অর্জুন বেড়িয়ে এলো

গত চারদিনে তুমুল বৃষ্টি পড়েছে। ঠিক বলা হল না, বৃষ্টিটা তুমুল হচ্ছে রাত্রে, দিনের বেলা টিপটিপিয়ে। আকাশের মুখ হাঁড়িচাচা পাখির চেয়েও কালো। ইতিমধ্যে করলা নদীর পাশেব রাস্তাটা ডুবে গিয়েছে। সারা শহর ভিজে।

এই চারদিন বাড়ি থেকে বের হয়নি অর্জুন। স্নান এবং খাওয়া ছাড়া বিছানা থেকে নামেনি। এখন তার বালিশের পাশে পৃথিবীর সব বিখ্যাত গোয়েন্দা গল্পের বই। অবশ্য ইংরেজিতে। সেই সঙ্গে একটা 'রিডার ডাইজেস্ট' পত্রিকা থেকে বের করা সঙ্কলন। পৃথিবীর রহস্যময় ঘটনাবলী। এই বইটাই সে পড়ছিল সকালবেলায়, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে। গোয়েন্দা গল্পের চেয়ে এই বাস্তব রহস্যকাহিনী অনেক বেশি চনমনে।

এই সময় কেউ একজন কড়া নাড়ল। অর্জুন জানে, মা দরজা খুলবেন। একনাগাড়ে চারদিন ছেলেকে বাড়িতে পেয়ে মা খুব খুশি। একটু বাদেই তিনি ঘরে এলেন, "তোর চিঠি।"

হাত বাড়াল অর্জুন। সাদা খাম। মুখ আঁটা। জিজ্ঞেস করল, "কে দিল ?"

"একটা ছেলে এসে দিয়ে গেল।" মা বললেন, "আজ খিচুড়ি খাবি ?"

"দারুণ। বৃষ্টিটা যা জমেছে না !"

"কাল কিন্তু বৃষ্টি মাথায় করেও বাজারে যেতে হবে।" মা চলে গেলেন।

খাম খুলল অর্জুন। জগুদার চিঠি। "স্নেহের অর্জুন, আশা করি ভাল আছ। গতরাত্রে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিলাম। আজ ভোরে যখন বেরোচ্ছি তখনও বৃষ্টি। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে না পেরে চিঠি লিখে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। তুমি আজ বেলা একটা নাগাদ শিলিগুড়িতে আমার অফিসে আসতে পারবে ? শিলিগুড়ির সেবক রোডে আমাদের ব্যাঙ্ক। শুভেচ্ছা রইল। তোমাদের জগুদা।"

অর্জুন চিঠিটা দু'বার পড়ল। জগুদার মতো মানুষ অকারণে তাকে শিলিগুড়িতে ডেকে নিয়ে যাবেন না। মিনিবাসেই প্রায় পঞ্চাশ মিনিট লাগে।

তার ওপর এই বৃষ্টি। ব্যাপারটা কী ? সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি জল ঝরছে। একটুও ইচ্ছে করছে না বাইরে যেতে। চিঠি খামে পুরে পাশে রেখে সে রহস্যকাহিনীতে মন দেওয়ার চেষ্টা করল। নাঃ, বারেবারে চিঠিটার কথা মনে আসছে। জগুদা খুব সিরিয়াস মানুষ। তাকে বেশ পছন্দ করেন। সে বিছানা থেকে জোরে হাঁক দিল, "মা, তাড়াতাড়ি খিচুড়ি করো, আমি বেরোব।"

"ওমা, এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবি ?" মায়ের গলা ভেসে এল।

"শিলিগুড়িতে। জগুদা ডেকে পাঠিয়েছেন।"

মায়ের কথাটা নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি। তাই তাঁর গলার স্বর পালটাল। "কখন ফিরবি ?"

"সন্ধের মধ্যেই।" অর্জুন জবাব দিল।

এখন ছাতা হাতে চলা মুশকিল। যা উলটোপালটা হাওয়া বৃষ্টির সঙ্গে বইছে তাতে ছাতা সোজা রাখা যায় না। অর্জুন বর্ষাতি চাপিয়েছিল। মাথায় বারান্দা-দেওয়া টুপি। পায়ে ছোট গামবুট। এই পোশাক পরে দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাস্তায় চললেই নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দাকাহিনীর কথা মনে আসে। বিদেশি দু-তিনটে বইতেও এমন চরিত্র সে পড়েছে। গত বছর এখানে অর্জুনের প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন। আলাপ করতে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, আপনার সন্তু-কাকাবাবুকে ঠিক রহস্যময় গোয়েন্দা মনে হয় না কেন ?" ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন "কীরকম ?"

"এই যেমন ধরুন, একটা বর্ণনা, রাত তখন দুটো, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় কেউ নেই। গ্যাসপোস্টের আলোও ঝাপসা। এই সময় লোকটিকে হেঁটে যেতে দেখা গেল। পরনে ওভারকোট, মাথায় ফেল্টহ্যাট, দু' হাত পকেটে ঢুকিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটায় তার চিবুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। পড়লেই কেমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়, তাই না ?" অর্জুন বোঝাতে চেষ্টা করছিল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "ওই লোকগুলোকে আজকাল রাস্তাঘাটে তেমন দেখা যায় না। এই যেমন ধরো তুমি, এত নাম করেছ, তোমাকে দেখে মনে হয় কফি-হাউসে আড্ডা মারতে পারো, খেলার মাঠেও চিৎকার করতে পারো। এটাই তো ভাল।"

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুনের মনে হল তার প্রিয় লেখক এখন তাকে দেখলে কী বলতেন ? সে হেসে ফেলল। কদমতলা পৌঁছে সে আবিষ্কার করল বাস নেই রিকশাও বের হয়নি শহরে। পথেঘাটে মানুষ দেখাই যাচ্ছে না। রূপমায়া সিনেমার পাশে একটা মিষ্টির দোকানের শেড-এর তলায় দাঁড়াতেই শুনল ভেতরে বসা কয়েকজন বলছে ডুয়ার্সের নদীর জল বেশ বেড়ে গিয়েছে। এমনকী কার্নিশের ওপরের দিকে জল ঢুকে পড়েছে। এসব শুনে

সে বুঝতে পারছিল না কী করবে। এই সময় একটা মিনিবাস এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াল। কন্ডাক্টর চিৎকার করছে, "শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি।" অর্জুন মিনিবাসে উঠে দেখল দু'জন যাত্রী বসে আছেন পুরো গাড়িতে। টুপি আর কোট খুলে সে সিটে বসল। জলে জলময় হয়ে যাচ্ছে বাসের ভেতরটা।

জলপাইগুড়ির মোড় ছাড়িয়ে বাসটা যখন শিলিগুড়ির পথে, তখনও অর্ধেক সিট খালি। বৃষ্টির জন্যই খুব দ্রুত যেতে পারছে না গাড়িটা। যাওয়ার পথে যে-ক'টা ছোট নদী পড়ল সেগুলো টইটুম্বর। শিলিগুড়ির থানার সামনে বাস থেমে গেলে নেমে পড়তে হল। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে সকাল থেকেই বৃষ্টি নেই। কিন্তু আকাশের অবস্থা যা, তাতে যে-কোনও মুহূর্তেই প্রলয় হয়ে যেতে পারে। অর্জুন একটা রিকশা নিল। টাউন স্টেশনের পাশ দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও।

ঠিক একটা বাজতে দশে সে জগুদার ব্যাঙ্কে পৌঁছাল। জগুদার ভাল নাম অশোক গাঙ্গুলি। জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল ঘরটা। ঘরে ঢুকতেই জগুদা হাসলেন, "যাক, এসেছ তা হলে। বোসো, বোসো। চা খাবে?"

"খেতে পারি।" অর্জুন তার ওভারকোট আর টুপিটা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে দিল। বেশ শুকিয়ে এসেছে এরমধ্যে। জগুদা চায়ের হুকুম দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। শিলিগুড়িতে দেখছি বৃষ্টি নেই।"

"ফোরকাস্ট বলছে বিকেলে ভাসাবে। খেয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না কেন জগুদা তাকে ডেকেছেন। এতক্ষণ যেসব কথা হল তাতে জরুরি কোনও প্রয়োজন আছে। সে নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না বলে ঠিক করল। ব্যাঙ্কে জগুদার ওপরে কাজের চাপ আছে। একের পর এক লোক আসছে খাতাপত্র নিয়ে। তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে সমস্যাগুলো। জগুদা তার মধ্যে বললেন, "আর মিনিট পাঁচেক।"

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই জগুদা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন, "আসুন, আসুন। কেমন আছেন?"

"আর থাকা। এখনও বেঁচে আছি। বিদেশের হাজারো লোভ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এলাম মন দিয়ে কাজকর্ম করব বলে, তা আর হচ্ছে কই? বসছি!" ভদ্রলোক অর্জুনের পাশের চেয়ারটা নিজেই টেনে নিলেন।

"নিশ্চয়ই।"

তিনজনে বসামাত্র তিনকাপ চা এল। ভদ্রলোক বললেন, "আমি তো চা খাই না। আপনারা খান। আমার চেকগুলোর কোনও খবর আছে?"

"আমি খুব দুঃখিত ডক্টর গুপ্ত। একটু আগেও আমি খোঁজ নিয়েছি। আসলে বিদেশি ব্যাঙ্কের চেক বলেই দেরি হচ্ছে। আমি হেড অফিসে ফোন করেছিলাম। ওরাও চেষ্টা করছে।" জগুদা বললেন।

"ঠিক আছে। আমার যা আছে তাতে দিন পনেরো চলে যাবে।"

এই সময় একজন খাতা নিয়ে জগুদার কাছে আসতেই তিনি 'এক মিনিট' বলে তাতে ঝুঁকে পড়লেন। অর্জুন ডাক্তার গুপ্তকে দেখছিল। আশিভাগ চুলই সাদা, ছোট্ট পাকা আমের মতো শরীর। চোখে পুরু চশমা। ডাক্তার হিসাবে নিশ্চয়ই ইনি খুব ভাল, নইলে জগুদা এত খাতির করতেন না।

কাজ শেষ করে জগুদা মুখ ফেরালেন, "ডক্টর গুপ্ত, আপনি কী স্থির করলেন ? পুলিশের কাছে যাবেন না ?"

"কোনও লাভ হবে না মিস্টার গাঙ্গুলি। পুলিশকে বললে তারা আমার বাড়ির সামনে পাহারা বসাতে পারে। কিন্তু ক'দিন ? তা ছাড়া হাজারটা কৈফিয়ত। এসব আমার ভাল লাগে না। খবরের কাগজ জানতে পারবেই। আপনাকে আমি বলেছি যে, প্রচার চাই না। আর ক'টা দিন যদি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারি তা হলে আমি নিজেই প্রেসকে বলব।" ডক্টর গুপ্তের ডান হাত বারংবার নিজের মাথার চুলে চলে যাচ্ছিল। বোধ হয় কথা বলার সময় চুলে হাত বোলানো তাঁর বদ-অভ্যাস।

এবার জগুদা বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে ওকে জলপাইগুড়ি থেকে আসতে বলেছিলাম। খুব খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও চলে এসেছে।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, "আচ্ছা! এরই কথা সেদিন বলেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। দেখতে অল্পবয়সী হলে কি হবে এর মধ্যে দারুণ-দারুণ সমস্যার সমাধান করে বসে আছে। এমনকী ইংল্যান্ড আমেরিকায় গিয়েও অপরাধী ধরেছে।"

"তাই নাকি ? বাঃ। দেখে তো মনেই হয় না। কী নাম ভাই ?"

"অর্জুন।"

কি একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বাঃ। চমৎকার নাম। কিন্তু মহাভারতটা কি ভাল করে পড়া আছে ? অর্জুন চরিত্রটা কি জানা ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, সে জানে।

"বেশ। এবার আমায় একটা সমস্যার সমাধান করে দাও তো। মহাভারতের অর্জুন একসময় স্বর্গে গিয়েছিলেন। যেখানে উর্বশীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বেশ কিছুদিন ছিলেনও সেখানে। তারপর ফিরে এসেছিলেন। তা স্বর্গ মানে আউটার স্পেস। পৃথিবীর বাইরে। সেখানে কারও বয়স বাড়ে না। এমনকী উর্বশীরও বাড়েনি। অতএব অর্জুন যখন সেখানে কিছুদিন ছিলেন তাঁরও তো বয়স বাড়ার কথা নয়। তা তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর দাদা, ভাই, স্ত্রীর বয়স পৃথিবীতে থাকার দরুন বেশ বেড়ে গিয়েছে। অর্জুন

তো বয়সে সবার ছোট হয়ে গেলেন, তাই না ?"

অর্জুনের বেশ মজা লাগল। মহাভারতে এই ঘটনার কথা সে পড়েছে। কিন্তু এটা যে সমস্যা হতে পারে তা সে ভাবেনি কখনও। কাউকে বলতেও শোনেনি। ডক্টর গুপ্ত তার উত্তরের অপেক্ষা করে আছেন দেখে সে বলল, "পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করবে অঙ্কের ওপর।"

"অঙ্ক ? ইন্টারেস্টিং ! কীরকম ?"

"প্রথমত, অর্জুন কতদিন স্বর্গে ছিলেন ? স্বর্গের একদিন মানে পৃথিবীর কতদিন ? এখানে সূর্যের উদয়-অস্তের সঙ্গে দিনের পরিমাপ করা হয়। স্বর্গে নিশ্চয়ই তা হয় না। তা হলে স্বর্গের দিন মাপার পদ্ধতিটা কী ? সেটা বের করে স্বর্গের একটা দিনের সমান পৃথিবীর কতদিন হয় বের করে যে-ক'দিন অর্জুন সেখানে ছিলেন সেই ক'টা দিন দিয়ে গুণ করলেই পৃথিবীর সময়টা বেরিয়ে আসবে। যদি তিন-চার মাস হয় তা হলে ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে থাকবে না।" অর্জুনের বেশ মজা লাগছিল বলতে।

"চমৎকার। কিন্তু স্বর্গের সময়টা কীভাবে মাপবে ?"

"সেটা মহাভারতে নেই। পৃথিবী থেকে স্বর্গে হেঁটে যেতে কত সময় লাগে মহাপ্রস্থানের সময় হিসাব করে জানা যেতে পারে।"

"তাতে কী লাভ ? পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী যদি রথে চেপে যেতেন তা হলে নন-স্টপ পৌঁছে যেতেন। হুম। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছে। তুমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ?"

"হ্যাঁ। তাই বলতে পারেন।"

এবার ডক্টর গুপ্ত জগুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি একে কিছু বলেছেন ?"

"না। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তা ছাড়া আপনিও আমাকে সব খুলে বলেননি।" জগুদা হাসলেন, "অর্জুন, ডক্টর গুপ্ত অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। প্রায়ই বিদেশের সায়েন্স জার্নালে ওঁর লেখা বের হয়। আমার সঙ্গে আলাপ সেই বাবদ পাওয়া চেক ভাঙানোর সুবাদে। অবশ্য উনি এখন আমাকে বেশ স্নেহ করে ফেলেছেন। উনি একটা সমস্যায় পড়ায় আমার মনে হয় তোমাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শুনলেই তো উনি পুলিশের কাছে যাবেন না।" জগুদা বিস্তারিত বললেন।

"সমস্যাটা কী ?" অর্জুন জানতে চাইল।

"সেটা বুঝতে গেলে তোমাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে।"

"মুখে বলা যায় না ?"

"বললেও স্পষ্ট হবে না। অন্তত সত্তরভাগ সমস্যা মানুষ অভিজ্ঞতা ছাড়া হৃদয়ঙ্গম করে না। তিরিশভাগ শুনে বা পড়ে অনুভব করা যায়।" ডক্টর গুপ্ত

হাসলেন, "আমার আস্তানা এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। সঙ্গে একটা পুরনো অস্টিন গাড়ি আছে। পাহাড়ি পথ, তাই যেতে মিনিট চল্লিশেক লাগবে।" কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর গুপ্ত, "চলি মিস্টার গাঙ্গুলি।"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল, "কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গে গেলে কি আজ জলপাইগুড়িতে ফিরতে পারব ?" এমনিতেই বাস খুব কম।"

জগুদা বললেন, "যদি না পারো তা হলে আমি মাসিমাকে নিজে গিয়ে বলে আসব কোনও চিন্তা না করতে। তুমি কিছু ভেবো না।"

অগত্যা অর্জুন ডক্টর গুপ্তকে অনুসরণ করল। মানুষটিকে তার ইতিমধ্যে বেশ পছন্দ হয়েছে। মনের ভেতরে একটা খুঁতখুতানি ছিল মায়ের জন্য। তবে এখন তো সবে পৌনে দুটো। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে ফেরার বাস সন্ধে সাতটাতেও পাওয়া যায়। শুধু এখানে বৃষ্টিটা না নামলে হয়।

ডব্লু বি এ নাম্বার দেওয়া একটা কালো গাড়ি ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে। এ-ধরনের প্রাচীন গাড়ি আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এ-গাড়ি খুব বিশ্বস্ত। আমাকে কখনও বিপদে ফেলে না। চলার সময় একটু প্রতিবাদ করে, এই যা।"

গাড়িতে উঠে অর্জুন দেখল বাইরে থেকে যতটা মনে হচ্ছিল ভেতরটা কিন্তু ততটা পুরনো নয়। অথচ এই গাড়ির বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ হয়ে গিয়েছে। ডক্টর গুপ্ত ইঞ্জিন চালু করে চলতে আরম্ভ করতেই রাস্তার লোকজন তাকাতে আরম্ভ করল। এত নামী একজন বৈজ্ঞানিক এমন গাড়ি ব্যবহার করেন কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও অশোভন হবে বলে সে চুপ করে গেল।

গাড়ি এখন সেবক ব্রিজের দিকে এগোচ্ছে। শিলিগুড়ি পার হওয়ার পর দু'দিকে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢোকার সময় অর্জুনের মনে হল যে-কোনও মুহূর্তে আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে যাবে। এত কালো আকাশ এমন নীচে সে কখনও দেখেনি। এই রাস্তায় অর্জুন বেশ কয়েকবার গিয়েছে এর আগে। ডান দিকে বাগরাকোটে আর ওদিকে তিস্তাবাজারের কাছে বেশ কিছু বসতি আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

ডক্টর গুপ্ত বললেন, "কালীঝোরা বাংলোটা পেরিয়ে খানিক ওপরে। এক ইংরেজ ভদ্রলোকের বাংলো ছিল ওটা। আমি নিজের মতো করে নিয়েছি।"

"জগুদা মানে মিস্টার গাঙ্গুলি আপনার সমস্যার কথা বলছিলেন !"

"হ্যাঁ ভাই। বছরখানেক আছি আমি এখানে। গত বছর আমার এক বন্ধু আমেরিকা থেকে এসেছিল নেহাত গায়ে পড়েই। এখানে আসার পর কাউকে আমি আসতে বলিনি। লোকটার নাম রবার্ট সিনক্লেয়ার। একটা সায়েন্স জার্নালের সম্পাদক। লেখা পাঠাই, ছাপলে চেক পাঠায়, তাই ঠিকানা ওর জানা ছিল। তা বলা-কওয়া নেই চলে এল দুম করে। আমি কী নিয়ে গবেষণা করছি তা জানার জন্য খুব কৌতূহল ওর। তিনদিন ছিল, আমি জানাতে চাইনি।

কারণ জানতে পারলেই গবেষণা শেষ হওয়ার আগেই ও ওর জার্নালে ছেপে দেবে। কিন্তু মুশকিল করল তাতান।"

"তাতান কে?" অর্জুন জানতে চাইল।

"আমার কুকুর। ওকে দেখে বব, মানে রবার্টের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।"

"কেন? অদ্ভুত ধরনের কুকুর বুঝি?"

"একটু অদ্ভুত। লম্বায় দুই ইঞ্চি, প্রস্থে ইঞ্চিতিনেক।"

অর্জুনের মনে হল সে নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। ওটা ইঞ্চি না হয়ে ফুট হবে।

ডক্টর গুপ্ত হাসলেন, "কী, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ববেরও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু যখন বুঝল ওটা ইঁদুর নয়, সত্যিকারের কুকুর, তখন নিয়ে যাওয়ার জন্য কী ঝুলোঝুলি। দশ হাজার ডলার দাম দিয়েছিল সে তাতানের। তার মানে আমাদের দেশের দু' লক্ষ টাকা। আমি দিইনি। এমনকী তাতানের ফোটো তুলতেও অনুমতি দিইনি। ব্যাটা করল কী, দেশে ফিরে গিয়ে এ-সবই তার জার্নালে ছেপে দিল। আর তারপর থেকেই সমস্যা শুরু হয়ে গেল।"

"কীরকম?" অর্জুনের মনে হচ্ছিল সে আষাঢ়ে গল্প শুনছে।

"লোক আসতে লাগল একের পর এক। সবাই তাতানকে দেখতে চায়, কিনতে চায়। প্রথম দিকে বুঝিনি, দেখিয়েছি। দু'-দু'বার চুরির চেষ্টা হল। শেষপর্যন্ত বাড়ির চারধারে ইলেকট্রিক তার লাগালাম। দুটো লোক শক খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদিকে এখন দাম উঠেছে দশ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল। একাই সামলে নিচ্ছিলাম। তাতানকে আর বাইরে বের করি না। কিন্তু এখন ঘটনা ঘটছে আরও খারাপ।"

"কী ঘটনা?"

"সেটা মুখে বললে তুমি বুঝবে না। চলো, গিয়ে দেখবে।"

সেবক ব্রিজের গা ঘেঁষে গাড়ি উঠছিল ধীরে-ধীরে। জায়গাটা এর মধ্যেই অন্ধকার-অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। নীচ থেকে তিস্তার আওয়াজ উঠে আসছে। নিশ্চয়ই জল আরও বেড়েছে। কালীঝোরা বাংলো দেখা গেল। অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত প্রশান্তমুখে গাড়ি চালাচ্ছেন। ভদ্রলোকের কুকুরের নাম তাতান। তার উচ্চতা দুই ইঞ্চি। ভাবা যায়? হঠাৎ ডক্টর গুপ্ত বললেন, "ওই যে শ্রীমানরা এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মহা মুশকিল।"

নির্জন পাহাড়ি রাস্তার একধারে একটা মারুতি জিপসি দাঁড়িয়ে। তার সামনে একজন সাহেব আর দু'জন ভারতীয় হাত তুলে তাদের থামতে বলছে। ডক্টর গুপ্ত বাঁ হাত বাড়িয়ে ড্রয়ার থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার বের করে ডান হাতে নিয়ে মারুতি গাড়ির টায়ার লক্ষ করে ট্রিগার টিপলেন চলন্ত অবস্থায়। লোকগুলো হকচকিয়ে গেল। তার মধ্যেই তিনি পেরিয়ে এলেন জায়গাটা। রিভলভার রেখে দিয়ে বললেন, "এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

থামলে ওরা ঝামেলা করত না থামলে ওভারটেক করে এসে গাড়ি আটকাত। ওরা চাকা বদলাতে-বদলাতে আমি বাংলোয় ঢুকে যেতে পারব।"

"এরা কী চাইছে?"

"আমাকে ব্যবহার করতে।" ডক্টর গুপ্ত চুপ করে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত পিচের রাস্তা ছেড়ে গাড়ি বাঁ দিকের কাঁচা পথ ধরল। একটু চড়াই উঠতে গাড়িটা বেদম হয়ে যাচ্ছিল। তবু তাকে তুলে নিয়ে আসতে পারলেন ডক্টর গুপ্ত। লম্বা-লম্বা গাছের পর বাংলোটা দেখা গেল। এককালে সাদা রং ছিল এখনও বোঝা যায়। বাংলোর চারপাশে খালি জমি, তারপর লোহার বিম দিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছে। পনেরো ফুট উচ্চতার বেড়ার ওপরে অন্তত ফুটচারেক তারের সারি চলে গেছে। অর্জুন বুঝল ওখান দিয়েই বিদ্যুৎ যাচ্ছে। মাঝখানে একটা গেট আছে। ভেতরে থেকে জেনারেটারের আওয়াজ ভেসে আসছে, যদিও এই বাংলোয় সরকারি বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। ডক্টর গুপ্ত পকেট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোলার বের করে কয়েকটা নম্বর টিপতেই গেট খুলে গেল। অর্জুন বুঝতে পারল গেট খোলার জন্য সাঙ্কেতিক নম্বর আছে যা জানা না থাকলে ওটা খুলবে না। ভেতরে ঢুকে আবার নম্বর টিপেই গেট বন্ধ করলেন তিনি। গাড়িটাকে সোজা নিয়ে এলেন বাংলোর গাড়ি বারান্দার নীচে। রিভলভাবটা পকেটে ফেলে বললেন, "এই আমার আস্তানা। দাঁড়াও দরজা খুলি।"

দরজায় কোনও তালা নেই। কিন্তু রিমোট টিপে ধরতেই সেটা খুলে গেল। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "পেছনের সিটে সারা সপ্তাহের বাজার আছে, তুমি যদি একটু হাত লাগাও তা হলে তাড়াতাড়ি হয়।"

বড়-বড় প্যাকেট ভর্তি সবজি, মাংস ইত্যাদি জিনিস। অর্জুন সাহায্য করল। আর এই সময় হাওয়া ছাড়তেই শীত-শীত করে উঠল অর্জুনের। টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। গাড়ি বন্ধ করে মালপত্র নিয়ে ডক্টর গুপ্ত ভেতরে ঢুকে বললেন, "নীচতলাটা বসা আব থাকার ঘর। কিচেন টয়লেটও এখানে। ওপরটা আমার কাজের জন্য। ওখানে আমি ছাড়া কারও যাওয়া নিষেধ। নীচটাকে নিজের মতো মনে করো।"

॥ দুই ॥

বসার ঘরটি সুন্দর। বাহুল্য কিছু নেই। দুটো বেডরুম আছে। ডক্টর গুপ্ত মালপত্র কিচেনে রেখে গরম জল চাপিয়ে দিলেন স্টোভে। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ি গাছের ঝুঁটি ধরে নাড়াচ্ছে খ্যাপা বাতাস। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "সরকারি কারেন্ট যখন আছে তখন জেনারেটারটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। অবশ্য ওটি খুব শক্তিশালী। এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা

চলতে পারে।" চোখের আড়ালে চলে গেলেন ভদ্রলোক। তারপরেই শব্দটা থেমে গেল। অর্জুন কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। এরকম অবস্থা যদি বিকেল পর্যন্ত চলে তা হলে আজ ফেরার কথা ভুলে যেতে হবে। এমনিতেই ঘরে আলো জ্বলছে এখন।

সে বাইরের ঘরের সোফায় এসে বসল। ব্যাঙ্কে ডক্টর গুপ্ত টাকার কথা বলছিলেন। কিন্তু এই বাড়ির পেছনে যাঁর এত খরচ হয় তাঁকে কি গরিব বলা যায় ? কখনও নয়। এত খরচ করে নিরাপদে থেকে উনি কী করছেন ? একা থাকতে হাঁফিয়ে ওঠেন না ? এই সময় ডক্টর গুপ্ত একটা জুতোর বাক্স নিয়ে নেমে এলেন ওপর থেকে। বললেন, "এবার কফিটা বানিয়ে ফেলি, তুমি ততক্ষণ তাতানের সঙ্গে ভাব করো।" জুতোর বাক্সটা অর্জুনের সামনের টেবিলে রেখে তিনি চলে গেলেন।

অর্জুন দেখল বাক্সটা একটু অন্যরকমের। গোল-গোল সিকি সাইজের গর্ত আছে ওপরে। একপাশে হুক লাগানো আছে, মানে সেটি দরজা। হুক ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। তারপর অর্জুনের অবাক হওয়া চোখের সামনে এসে দাঁড়াল তাতান। ডক্টর গুপ্ত যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি। তাতানের গায়ের রং খয়েরি। কান ঝোলা। বাইরে বেরিয়ে এসে পেছনের পা মুড়ে বসে সে অর্জুনকে দেখতে লাগল। তার লেজ নড়ছে। পৃথিবীর কোথাও কেউ এত ছোট কুকুরের কথা শুনেছে ? অর্জুন ডাকল, "তাতান ?"

তাতান উঠে দাঁড়াল, তারপর মুখ তুলে ডাকল। খুব মিহি ডাক। অন্যমনস্ক থাকলে এমন ডাক কানেও ঢুকবে না। অর্জুন আঙুল বাড়াতেই চারপায়ে পিছিয়ে যেতে লাগল তাতান। তারপর ঘুরে একদৌড়ে বাক্সের ভেতর।

এই সময় একটা ট্রেতে কফি আর বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর গুপ্ত, "কি, ভাব হল তাতানের সঙ্গে ? কোথায় গেল ?"

ট্রে নামিয়ে কফি দিয়ে তিনি চেয়ার টেনে বসে ডাকলেন, "তা-তান।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে ছুটে এল কুকুরটা। টেবিলের ওপর হাত পেতে দিতেই সে উঠে পড়ল সেখানে। হাত না ভাঁজ করে ডক্টর গুপ্ত তাকে নিয়ে এলেন নিজের মুখের সামনে, "আই অ্যাম সরি তাতান। তোর এই দশা আমার জন্যই হয়েছে। কিন্তু আমি যে এখনও অভিমন্যু। ঢুকতে জানি, বেরতে জানি না।" বিস্কুটের কুচি ভেঙে তাতানকে খাওয়ালেন তিনি।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ও কি অন্য কুকুরদের মতোই খায় ?"

"হ্যাঁ, সব খায় তাতান। খুব ভাল।" তিনি কুকুরটাকে নামিয়ে দিলেন টেবিলের ওপরে। অর্জুনের মনে হল একটা পুতুল-কুকুর হেঁটে বেড়াচ্ছে। এই পুতুলের দাম এখন দশ লক্ষ টাকা উঠেছে ? সে জিজ্ঞেস করল, "তাতানকে আপনি কী করে পেলেন ?"

"তিস্তাবাজারে এক বুড়ো নেপালি কয়েকটা পাহাড়ি কুকুরের বাচ্চা বিক্রি

করছিল। কালিম্পং থেকে ফেরার পথে দেখতে পেয়ে কিনে এনেছিলাম। তখন ওর বয়স হবে মাসদুয়েক। নাম রাখলাম তাতান। বছর দেড়েকের মধ্যে বেশ তাগড়াই হয়ে গেল। পাহাড়ি কুকুর বেশি লম্বা হয় না। তাতান ফুট দেড়েক হয়েছিল। ভারী সুন্দর গায়ের লোম। ওই যে দেওয়ালে ছবি দেখছ, ওই হল তাতান।"

অর্জুন দেওয়ালের ফটোটা দেখল। স্বাভাবিক চেহারার একটা কুকুরের ছবি। অবিকল এই তাতানের মতো দেখতে, কিন্তু বহুগুণ বড়। সে প্রচণ্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "অতবড় কুকুর এত ছোট হল কী করে?"

"আমার ভুলে।"

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

ডক্টর গুপ্ত কফির কাপে চুমুক দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমার সমস্যাটা তো এখানেই। বব ওর জার্নালে ছাপিয়েছে, আমি এমন কিছু আবিষ্কার করেছি যে, বড় জিনিস ছোট করতে পারি। এবার ধরো, একটা জায়গায় বিরাট বস্তি আছে। জমির মালিক কাউকে উচ্ছেদ করতে পারছে না, কিন্তু সেটাই তার বাসনা। লোকটা আমাকে বলল আমি যদি পুরো বস্তিটাকে দুই ইঞ্চি করে দিই তা হলে সে আমাকে অনেক টাকা দেবে। জমির মালিক বেলচায় তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। এক ইঞ্চি সাইজের মানুষগুলো প্রতিবাদও করতে পারবে না। আমি কাউকে বোঝাতে পারছি না এটা আমার গবেষণার বিষয় নয়। তাতানেব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দুর্ঘটনাক্রমে হয়ে গিয়েছে।"

"কী করে হল?"

"সেটাও আমি বুঝতে পারিনি এখনও। তবে অনুমান করতে পারি। তার আগে বল পৃথিবীতে আমাদের বয়স কীভাবে বাড়ে?"

"মিনিট ঘণ্টা দিন সপ্তাহ মাস বছর হিসাব করে।"

"গুড। পৃথিবী যে সময়টায় সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে তা মোটামুটি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে। আমরা বলি এক বছর। কিন্তু আমাদের এক বছর আর চাঁদে বাস করলে যে এক বছর হবে তা এক নয়। একই সময়ে সেখানে বয়স বেশি বাড়ে। অর্থাৎ তুমি যদি চাঁদে গিয়ে থাকো তা হলে দশ বছর পরে তোমার সমান বয়সী কোনও ছেলের সঙ্গে একটুও মিল থাকবে না। তেমনই সাতশো দিনে সূর্যকে যে গ্রহ প্রদক্ষিণ করে, সেখানে বাস করলে পৃথিবীর থেকে কম বয়স বাড়ে। এটা অঙ্ক। আমি আবিষ্কার করতে চলেছি এমন একটি গ্রহের, যেখানে বাস করলে বয়স আদৌ বাড়বে না। সেটা করতে গিয়ে তাতানকে আমি এমন একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যেখানে স্থির হয়ে যাওয়ার পরের স্টেজ, অর্থাৎ বয়স কমতে থাকে।"

অর্জুনের মাথার ভেতরে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "বয়স কমলে আকৃতি ছোট হয়ে যাবে কেন?"

"বয়স বাড়লে একটা সময় পর্যন্ত আকৃতি বাড়ে ?"

"হ্যাঁ, তা বাড়ে।" অর্জুন স্বীকার করল।

"তাতান যতটুকু বেড়েছিল তার থেকে অনেক বেশি বাড়ত স্বাভাবিক অবস্থায়। সেই ততটুকু কমে যেতে ওর এই অবস্থা হয়েছে।" ডক্টর গুপ্ত বললেন।

ঠিক এই সময় ওপরের ঘর থেকে একটা কুঁ-কুঁ শব্দ ভেসে এল। অর্জুন দেখল শব্দটা শোনামাত্র তাতান লাফাতে লাগল। ভয় হচ্ছিল, তাল সামলাতে না পেরে বেচারি টেবিল থেকে হয়তো পড়ে যাবে। ডক্টর গুপ্ত টেবিলের কাছাকাছি মুখ নামিয়ে বললেন, "নো, ঘরে ঢুকে যাও তাতান। অত উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ওই পুঁচকে কুকুর যেন পাগল হয়ে উঠছিল। অনর্গল তার খুদে গলায় ডেকে যাচ্ছিল সে। ডক্টর গুপ্ত এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, "কুকুরটাকে একটু নজরে রেখো, আমি আসছি।"

উনি ওপরে চলে যেতে অর্জুন নিজের কড়ে আঙুলটাকে তাতানের কাছে নিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তাতান ছুটে এল সেটাকে কামড়াতে। আঙুল সরিয়ে নিল অর্জুন চট করে। কুকুর কামড়ালে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নিতে হয়। তা সাধারণ মাপের কুকুর হোক আর এই পুঁচকে কুকুরই হোক। দুটোই তো কুকুর। হঠাৎ কুঁ-কুঁ শব্দটা থেমে গেল। তাতান কান খাড়া করে ওপরের দিকে তাকাল। যেন খুব হতাশ হয়েছে সে। একটু পরে শান্ত হয়ে বসল নিজের ঘরের সামনে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত নেমে আসছেন। এসে তাতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর জন্য আমাকে কাজকর্ম ছাড়তে হবে দেখছি। এ তো বড় জ্বালা হল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আ: নি কিন্তু এখনও আপনার সমস্যা বলেননি ?"

"উৎপাত। আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে না।"

"কী করে সম্ভব সেটা ? আমি যা দেখলাম বিনা অনুমতিতে এই বাংলোয় কোনও মানুষ ঢুকতে পারবে না। উৎপাত করবে কীভাবে ? হ্যাঁ, আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন সমস্যায় পড়তে পারেন। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তো বন্দুক রেখেছেন।"

"তোমার কি মনে হচ্ছে এখানে আমি খুব নিরাপদে আছি ?"

"নিশ্চয়ই। কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না, নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন।"

হাসলেন ডক্টর গুপ্ত, "তুমি বাইরের দেওয়াল আর তার ওপরের ইলেকট্রিক তার দেখেছ। কিন্তু মাথার ওপরে তো খোলা আকাশ রয়েছে হে। উৎপাত হচ্ছে সেখান দিয়েই। রিভলভার ছুঁড়ব তারও তো কোনও উপায় নেই।"

অর্জুন চিন্তিত হল। মাথার ওপর আকাশ দিয়ে কেউ আসছে নাকি ?

আশেপাশের গাছ থেকে লাফিয়ে নামছে ? যদি নামেও, তা হলে ফিরে যাওয়ার তো উপায় নেই। সে উঠে জানলার কাছে গেল। বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। আজ জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। সে গাছগুলোকে দেখল। না, দেওয়াল থেকে অনেক দূরে রয়েছে তারা। কোনও মানুষের পক্ষে ওই গাছে উঠে এদিকে লাফিয়ে পড়া সম্ভব নয়। তা হলে ? জানলার কাচের এপাশে দাঁড়িয়ে সে ডক্টর গুপ্তের গাড়িটার দিকে তাকাতেই হতভম্ব হয়ে গেল। ডিকিটা খুলে গেল ধীরে-ধীরে। তারপর বাড়তি টায়ার যা ডিকিতে থাকে সেটা বেরিয়ে এল বাইরে। মাটিতে পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না অর্জুন। সে দেখল টায়ারটা বৃষ্টির মধ্যে সামনের লনে পাক খাচ্ছে। ঠিক যেভাবে বাচ্চা ছেলেরা চাকা নিয়ে দৌড়য় সেইভাবে পাক খেয়ে চলেছে। অর্জুনের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে কোনওদিন ভূত দ্যাখেনি, ভূত আছে বলে বিশ্বাসও করে না। কিন্তু এ যদি ভূতেব কাণ্ড না হয় তা হলে...। সে চোখ ফেরাল। ডক্টর গুপ্ত তাতানকে বাক্সবন্দি করছেন। চাপা গলায় অর্জুন ডাকল, "একবার এখানে আসুন।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের মুখ দেখে সম্ভবত অনুমান করেছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চলে এলেন জানলার পাশে। টায়ার তখনও ঘুরে চলেছে। জলে ভেজা ঘাসে এলোমেলো দাগ পড়ে যাচ্ছে। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "যা বলছিলাম তা তো নিজের চোখেই দেখছ। এ তো কিছুই নয়। আপনমনে খেলছে। উৎপাত যখন করে তখন মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

"কী ব্যাপার বলুন তো ?" অর্জুন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

"তোমার কী মনে হয ?"

"এ তো ভুতুড়ে কাণ্ড।"

"যা আমরা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পাবি না তাকে ভুতুড়ে বলি। তবে তোমার দেখছি সাহস আছে ছোকরা। অজ্ঞান হয়ে যাওনি।"

হয়তো ডক্টর গুপ্ত সঙ্গে আছেন, দিনের আলোও নিভে যায়নি বলেই অর্জুন ভয় পায়নি। এখন শোনামাত্র কেমন গা ছমছম করতে লাগল। সে তো ডক্টর গুপ্তকেও ভাল করে চেনে না। জগুদাও বা কতটা চেনেন ? এটি একটি হন্টেড বাংলো হতে পারে। ডক্টর গুপ্ত নিজে একজন ড্রাকুলা হতে পারেন। এমন কত গল্পই তো শোনা যায়। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটল। সে আড়চোখে দেখল ডক্টর গুপ্তের ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। যাক ইনি তা হলে ভূত নন। ভূতেদের ছায়া পড়ে না। অর্জুন দেখল টায়ারটা গড়িয়ে সোজা চলে এল গাড়ির পেছনে। যেভাবে নেমেছিল সেইভাবে লাফিয়ে উঠে পড়ল ডিকিতে। কাত হযে শুয়ে পড়তেই ডিকি বন্ধ হয়ে গেল। এসব কাণ্ড ঘটল অথচ কোনও মানুষ গাড়ির ধারে কাছে নেই।

ডক্টর গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কখন যাবেন কে জানে কিন্তু এবার বুঝলেন উৎপাত কীভাবে এখানে আসে ?"

অর্জুনের গলার স্বর কেঁপে উঠল, "কে এটা করল ?"

"তাতানের বন্ধু। এখন পর্যন্ত আমার কোনও ক্ষতি সে করেনি কিন্তু ওর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি বসো আমি তাতানকে ওপরে রেখে আসি।" ডক্টর গুপ্ত টেবিল থেকে বাক্সটা তুলে নিলেন।

অর্জুন পাশে এসে দাঁড়াল, "আমি আপনার কথা বুঝতেই পারছি না। তাতান একটা কুকুর। ওর বন্ধু এভাবে অদৃশ্য হয়ে অমন কাণ্ড কীভাবে করতে পারে ?"

"বন্ধুটি দেহধারণ করতে পারছে না কোনও কারণে।"

"বিদেহী ?"

"বিদেহী মানে আমাদের ধারণায় ভূত। ও তা নয়। তাতানকে আমি যে গ্রহে পাঠিয়েছিলাম, মানে যেখানে গিয়ে তাতানের আকৃতি ছোট হয়ে গেছে, ওর বন্ধু সেখান থেকেই এসেছে। দাঁড়াও, আমি আগে তাতানকে রেখে আসি।" ডক্টর গুপ্ত দ্রুতপায়ে ওপরে চলে গেলেন।

অর্জুন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। একী ভুতুড়ে কাণ্ড বাবা ! অন্য গ্রহের প্রাণী একটা কুকুরের জন্য এখানে ঘুরঘুর করছে ? পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহেও প্রাণী আছে বলে সন্দেহ করেন বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু সেটা তো শুধুই সন্দেহ। ডক্টর গুপ্তের কথা যদি সত্যি হয়...। মায়ের কথা মনে পড়ল। তাঁর দেশের বাড়ির অনেক ভুতুড়ে গল্প তিনি শুনিয়েছেন। ঝড় নেই হাওয়া নেই হঠাৎ মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। অথবা দরজা-জানলা হুটহাট করে খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। এ তো প্রায় সেইরকম ব্যাপার। অর্জুন অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ দেখল চায়ের কাপ টেবিল থেকে উঠে যাচ্ছে। ঠিক চার ফুট উঁচুতে উঠল কাপটা। ধীরে-ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অর্জুনের গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখ ছানাবড়া। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে কাপটা সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল।

একটু-একটু করে সাহসী হল অর্জুন, নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ?"

কেউ উত্তর দিল না। অর্জুন একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, "আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন ?"

এবারও কোনও জবাব নেই। এই সময় ডক্টর গুপ্ত ওপর থেকে খালি হাতে নেমে আসছিলেন। অর্জুন তাঁকে সতর্ক করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ওঁর পা পড়ল প্লেটের ওপর। ছিটকে গেল সেটা। মেঝেতে পড়ে দু' টুকরো হল। উলটে পড়তে-পড়তে কোনওমতে সামলে নিলেন ডক্টর গুপ্ত। বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কাপ রাখতে গেলে কেন ? এটা কি

রাখার জায়গা ?”

সত্যি, বড় অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত। অর্জুন বলল, “আমি রাখিনি।”

ডক্টর গুপ্ত চোখ ছোট করলেন, “ও। সরি। এভাবে তোমাকে বলা ঠিক হয়নি।” কাপ তুলে নিয়ে কিচেনে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, “আমার বেসিনটা প্রায় সাড়ে চার ফুট ওপরে। ও নাগাল পাবে না।”

“কাপ ফুট চারেক ওপরে উঠেছিল।” অর্জুন জানাল।

“ঠিকই। আমার বিশ্বাস ওর হাত মাথার ওপরে তুললে চার ফুটের ওপরে যায় না। মুশকিল হল আমি ওর সঙ্গে কোনওরকম কম্যুনিকেট করতে পারছি না। ও বাংলা হিন্দি ইংরেজি অথবা জর্মান ভাষা বোঝে না।”

“কিন্তু এই ঘরে ঢুকল কী করে ?”

“হয়তো শরীরটাকে খুব ছোট করতে পারে। আমার কিচেনের জল যাওয়ার গর্তটা বেশ বড়। তাই দিয়েই আসে।” ডক্টর গুপ্ত চারপাশে তাকিয়ে নিলেন।

“এই সিদ্ধান্তে এলেন কী করে ?”

“বললাম তো চার ফুটের ওপরে যেমন জিনিস আছে সেগুলোতে ও কখনওই হাত দেয় না। আমার দোতলায় ওঠার দরজাটায় এক চিলতেও ফাঁক নেই। ঘরটাও এয়ারটাইট। সেখানে কখনওই ও যায় না।”

“এয়ারটাইট মানে সাউন্ডপ্রুফ ?” অর্জুন কুঁ-কুঁ শব্দটাকে মনে করতে পারল।

“না, সাউন্ডপ্রুফ নয় পুরোপুরি। এই হল আমার সমস্যা। পুলিশের পক্ষে এর সমাধান করা সম্ভব নয়। তোমার কী মনে হয় ? পারবে ?”

এমন সমস্যা এর আগে কোনও সত্যসন্ধানী সমাধান করেছেন বলে অর্জুনের জানা নেই। স্বয়ং অমল সোম থাকলেও পারতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ব্যাপারটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। চট করে না বলতে ইচ্ছে হল না অর্জুনের। সে বলল, “খুব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমি চেষ্টা করতে পারি। তবে ক’দিন এখানে থাকতে হবে।”

“অফকোর্স। স্বচ্ছন্দে থাকো। তোমার দক্ষিণা কত ?”

অর্জুন হেসে ফেলল, “সেটা নিয়ে এখন কথা না বললেই ভাল হয়।”

“নো। তুমি কাজ করবে আর আমি জানতে পারব না কত পারিশ্রমিক নেবে ? না না, এভাবে হবে না।”

“বেশ। আপনি যা স্থির করবেন তাই নেব। কিন্তু সফল হলে।”

“কবে থেকে এসে থাকছ তুমি ? আমি না হয় শিলিগুড়িতে গিয়ে নিয়ে আসব।”

“আমি কাল থেকেই আসতে চাই। কিন্তু এই প্রলয়ের মধ্যে ফিরব কী

করে ?”

“হুম্। আমি ভাবিনি এরকম বৃষ্টি পড়বে। ঠিক আছে, চলো আমি তোমাকে না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।” ডক্টর গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।

সেই সময় মেঝেতে শব্দ হল। ওরা দু'জনেই দেখল একটা চেন সাপের মতো এগিয়ে আসছে। চেনটা যে তাতানের ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এবার চেনটা মাটি থেকে খানিক ওপরে দুলতে লাগল। ডক্টর গুপ্ত বলে উঠলেন, “অর্জুন, সাবধান, ও বোধ হয় আমাদের মারতে চাইছে।” বলতে-বলতে তিনি ছুটে ঘরের কোণে রাখা লম্বা টুলের ওপর উঠে বসলেন। অর্জুন নড়ল না। ঠিক করল চেনটা তাকে আঘাত করতে এলেই সে ওটাকে ধরবে। দেখা গেল চেনটা টুলের দিকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল শূন্যে। তারপর ঘরের এক কোণে ছিটকে পড়ল। অর্থাৎ যে ওটাকে এতক্ষণ নাচাচ্ছিল সে বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অর্জুন উঠে চেনটাকে কুড়িয়ে নিতে ডক্টর গুপ্ত নেমে এলেন, “ভয়ঙ্কর, এই প্রথম ও এমন ব্যবহার করল। আক্রমণাত্মক।”

এই সময় বাইরে কড়-কড় করে বাজ পড়ল। এবং সেইসঙ্গে সারা বাড়িতে এলার্ম বাজতে লাগল। অর্জুন চমকে ডক্টর গুপ্তের দিকে তাকাতেই তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, “ঝড়ে বোধ হয় কোনও গাছের ডাল ইলেকট্রিক তারের ওপর ফেলেছে।”

অর্জুন জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেওয়ালটা দেখতে পেল। না, এদিকের তারে কিছু জড়িয়ে নেই। সে বর্ষাতিটা পরে নিয়ে টুপি মাথায় দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। বৃষ্টিতে চারধার সাদা হয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকের দেওয়ালের দিকে এগোতেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যেই একটি মানুষের শরীর দেওয়ালের ওপরে তারের গায়ে ছটফট করছে। সে দ্রুত ফিরে এসে ডক্টর গুপ্তকে বলল, “তাড়াতাড়ি দেওয়ালের কারেন্ট অফ করে দিন। একটা মানুষ মারা যাবে।”

“মানুষ ?” দরজায় দাঁড়ানো ডক্টর গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, “আবার চেষ্টা করেছে বুঝি ? যারা ওখান দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চায় তাদের মরাই উচিত।”

“প্লিজ এখন ওসব বলবেন না। অফ করুন তাড়াতাড়ি।” অর্জুন ধমকে উঠল।

ডক্টর গুপ্ত ভেতরে চলে গেলেন। এবং তার খানিক বাদেই অর্জুন দেখল শরীরটা তার থেকে খসে ওপাশে পড়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক রকমের আহত হয়েছে। নিশ্চয়ই ভোল্টেজ বেশি নয় তাই এতক্ষণ ছটফট করছিল। অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত আবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সে বলল, “মেইন গেট খুলে দিন। লোকটাকে দেখা দরকার।”

কিন্তু ঠিক তখনই কানে একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এল। দ্রুত নেমে

যাচ্ছে। এর মানে লোকটা একা ছিল না। যারা ওকে পাঠিয়েছিল তারাই চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনের মনে হল ডক্টর গুপ্তেব ঘরে-বাইরে বিপদ। এই সময়টুকু বৃষ্টিতে দাঁড়াতেই অর্জুনের মনে হল জলপাইগুড়িতে যাওয়া যাবে না। অন্তত আজ তো নয়ই।

ঘরে ঢোকার আগে ওভারকোট আর টুপি খুলতেই অনেকটা জল ঝরল। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "কি হে, চেষ্টা করবে নাকি ?"

"আপনার এখানে ফোন নেই ?"

"আছে। কিন্তু অর্ধেক দিন সাড়া দেয় না। ঝড়বৃষ্টি হলে কথাই নেই।"

"তবু দেখুন তো। মিস্টার গাঙ্গুলিকে এখনও ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে।"

ওপাশে আর-একটি ঘর রয়েছে। সম্ভবত গেস্ট রুম। ফোনটা সেখানে। এখানে ডায়াল করে লাইন পাওয়া যায় না। অপারেটারের সাহায্য নিতে হয়। দেখা গেল টেলিফোনে কোনও সাড়া নেই।

অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অর্জুন এখানে আজকের রাতটা থাকবে। কাল সকালে শিলিগুড়িতে গিয়ে কাজের ব্যাপারটা মাকে জানানোর জন্য জগুদাকে বলে আসবে। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এই ঘরটি তোমার। আমি ঠিক তোমার মাথার ওপরে শোব। প্রয়োজন পড়লে বিছানার পাশে এই যে বোতাম আছে চাপ দিও, আমার ওখানে অ্যালার্ম বাজবে। যাই, আবার বিদ্যুৎ চালু করি।"

॥ তিন ॥

ভদ্রলোক চলে গেলে অর্জুন চেয়ারে বসল। থাকার কথা তো ঠিক হল কিন্তু সঙ্গে যে একটা পাজামাও নেই। রাত্রে শোবে কী পরে ? হঠাৎ তার খেয়াল হল তাতানের বন্ধুর কথা। অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সে চারপাশে তাকাল। অন্যগ্রহের সেই ছোট্ট প্রাণী হয়তো এই ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে এখন। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এখানে আছ ?"

কেউ সাড়া দিল না।

"তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো। আমি লোক খারাপ নই। মানে, আমরা বন্ধু হতে পারি। বুঝতে পারছ ? আচ্ছা, এবার বলো, তুমি কীভাবে এখানে এসেছ ? তোমার কি কোনও মহাকাশযান আছে ?"

কোনও জবাব নেই। হাল ছেড়ে দিল অর্জুন। এইভাবে একা শূন্যঘরে কাউকে কথা বলতে দেখলে সে তাকে পাগল ভাবত। প্রাণীটা কত ছোট ? ডক্টর গুপ্ত বললেন হাত তুললে চার ফুটের বেশি হবে না। ধরে নেওয়া যেতে পারে মাথায় সে আড়াই থেকে তিন ফুট। ওঃ, এর চেয়ে ছোট প্রাণী পৃথিবীতে ছিল। গালিভার যাদের লিলিপুট বলেছেন। হাজার-হাজার ছিল তারা। হয়তো অন্যগ্রহ থেকে এসেছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণীদের আকৃতি ছোট

হয়। একসময় এই পৃথিবীতেই বিশাল-বিশাল প্রাণী দাপটে ঘুরে বেড়াত। ডাইনোসরাস এখন কোথায় ? এমনকী এখন যে হাতি দেখে অবাক হতে হয় সেকালে এর আকৃতি ছিল প্রায় দ্বিগুণ। আদিম মানুষের যে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে তার পাশে আমাদের পায়ের ছাপ লিলিপুট। আজ থেকে তিন হাজার বছর পরে একটা হাতি যদি গোরুর উচ্চতায় নেমে যায় তা হলে মানুষ তিন ফুটের বেশি লম্বা থাকবে না। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর বিবর্তনকালের অনেক আগে বিবর্তন শুরু হওয়া অন্য কোনও গ্রহের প্রাণীই আজ ডক্টর গুপ্তের বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ধরে নিলে একটা সহজ সমাধান তৈরি হয়।

কিন্তু সেই প্রাণী কোথা থেকে আসছে এবং কেমন ভাবে, তা বোঝা যাচ্ছে না। ডক্টর গুপ্ত কি জানেন ? লোকটা বেশ রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে অর্জুনের। অথচ কুকুরের চেনটাকে শূন্যে ভাসতে দেখে কীরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় আগন্তুকের সঙ্গে ডক্টর গুপ্তের সম্পর্ক ভাল নয়। ভেবেচিন্তে কোনও সুরাহা করতে পারছিল না অর্জুন। আজ জলপাইগুড়িতে যেতে পারলে অমল সোমের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলা যেত।

বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাছেরা মাথা দোলাচ্ছে পাগলের মতো। অর্জুন চুপচাপ বসে দেখল দিন ফুরিয়ে আসছে। অথচ ঘড়িতে এখন মাত্র তিনটে বাজে। এদিকে ডক্টর গুপ্ত সেই যে ওপরে গিয়েছেন আর নামেননি। ভদ্রলোক তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্য কেউ ওপরে যাক তা তিনি পছন্দ করেন না। অর্জুন উঠল।

অন্যগ্রহের মানুষটি এখন এ-বাড়িতে আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কারণ দীর্ঘ সময় সে তার অস্তিত্ব জানাচ্ছে না। কিছুদিন আগে অর্জুন রূপশ্রী সিনেমায় একটা খুব পুরনো ছবি দেখেছিল। ইনভিজিব্‌ল ম্যান। ব্যাপারটা কি সেইরকম ? সে নীচের তলার ঘরগুলো দেখতে লাগল। এ-বাড়িতে কাজের লোক পর্যন্ত নেই। সব কিছুই ডক্টর গুপ্তকে করতে হয়। ফলে একটু অগোছালো ভাব চারধারে।

ঠিক চারটের সময় দপ করে আলো নিভে গেল। ঘরের ভেতর এখন পাতলা অন্ধকার। ওপর থেকে ডক্টর গুপ্তের গলা ভেসে এল, "এক মিনিট, জেনারেটার চালিয়ে দিচ্ছি।"

জেনারেটার চালু হওয়ামাত্র আলোকিত হল বাংলো। ডক্টর গুপ্ত নেমে এলেন ওপর থেকে। সোফায় বসে বললেন, "মনে হচ্ছে আজকের রাতটায় আর উপদ্রব হবে না।"

অর্জুন বলল, "কেন মনে হচ্ছে ?"

"খুব সোজা ব্যাপার। পৃথিবীর আকাশে এখন মেঘে-মেঘে ঘষা লেগে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। এই স্তর ভেদ করে আসাটা খুব ঝুঁকির কাজ। কেউ

বোকামি করবে না।"

"আপনি নিশ্চিত, যে আসছে সে অন্যগ্রহের বাসিন্দা ?"

"অবশ্যই।"

"কোন গ্রহ ?"

"আমরা এর অস্তিত্বই জানতাম না যে নামকরণ করব। সূর্যের চারপাশে যেমন পৃথিবী সমেত অন্য গ্রহগুলো ঘুরছে তেমনই সূর্যের মতো আরও অনেক নক্ষত্র তাদের পরিবার নিয়ে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইরকম একটি পরিবার থেকে এই উপদ্রবটি এখানে পৌঁছেছে।"

"পৃথিবীতে আসতে ওর কত সময় লাগছে ?"

"এইটেই আমাকে ভাবাচ্ছে। আমি আলোর চেয়ে দ্রুতগামী একটা রকেট তৈরি করেছিলাম। ট্যাকিয়ন রকেট। সেই রকেটে করে তাতানকে মহাকাশে পাঠিয়েছিলাম। রকেটের লক্ষ্য ছিল ৭·৫ আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রের গ্রহজগৎ। মাত্র ঘণ্টা দশেকের মধ্যেই তাতান সেই নক্ষত্রের একটি গ্রহে পৌঁছে যায়।

...তুমি নিশ্চয়ই আলোর গতি জানো ?" ডক্টর গুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

ব্যাপারটা জানা ছিল অর্জুনের, "এক বছরে, মানে আমাদের এক বছরে আলো মহাকাশে যায় প্রায় ছয় মিলিয়ন মাইল।"

"গুড।" খুশি হলেন ডক্টর গুপ্ত।

"আপনি যে তাতানকে রকেটে করে মহাকাশে পাঠালেন, এখানে কি সেরকম পাঠানোর ব্যবস্থা আছে ? আর তার জন্য তো প্রচুর টাকা লাগে।"

অর্জুন অকপটে তার মনের কথা বলে ফেলল।

ডক্টর গুপ্ত মাথা নাড়লেন, "তুমি ঠিক বলেছ। আমার মতো সাধারণ মানুষ অত টাকা পাবে কোথায় ? তা ছাড়া একজন সাধারণ নাগরিককে সরকার রকেট ছোঁড়ার অনুমতি দেবেন কেন ?"

"তা হলে ?" অর্জুন বেশ বিস্মিত হচ্ছিল।

এক মুহূর্ত ভাবলেন ডক্টর গুপ্ত। সম্ভবত অর্জুনকে নিজের কথা বলবেন কি না তাই চিন্তা করলেন। এবার তাঁকে হাসতে দেখা গেল, "অর্জুন, এককালে লোকে গোরুর গাড়ি-ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত করত। কলকাতা থেকে দিল্লিতে একদিনে যাওয়ার কথাই ভাবতে পারত না। তারপরে যখন ট্রেন চলল তখন দু' ঘণ্টায় যাওয়ার কথাও কেউ বিশ্বাস করেনি। এখন তো সেটাই জলভাত। এমন দিনও তো আসতে পারে, ছ' মিনিটে আমরা কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছে যেতে পারি। তাই না ?"

"হয়তো !" অর্জুন আর কী বলতে পারে !"

"রকেট চালিয়ে মহাকাশে যান পাঠানো এখনকার রীতি। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার যে দুটো আবিষ্কার তা এই রীতি থেকে অবশ্য

এগিয়ে। কিন্তু সেটা জানার আগে বল যে জন্য তোমায় নিয়ে এলাম তার কী করলে ?"

অর্জুন তাকাল। তারপর বলল, "এত অল্প সময়ে কিছু করা সম্ভব ? আপনি বলছেন অন্য গ্রহ থেকে জীবন এখানে আসছে। কীভাবে আসছে ?"

"ঠিক প্রশ্ন করেছ তুমি। না, সে সাধারণ মহাকাশযানে চেপে আসছে না। এই ব্যাপারটা অন্য অনেক গ্রহে খুব পুরনো বলে বাতিল হয়ে গিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, যেভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলাম সেভাবে এই উপদ্রবটি যাওয়া-আসা করছে। তাতানকে সাধারণ মহাকাশযানে পাঠালে ওর সঙ্গে দেখাই হত না। সম-স্তর বলেই যোগাযোগ হয়েছিল। ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে ওপরে চলো।

"ওপরে ?" অর্জুন প্রশ্ন না করে পারল না।

"হ্যাঁ। আমি কাউকে ওপরে নিয়ে যাই না। কিন্তু তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

আচমকা অর্জুন প্রশ্ন করল, "আপনি তো আজই আমাকে প্রথম দেখলেন, ভাল করে চেনেনও না। আপনার গোপন গবেষণার ঘরে আমাকে নিয়ে যাওযা কি উচিত হচ্ছে ?"

ডক্টর গুপ্ত মাথা ঘোরালেন। তাঁকে খুব হতভম্ব দেখাল প্রথমটায়। তারপর অকস্মাৎই অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন, "গুড। গুড। আমার মন আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।"

"কীরকম ?"

"খুব সাধারণ ব্যাপার। তোমার মনে অন্য কিছু থাকলে এই প্রশ্ন করতে না। তা ছাড়া তোমাকে িয়ে আমার কোনও ভয় নেই। যে কোনও দিন মোটরগাড়ি দেখেনি তাকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে দিলেও সে গাড়ি নিয়ে পালাতে পারবে না। চলো।"

ডক্টর গুপ্তর পেছন-পেছন অর্জুন ওপরে উঠল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে তিনি বললেন, "একটু সাবধানে আসতে হবে। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। যদিও মনে হচ্ছে উপদ্রবটি তার গ্রহে ফিরে গেছেন তবু কে জানে এখানেই ঘাপটি মেরে পড়ে আছেন কি না। তুমি যখন ভেতরে ঢুকবে তখন তোমার শরীর একটি বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যাবে। সামান্য চিনচিন করবে। অশরীরী অস্তিত্বের কাছে সেটা খুবই মারাত্মক অবশ্য। এসো।"

দরজা খুলে ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন। অর্জুন পা বাড়াতেই মনে হল সমস্ত শরীরে ঝিঁঝিঁ ধরে গিয়েছে। অর্থাৎ সে বিদ্যুৎপ্রবাহের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওমতে শরীরটা সামনে ঠেলে দিয়ে আসার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ডক্টর গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও অসুবিধে হয়নি তো ? একটু চিনচিন ? প্রত্যহ এক-দু'বার নিলে জীবনে বাত হবে না তোমার। আমি তো

অনেকবারই নিই, দ্যাখো, কী ফিট বডি আমার।"

এসব কথায় মন ছিল না অর্জুনের। তার চোখ এখন ঘরের চারপাশে। বেশ লম্বা হলঘর এটি। চারপাশে নানা যন্ত্রপাতি ছড়ানো। এক কোণে জানলার পাশে ফ্রেমের মতো কিছু, যার মুখে আয়না জাতীয় বস্তু লাগানো। তার পাশেই অদ্ভুত টেবিল-চেয়ার। প্রতিবন্ধীদের জন্য যে-ধরনের হুইল চেয়ার তৈরি করা হয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ছোট্ট টেবিলও। ডক্টর গুপ্ত জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাচের জানলার ওপাশে বিদ্যুৎ চমকে বারংবার পৃথিবী আলোকিত হচ্ছে। ভদ্রলোক দু' হাত মাথার ওপরে তুললেন, "আমাদের পৃথিবীর আর মহাকাশের মধ্যে যোগাযোগ এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রুকাউয়াট কে লিয়ে খেদ নেহি হ্যায়।"

অর্জুনের মজা লাগল। তা হলে এই ভদ্রলোক টিভিও দেখেন!

ডক্টর গুপ্ত ঘুরে দাঁড়ালেন, "এই হল আমার জায়গা। আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। সারাজীবন ধরে তিল-তিল পরিশ্রম করে এটিকে আমি তৈরি করেছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমি মহাকাশের অনেকটাই ঘুরে আসতে পারি। ববকে, মানে রবার্ট সিনক্লেয়ারকে এই ঘরে ঢুকতে দিইনি আমি। সে এই লাইনের লোক। আমার এই ভাঙাচোরা যন্ত্র নিয়ে কোনওমতে যে কাজ করছি আমি, তা দেখতে পেলে সে দেশে ফিরেই বেশ সফিসটিকেটেড মেশিন তৈরি করে ফেলতে পারত। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার সেই ভয় নেই। বোসো, বোসো।" হাত বাড়িয়ে সেই চেয়ারটিকে দেখিয়ে দিলেন তিনি। চেয়ারের তলায় চাকা আছে। সাবধানে না বসলে পিছলে যেতে পারে। অর্জুন অস্বস্তি নিয়ে সেখানে বসল। ডক্টর গুপ্ত তখন সেই বাক্স থেকে তাতানকে বের করে একটা গামলার মধ্যে রেখেছেন। ঝুঁকে পড়ে চুক-চুক করে তাকে ডাকছেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্যাটার খুব মন খারাপ দেখছি। একবার গিয়ে এমন মন খারাপ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে উপদ্রবটি এখানে এসেছিল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করব?"

"নিশ্চয়ই।"

"এসব তো সায়েন্স ফিকশনে হয়ে থাকে। স্পিলবার্গ নামের একজন চিত্রপরিচালকও এমন বিষয় নিয়ে ছবি করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবী ছাড়া অন্যগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে শুনিনি।"

মাথা নাড়েন ডক্টর গুপ্ত, "কারেক্ট। পৃথিবী ছাড়া সূর্যের চারপাশে যারা ঘুরছে তাদের আবহাওয়ায় প্রাণের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। মঙ্গলে তবু একটু সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সেখানে জলের অভাবই বোধ হয় এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"তা হলে ?"

ডক্টর গুপ্ত বললেন, "দ্যাখো বাবা, বিরাট মহাকাশে সূর্য এবং তার পরিবার এট্টুসখানি জায়গা নিয়ে থাকে। ওরকম কত সূর্য আর তাদের ঘিরে কত গ্রহ ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। সেই রকম অনেক গ্রহেই দেখা যাবে আমাদের পৃথিবীর মতো আবহাওয়া। সূর্য থেকে যতটা দূরত্বে থাকায় পৃথিবীতে এমন আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেই গ্রহগুলো তাদের সূর্য থেকে ঠিক একই দূরত্বে থাকলে সমান আবহাওয়া পাবে এবং পাচ্ছে। ফলে প্রাণের অস্তিত্ব একশো ভাগ সম্ভব।"

"এর কোনও প্রমাণ আছে ?"

"নিশ্চয়ই। সূর্য থেকে ছিটকে আসা গ্রহগুলো স্থিতাবস্থায় আসার পর যখন পৃথিবীতে অ্যামিবার জন্ম হল, সেই সময় থেকে মানুষের জন্ম পর্যন্ত বিবর্তনের ইতিহাস আমরা জানি। মহাকাশের অন্য সূর্যগুলো থেকে একই প্রক্রিয়ায় এমন অনেক গ্রহের উৎপত্তি হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি বছর বয়স্ক। ফলে সেখানে প্রাণ এসেছে আমাদের অনেক আগে। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষজাতীয় প্রাণী জন্ম নিয়েছে বহু বহু আগে। তাই তাদের বোধবুদ্ধি এবং কার্যক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। এটাই তো স্বাভাবিক। তারা ইচ্ছে করলে তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে পারে। আমরা শুধু চাঁদে মানুষ নামাতে পারি, মঙ্গল গ্রহে পাঠাতে পারি। হ্যাঁ, বলতে পারো আমি তার থেকে এক ধাপ এগিয়েছি। কিন্তু সেখানে কোন গ্রহের অস্তিত্ব তার নাম জানি না। তাতান যদি কথা বলতে পারত তা হলে সেটা জানা যেত।"

অর্জুন একমনে শুনছিল। ডক্টর গুপ্তের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু সঠিক প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তা তিনি দিতে পারেননি। সে জিজ্ঞেস করল, "মহাকাশে যে মানুষজাতীয় বুদ্ধিমান প্রাণীর কথা আপনি বলছেন তারা কি আমাদের মতো দেখতে ?"

"অসম্ভব। হতে পারে না। দাঁড়াও, তোমাকে ছবিগুলো দেখাই।" ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে। সেখানে দেওয়াল-আলমারি জুড়ে প্রচুর বই রয়েছে। তার একটি বের করে পাতা খুলতে-খুলতে এগিয়ে এলেন, "এটা কীসের ছবি ?"

অর্জুন দেখল বিশাল চেহারার হাতি, সারা শরীরে লোম। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এটি হল ম্যামথ। আদিকালের হাতি। এখনকার হাতির চেয়ে দেড়গুণ বড় শরীর। এর পাশে চিড়িয়াখানার হাতিদের শিশু বলে মনে হবে। যতদিন যাচ্ছে তত আকার ছোট হচ্ছে। তুমি যদি কয়েকশো বছর পিছিয়ে যাও তা হলে দেখবে তখনকার মানুষ যেসব পোশাক ব্যবহার করত তাতে তোমার

মতো দু'জন ঢুকে যাবে। আমাদের মুগল সম্রাট যেসব অস্ত্র স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন তা আমাদের পক্ষে তুলে ধরাই বেশ কষ্টকর। তার মানে ওঁদের শরীর আমাদের চেয়ে বড় ছিল। আবার যদি কয়েকশো বছর এগিয়ে যাও তা হলে দেখবে সব কিছু কেমন ছোট-ছোট অথচ তোমার থেকে বেশি বুদ্ধিদীপ্ত। এটাই নিয়ম। পৃথিবীর বাইরে যে প্রাণ, তার জন্ম হয়েছে আমাদের অনেক, অনেক আগে। ফলে সেখানকার প্রাণীর আকার, বিবর্তন মেনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে। হয়তো মস্তিষ্ক, উদর, হাত-পা ছাড়া আর কিছুই নেই তাদের।"

সত্যি, অতবড় হাতি ছবিতেও দেখেনি অর্জুন। শুধু শুঁড় এবং চারটি পা ও লেজ ছাড়া এখনকার হাতির সঙ্গে তেমন মিল নেই। বিশাল লোম, একটা বিকট আকৃতির জন্য ম্যামথকে বেশ বীভৎস বলে মনে হচ্ছিল। বই রেখে দিয়ে ডক্টর গুপ্ত বললেন, "অর্জুন, তোমার নামের সেই বিখ্যাত পাণ্ডবটি স্বর্গে গিয়েছিলেন এ-কথা মহাভারতে আছে। স্বর্গে সময় স্থির হয়ে আছে। স্বর্গটি কোথায় ? কাউকে জিজ্ঞেস করো, সে যত নিরক্ষরই হোক স্বর্গ বললে মাথার ওপরে হাত তুলে দেখাবে। অর্থাৎ স্বর্গ ওই মহাশূন্যে, মাটির নীচে বা পাশাপাশি কোথাও নেই। মানুষকে কিন্তু কেউ বলেনি স্বর্গ মাথার ওপরে আছে। জন্মজন্মান্তর থেকে একটা ধারণা তার রক্তে সে বয়ে নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে। সে পড়েছে দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে আসেন। নেমে আসা মানে আমাদের ওপরে তাঁরা থাকেন। আর ওপর বলতে তো আকাশ, মহাকাশ। অর্থাৎ, মহাকাশেই কোথাও স্বর্গ আছে যেখানে সময় স্থির হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই সূর্যের সংসারের কোনও গ্রহে স্বর্গ নেই। সেখানে তো প্রাণের অস্তিত্বই অসম্ভব। তা হলে অন্য কোথাও, অন্য সূর্যের সংসারে স্বর্গ বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। সেখান থেকে মাঝে-মাঝে দেবতারা এই পৃথিবীতে নেমে আসেন।"

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, "আসতেন।"

"আসতেন ? নো। আসতেন কেন ? এখনও আসেন। ওই যে উৎপাতটা তাতানের খোঁজে আসছে, ওকে নিশ্চয়ই আমাদের গ্রামবৃদ্ধরা উপদেবতা বলতেন।"

অর্জুনের খেয়াল হল সে কিছুদিন আগে দানিকেন সাহেবের লেখা কয়েকটা বই পড়েছে এবং ডক্টর গুপ্তের মতো এতবড় বিজ্ঞানী সেইরকম কথাই বলছেন। দানিকেন সাহেবের কথা তুলতেই ডক্টর গুপ্ত হাত নাড়লেন, "যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না তাই অন্য গ্রহের মানুষের কাজ বলে চাপাতে আমি রাজি নই। অর্জুন, আমার গবেষণা দুটো বিষয় নিয়ে। এক, মহাকাশের অন্য গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করা। অংশত আমি সফল। তাতানকে আমি পাঠিয়েছিলাম, ওর পেছন-পেছন যে নেমে এসেছে সেই প্রমাণ দিচ্ছে মহাশূন্য

প্রাণীহীন নয়।"

"আপনি কীভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলেন ?"

"সেটা তোমাকে বলব না। যতক্ষণ না গবেষণা সফল হচ্ছে ততক্ষণ বলা ঠিক হবে না। আমি পৃথিবীকে একবারেই চমকে দিতে চাই।"

"কিছু মনে করবেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?"

ডক্টর গুপ্ত যেন রেগে গেলেন। তারপর বললেন, "তুমি মহাশূন্যে যেতে চাও ?"

অর্জুন তাতানের দিকে তাকাল। মহাশূন্যে গেলে যদি তার অবস্থা ওই তাতানের মতো হয়ে যায় ? লম্বায় চার ইঞ্চি। অসম্ভব। সে মাথা নাড়ল।

ডক্টর গুপ্ত এবার হাসলেন, "ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে ! আরে মহাশূন্যে যাওয়া মানে তাতান হয়ে যাওয়া এমন ভাবছ কেন ? তাতান এমন একটা গ্রহে গিয়ে পড়েছিল যেখানে গেলে ওই অবস্থা হয়। তুমি এই সূর্যের সংসারগুলো দেখে এলে পারতে। অবশ্য চাঁদের বাইরে কিছুটা বাদে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা তেমন কোনও প্রতিক্রিয়ার খবর এখনও পাননি।"

ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন সেই ক্রেনের মতো দেখতে মেশিনটার কাছে। মেশিনটার গায়ে হাত রেখে বললেন, "এইটে আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি মানুষকে তার ভবিষ্যৎ জানাতে চাই। আজ তুমি যে সময়টায় দাঁড়িয়ে আছ সেই সময়টাকে স্থির রেখে আমি, ধরো, দুশো বছর এগিয়ে নিয়ে গেলাম। অর্থাৎ দুশো বছর বাদে কী ঘটবে তা দেখতে চাইলাম এখনকার মানসিকতা নিয়ে। এটা করতে পারলে ভবিষ্যতে যাঁবা হাত দেখে কুষ্ঠি বিচার করে চলে তাদের জব্দ করা যাবে। আবার মানুষ তার ভবিষ্যতের কাজকর্ম দেখে বর্তমানের ভুল শুধরে নিতে পারবে।"

"এই গবেষণায় কতটুকু এগিয়েছেন ?"

"তেমন কিছু না। এক-দু' পা মাত্র। এদিকে এসো, এই যে সুইচটা দেখছ, এটা টিপলে যন্ত্র চালু হবে এবং তোমার চারপাশের সময়টা চাপ বেঁধে স্থির হয়ে যাবে। এবার দ্বিতীয় বোতামটা টিপলে তোমার ওই সময় সচল হবে। এখানে দ্যাখো, মিটার আছে। বর্ষমিটার। তুমি পাঁচ থেকে পাঁচশো পর্যন্ত মিটার ঘোরাতে পারো। অর্থাৎ, ইচ্ছে করলে পাঁচ থেকে পাঁচশো বছর ভবিষ্যতে চলে যেতে পারো। কিন্তু এ-জায়গায় আমি সবসময় সাফল্য পাচ্ছি না। একবার হয়েছিল। নাইন্টি ফোরে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। ইতালিকে দু' গোল দিয়েছিল জার্মানি। ফিরে এলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর মেশিনটা কাজ করছে না। প্রথমবারে যা-যা করেছিলাম তা করেও নয়। এটাই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

অর্জুন হতভম্ব। নাইন্টি ফোর আসতে এখনও তিন বছর বাকি আছে। হ্যাঁ, সেই সময় আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড কাপ হওয়ার কথা। কিন্তু ডক্টর গুপ্ত গোল

দিয়েছিল বললেন ? সে-কথাটা তুলতেই ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "আসলে খেলা শেষ হওয়া অবধি আমি লস অ্যাঞ্জেলিসের স্টেডিয়ামে ছিলাম। গোল দেওয়া হয়ে গেলে, গিয়েছিল তো বলবই।"

"তার মানে আপনি বলছেন ওই টুর্নামেন্টে জার্মানি দু' গোলে ইতালিকে হারাবেই ? এটা এখন থেকে আপনি জানতে পারছেন ?" অর্জুন উত্তেজিত।

মাথা নাড়লেন ডক্টর গুপ্ত, "হ্যাঁ; জানতে পারছি কিন্তু কাউকে জানাতে চাইছি না। পৃথিবীর কিছু মানুষ সেটা জেনে গেলে ফাটকা খেলবে। লক্ষ-লক্ষ মানুষকে ভুয়ো জুয়ায় হারাবে। জুয়াড়িরা যদি জেনে যায় জার্মানি জিতে যাবেই, তা হলে ইতালির সমর্থকদের কোটি-কোটি টাকা তারা বেমালুম হজম করে ফেলবে।" হাসলেন তিনি, "এ তো গেল খুব সামান্য দিক। এর বড় দিকটাই আসল চিন্তার ব্যাপার।"

ঠিক এই সময় ঘরের এক কোণে লাল আলো জ্বলে উঠে বিপ-বিপ শব্দ শুরু হল। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটল। তার মনে হল মহাকাশ থেকে নিশ্চয়ই কেউ কোনও সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। কিন্তু ডক্টর গুপ্তকে বেশ হতাশ দেখাল, "একটু একা থাকতে দেবে না। এই ঝড়বাদলে অন্ধকারে আবার কে এল ?"

"আপনি বললেন মেঘের আস্তরণ, বিদ্যুতের ঝলকানি থাকায়...।"

"এসেছে নীচের গেটে। অবশ্যই গাড়িতে। এখানে হেঁটে কে আর আসবে। চলো, নীচে যাই। দেখি গিয়ে।" ডক্টর গুপ্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ এই পরিবেশে বেশ ভাল লাগছিল অর্জুনের। বিজ্ঞানের মাধ্যমে কতরকম কাণ্ড ঘটছে পৃথিবীতে। জলপাইগুড়িতে বসে সেসব কথা জানাই যেত না। জলপাইগুড়ির অনেক মানুষ এখনও বলতে পারবে না কীভাবে টিভি-র পর্দায় ছবি ফোটে, রেডিওতে গান বাজে অথবা টেলিফোনে কথা শোনা যায় ! সে ক্রেনের মতো দেখতে যন্ত্রটার দিকে তাকাল। যন্ত্রটা গোলমাল করছে। নইলে সে ডক্টর গুপ্তকে বলত কাছাকাছি সময় থেকে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে।

সদর দরজা খুলে বাইরের আলো জ্বালাতেই বৃষ্টিভেজা বাগানটার সামান্য অংশ দেখা গেল। ডক্টর গুপ্তের গাড়ির গায়ে অঝোরে জল পড়ছে। কারণ গাড়িটা এখন গাড়ি-বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়ে। ওটা আগে ওখানে ছিল না।

গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ডক্টর গুপ্ত চিৎকার করলেন, "হু ইজ দেয়ার ? কে এসেছেন ? আগে নিজের পরিচিতি জানান।"

পনেরো ফুট দেওয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া, মজবুত গেট, তার ওপর বৃষ্টির শব্দ, ডক্টর গুপ্তের গলা আগন্তুক শুনতে পেল কি না সন্দেহ। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "লাউড স্পিকারের কথা কখনও ভাবিনি, এখন মনে হচ্ছে সেরকম একটা কিছু থাকলে ভাল হত।"

কেউ যে এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টি ভেদ করে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ছে ওপাশের গাছের ওপর। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে আপনার কাছে এর আগে কেউ এসেছেন ?"

ডক্টর গুপ্ত মাথা নাড়লেন, "সচরাচর নয়। তবে শিলিগুড়ির কে পুলিশ অফিসার এ-পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে-মাঝেই খোঁজখবর নিয়ে যান।"

এই সময় বৃষ্টিটা একটু ধরল। ঝোড়ো বাতাস শব্দ বাড়াচ্ছে গাছের পাতায় আঘাত করে। ডক্টর গুপ্ত চেঁচালেন আবার, "হু ইজ দেয়ার ?"

"প্লিজ ওপেন দ্য গেট। দিস ইজ বিল।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, "বিল ? মানে ? উইলিয়াম উইলিয়াম জোন্স ?" বলেই তিনি ছুটে গেলেন বৃষ্টির মধ্যে আচমকা।

অর্জুন কোনও বাধা দিতে পারল না। উইলিয়াম জোন্স নিশ্চয়ই তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ কেউ, নইলে ছুটবেন কেন ? কিন্তু একটা ছাতা সঙ্গে নিয়ে গেলে পারতেন। গেট খুলে যাচ্ছে। হয়তো রিমোট ডক্টর গুপ্তের পকেটেই ছিল। গাড়ির হেডলাইটের সামনে এখন ডক্টর গুপ্তের শরীর শ্যিলুট হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ অর্জুন ভদ্রলোককে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল। তিনি চিৎকার করে কিছু বললেন। গাড়ি সটান এগিয়ে আসছে তাঁকে চাপা দেওয়ার জন্য। ডক্টর গুপ্ত একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গাড়িটা এবার তার দিকে এগিয়ে আসছে। অর্জুন দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে গুলির আওয়াজ এবং ঝন-ঝন শব্দ শুরু হয়ে গেল। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। ডক্টর গুপ্ত নিশ্চয়ই আহত হয়ে বৃষ্টির ভেতর পড়ে আছেন। তাঁকে সাহায্য করতে গেলে বন্দুকবাজদের সামনে পড়তে হবে।

দরজায় আঘাত শুরু হল। ওরা সেটাকে ভাঙতে চাইছে। গাড়িতে ঠিক ক'জন মানুষ ছিল, অন্ধকার এবং বৃষ্টির কারণে বোঝা যায়নি। অর্জুনের মনে হল, আপাতত ডক্টর গুপ্তকে দেখার বদলে তাঁর গবেষণার জিনিসগুলো বাঁচানো বেশি জরুরি। সে দ্রুত দোতলায় উঠে এল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সেটাকে প্রথমে বন্ধ করতেই শরীরে চিনচিনে অনুভূতি হল। অর্থাৎ কারেন্ট পাস হচ্ছে এখান থেকে। সে ঘরের ভেতর ঢুকে ভাল করে তাকাল। নীচে তখনও সমানে গুলির আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে রেগুলেটরের মতো একটা নব। ওটার গায়ে লেখা আছে এক দুই তিন চার। রেগুলেটারের মার্কিংটা এক নম্বরে রয়েছে। যদি ওটাকে দুই বা তিনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে কি এখানকার কারেন্ট আরও তীব্রতর হবে ? সেক্ষেত্রে কেউই এ-ঘরে ঢুকতে পারবে না। অর্জুন নবটাকে ঘোরাল। দরজার সামনে গিয়ে নিজের শরীর নিয়ে পরীক্ষা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করল না। এক নম্বরেই যদি অমন চিনচিনানি হয় তা হলে... !

এই সময় নীচের দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। হয়ে গেল। ওরা

এবার একতলায় ঢুকে পড়বে। ডক্টর গুপ্ত এত সাবধানতা অবলম্বন করে এখানে ছিলেন কিন্তু কী লাভ হল তাতে ? সামান্য একটা ভুলে সব নষ্ট হতে চলেছে। অর্জুন চুপচাপ দরজা ছেড়ে জানলার কাচের পাশে চলে এল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাইরের।

এবার দোতলার সিঁড়ির গায়ে ধাক্কা। এবং সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার। কেউ যেন ছিটকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল নীচে। মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার ধাক্কা হওয়ামাত্র আবার চিৎকার। অর্জুন একটু নিশ্চিন্ত হল। নব ঘুরিয়ে কারেন্ট বাড়ালে নিশ্চয়ই সমস্ত দরজাটাই ইলেক্‌ট্রিফাইড হয়ে গিয়েছে।

একটু চুপচাপ। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হল। দরজা ভেদ করে একটা গুলি এসে লাগল ঘরের ছাদে। খানিকটা কাঠের টুকরো পড়ল মেঝেতে। দ্বিতীয় গুলিটা দরজা ফুটো করে ছুটে এল অনেকটা নীচ দিয়ে। প্রায় অর্জুনের কান ঘেঁষে সেটা লাগল ক্রেনের মতো দেখতে যন্ত্রটায়। অর্জুন চমকে গেল এমন যে, মাটিতে না বসে পারল না। তৃতীয় গুলিটা ছুটে গেল ছাদে। কিন্তু ততক্ষণে অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুরু হয়েছে ঘরের ভেতর। অর্জুন মুখ তুলে শুনল। আওয়াজটা আসছে ওই ক্রেন জাতীয় যন্ত্রটার শরীর থেকে। গুলিটা লাগার পরই ওর পিস্টন চালু হয়ে গিয়েছে। সে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনটাকে দেখতে লাগল। ক্রেনের ভেতরে একটা বসার জায়গা আছে। তার সামনে মোটরগাড়ির হুইল। ড্যাশবোর্ডের মতো জায়গায় নানারকম আলো জ্বলছে। ডক্টর গুপ্ত ইঞ্জিনটাকে চালু করতে পারছিলেন না, কিন্তু একটা বন্দুকের গুলি আচমকা সঠিক জায়গায় আঘাত করায় ওটা চালু হয়ে গেল। কী তাজ্জব ব্যাপার !

যিনি বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছেন তিনি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। এবার তাঁর গুলি লাগল দরজার ভেতরে তালার গায়ে। ভাল শব্দ হল। অর্জুন জানে লোকটার উদ্দেশ্য এই ঘরে ঢুকে যন্ত্রপাতির দখল নেওয়া। যদি বুদ্ধি করে ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিয়ে দরজা ভেঙে ঢোকে তা হলে বন্দুকের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্য সফল করতে একটুও বেগ পেতে হবে না ওদের। এ-অবস্থায় সে কী করতে পারে ?

ইতস্তত ভাবতে-ভাবতে অর্জুন মেশিনটার দিকে তাকাতেই দ্বিতীয় মতলব মাথায় এল। সে চুপচাপ মেশিনের মাঝখানের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। এটিকে কী করে চালু করতে হয় তা সে জানে না। মেশিন থেকে যেরকম শব্দ বের হচ্ছে তাতে মনে হয় ওটা ইতিমধ্যেই সচল হয়েছে। কিন্তু এখন কী করা যাবে ? অর্জুন সামান্য ঝুঁকে ড্যাশবোর্ডের আলোগুলো দেখল। দশ-বিশ-ত্রিশ পঞ্চাশ-একশো-হাজার-দশ হাজার লেখা রয়েছে যেখানে, তার নীচেই একটা বোতাম। অর্জুন বোতামটাকে টিপতেই বিপ্‌-বিপ্‌ শব্দ বাজতে লাগল এবং নম্বরগুলোর একপাশে একটা একটা কাঁটাকে ভেসে উঠতে দেখা গেল। অর্জুন

সেটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করতেই কাঁটাটাকে এক লাফে কুড়ি এবং ত্রিশের মাঝখানে চলে আসতে দেখা গেল। অর্জুনের সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপছিল। মেশিনটা যেন পাগলের মতো আচরণ করছে এখন। এবার তার নজরে এল পাশাপাশি দুটো সুইচ রয়েছে। তার একটাতে চাপ দিল সে উদভ্রান্তের মতো।

॥ চার ॥

প্রবল একটা ঝাঁকুনি, মনে হল হাড়গোড় সব ভেঙে যাচ্ছে, অর্জুন বন্ধ চোখে অন্ধকার দেখল। এবং তারপরেই শরীরে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগল। বাইরে বৃষ্টি হলেও এই ঘরে তো হাওয়া ঢোকার উপায় নেই। সে চোখ খুলতেই হতভম্ব হয়ে গেল। ওগুলো নিশ্চয়ই তারা। একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তার মানে বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু ঘরের ছাদটা কোথায় গেল! সে তারা দেখছে কীভাবে? মাথা ঘোরাতেই সেটা ভোঁ-ভোঁ করে উঠল। ঘর কোথায়? তার চারপাশে তো গাছগাছালি। মাথার ওপরে আকাশ। সামনে সেই ড্যাশবোর্ড, যেখানে এখনও আলো জ্বলছে। শব্দ বাজছে। সে কোথায় চলে এল? চটপট মেশিন থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াল অর্জুন। একটা রাতের পাখি বেশ ভয় পেয়েই ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল দিগন্তে। দু-তিন পা জঙ্গল ভেঙে এগিয়েও কোনও দিশা পেল না সে। শুধু যন্ত্রটা থেকে আসা আওয়াজ রাত্রের নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ করছে। অর্জুন আবার ফিরে এল ওটার কাছে। কীভাবে আওয়াজটাকে বন্ধ করা যায়। তার মনে পড়ল শেষবার সে যে সুইচটাকে টিপেছিল তার কথা। পাশাপাশি আর-একটি সুইচ আছে। সেটিকে টিপতেই সব শব্দ আচমকা থেমে গেল। সুইচটির গায়ে দ্বিতীয়বার চাপ দিতেই আবার শব্দ চালু হল। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সে তৃতীয়বার চাপ দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ সে সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। যন্ত্রটায় সে বসে ছিল। সে ছিল ঘরের মধ্যে। এখন জঙ্গলে। তার মানে সে খুবই বিস্ময়কর এক জায়গায় চলে এসেছে মেশিনের কল্যাণে। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার একমাত্র বাহন হল ওই মেশিনটি। অতএব একে হারালে চলবে না। অর্জুন ডালপালা ভেঙে পাতার আড়ালে মেশিনটাকে এমনভাবে ঢেকে রাখল যাতে চট করে কারও নজরে না পড়ে। অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়ার পর সে মেশিনটাকে পেছনে রেখে সোজা হাঁটতে লাগল। জায়গাটায় এত বুনো ঝোপ যে, বোঝাই যায় অনেককাল কেউ এদিকে আসেনি। হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। মিনিটচারেক হাঁটার পর চোখের সামনে একটা বিশাল রাস্তা দেখতে পেল। তার মনে পড়ল এতবড় রাস্তা সে যখন আমেরিকায় গিয়েছিল তখন দেখেছিল। রাস্তার দু'দিক দিয়ে একসঙ্গে আটখানা গাড়ি স্বচ্ছন্দে যেতে

পারে। মাঝখানে তিরিশ গজ অন্তর তীব্র আলো জ্বলছে।

সে নিজের কবজির দিকে তাকাল। এখন সন্ধে সাতটা, সেপ্টেম্বর মাসের বারো তারিখ, উনিশশো একানব্বুই। এই সন্ধেবেলায় আকাশ নির্মেঘ। অথচ সেখানে আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। কাছাকাছি জনবসতি আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় নেমে বাঁ না ডান, কোনদিকে হেঁটে যাবে ঠাওর করতে পারছিল না অর্জুন।

হঠাৎ মাথার ওপরে এয়ারবাসের ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যেতে সে চোখ ওপরে তুলল। কী আশ্চর্য, ওটা কী ? নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন একটা আকাশযান যার আকার গোল টুপির মতো, ওই শব্দ করতে-করতে উড়ে গেল পশ্চিমে। খানিক বাদে পশ্চিম থেকে ওই একই ধরনের যান ওপরে উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। এগুলো কি প্লেন ? তা হলে তার ডানা কিংবা লেজ কোথায় ?

অর্জুনের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। ডক্টর গুপ্তের মেশিনটা যদি সঠিক কাজ করে তা হলে সে আর তিস্তাপারের ওই বাংলোয় নেই। কিন্তু কোথায় আছে ? এতবড় চওড়া রাস্তায় এই সন্ধেবেলায় গাড়ি ছুটছে না কেন ? সে ঠিক করল রাস্তায় নামবে না। পাশের জঙ্গল দিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল। শুধু জায়গাটা ছাড়ার আগে ভাল করে দেখে রাখল যাতে পরে চিনতে অসুবিধে না হয়। তিন-তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ অদ্ভুতভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গা ঘেঁষে সোজা গেলেই ডক্টর গুপ্তর মেশিনটা পাওয়া যাবে।

অর্জুনের ঘড়িতে যখন ন'টা, মানে রাত্তির ন'টা, তখন পুবের আকাশে সূর্যদেব দেখা দিলেন। খুব স্বাভাবিক ভোর, নরম রোদে গাছগাছালি ঝলমল। অর্থাৎ সে সময়ের দিক থেকে অন্তত আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে, একটি দিনের পরিমাপে।

দিন শুরু হতেই অদ্ভুত চেহারার গাড়িতে রাস্তাটা ভরে গেল। ষাট কিলোমিটার স্পিডে গাড়িগুলো ছুটছে, একটার সঙ্গে পরেরটার ব্যবধান দশ-বারো ফুটের। পাশাপাশি দু'মুখো রাস্তার সবক'টা লেন এখন একটু-একটু করে ভরে উঠেছে। এই গাড়িগুলোকে যেন কেউ এতক্ষণ আটকে রেখেছিল, ছাড়া পেয়ে সবাই হুড়মুড়িয়ে চলছে। জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুনের মনে হল হুড়মুড়িয়ে শব্দটায় একটা বিশৃঙ্খল মানে বোঝায় কিন্তু গাড়িগুলো যাচ্ছে খুবই শিষ্ট হয়ে। সবচেয়ে বড় কথা, এতগুলো গাড়ি রাস্তায় ছুটছে, কিন্তু একটিও হর্নের আওয়াজ নেই, গাড়ির বিকট শব্দ অথবা ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। মাঝে একটি টু-হুইলার বেরিয়ে গেল। জলপাইগুড়িতে অর্জুনের লাল বাইক হলে এতক্ষণে কান ফাটাত। এই রাস্তায় কোনও ফুটপাত নেই। আমেরিকার হাইওয়েগুলোকে যেমন সে দেখেছিল তার সঙ্গে হুবহু মিল। অর্জুনের মনে হল সে নির্ঘাত আমেরিকায় এসে পৌঁছেছে। ওখানকার হাইওয়েতে কেউ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাতে যায় না। চাইলেও গাড়ি থামবে না। অতএব এখানে

অর্জুনও সেই চেষ্টা করল না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল।

ঘড়িতে যখন রাত এগারোটা, এখানে তখন চনমনে রোদ্দুর। হঠাৎ জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেল। একটু ঢালু মাঠের পরে কিছু রঙিন ঘরবাড়ি, তাদের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। দূর থেকে বোঝা যায় মানুষজন আছে। অনেকটা কৌতূহল নিয়ে অর্জুন এগিয়ে যেতে বিপ-বিপ শব্দ কানে এল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল দুটো বাচ্চা মেয়ে দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সাইকেল দুটো সম্ভবত ফাইবার গ্লাসের। চলে যাওয়ার সময় দুটো মেয়েই তার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে গেল।

অর্জুন বাড়িঘরগুলোর কাছাকাছি আসতেই ভেতর থেকে কেউ একজন বেরিয়ে এল। লোকটি ঈষৎ খাটো, পরনে শর্টপ্যান্ট কিন্তু তার সেলাই অন্যরকম। চোখাচোখি হতে লোকটিকেও অবাক হতে দেখল সে। কী ভাষায় কথা শুরু করবে বুঝতে না পেরে অর্জুন হাসল। তারপর ইংরেজির আশ্রয় নিল, 'গুড মর্নিং'।

লোকটি ঠোঁট কামড়াল। তারপর ঘুরে ভেতরে চলে গেল। অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। নিশ্চয়ই ও ইংরেজি জানে না। ইংরেজি না-জানা সভ্য দেশ ইউরোপে অনেক আছে। কিন্তু এই লোকটিকে দেখে মোটেই ইউরোপিয়ান বলে মনে হচ্ছে না। চিন বা জাপানের সাধারণ মানুষও ইংরেজিতে কথা বলা দরকার বলে মনে করে না। সাধারণত যেসব দেশ এককালে ব্রিটিশদের অধীনে ছিল তারাই ইংরেজি শিখেছে বাধ্য হয়ে।

অর্জুন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবে কি না ভাবছিল এমন সময় সেই লোকটি আবার বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে। বৃদ্ধের পাকা দাড়ি, লম্বা চুল আবার জিনসের প্যান্ট এবং কায়দা-করা শার্ট, সব মিলিয়ে অন্যরকম দেখাচ্ছে। অর্জুন খুব বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করল।

বৃদ্ধ হাসলেন এবং নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন। তারপর হাত নেড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। অর্জুন ওঁদের পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকল। সুন্দর সাজানো একটি ঘর। এবং দেওয়ালের একটি ছবির দিকে তাকাতেই সে খুব অবাক হয়ে গেল। ছবিটা কাচে বাঁধানো নয়, পুরো দেওয়াল জুড়ে আঁকা।

সে প্রশ্ন না করে পারল না, "রবীন্দ্রনাথ টেগোর?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "টেগোর? না। ঠাকুর। আমাদের পরমপিতা।"

"আ-আপনি বাঙালি?"

"বাঙালি? হ্যাঁ, আমরা বঙ্গভাষাভাষী। প্রায় দুশো বছর আগে পরমপিতা পৃথিবীতে এসেছিলেন। আমাদের যা কিছু গৌরব তা ওঁরই দান।" বৃদ্ধ হাসলেন, "আপনি বঙ্গভাষা জানেন জেনে খুশি হলাম। আপনার নিবাস?"

"আমার বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে।"

বৃদ্ধ যেন খুব অবাক হলেন। তিনি সঙ্গীর দিকে তাকালেন। সঙ্গীর চোখ

ছোট হল। বৃদ্ধ ইঙ্গিতে অর্জুনকে বসতে বললেন, "মনে হচ্ছে আপনি আপাতত অনেকদূর পথ ভ্রমণ করেছেন। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে ?"

অর্জুন একটি সুদৃশ্য চেয়ারে বসল। তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বৃদ্ধ তাঁর সঙ্গীকে ইশারা করতে সে ভেতরের দরজা দিয়ে চলে গেল। বৃদ্ধ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পোশাক দেখছি প্রায় নতুন। আমাদের বালক বয়সে ওইরকম কাপড়ের পোশাক দেখেছি । আপনি কোত্থেকে এগুলো সংগ্রহ করলেন ?"

এই বৃদ্ধ তার ছেলেবেলায় এমন জামাপ্যান্ট দেখেছে ? লোকটার মাথা ঠিক আছে তো ? সে হেসে বলল, "আমি দোকান থেকেই কিনেছি।"

এই সময় সেই যুবক বেরিয়ে এসে বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কিছু বলল। বৃদ্ধ ব্যস্ত হলেন, "আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগল। আপাতত এই ঘরে বিশ্রাম নিন। বাইরের রোদ হয়তো আপনার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। আমাকে এখনই একটু বিশেষ কাজে বেরোতে হবে। ততক্ষণ পুত্র আপনাকে দেখাশোনা করবে।" বৃদ্ধ তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অর্জুনকে অবাক হতে দেখে যুবক বলল, "বাবার একটা জরুরি কাজ আছে মিনিট দশেকের মধ্যে। উনি সেটা খেয়াল করেননি।"

এই সময় ঘরে মিষ্টি বাজনা বাজতে লাগল। যুবক উঠে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা সুইচ টিপতেই সেখানে সিনেমার পর্দার মতো আলো ফুটে উঠল। বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। চৌকো আলোর মধ্যে সুন্দরী মেয়ের মুখ ভেসে উঠল, "বাবা বেরিয়ে গেছে দাদা ?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র। আমি মনে করিয়ে দিলাম।" যুবকের দেওয়ালের দিকে মুখ।

"আজকাল বাবার যে কী হচ্ছে ! তুমি কী করছ ?"

"একজন অতিথি এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছি।"

"অতিথি ? কে ? আমি চিনি ?"

"না। মানে সম্ভবত না। তিনি বলছেন জলপাইগুড়ি থেকে আসছেন।" কথাটা বলেই যুবক হাসল। সুন্দরী বেশ অবাক, "কী যা-তা বলছ ?"

"আমি ঠিকই বলছি।"

অর্জুন শুনতে পেল সুন্দরী চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "মাথা ঠিক আছে ?"

"এখনও বুঝতে পারছি না। কখন ছুটি হচ্ছে ?"

"আধঘণ্টার মধ্যেই। ঠিক আছে !"

"ঠিক আছে।" দেওয়ালের আলো মিলিয়ে গেল। যুবক সুইচ অফ করে ফিরে এসে হাসল, "আমার বোন। ওর রাতের চাকরি।"

অর্জুন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তার মুখ থেকে প্রশ্ন ছিটকে বের হল, "উনি আপনার সঙ্গে কীভাবে কথা বললেন ?"

"কেন ? এই পদ্ধতি আপনি আগে দেখেননি ?"

"না। আমরা টেলিফোনে কথা বলি। সেখানে শোনা যায়, দেখা যায় না।"

"আমরা শ্রবণ এবং দর্শন একই সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি। আচ্ছা, আপনি মনে করার চেষ্টা করুন তো, এখানে আসার ঠিক আগে কোথায় ছিলেন ?"

"কোথায় ছিলেন মানে ?"

"কোনও চিকিৎসালয়ের কথা আপনার কি মনে পড়ে ?"

হঠাৎ অর্জুনের খেয়াল হল। এদের কাছে তার কথা, পোশাক, আচরণ নিশ্চয়ই অন্যরকম লাগছে। স্বভাবতই এরা ভাবতে পারে সে কোনও মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে। এই ভাবনাটা ওদের বেশি বিচলিত না হতে সাহায্য করছে। অতএব এদের ভুল না ভাঙানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সে অভিনয় করল, "আমার মাথায় যন্ত্রণা হত খুব। তবে আজ সকাল থেকে সেই যন্ত্রণা আর নেই।"

"আপনার বাবা-মা-স্ত্রী অথবা বাড়ির ঠিকানা মনে আছে ?"

"না। কিছুই মনে করতে পারছি না। তবে শরীর খুব ভাল লাগছে।"

"এই পোশাকগুলো আপনি পেলেন কী করে ? কোনও চিকিৎসালয়ে তো এমন পোশাক ব্যবহার করতে দেবে না। সেখানে কি মজাদার পোশাক পরার কোনও অনুষ্ঠান হয়েছিল। মনে করে দেখুন !"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেরকম একটা কিছু... ।"

যুবক এবার গম্ভীর হল, "দেখুন, একজন নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য এখনই জনস্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আপনি আমার বাবার অতিথি। তাছাড়া বলছেন আপনার শরীর ভাল আছে। অনেক সময় অবশ্য বাইরের আলো হাওয়া খুব কাজে দেয়। দাঁড়ান, আপনার খাবার নিয়ে আসি।" যুবক ভেতরে চলে গেল।

অর্জুন কিছুক্ষণ একা-একা আকাশপাতাল ভাবল। তার নিজেকে উন্মাদ ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগছিল না। যুবক ফিরল একটা সুন্দর ট্রেতে খাবার নিয়ে। অর্জুনের সামনের টেবিলে ট্রেটা বসিয়ে দিয়ে বলল, "মোটামুটি এই বাড়িতে ছিল।"

অর্জুন দেখল এক বাটি সুপ, অনেকখানি সবজি সেদ্ধ আর গোল ফুলকো রুটি দু'খানা প্লেটে রয়েছে। সে চুপচাপ খেয়ে গেল। খিদে যে মারাত্মক পেয়েছিল তা খাবার মুখে দিতে মালুম হল। এমন স্বাদহীন খাবার শেষ করতে বেশি সময় লাগল না। খাবার শেষ করা মাত্র দরজায় শব্দ হল। এবং দেওয়ালে যার ছবি দেখেছিল সেই সুন্দরীকে ভেতরে ঢুকতে দেখল সে।

সুন্দরী ঘরে ঢুকতেই তাকে দেখতে পেয়েছিল। যুবক বলল, "আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার বোন বলাকা। আপনার নামটা জানা হয়নি।"

"অর্জুন।" সে দুই হাত যুক্ত কবল নমস্কার জানাতে। বলাকা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে ডান হাত বাড়িয়ে অর্জুনের আঙুল স্পর্শ করল, "আপনার বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিত্রাঙ্গদাব খুব ভক্ত।"

"চিত্রাঙ্গদা ?" অর্জুন হতভম্ব।

"নইলে অর্জুন নামটি তাঁরা রাখতেন ন৷ তাই না ?"

এবার বুঝল অর্জুন। বলাকা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের কথা বলছে।

বলাকা এবার তার দাদার দিকে তাকাল, "আমি দুটো প্রবেশপত্র পেয়েছি। আর ঠিক এক ঘণ্টা বাদে লন্ডনে খেলা শুরু হবে।"

যুবক বলল, "ক্রিকেট আমার ভাল লাগে না। ফুটবল হলে যেতাম।" সে এবার অর্জুনের দিকে তাকাল, "আপনি ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাবেন ?"

"কোথায় হচ্ছে ?" অর্জুন ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইল।

"লন্ডনে। ভারত বনাম ইংল্যান্ড।" বলাকা বলল, "এ-খবর আপনি জানেন না ?"

যুবক নিচু গলায বলল, "ওর জানার কথা নয়।"

"আমার কাছে একটি অতিরিক্ত প্রবেশপত্র আছে। যেতে চাইলে সঙ্গে আসুন।"

এই ঘব থেকে বেরনো যাবে, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না, অর্জুন তাই উঠে দাঁড়াল। যুবক জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কখন ফিরছ ?"

বলাকা জবাব দিল, "দু' ঘণ্টার তো খেলা, শেষ হলেই ফিরব।"

বলাকাকে অনুসরণ করে অর্জুন হাঁটতে-হাঁটতে ভেবে পাচ্ছিল না ক্রিকেট কী করে দু' ঘণ্টার খেলা হবে ? পাঁচদিনের টেস্ট, তিনদিনের ম্যাচ থেকে এখন ওয়ান ডে-তে এসেছে। অথচ বলাকা বলছে দু' ঘণ্টার খেলা।

পার্কিং লটে একটা লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে সেটায় উঠে বসে পাশের দরজা বোতাম টিপে খুলে দিল বলাকা। অর্জুন দেখল গাড়িতে গীয়ার নেই, ক্ল্যাচ নেই। সুইচ অন করে একটা বোতাম টিপতে গাড়ি ভুস করে ছুটে চলল। কয়েক সেকেন্ডেই হাইওয়ে। হঠাৎ মাথার ওপরে একটা বিরাট হোর্ডিং নজরে এল, "জলপাইগুড়ি শহরে সুস্বাগতম।"

জলপাইগুড়ি শহর ? অর্জুন সোজা হয়ে বসল, এটা জলপাইগুড়ি শহর নাকি ? যে-শহরে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তার কিছুই চেনা মনে হচ্ছে না ? এতবড় হাইওয়ে কবে জলপাইগুড়িতে ছিল ? শহরের মধ্যে সরু ঘিঞ্জি কিছু রাস্তায় যাতায়াত করত সবাই।

সে জিজ্ঞেস করল, "তিস্তা নদীটা কোন দিকে ?"

বলাকা হাসল, "শুনলাম আপনি বলেছেন যে, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়ি, তিস্তা নদীর কী অবস্থা তা জানেন না।"

অর্জুন বুঝল। কেন বৃদ্ধ এবং যুবক তার কথা শুনে অমন অবাক হয়েছিল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলাকা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমাকে সত্যি কথা বলুন তো ? আপনার পরিচয় কী ?"

অর্জুন হাসল। সত্যি কথা বলে কোনও লাভ নেই। কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। সে মাথা নাড়ল, "আমার কোনও কথাই মনে পড়ছে না।"

"কোনও কষ্ট হচ্ছে ?"

"বিন্দুমাত্র নয়।"

পিলপিল করে গাড়ি ছুটে চলেছে। নানা ধরনের গাড়ি, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। দিনটা ভালই। বলাকা বলল, 'আমরা স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছি। আপনি তিস্তার কথা বলছিলেন, এই দেখুন।"

বলাকার আঙুল অনুসরণ করে অর্জুন দেখল একটা বড় নোটিস বোর্ডে লেখা আছে, "আপনারা তিস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন।"

মানে ? বলাকা যা বলল তা হল, এককালে তিস্তা নাকি সারা বছর শুকিয়ে থাকত। অনেকখানি জায়গা শহরের পাশে বালির চর হয়ে পড়ে নষ্ট হত। মাঝে-মাঝে বর্ষায় বন্যা হত এই যা। বেশ কিছু বছর আগে পাহাড় থেকে যেখানে তিস্তা নীচে নামছে সেখান থেকেই মাটির তলায় বিশাল টানেল করে নদীর জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ না থাকায় সারাবছর সেখানে জল থাকে। স্রোতও। ফলে ভাল বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। আর ওপরের বালি জমিকে নানান কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। শহরের পাশে সেই বিরাট চরেই গড়ে উঠেছে খেলাধুলোর নানান ঘেরা মাঠ।

পেটের ভেতর চিনচিন করতে লাগল অর্জুনের। সেই বিখ্যাত চর উধাও ? তিস্তা-ব্রিজের দরকার নেই। এখানে স্টেডিয়াম হয়েছে। জলপাইগুড়িতে স্টেডিয়াম বলতে ছিল কয়েকটা গ্যালারি নিয়ে হাকিমপাড়ার টাউন ক্লাব। আর বলাকা যেখানে গাড়ি পার্ক করল, লম্বা ট্রলি জাতীয় গাড়ি তাদের তুলে নিয়ে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে অর্ধেকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল স্টেডিয়াম। কবে হল এসব ? এত লোক আজ খেলা দেখতে এসেছে তবু ঝামেলা হচ্ছে না এতটুকু ! প্রবেশপত্র দেখিয়ে মাঠে ঢোকা হতে চোখ জুড়িয়ে গেল অর্জুনের। এমন সবুজ মাঠ, ঝকঝকে স্টেডিয়াম সে কখনও দেখেনি। মাঠের দু'দিকে স্কোরবোর্ড রয়েছে। আর একপাশে বিশাল একটা ক্যামেরাজাতীয় যন্ত্র মাঠেব দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। গ্যালারি ইতিমধ্যেই ভরে উঠেছে।

এই সময় আকাশবাণী শোনা গেল, "প্রিয় বন্ধুগণ, আর কিছুক্ষণ বাদেই ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। দুই

দলে যাঁরা খেলছেন তাঁদের নাম নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। তবু আর-একবার জানানো হচ্ছে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক স্বপনলাল। দলে আছেন···।"

অর্জুন কান পেতে শুনল। একটি নামও তার চেনা বলে মনে হল না। পাশে বসা বলাকাকে সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "শচীন খেলছে না ?"

"কে শচীন ?"

"শচীন তেণ্ডুলকর। বিস্ময়-বালক।"

"বিস্ময় বালক মানে ? এরকম নাম তো কখনও শুনিনি।" বলাকা অবাক।

অর্জুনের ডান দিকে বসা এক বৃদ্ধ বললেন, "শচীন তেন্ডুলকর ? নামটা কিন্তু কোথায় পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।"

তাঁর ওপাশে বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, "অনেকদিন আগে ওইরকম নামের এক ভদ্রলোক নাটক লিখতেন। মারাঠি ভাষায়।"

"কতদিন আগে ?" প্রথম বৃদ্ধ জানতে চাইলেন।

"সময়টা ঠিক মনে নেই। নাটকের ওপর একসময় পড়াশোনা করেছিলাম। তখন পড়েছিলাম। তবে প্রথম নামটা নিশ্চয়ই শচীন নয়।" দ্বিতীয় বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল। আকাশবাণী হল, "খেলা শুরু হচ্ছে। এখন আমরা আপনাদের সামনে লর্ডস মাঠকে উপস্থিত করছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে মাঠের একপাশে দাঁড় করানো ক্যামেরাজাতীয় যন্ত্রটা চালু হল। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল স্টেডিয়ামের মাঝখানে মাঠটা মুহূর্তেই বদলে গিয়ে লর্ডস মাঠে পরিণত হল। আম্পায়ার দুই অধিনায়ককে দিয়ে টস করাচ্ছেন। ইংল্যান্ড টসে জিতে প্রথম ঘন্টার ব্যাটিং নিল। এই মুহূর্তে লর্ডসে বসে থাকলে সে যেমনটি দেখত, জলপাইগুড়িতে বসে ঠিক তেমনই দেখছে। মাঠ, খেলোয়াড়। এক শুধু দর্শকরা পালটে গেছে। সে বলাকাকে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "অত হাজার মাইল দূরে যে খেলা হচ্ছে তা এই মাঠে কী করে দেখানো সম্ভব ?"

বলাকা হাসল, "আপনি সত্যি সব ভুলে গেছেন ! আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা ঘরে বসে লর্ডসের খেলা দূরদর্শন যন্ত্রে দেখতেন। সেটা কী করে সম্ভব হয়েছিল ? শুধু চারচৌকো বাক্সের পরদায় ছবিটাকে না রেখে এই বড় মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে মেজাজটা ভাল পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্তত তিনশোটা মাঠে একই সঙ্গে মানুষ খেলাটা দেখতে পাচ্ছে।"

খেলা চলাকালীন এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল অর্জুন যে, অন্যদিকে মন ছিল না। প্রথম ঘন্টায় ইংল্যান্ড আশি রান করল তিন উইকেট হারিয়ে। ভারত বল করেছে কুড়ি ওভার। দ্বিতীয় ঘণ্টার জন্য ভারত নেমেই একটা উইকেট খোয়াল। সমস্ত স্টেডিয়াম জুড়ে হাহাকার। ইংল্যান্ড উনিশ ওভার বল করলে

ভারত রান তুলল তিন উইকেটে ছিয়াত্তর। খেলা শেষ। কিন্তু যেহেতু ইংল্যান্ড এক ওভার কম বল করেছে তাই ভারত চার রান বোনাস পেল। ফলে দুই দলের স্কোর হয়ে গেল সমান-সমান, আশি। ম্যাচ ড্র। বলাকা বলল, "আজকাল প্রায়ই দেখছি ম্যাচ ড্র হচ্ছে। চলুন।"

অর্জুন নিজের ঘড়ির দিকে তাকাতে পুরনো সময় দেখতে পেল। বলাকার চোখ পড়েছিল তার ঘড়ির ওপর। সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, "ও মা, এ কীরকম ঘড়ি আপনার ? দেখি, দেখি।"

বাধ্য হয়ে নিজের কবজিটাকে তুলে ধরল অর্জুন। বলাকা সেটাকে দেখতে-দেখতে বলল, "খুব দাম হবে ঘড়িটার। পুরনো জিনিস সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনার ঘড়ি যে উলটোপালটা সময় দিচ্ছে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ঠিক করা হয়নি।"

"কিন্তু তারিখটা ? কী লেখা আছে ?"

অর্জুন ইংরেজিতে তারিখটা দেখল। এবং তখনই খেয়াল হল এখানে আসার পর থেকে সে একটিও ইংরেজি শব্দ শুনতে পায়নি। বলাকাদের পরিবারের কেউই কথার মধ্যে ইংরেজি বলেনি। হয়তো এখানে কেউ ইংরেজি শেখে না। এই কারণেই বলাকা পড়তে পারছে না তারিখটা, সে দেখল অদ্ভুত দৃষ্টিতে বলাকা তাকে দেখছে। একটা কিছু জবাব দিতেই হয়। কিন্তু তার আগেই বলাকা বলল, "নিশ্চয়ই এটাও আপনার মনে পড়ছে না। চলুন।"

বলাকার পেছন-পেছন হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুনের মনে হল মেয়েটা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এবার বেজায় সন্দেহ করছে, সে কী করে এদের বোঝাবে উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে শিলিগুড়ির কাছে একটা বাংলোয় ছিল ! আর এখন ঠিক কোন সাল তাই তো বোঝা যাচ্ছে না।

গাড়িগুলো ফিরছিল। হাইওয়ের গায়ে মাঝে-মাঝে লেখা, ডান দিকের সরু পথ দিয়ে জলযোগকেন্দ্র, বিশ্রামালয়। তিন নম্বর বাহিরপথ বিমানবন্দরের জন্য। বিমানবন্দর ? জলপাইগুড়ি শহরে এয়ারপোর্ট আছে নাকি ?

হঠাৎ বলাকা বলল, "আপনি এতক্ষণ আমাদের সঠিক কথা বলেননি। হতে পারে আপনার মস্তিষ্ক স্থির নেই কিন্তু আপনার পোশাক, ঘড়ি, কথাবার্তায় এখনকার কিছুই ধরা পড়ছে না। আপনাকে সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার আগে আপনাকে আমি জলপাইগুড়ি শহরটা ঘুরিয়ে দেখাব।" কথা বলতে-বলতেই বলাকা হাইওয়ে থেকে শহরে যাওয়ার পথ ধরে ডান দিকে বাঁক নিল। অর্জুনের মনে পড়ল আমেরিকার হাইওয়েতে এইরকম পথগুলোকে এগজিট বলে। গঠনটা ঠিক একই ধাঁচের. বাঁ দিকের কার পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলাকা গাড়ির বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে চার ইঞ্চিটাক টিভি স্ক্রিন বেরিয়ে এল ড্যাশ বোর্ডের একধারে। বাজনা বাজছে কোথাও। এবারে সেই স্ক্রিনে বলাকার দাদাকে দেখা গেল, "কী ব্যাপার ?"

"বাবা ফিরেছেন ?"

"হ্যাঁ। একটু আগে। তোমরা কোথায় ?"

"ছয় নম্বর বাহির পথে। আমরা একটু শহরে যাচ্ছি।"

"কেন ?"

"অর্জুনকে শহর দেখাব।"

"একটু সতর্ক থেকো। বাবা ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছেন। ঠিক এক ঘন্টা বাদে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে সবাই এখানে আসছেন। এর ভেতরেই চলে এসো।" আলো নিভে গেল। বলাকা সুইচ টিপে স্ক্রিনটাকে আবার ভেতরে চালান করে দিয়ে বলল, "শুনলেন তো ? এবার সত্যি কথা না বলে আপনার কোনও উপায় নেই। এই শহরের কোথাও আপনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারেন।"

অর্জুনের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বলাকা যে একটুও মিথ্যে বলছে না তা সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু কী করে সঠিক ব্যাপারটা সে বোঝাবে। বলাকা আবার গাড়ি চালু করে গুনগুন করে সুর ধরল, "আর আমি যে কিছু চাহিনে।" হঠাৎই সে থেমে গিয়ে প্রশ্ন করল, "পরের লাইনটা কী বলুন তো ?"

অর্জুনের মনে পড়ল দেবব্রত বিশ্বাসেব গলায় রবীন্দ্রনাথের এই গানটি সে শুনেছে। মনে করেই সে জবাব দিল, "জননী বলে শুধু ডাকিব।"

"বাঃ। খুব ভাল। এবাব বলুন।"

গাড়ি এখন শহরেব মধ্যে ঢুকছে, সব পালটে গেছে, সব। যদি অতবড় তিস্তা নদীকে ছোট কবে পাতালনদী করে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে শহরটার ভোল পালটাবেই। সে জিজ্ঞেস করল, "করলা নদী কোথায় ?"

"করলা ? সেটা আবার কী ?"

অর্জুন এবার মরিয়া হল। যা হওয়ার হোক, বলাকাকে ব্যাপারটা বলা দরকার। সে বলল, "অনুগ্রহ করে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাবেন যেখানে আমরা কথা বলতে পারি ?"

বলাকা ওর দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়ল। দু'পাশে বড়-বড় ঝকঝকে বাড়ি। মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত যানবাহন চলছে। সব আধুনিক গাড়ি। একটা সিঁড়ি দিয়ে কিছু লোক নীচে নেমে গেল, তার মানে এখানে পাতালরেলও রয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের একটি বাড়ি বা দোকানকে সে এখন কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

এখন পার্কিং প্লেস পাওয়া খুবই মুশকিল, বলাকা আধ ঘণ্টার জন্য একটা জায়গায় গাড়ি রেখে পাশের রেস্টুরেন্টে তাকে নিয়ে ঢুকল। রেস্টুরেন্টে একজনই কর্মচারী। থরে-থরে খাবার সাজানো আছে। মানুষজন সেগুলো প্লেটে তুলে কর্মচারীটিকে দাম দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসছে। এমন ঝকঝকে

রেস্টুরেন্ট জলপাইগুড়িতে কখনও ছিল না।

দু' কাপ কফি নিল বলাকা। নিল মানে কফির লিকার কাপে ঢেলে চিনি মিশিয়ে নিল, দুধ ঢালল না। তারপর ট্রে হাতে এগিয়ে গেল দাম দেওয়ার জন্য। অর্জুনের মনে হল বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এরা এর মধ্যে প্রচুর উপকার করেছে তার। অতএব কফির দাম তারই দেওয়া উচিত।

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বলাকা কিছু বলার আগেই সে কর্মচারীটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "দুটো কফির দাম কত?"

"দু' হাজার।" কর্মচারী জবাব দিল।

হকচকিয়ে গেল অর্জুন। দু' হাজার টাকা দু' কাপ কফির দাম? তার কাছে তো অত টাকা নেই। পেছন থেকে বলাকা বলল, "আপনি সরে দাঁড়ান, আমি দিচ্ছি।" ট্রে-টাকে পাশের টেবিলে রেখে সে নিজের ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে কর্মচারীটিকে দিতেই ভদ্রলোক মেশিনে সেটা পাঞ্চ করে ফিরিয়ে দিল।

রেস্টুরেন্টের এক কোণে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে বলাকা জিজ্ঞেস করল, "আপনার হাতে ওটা কী?"

দশ টাকার নোট তখনও হাতেই ছিল, সেটা নিঃশব্দে এগিয়ে দিল অর্জুন। বলাকা সবিস্ময়ে সেটাকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এটা কোথায় পেলেন?"

"আমার কাছেই ছিল। আমাদের সময় এই দশ টাকায় পাঁচ কাপ কফি পাওয়া যেত।"

"আপনাদের সময়ে মানে?"

"উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ। আপনাকে আমি সব কথা খুলে বলছি। তার আগে বলুন, এটা কোন সাল, মাস, খ্রিস্টাব্দ?"

"আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আজ চব্বিশে বৈশাখ, পনেরোশো আটষট্টি সাল।" বলাকা জবাব দিল।

"তার মানে, কাল পঁচিশে বৈশাখ? রবীন্দ্রনাথের তিনশো বছর পূর্ণ হবে?"

"হ্যাঁ। কাল আমাদের বিরাট উৎসব।"

অর্জুন মনে-মনে হিসাব করল, বলাকার কথা যদি ঠিক হয় তা হলে সে একশো সত্তর বছর পরের জলপাইগুড়ি শহরে বসে আছে। তার মানে ডক্টর গুপ্তের মেশিন তাকে একশো সত্তর বছর ভবিষ্যতে নিয়ে এসেছে। সে ধীরে-ধীরে সব কথা বলাকাকে খুলে বলল।

শুনতে-শুনতে বলাকা খুব উত্তেজিত, "আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন?"

"নিশ্চয়ই। এই পোশাক উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমরা পরি। এই ঘড়ি তখন স্বাভাবিক ছিল। এই যে নোট দেখছেন, এটা দশ টাকার, তখন সারা ভারতবর্ষে এটাই চালু ছিল।" অর্জুন বোঝাতে চাইল।

বলাকা কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার এখন বয়স কত ?"

অর্জুন জবাব দিল, "তেরোশো আটানব্বই সালে বাইশ বছর ছিল।"

"তা হলে তো এখন একশো বিরানব্বই হয়েছে ?"

"হয়নি, কারণ আমি এক মুহূর্তে এখানে এসেছি। আপনি মহাভারত পড়েছেন ? মহাভারতে অর্জুন নামে একজন বীর ছিলেন। তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন আচমকাই, জীবিত অবস্থায় ' সেখানে থাকার সময় তার বয়স বাড়েনি।"

"মহাভারত ? নাম শুনেছি। আসলে রবীন্দ্রনাথের নাম ছাড়া আর কিছু পড়ার সময় আমাদের নেই। ওঁর গানই আমাদের পুজোর মন্ত্র। কী অদ্ভুত লাগছে আপনাকে দেখে, সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে।"

"প্লিজ, সেটা করবেন না, আমার বিপদ হবে।"

"প্রথম শব্দটা কী বললেন ?"

"প্লিজ, মানে অনুগ্রহ করে। এটি ইংরেজি শব্দ।"

"ও, ব্রিটিশদের ভাষা। আমরা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বলি না।"

"কিন্তু ভারতবর্ষ তো বিরাট দেশ, তার ভাষাও অনেক···।"

"নিশ্চয়ই। শুনেছি এই কারণে এক সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দাঙ্গা হত। কেউ-কেউ বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত ঠিক হল প্রত্যেক প্রদেশকে একমাত্র বৈদেশিক ব্যাপাব ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধিকার দেওয়া হবে। এর পরে আর কোনও সমস্যা নেই। দেশের মধ্যে আমরা সাধারণত নিজেদের নিয়ম মেনে চলি। কিন্তু আপনার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আপনি আমার পূর্বপুরুষ ?" অদ্ভুত চোখে তাকাল বলাকা।

অর্জুনের লজ্জা হল। বলাকা তার সমবয়সী বলা যায়।

"আপনি সত্যি এই শহরে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। শহরটা তখন এরকম ছিল না।"

"কী রকম ছিল ?"

"মফস্বল শহর যেমন হয়। হাইওয়ে ছিল না। একটা বাইপাস ছিল। নদী ছিল বিশাল এবং প্রায়ই জল থাকত না। উনিশশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দের বন্যার পর শহরটা প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তিন-চারতলা বাড়ি হাতে গোনা যেত। মানুষজন ছিল ভাল, কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিল। তখন লন্ডনে খেলা হলে আমরা টিভিতে দেখতে পেতাম।"

বলাকা বলল, "আমি আপনার এসব কথা অনুমানও করতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনি আমার সঙ্গে ইতিহাস-ঘরে চলুন।"

"ইতিহাস-ঘর ?"

"হ্যাঁ। আমাদের শহরের যাবতীয় অতীতের তথ্য সেখানে রাখা আছে।

যদিও আমার হাতে বেশি সময় নেই, তবু আপনার কথা জানার পর যেতে ইচ্ছে করছে।"

কফির কাপ এবং ট্রে একটি বিশেষ বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে বলাকা অর্জুনকে নিয়ে বের হল। গাড়ি মিনিট-তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল একটা দশ তলা বাড়ির সামনে। নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলাকা সেখানকার ছুটন্ত সিঁড়িতে চেপে অর্জুনকে নিয়ে সাত তলায় পৌঁছে গেল। দরজার ওপর লেখা আছে, অতীত দু'শো বছর। নিস্তব্ধ বিশাল হলঘর। শীর্ণদেহ কিন্তু খুব স্মার্ট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, "কোনও সাহায্যে আসতে পারি ?"

"হ্যাঁ। আমরা এই শহরটার অতীত সম্পর্কে জানতে চাই।"

"কী জানতে চান আপনারা ?"

"শহরটা তৈবি হয়েছিল কবে ?"

"জলপাইগুড়ির মূল শহর তৈরি হয় কয়েকশো বছর আগে, পুনর্গঠিত হয় আশি বছর।" বৃদ্ধ ওদের নিয়ে একটা বড় ডেস্কের সামনে চলে এলেন।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "উনিশশো একানব্বই মানে তেরোশো আটানব্বই সালের জলপাইগুড়ি সম্পর্কে কিছু বলুন।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। তারপর নানারকম বোতাম টিপতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে বোর্ডের ওপর একটা ম্যাপ ফুটে উঠল। অর্জুন উত্তেজিতভাবে তাকাল। হ্যাঁ, শহরের ম্যাপ। বাড়ি, রাস্তা। বৃদ্ধ বললেন, "অনেকটাই অনুমান-নির্ভর ম্যাপ। কিছু ছবি. আর বইপত্র ঘেঁটে তৈরি। তখন তিস্তা শহরের পাশে ছিল অনেকটা জায়গা নিয়ে। এই যে।"

বৃদ্ধের স্টিক অনুসরণ রে অর্জুন তাকাতে নদীর চিহ্ন দেখতে পেল। তিস্তা যদি ওটা হয়, তা হলে পাশেই সেনপাড়া এবং হাকিমপাড়া। সে জিজ্ঞেস করল, "তিস্তা সেতুটা কোথায়, যার ওপর দিয়ে ডুয়ার্সে যাওয়া যেত ?"

"সেতু ? শহরের ছবিতে তিস্তার ওপরে কোনও সেতু নেই। রাস্তাগুলো ছিল খুব সরু। কিছু ব্যক্তি চা-ব্যবসার কল্যাণে ধনী ছিলেন, কিন্তু অনেকেই দরিদ্র।"

হঠাৎ অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "ওই তো করলা নদী !"

বৃদ্ধ ফিবে তাকালেন, "হ্যাঁ, তখন ওই নামে একটা খাল ছিল কিন্তু এ-তথ্য আপনি জানলেন কী করে ?"

অর্জুন হকচকিয়ে গেল। উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক হয়নি। বলাকা বলল, "উনি ওই সময় সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন।"

"তাই নাকি ? আমাদের এই ইতিহাস-ঘরের বাইরে তথ্য আছে ? বেশ, তখন অঞ্চলগুলোকে কীভাবে ভাগ করা হত বলুন তো ?"

"পাড়া হিসাবে। আলাদা নাম ছিল পাড়ার। এই যে তিস্তার পাশে আর করলার মধ্যে জায়গাটা, এর নাম ছিল হাকিমপাড়া। এইটে স্টেডিয়াম। আমরা

টাউন ক্লাব স্টেডিয়াম হিসাবে জানি।" অর্জুন উজ্জ্বল মুখে বলল।

"আপনি ঠিক বলছেন। এত বিশদ আমিও জানি না।"

"এই ইতিহাস-ঘর ওই ম্যাপের কোনখানে হবে ?"

বৃদ্ধ তাঁর স্টিকটি যেখানে রাখলেন সেদিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "আরে, এটা তো জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি। পাশে একটা মন্দির ছিল, মন্দিরের পাশে বিরাট বিল। দাঁড়ান, এই সোজা চলে এলাম, দিনবাজারের পুল পেরিয়ে সোজা কদমতলার রাস্তায়, হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে এখন কী বলে ?"

"পাতালরেল দফতর।"

অর্জুন হতভম্ব। বাড়িটা যেখানে সেখানে একশো সত্তর বছর বাদে পাতাল রেলের দফতর হবে। রাজবাড়ির চিহ্ন থাকবে না। সে জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলটাকে খুঁজল। শ্যামাপ্রসাদবাবু এখন হেডমাস্টারমশাই। খুব ভাল লোক। সে জায়গাটা দেখিয়ে বলল, "এইটে একটা বড় স্কুল।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "ওটিকে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু মহাশয়, আপনি এত তথ্য জানতে পারলেন কী করে ?"

অর্জুন হাসল, "জেনেছি। আচ্ছা, মোটে তো একশো সত্তর বছর। এমন কোনও প্রবীণ মানুষের কথা কি জানেন, যিনি তাঁর পিতা বা পিতামহের কাছে অতীত দিনের কথা শুনে মনে রেখেছেন ?"

বৃদ্ধ হাসলেন, "আমিই শুনেছি। আমার পূর্বপুরুষের চা-বাগান ছিল। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন তার একটু আগে একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন যাকে নাকি জলপাইগুড়ি শহরের পিতা বলা হত।"

অর্জুন আচমকা জিজ্ঞেস করল, "তাঁর নাম কি এস পি রায় ?"

"এস পি ? হ্যাঁ তিনি রায় ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়।"

"আপনি সত্যেন্দ্রপ্রসাদের বংশধর ?" অর্জুন হতভম্ব।

"আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন তাঁকে চেনেন ?" বৃদ্ধ এবার বেশ অবাক হলেন। এই সময় বলাকার হাতের ঘড়িতে বিপ্ বিপ্ শব্দ শুরু হল। সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার দূরাভাষ আমি ব্যবহার করতে পারি ?"

"অবশ্যই।" দূরের একটি ডেস্ক দেখিয়ে দিলেন।

বলাকা সেদিকে এগিয়ে গেল। ডেস্কের উলটোদিকে দূরদর্শনের পরদার মতো একটা পরদায় আলো জ্বলে উঠল বলাকা বোতাম টিপতেই। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, সেই সময় যে-সমস্ত মানুষ বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের নাম জানা যাবে ?"

বৃদ্ধ বললেন, "নিশ্চয়ই। কলকাতার বিখ্যাত মানুষদের সংখ্যা অনেক। সেসব তথ্য পেতে কষ্ট হয়নি। বিভিন্ন জেলার মানুষদেরও আমরা যতটা সম্ভব এই সংগ্রহে রেখেছি।" ভদ্রলোক বোতাম টিপতেই ম্যাপ মুছে গেল। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী ধরনের মানুষের কথা জানতে চান ?"

"ভাল খেলোয়াড় ?"

বোতাম টেপা হল। অর্জুন দেখল দুটো নাম ফুটে উঠেছে। তেরোশো পঞ্চাশের পর দু'জন বিখ্যাত খেলোয়াড় হলেন, রুণু গুহঠাকুরতা এবং মণিলাল ঘটক। এঁরা ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

"শিল্পী ?"

বোতাম টেপা হল। না। সেই সময় জলপাইগুড়িতে ভারতবিখ্যাত শিল্পী ছিলেন না।

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় ডক্টর গুপ্তের কথা ভেসে উঠল। ডক্টর গুপ্ত নিশ্চয়ই বিখ্যাত মানুষ। যদিও অনেকেই তখন তাঁর নাম জানত না। কিন্তু শিলিগুড়ির কাছে যেখানে ওঁর গবেষণাগার সেটা জলপাইগুড়ি জেলায় পড়ে না। সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "দার্জিলিং জেলার বিবরণ আছে ?"

বৃদ্ধ তাকে পাশের টেবিলে নিয়ে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তেরোশো আটানব্বই সালে ডক্টর গুপ্ত নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন···।"

বৃদ্ধ বোতাম টিপলেন। পরদায় ফুটে উঠল দার্জিলিং জেলার দুশো বছরের বিখ্যাত বিজ্ঞানী—ডক্টর এস. বি. গুপ্ত এবং তাঁর পরে অনেক নাম।

অর্জুনের মনে পড়ল না, ডক্টর গুপ্তর প্রথম নাম এস বি কি না। তবে এই মানুষটি যে তিনিই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে বলল, "ওই ডক্টর এস বি গুপ্ত সম্পর্কে বেশি কিছু জানলে ভাল লাগবে।"

ডক্টর গুপ্তের নামের পাশের একটা নীল আলো দপদপ করতে লাগল। তারপর পরদায় লেখাগুলো ফুটে উঠল, ডক্টর সুরব্রত গুপ্ত। মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে চোদ্দশো সাত সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তেরোশো আটানব্বইতে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মস্তিষ্কে আঘাত লাগে এবং কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকেন। সুস্থ হওয়ার পর দেখা যায় তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন হয়েছেন। চোদ্দশো দশ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর গবেষণার জন্যই এখন সূর্যের সংসারের বাইরে অন্য একটি গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গ্রহটির নামকরণ তাঁর সম্মানে করা হয়েছে সুরব্রত।

অর্জুনের কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তার মানে ডক্টর গুপ্ত মারা যাননি। আরও নয় বছর গবেষণা করার পরে উনি নোবেল পাবেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ খবর তিনি নিজেও জানেন না।

কতক্ষণ এইসব নিয়ে সে মগ্ন ছিল জানে না। চৈতন্য হল যখন সে দেখল, বলাকার সঙ্গে আরও চারজন প্রৌঢ় তার দিকে এগিয়ে আসছে। একজন তাকে বলল, "আপনি অর্জুন ? বেশ। আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।"

"কোথায় ?"

"প্রধান তদন্তকেন্দ্রে।"

"কেন?"

"আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব। তারপরে যদি প্রয়োজন হয় আপনি আইনের সাহায্য নিতে পারেন। আসুন।"

অর্জুন অসহায় হয়ে বলাকার দিকে তাকাল। বলাকা মাথা নিচু করল। অগত্যা প্রৌঢ়দের অনুসরণ না করে উপায় রইল না অর্জুনের।

যেভাবে হাতকড়া না পরিয়ে বন্দিদের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় সেইভাবেই ওরা অর্জুনকে নিয়ে চলল শহরের প্রান্তে। রাস্তাঘাট চিনতে পারল না সে। মূল প্রবেশদ্বারে কোনও রক্ষী নেই। ড্রাইভার মাইক্রোফোনে সাঙ্কেতিক শব্দ বলতেই গেট খুলে গেল। গাড়ি চলল সরু পথ দিয়ে। আরও দুটো গেট পার হওয়ার পর সবাই গাড়ি থেকে নামল। বিশেষ একটি ঘরে ওদের সঙ্গে ঢুকে অর্জুন দেখল আরও দু'জন মানুষ সেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

একজন প্রশ্ন করল, "ইনিই সেই অবাঞ্ছিত অতিথি? কী নাম?"

দাঁড়িয়ে থেকেই অর্জুনকে জবাব দিতে হল, "অর্জুন।"

"আপনি বলেছেন, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়ি। কোথায়?"

"এখন সেই বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনাদের পাতাল রেলের যেখানে দফতর সেখানেই আমাদের বাড়ি ছিল", অর্জুন নির্বিকার মুখে জবাব দিল।

জবাবটা শোনামাত্র সবাই নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল। একজন বলল, "আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, পাতাল রেলের দফতর প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তত একশো বছর আগে।"

"আমি আপনাদের সময়ের একশো সত্তর বছর আগে ওখানে থাকতাম।"

"আপনি যা বলছেন তা আপনার ধারণায় সত্যি?"

"অবশ্যই।"

"তার মানে আপনি অতীতের মানুষ, এই বর্তমানে কীভাবে এলেন?"

"ডক্টর গুপ্তর বাংলোয় তাঁর তৈরি মেশিনে চড়ে।"

"ডক্টর গুপ্ত কে?"

"তিনি একশো সত্তর বছর আগে সময়, মহাকাশ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করতেন।"

অর্জুন দেখেনি, ইতিহাসঘরের সেই বৃদ্ধকেও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। ইঙ্গিতমাত্র তিনি এগিয়ে এসে নিচু গলায় কিছু জানালেন। সম্ভবত একটু আগে ডক্টর গুপ্ত সম্পর্কে জানা কিছু তথ্য। এবার যেন সত্যি অর্জুনের অস্তিত্ব বিশ্বাস করল ওরা। সঙ্গে-সঙ্গে হইচই পড়ে গেল। একজন প্রশ্ন করল, "আপনি তরুণ। ওই সময়ে জলপাইগুড়িতে আপনি কি করতেন?"

"প্রচলিত অর্থে তেমন কিছু নয়।"

"ডক্টর গুপ্ত একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হল কী করে?"

"তাঁকে আমি সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। তিনি গবেষণার কাজে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমি সেটা সক্ষম হইনি তাঁরই আচরণের জন্য।"

"আপনার সাহায্য তিনি কেন চেয়েছিলেন?"

"আমি একজন সত্যসন্ধানী।"

"এজন্য আপনি শিক্ষা নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। আমার গুরু অমল সোমের সহকারী হিসাবে আমি অনেকটা শিখেছি।"

"তিনি কি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন?"

"যে-কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁকে চিনতেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে ইতিহাসঘরের বৃদ্ধকে নির্দেশ দেওয়া হল, অমল সোম সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য। তিনি টেলিফোন-ডেস্কের সামনে গিয়ে বোতাম টিপে সংযোগ করতেই ইতিহাসঘরের সহকারীকে পরদায় দেখা গেল। সেই ভদ্রলোক নির্দেশ শুনে সেটা পালন করতেই টেলিফোনের উলটো দিকের পরদায় ফুটে উঠল, "অমল সোম—বিস্তারিত বিবরণ শূন্য।"

প্রশ্নকারীর একজন হাসল, "কীরকম বিখ্যাত সেটা বুঝতেই পারছি। গুরুর যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন একবার শিষ্যের খোঁজ করুন।"

ইতিহাসঘরের বৃদ্ধ অর্জুনের নাম জানাতেই তাঁর সহকারী পরদায় ফুটিয়ে তুলল, "অর্জুন, সত্যসন্ধানী, নানান রহস্য উদ্ধার করেছেন। বর্তমান থেকে অতীতে তিনি পরিক্রমা করে এসেছেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় মারা যান।"

এবার এই ঘরে কোনও কথা নেই। বৃদ্ধ টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মুখ্য প্রশ্নকর্তা অর্জুনের দিকে এগিয়ে এলেন, "আমি জানি না আপনি খুব বড় প্রতারক কি না। হয়তো এসব তথ্য জেনেই আপনি আমাদের বিভ্রান্ত করতে এখানে এসেছেন। আবার এও হতে পারে, আপনি যা বলছেন তা সত্যি। সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের পূর্বপুরুষদের একজন। আপনার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় লাগবে। সেই সময় পর্যন্ত আপনাকে আমাদের অতিথি হিসাবে থাকতে হবে।" ভদ্রলোক ইঙ্গিত করতে দু'জন রক্ষী অর্জুনকে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যে-ঘরটিতে তাকে নিয়ে আসা হল তার একটিমাত্র জানলা। কিন্তু তার কাচ বন্ধ। ঘরটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। রক্ষীরা চলে গেলে অর্জুন বুঝল তাকে ওরা বন্দি করে রেখে দিল। হয়তো আরও খোঁজখবর করবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেসব জানার পর রায় দেবেন। সেই রায় যদি তার বিপক্ষে যায় তা হলে?

এরা কি তাকে মেরে ফেলবে ? এখানে এখন শাস্তির পরিমাপ কী ? সে তো কোনও অন্যায় করেনি।

সে ঘরটিকে খুঁটিয়ে দেখল। একটি সুন্দর বিছানা, বিছানার পাশেই টেলিফোন-ডেস্ক। দেওয়ালে কিছু বই। সে এগিয়ে গেল। প্রথম বইটি গীতবিতান। অন্য বইগুলো গীতবিতানের গান নিয়ে লেখা প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান যাদের কাছে বেদ অথবা মহাভারতের মতো, তারা কি তার সম্পর্কে ভয়ঙ্কর হতে পারে ?

অন্যমনস্ক অর্জুন পকেটে হাত ঢোকাতে সিগারেটের প্যাকেটের স্পর্শ পেল। সিগারেট সে খুবই কম খায়। গত আট-দশ ঘণ্টায় তো খায়নি। সে সিগারেট ধরাল। নার্ভের যে অবস্থা তাতে সিগারেট সাহায্য করবে হয়তো। অর্জুন ধোঁয়া ছাড়তেই অদ্ভুত কাণ্ড হল। ঘরের ভেতর দপ করে আলো জ্বলে উঠে সোঁ-সোঁ শব্দ শুরু হল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেল এবং বেশ কিছু উত্তেজিত মুখকে উঁকি মারতে দেখা গেল। অর্জুন হতভম্ব। লোকগুলো তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে। দরজা খোলা থাকায় কানে আসছে সাইরেন জাতীয় কিছু একটা তীব্রস্বরে বাজছে। এই সময় একজন কর্তাব্যক্তি ছুটে এলেন, "আপনি ওটা কী করছেন ?"

"আমি ? সিগারেট খাচ্ছিলাম।"

"সিগারেট ? ওর ভেতর কী আছে ?"

"তামাক। সাধারণ তামাক।"

"নিভিয়ে ফেলুন। চটপট। তাম্নাক পোড়ার ধোঁয়া মানুষের স্বাস্থ্যের শত্রু। আপনি নিজে মরবেন, আমাদেরও মারবেন।"

"এখানে কেউ তামাক খায় না ? সিগারেট বিক্রি হয় না ?"

"ওসব এখানে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ ওসব খাচ্ছে জানলে তাকে কড়া শাস্তি দেওয়া হয়। নিভিয়ে ফেলুন বলছি।"

অর্জুন সিগারেট নেভাল। ওরা এবার একটা যন্ত্র নিয়ে এসে ঘরে যেটুকু ধোঁয়া ছিল সব টেনে নিল। তারপর একটা পাত্রের ভেতর সিগারেট, দেশলাই ফেলে দিতে বলল অর্জুনকে। হুকুম পালন না করে কোনও উপায় ছিল না। ওরা দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার আগে বলে গেল একজন চিকিৎসক আসবেন ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। অর্জুন খাটের পাশে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে চুপচাপ বসল।

সিগারেট খাওয়া নিয়ে এমন কাণ্ড হবে কে জানত! উনিশশো একানব্বইতে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে সতর্কীকরণ লিখে ছেড়ে দেওয়া হত। দেশের ভেতর প্লেনে চাপলে সিগারেট খাওয়া যেত না, হাসপাতালে নয়, ট্রাম-বাস অথবা সিনেমা হলে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন আতঙ্ক তখন সৃষ্টি হয়নি। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, সেই সময় যদি এটা হত তা হলে মানুষের উপকারে

লাগত।

কী আশ্চর্য! এর মধ্যেই সে সেই সময় বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাও করা যায় না। এখন যদি সে ওখানে থেকে যায় তা হলে তার বয়স একশো সত্তর বছর বেশি হয়ে যাবে? অসম্ভব। অর্জুন নিজের গালে হাত বোলালো। গতকাল সকালে সে দাড়ি কেটেছে। কোথাও যাওয়ার না থাকলে সে একদিন অন্তর দাড়ি কাটে। কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা বাদে যতটুকু দাড়ি সাধারণত বাড়ে তার অর্ধেকও বাড়েনি। কেন এমন হল? তার কি এখানে থাকার সময় বয়স বাড়ছে না? সে যদি দশ বছর এখানে থাকে তা হলেও বয়স বাড়বে না?

এই সময় দরজায় শব্দ হল। সেটা খুলে যেতে দু'জন মানুষ কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাদের আপাদমস্তক মহাকাশচারীদের মতো পোশাকে ঢাকা। একজন বললেন, "আমরা চিকিৎসক। আপনার শরীর পরীক্ষা করব। দয়া করে উঠে আসুন।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "এমন অদ্ভুত পোশাক আপনারা পরেছেন কেন?"

"সংক্রামিত হতে পারে এমন রোগ থেকে সতর্ক থাকতে চাই।"

"কিন্তু আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ।"

"আপনি ধূমপান করেন। এটা জানার পর এই সতর্কতার প্রয়োজন হয়েছে।"

অর্জুনের সমস্ত শরীর রশ্মিযন্ত্র দিয়ে পরদায় ফুটিয়ে তুলে বিশ্লেষণ করা হল। তার রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র, রক্তের ঘনত্ব ইত্যাদি পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক বললেন, "এখনও আপনার ফুসফুস নিকোটিনের কবলে পড়েনি। কিন্তু আপনি যদি আর কিছুদিন ধূমপান করেন তা হলে সেই আশঙ্কা থাকছে।"

ওরা আবার দরজা বন্ধ করে চলে গেল। এবার চেয়ারে বসে অর্জুনের মনে হল, অনেক হয়েছে, এবার ফেরার কথা ভাবা দরকার। সে চিরকাল এখানে পড়ে থাকতে পারে না। বাড়িতে মা আছেন। তা ছাড়া, এদের রেকর্ড যদি ঠিক কথা বলে তা হলে সে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবে। তাকে মরতে হবে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে। অর্জুনের এখনই শিরশির করল শরীর, যদিও পঞ্চাশে পৌঁছতে তার ঢের দেরি আছে। কিন্তু তাকে ফিরে যেতে হলে সেই হাইওয়ের পাশের জঙ্গলে যেতে হবে। এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যেতে এরা নিশ্চয়ই দেবে না। অর্জুনের মনে হল, এখানকার মানুষজন একটু আলাদা ধরনের। আবেগ কম, কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব।

তবে হ্যাঁ, এখানে এসে তার কয়েকটা লাভ হয়েছে। প্রথমত, ডক্টর গুপ্ত তাঁর গবেষণা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন এই তথ্য জানা গেল। ভদ্রলোক নোবেল পুরস্কার পাবেন। দ্বিতীয়ত, সে নিজে পঞ্চাশ বছরের আগে মারা যাবে না। তৃতীয়ত, একশো সত্তর বছর পরে জলপাইগুড়ির কী অবস্থা

হবে সেটাও নিজের চোখে দেখা গেল।

চুপচাপ কতক্ষণ কেটে গিয়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মিষ্টি বাজনার আওয়াজ কানে আসতেই সে সোজা হল। ঘরের এককোণে টেলিফোন-ডেস্কে আলো ফুটে উঠেছে। অর্জুন পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। যেভাবে এর আগে কথা বলার সময় অন্যদের বোতাম টিপতে দেখেছে সেইভাবে সে একমাত্র বোতামটি টিপতেই পরদায় একটি পুরুষের ছবি ভেসে উঠল। ভদ্রলোক বললেন, "শুভসন্ধ্যা। তথ্য ও জনকল্যাণ দফতর থেকে বলছি। আজ দুপুরে আমাদের আপনার কথা জানানো হয়েছে। দেশবাসী আপনার সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"করুন। কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

"আচ্ছা। এখনই সেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি···।"

"দাঁড়ান। এখানে আসার পর আমি স্যুপ আর সবজিসেদ্ধ খেয়েছি। আসলে ওতে আমার মন ভরে না, খিদেও মেটে না।"

"আপনি কী ধরনের খাবার খেতে চাইছেন ?"

"একদম দিশি। ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ কিংবা মাংসের ঝোল। অবশ্য এখন যদি সন্ধেবেলা হয়, আপনি শুভসন্ধ্যা বললেন বলেই বলছি, পরোটা আর কাবাব পেলেও চলবে। সঙ্গে এক কাপ ভাল চা।"

"এক মিনিট দাঁড়ান।" ভদ্রলোক সময় চেয়ে নিয়ে কাউকে ইঙ্গিত করলেন দেখা গেল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ, আপনি অর্জুন। একশো সত্তর বছর আগে এই শহরে বসে সত্যসন্ধান করতেন। হঠাৎ ভবিষ্যতে এসে আপনার কেমন লাগছে ? কী-কী পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন ?"

"সব কিছুই পরিবর্তিত। এসব আমরা ভাবতে পারতাম না।"

"তখনকার জীবন আর এখনকার জীবনের মধ্যে কোন্‌টা ভাল ?"

"জীবনযাপনের সুবিধেগুলো এখানে বেশি।"

"আমাদের পূর্বপুরুষ ডক্টর গুপ্তর মহাকাশ এবং সময়সম্পর্কিত আবিষ্কার এখনকার বৈজ্ঞানিকদের খুব সাহায্য করছে। আমরা এখন স্বচ্ছন্দে সময়কে নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্য গ্রহে যেতে পারি। ডক্টর গুপ্তকে আপনি দেখেছেন। একজন মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন ?"

"আমি তাঁকে মাত্র একটি সন্ধে দেখেছি। সেই সময় তিনি আতঙ্কিত ছিলেন, কারণ, তাঁর ভয় ছিল, কেউ তাঁর গবেষণা নষ্ট করে দিতে পারে।"

"কারা ?"

"আমি জানি না।"

"ওহো, এইমাত্র আমাদের খাদ্য দফতর জানিয়েছে, আপনি যেসব খাবার খেতে চেয়েছেন তা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। ভাত-ডাল-তরকারি বা মাছের ঝোলে শুধু উদর ভর্তি হয় কিন্তু কর্মক্ষমতা বাড়ে না। আর পরোটা,

কাবাব সুপাচ্য নয়, আপনার পেটের পক্ষে ক্ষতিকর। আসলে এই অনাবশ্যক খাবারগুলো অনেকদিন হল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের সেইসব খাবার খাওয়া উচিত যা তার শরীরকে পরিপূর্ণ করবে। আপনি মুরগির মাংস সেঁকা অবস্থায় খেতে পারেন এবং তাই আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ভাল দুধ।" ভদ্রলোক হাসলেন।

অর্জুন বিমর্ষ হল, "এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।"

"আপনি কি কিছু বলছেন ?" ভদ্রলোক যেন ঠিক বুঝতে পারেননি।

"আমি যা বলছি তা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"কেন ?"

"যে পায়েস, মালপোয়া বা গোকুল পিঠে খায়নি সে শীতকালের খাবার কত ভাল হতে পারে জানবে কী করে ?"

ভদ্রলোক গম্ভীর হলেন, "হ্যাঁ, এবার আপনার সঙ্গে একটি পরিবারের পরিচয় করিয়ে দেব। সারা দুপুর সন্ধানকাজ চালিয়ে এঁদের আমরা আবিষ্কার করেছি। চেয়ে দেখুন, একেবারে বাঁ দিকে যিনি বসে আছেন তাঁর নাম মধুসূদন। মধুসূদনের পাশে তাঁর স্ত্রী লাবণ্য। লাবণ্যের পাশে ওঁদের ছেলে ক্ষেমঙ্কর এবং পুত্রবধূ মালিনী।"

অর্জুন দেখল পরিবারের চারজনই অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল, এবার নমস্কার করল। তথ্য দফতরের ভদ্রলোক বললেন, "এই পরিবার আপনার উত্তরপুরুষ। আপনার রক্ত এঁদের দু'জনের শরীরে বর্তমান।"

অর্জুন হতভম্ব। বৃদ্ধ, যাঁর নাম মধুসূদন বেশ উত্তেজিত এখন, "আপনি, আপনি আমার প্রপিতামহের প্রপিতামহ ? এভাবে আপনার দর্শন পাব আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।"

"আপনি, আপনি আমার উত্তরপুরুষ ?" কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অর্জুন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দয়া করে আমাকে আপনি বলবেন না। আমি কত ছোট।"

"কিন্তু কী করে নিশ্চিন্ত হলেন ?"

"মানে ? আমার প্রপিতামহের ডায়েরি আমার কাছে আছে। তাতে তিনি তাঁর আটজন পূর্বপুরুষের নাম লিখে গিয়েছেন। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের সম্পর্কে বিশদ লেখা আছে। আপনি সত্যসন্ধানী ছিলেন। দেশে-বিদেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আপনার দুই পুত্র-সন্তান। একজন সন্ন্যাসী হয়ে যান। দ্বিতীয়জনের বংশধর আমরা। আপনার যখন পঞ্চাশ বছর বয়স তখন পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এসব আমি জানি। গল্প পড়ার কৌতূহলে পড়েছি। কিন্তু আপনাকে চোখে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে আমরা তা ভাবিনি। এই হল আমার পুত্র ক্ষেমঙ্কর। ওকে আশীর্বাদ করুন।" বৃদ্ধ মধুসূদন হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে দেখিয়ে দিতে সে আশীর্বাদ নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। অর্জুনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। যে-বংশধরদের

মানুষ কখনওই দ্যাখে না তাদের সামনে অনেক কমবয়স্ক শরীর নিয়ে সে বসে আছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম মধুসূদন, কিন্তু ওঁর ক্ষেমঙ্কর, কেন ?"

"আসলে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রাবলী থেকে নামকরণ করা এখন নিয়ম।"

"কিন্তু ক্ষেমঙ্করের স্ত্রী তো মালিনী ছিলেন না ?"

এবার সুন্দরী মহিলা যাঁর নাম মালিনী, জবাব দিলেন, "না, ছিলেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন, মালিনী ক্ষেমঙ্করকেই ভালবাসত।"

নাটকটি দেখেছে অর্জুন। কিন্তু এমন কিছু ছিল কিনা মনে পড়ল না। তাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে মালিনী বললেন, "একেবারে শেষে মালিনী বলেছেন, মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পতন এবং মূর্ছা। ওটা হয়েছিল ভালবাসার কারণেই।"

এবাব লাবণ্য জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাদের বাড়িতে আসবেন ?"

"আমি কোথায় যেতে পারি তা জানি না। এঁরা আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করছেন।"

তথ্য দফতরের ভদ্রলোক বললেন, "আপনার মঙ্গলের জন্যই তা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যদি জানে আপনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ তা হলে আপনি বিপদে পডতে পারেন। সেটা আমরা চাই না।"

"বিপদে কেন পড়ব ?"

"ইতিহাস বলে বিংশ শতাব্দীব মানুষেরা অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণ ছিল। তারা অকারণে বিশ্বজুড়ে দু-দু'বাব মারাত্মক যুদ্ধ করেছে। সেই যুদ্ধে নৃশংসভাবে তারা শত্রুপক্ষের মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি।"

"সেটা জার্মানি, ব্রিটেন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কেরা করেছিলেন। সাধারণ মানুষ কখনওই সেটাকে মেনে নিতে পারেনি।"

"দেখুন, আপনাদের ইতিহাসে সবসময় রাষ্ট্রনায়কদের কথাই লেখা থাকত, সাধারণ মানুষকে অবহেলা করা হত। যা হোক, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে হল। এবার আপনি বিশ্রাম করুন।"

চট করে আলো নিভে গেল। অর্জুন সুইচ অফ করতেই ঘরের দরজা খুলে গেল। দু'জন মানুষ একটা ট্রলিতে করে খাবারের ডিশ, গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। কোনও কথা না বলে তারা আবার বেরিয়ে গেল। অর্জুন দেখল এক প্লেট রোস্টেড মুরগি আর একগ্লাস দুধ রয়েছে ট্রলির ওপরে। মুরগির মাংসের পরিমাণ প্রচুর। একটুও সময় নষ্ট না করে সে খাবারে মন দিল। নরম মাংস, কিন্তু লবণের পরিমাণ খুব কম। এরা নুনও কম খায় বোধ হয়। পেট ভরে না যাওয়া পর্যন্ত খেয়ে গেল সে। তারপর বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। যেখানে যাই হোক, এখন তার শরীর একটু ঘুম চাইছে।

অথচ ঘুম এল না। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকে নাতি কিংবা পুতির

মুখ দেখে, ও দেখল কয়েক প্রজন্মের পরের মানুষগুলোকে। দেখে অবাক হয়েছিল কিন্তু কোনওরকম টান যা স্নেহ-ভালবাসা থেকে তৈরি হয় তা মনে আসেনি। ওদের কেমন বানানো-সাজানো মানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন।

এরা তাকে নিয়ে ঠিক কী করতে চায় ভেবে পাচ্ছিল না অর্জুন। কিন্তু আর নয়, এবার তার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা দরকার। সে এখন ঠিক কোথায় আছে তা জানা নেই। হাইওয়ের পাশে জঙ্গলের মধ্যে ডক্টর গুপ্তের মেশিনটাকে সে লুকিয়ে রেখে এসেছে। ওই মেশিনটার সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে ফেরা অসম্ভব। যেমন করেই হোক, মেশিনটার কাছে সবার অলক্ষে তাকে পৌঁছতেই হবে।

অর্জুন উঠে বসল। তাকে একই সঙ্গে উত্তেজিত এবং চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কী করে সেই জায়গাটায় যাওয়া যায়? বলাকা যখন তাকে গাড়িতে নিয়ে হাইওয়ে ধরে যাচ্ছিল তখন তো কোনও জঙ্গল চোখে পড়েনি। অথচ সেই জঙ্গল থেকে হাঁটা শুরু করেই সে বলাকাদের বাড়িতে পৌঁছেছিল। অতএব, সেই নির্দিষ্ট হাইওয়েতে যেতে হলে বলাকাদের বাড়ির দিকে যেতে হবে। অর্জুনেব মনে পড়ল, দুপুরের পর থেকে বলাকার দেখা সে পাচ্ছে না।

কিন্তু কী করে সেই জায়গায় যাওয়া সম্ভব হবে? প্রথম কথা, তাকে একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই বাড়ির অন্য দরজাগুলোয় নিশ্চয়ই ভাল পাহারা আছে। এখানে কোনও ট্রাম-বাস চোখে পড়েনি। হয়তো পাতাল রেল সেই জায়গাটার কাছাকাছি যায়। কিন্তু কীভাবে যেতে হয় তা সে জানে না। খুবই অসহায় হয়ে পড়ল অর্জুন।

ঘুমিয়ে পড়েছিল অর্জুন। সেটা কতক্ষণ তা বোঝার উপায় নেই। কারণ, সে আবিষ্কার করল ঘড়ির কাঁটা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে আছে। কী করে একটা অটোমেটিক ঘড়ি হাতে পরে থেকেও বন্ধ হয়ে যায় কে জানে!

অর্জুনের বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল। ঘরের ওপাশে একটা দরজা আছে, ঢোকার পরেই চোখে পড়েছিল। সে বিছানা ছেড়ে সেই দরজায় চাপ দিতে একটা মাঝারি ঘর দেখতে পেল। হালকা আলো জ্বলছে। ঝকঝকে তকতকে আধুনিক টয়লেট। লোকগুলোর তা হলে রুচি আছে।

শরীর হালকা হওয়ার পর সে জানলাটার দিকে তাকাল। কাচের জানলা। ভেতর থেকেই বন্ধ। সে একটু চেষ্টা করতেই জানলাটা খুলে গেল। চোখের সামনে নীল আকাশ। অনেক তারার ভিড় সেখানে। তার মানে এখন রাত অনেক। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে রয়েছে বেশ কয়েক তলা ওপরে। এই জানলা দিয়ে নীচের দিকটা আদৌ দেখা যাচ্ছে না। জানলার গরাদ ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই। অত ওপর থেকে পড়লে আর দেখতে হবে না।

ফিরে আসছিল অর্জুন। হঠাৎ খেয়াল হল, তার মৃত্যু হবে পঞ্চাশ বছর

বয়সে। পঞ্চাশ হতে তো বহুত-বহুত দেরি। অতএব ওই জানলা দিয়ে বেরতে গিয়ে পড়ে গেলেও তার বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু মরবে না এ-কথা বলা হয়েছে, হাত-পা ভেঙে জবুথবু হয়ে বেঁচে থাকবে না এমন কথা তো ওরা বলেনি।

তবু মারা যাবে না যখন, তখন একবার চেষ্টা করা উচিত। অর্জুন টয়লেটে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জানলার গরাদে হাত দিল। অসম্ভব। সমস্ত জানলাটাই ইস্পাতের মোটা জালে মোড়া। তার একার চেষ্টায় সামান্য নড়ানোও সম্ভব নয়।

অর্জুন ফিরে এসে ঘরে একটা পাক খেল। তারপর সদর দরজায় ধাক্কা মারল। তৃতীয়বারের পর সেই দরজাটা খুলল। যে-লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে রক্ষী ছাড়া কেউ নয়। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে এখানে কতক্ষণ বন্দি থাকতে হবে?"

রক্ষী গম্ভীর গলায় জবাব দিল, "ওসব বিষয় আমার জানার কথা নয়। আপনি আগামিকাল সকাল সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"এখন ক'টা বাজে?"

"রাতের তৃতীয় প্রহর সবে শেষ হল।" কথাটা বলেই রক্ষী দরজা বন্ধ করে দিল। ঠোঁট কামড়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে মনে-মনে প্রহরের হিসাব করছিল অর্জুন। তুলসীদাসের গান আছে। 'প্রথম প্রহরে সবাই জাগে, দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী, তৃতীয় প্রহরে তস্কর জাগে, চতুর্থ প্রহরে যোগী।' তার মানে তিন ঘণ্টায় এক প্রহর হলে তৃতীয় প্রহর শেষ হচ্ছে নয় ঘণ্টায়। সন্ধে ছ'টা থেকে নয় ঘণ্টা মানে এখন সবে তিনটে বেজেছে। সে ঘড়ির কাঁটা তিনটেতে নিয়ে গেলেও সেটা চালু হল না। হঠাৎ খেয়াল হতে সে দিন এবং বছরের কাঁটা ঘুরিয়ে একশো সত্তর বছর এগিয়ে নিয়ে আসা মাত্র আশ্চর্যজনকভাবে ঘড়ি চালু হল। অর্থাৎ, ঘড়িও ঠিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায়?

হঠাৎ কানে একটা শব্দ হল। কোনও কিছু যেন ঘষটে গেল। অর্জুন চারপাশে তাকাল। সবই তো স্বাভাবিক। সে বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল গরাদের ইস্পাত অদ্ভুতভাবে বেঁকে গিয়েছে। একটু আগেও ওরকম ছিল না। এখন অন্তত এক ফুট ফাঁক হয়ে গিয়েছে। কী ভাবে হল? অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করল। এখনই কেউ এমন কর্ম করেছে। কে করল! এই সময় তার কানে মৃদু স্বরে একটা ডাক পৌঁছল। খুব মৃদু। কিন্তু ডাকটা যে কুকুরের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে আসার পর সে কোনও জীবজন্তু দেখতে পেয়েছে কি না খেয়াল করতে পারল না। এত ওপরে কুকুরের ডাক? ওরা কি তার ওপর নজর রাখার জন্য কুকুর রেখেছে? অর্জুন অন্যমনস্কভাবে ঘরে ফিরে বিছানায় বসতে যেতে খুব কাছ

থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেল। ভাল করে তাকাতেই চক্ষুস্থির। এ তো তাতান! ডক্টর গুপ্তের সেই ছোট হয়ে যাওয়া কুকুর, যার সন্ধানে অন্য গ্রহ থেকে উপদ্রব আসত!

সেই ছোট্ট কুকুর সমানে ডেকে যাচ্ছে। অর্জুন অনেকটা ঝুঁকে আদুরে গলায় ডাকল, "তাতান। তা-তান।" সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা ডাক থামিয়ে কুঁই-কুঁই শব্দ করতে লাগল লেজ নাচিয়ে। অর্জুন ওকে হাতে তুলে নিল, "তাতান, তুই এখনও বেঁচে আছিস? অদ্ভুত ব্যাপার। তুই এখানে এলি কী করে?"

তাতান পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে সামনের পাদুটো তুলে লাফাবার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছিল অনেককাল পরে সে একটা চেনা মানুষকে দেখতে পেয়েছে। অর্জুন কোনও ব্যাখ্যা পাচ্ছিল না। সে যখন মেশিনে উঠে বসেছিল তখন তাতান ছিল বাক্সে। সময়যন্ত্রের মাধ্যমে এতদূর আসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ওই ছোট্ট কুকুর এত ওপরে উঠে এসে ইস্পাত বাঁকাতেও পারবে না।

অর্জুন তাতানের গলায় আঙুল বুলিয়ে আদর করল, "তাতান, আমি এখন বন্দি। কীভাবে ফিরে যাব জানি না। তোকে দেখে খুব ভাল লাগছে।"

হঠাৎই খাটের খানিকটা দূরে রাখা চেয়ারটা ঘষটে একটু এগিয়ে এসে দুলতে লাগল। অর্জুন হতভম্ব। এরকম ভৌতিক ব্যাপার দেখে অন্য সময় কী করত সে জানে না কিন্তু তাতান সঙ্গে থাকায় সে শক্ত হয়ে তাকাল। তার মনে পড়ল ডক্টর গুপ্তের গাড়িটার কথা। ডক্টর গুপ্ত যাকে উপদ্রব বলতেন সেই ভিন্ন গ্রহের প্রাণীটি এসে গাড়ির ডিকি খুলে কত না ভৌতিক কাণ্ড করেছিল সেই বিকেলে।

এখানেও তেমনই কিছু ঘটছে? অর্জুন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। চেয়ারটা চুপচাপ এখন। তাতান তার মুখের দিকে তাকিয়ে। অর্জুনের মনে হল সেই 'উপদ্রব'টি নিশ্চয়ই তাতানকে নিয়ে এসেছে, নইলে এর এখানে আসার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু তাতান একশো সত্তর বছর পরেও বেঁচে আছে?

অর্জুন চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কে জানি না, তবে মনে হচ্ছে আপনি তাতানের বন্ধু। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?"

কোনও জবাব এল না। শুধু চেয়ারটা সামান্য সরে গেল। অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আমার ভাষা বুঝতে পারছেন না?"

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

এবার তাতানকে দেখা গেল উত্তেজিত হয়ে বিছানার ধারে চেয়ারের দিকে ছুটে যেতে। একেবারে কিনারে পৌঁছে চেয়ারের দিকে মুখ করে সে সমানে চিৎকার করতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ারটা সরে এল বিছানার পাশে। তাতানের গলা থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হচ্ছিল এবার। রাগী কুকুরকে আদর করলে এমন শব্দ বের করে তারা। অর্থাৎ ওই আদরে তাতান খুশি হচ্ছে না।

ঘরের ভেতর এখন তিনটি প্রাণী, যার একজন অদৃশ্য। অর্জুন ঝুঁকে তাতানের গায়ে হাত রাখতেই মনে হল কিছু যেন চট করে সরে গেল হাতের তলা থেকে। অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি হল সেই মুহূর্তে। অর্জুন তাতানকে কোলে তুলে নিল, "তাতান, তোমার বন্ধুকে বল আমি খুব বিপদে পড়েছি, আমি সাহায্য চাই।"

কুকুরের কাছে প্রশ্নের জবাব চায়নি অর্জুন, যার কাছে চেয়েছিল সে রইল চুপচাপ। অর্জুন মরিয়া হল, "যদি আমাকে সাহায্য করতে ইচ্ছে থাকে তা হলে ওই চেয়ারটাকে খাটের নীচের দিকে সরিয়ে দেওয়া হোক।"

প্রায় দশ সেকেন্ড কিছুই হল না, তারপর সবিস্ময়ে অর্জুন দেখল চেয়ারটা সরে গেল খাটের একপাশে। আর তারপরেই বাথরুমের জানলায় মটমট করে শব্দ হতে লাগল। শব্দ থেমে যাওয়ার পর অর্জুন এগিয়ে গেল তাতানকে খাটের ওপর রেখে বাথরুমের ভেতর। গিয়ে সে দেখল জানলার অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে জানলা দিয়ে বাইরে বেরতে পারে। অর্জুন ঘরের দরজায় ফিরে অবাক, তাতান নেই। কিন্তু তার ডাকটা কানে আসছে জানলার দিক থেকে। অর্থাৎ তাতানকে আড়ালে নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে 'উপদ্রব'টি। অর্জুনের মনে হল এই মুহূর্তে আর ভিন্ন গ্রহের অধিবাসীকে উপদ্রব বলাটা ঠিক হবে না। সে দু' হাতে ভর রেখে জানলায় উঠে শরীরটাকে গরাদের বাইরে নিয়ে এল। অনেক নীচে রাত্রের রাজপথ। সেখানে কোনও মানুষ অথবা যানবাহন দেখা যাচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম হল। এত ওপর থেকে নীচে নামবে কী করে ?

অর্জুন পাশের দেওয়ালগুলো দেখল। না, জলের পাইপ বা ওই জাতীয় কোনও বস্তু নেই যা বেয়ে নীচে নামা যায়, কার্নিসে দাঁড়িয়ে সাতপাঁচ ভাবছে যখন, তখনই একটা বড় ধাক্কা খেল সে। ধাক্কা এমন আচমকা ছিল যে, তার পদস্খলন হল এবং প্রায় ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে হু-হু করে নামতে লাগল। অর্জুন বাঁচার জন্য মরিয়া হল। কোনওরকমে মাথাটাকে ওপরে নিয়ে যেতে পারল সে। কিন্তু যে গতিতে সে নামছে তাতে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেতে বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না। মাটির কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছে তখন দুই কাঁধ এবং কোমরে মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত একটা টান অনুভব করল সে। শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি লাগল, কিন্তু নিজের শরীরটাকে ধীরে-ধীরে ফুটপাথে নেমে আসতে দেখল সে। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার কোমর, কাঁধ টনটন করছে। অত ওপর থেকে পড়ার পরেও বেঁচে থাকার বিস্ময়টা সেইসঙ্গে প্রবল, সে এখন বুঝে গিয়েছে ডক্টর গুপ্তের সেই উপদ্রবটা এবার তাকে বাঁচাল। কিন্তু তারা ধারেকাছে নেই বা থাকলেও সে দেখতে পাচ্ছে না।

অর্জুন ভেবেছিল পা বাড়ালেই পড়ে যাবে, কিন্তু পড়ল না। এক পা এক পা

করে সে ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়াল। পেছনের ঘরবাড়িগুলো এখন অন্ধকার, দরজা বন্ধ। এখান থেকে কিভাবে হাইওয়ের ধারের জঙ্গলে পৌঁছনো যায় ? সে হাঁটা শুরু করল। কোথায় যাচ্ছে, রাস্তাঘাট কী, তা সে জানে না। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা চিহ্ন, তার নীচে লেখা, পাতাল রেল। পাশ দিয়ে নীচে নামার সিঁড়ি।

সেখানে পা দিয়ে ও জলপাইগুড়িব ম্যাপ দেখতে পেল। একটু খুঁটিয়ে দেখে সে স্টেডিয়ামটাকে চিনতে পারল, ওইখানে বলাকা তাকে নিয়ে গিয়েছিল। বলাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেডিয়ামে যাওয়ার সময় 'সুস্বাগতম' লেখা দেখতে পেয়েছিল। তার মানে বলাকার বাড়ি শহরের বাইরে, স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকে। অনেকক্ষণ দেখার পর আন্দাজে মনে হল জায়গাটাকে সে চিনতে পারছে। বলাকাদের বাড়ি ছাড়িয়ে যে হাইওয়ে চলে গিয়েছে, সেইখানে তাকে যেতে হবে। মূল শহরের ম্যাপের পাশে পাতাল রেলের ম্যাপ। অর্জুন দেখল সেদিকটায় পাতাল রেলের একটা লাইন শেষ হয়েছে। লাইনের নাম, মুক্তধারা। এদের পাতাল রেলের বিভিন্ন লাইনের নামকরণ হয়েছে কবিগুরুর নাটক থেকে।

কিন্তু পাতাল রেলে চড়তে গেলে টিকিট লাগবে। অভিজ্ঞতা আছে তার। টিকিট যন্ত্রের ভেতর না ঢোকালে দরজা খোলে না। টিকিট কেনার পয়সা তার নেই। একশো সত্তর বছর আগেকার নোট যে এখন বাতিল হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। মুহূর্তেই কর্তৃপক্ষ তার অস্তিত্ব জেনে যাবে। এখন কি পাতাল রেল চলছে ? অর্জুন ইতস্তত করছিল এমন সময় একটা লোককে অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে আসতে দেখল। লোকটার রকমসকম খুব চেনা। হিন্দি সিনেমায় যে গুণ্ডাদের দেখা যায় এর ভাবভঙ্গি তাদের মতন।

লোকটা ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়াল, "বাঁচতে চাও তো পকেটে যা আছে দাও।"

অর্জুন এমন অবাক যে, না বলে পারল না, "এখানে এখনও গুণ্ডামি হয় ?"

"আবার বাজে কথা ! দাও ?" রীতিমতো ধমকে উঠল লোকটি।

অর্জুন বিনা বাক্যব্যয়ে পকেটের সব টাকা লোকটার হাতে দিয়ে দিল। আধা-অন্ধকারে লোকটা বলল, "এসব কী হাবিজাবি দিচ্ছ ? তোমার ক্রয়পত্র নেই ?"

"না।" অর্জুনের মনে পড়ল বলাকা একটা কার্ড নিয়ে ঘোরে।

"এগুলো কী ?"

"টাকা।"

"দুস।" লোকটা খুব বিরক্ত হয়ে টাকাগুলো ফেরত দিয়ে বলল, "কপালটাই খারাপ। তা ক্রয়পত্র সঙ্গে না নিয়ে বেরিয়েছ, পাতাল রেলে চড়বে কী করে

বুদ্ধুরাম ?”

“সে-কথাই ভাবছি।”

“বুঝেছি, তুমি আমারই মতন শিকার খুঁজছ। নাম কী ?”

“অর্জুন।”

“আমি রঘুপতি, তোমার দলে কেউ আছে ?”

“না, আমি একা।”

“আমিও। এখনও ধরা পড়িনি। তুমি পড়েছ ?”

“না।”

“বেশ ভাল হল। কোথায় যাবে ?”

“মুক্তধারার শেষ প্রান্তে।”

“আরে, ওখানেই তো আমার বাড়ি। তোমাকে আগে দেখিনি কেন ? চলো, আজ রাত্রে আর কিছু হবে না। তবে ক্রয়পত্র সঙ্গে না নিয়ে এলে কী করে ?” লোকটা হাঁটতে-হাঁটতে প্রশ্ন করল।

“এসে গেলাম।” অর্জুন সমানে তাল দিচ্ছিল।

“উচিত হয়নি। পাতাল রেলকে ঠকানো উচিত নয়। এবার আমি তোমার প্রবেশপত্র কিনে নিচ্ছি।” লোকটা এগিয়ে গেল একটা মেশিনের দিকে। ওরা তখন পাতাল রেলের মূল দ্বারে পৌঁছে গিয়েছে। অর্জুন দেখল, মেশিনে কার্ড পাঞ্চ করে লোকটা দুটো টিকিট বের করে নিল। সেই টিকিট গেটের গর্তে ঢুকিয়ে ওরা প্ল্যাটফর্মে চলে এল। এখন প্রায় ভোর পাঁচটা। মাটির নীচে পাশাপাশি আটটি প্ল্যাটফর্ম এই ভোরে দু-তিনজন যাত্রী দাঁড়িয়ে। রঘুপতি বলল, “এখানে কিছু করবে না। চারধারে জাল পাতা আছে।”

ঠিক পাঁচটা দশে ওবা ট্রেনে উঠল। ট্রেনের ভেতরটা রবীন্দ্রনাথের নানা লাইন ছবির মতো লেখা। কিছু চরিত্রেব ছবিও আছে।

অর্জুন ছুটন্ত ট্রেনে বসে জিজ্ঞেস কবল, “তুমি কী করো ?”

“মাংস বিক্রি করতাম। পাঁচ মাস আগে ওরা আমার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে।”

“কেন ?”

“মাংসটা ভাল ছিল না।”

“এখন চলে কী করে ?”

“বেকার ভাতা দেয়। তাতে চলে নাকি ? তাই সপ্তাহে একদিন বেরিয়ে এসে এই কাণ্ড করি। ক্রয়পত্র হাতিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তাই দিয়ে জিনিসপত্র কিনে সেটাকে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। তুমি কী করো ?”

“সত্যসন্ধান।”

“সেটা কী জিনিস ?”

“তুমি বুঝবে না। ধরা পড়লে কী হবে তোমার ?”

"কুড়ি বছর। তোমার ?"

"আজীবন।" অর্জুন হাসল।

"তা হলে তো তুমি আমার চেয়েও বড় কিছু করো ?"

এক-একটা স্টেশনে পাতাল রেল দাঁড়াচ্ছিল আর যাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। তারা উঠে অর্জুনের দিকে তাকাচ্ছিল বারেবারে। কিন্তু সে একজন যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছে দেখে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল।

রঘুপতি হাসল, "এই পোশাক কোথায় পেলে ?"

"পেয়ে গেলাম।"

"খুব মজাদার পোশাক।"

মুক্তধারার শেষ প্রান্তে ওরা ট্রেন থেকে নামল। গেট থেকে বাইরে পা দিতেই আকাশবাণী হল, "জলপাইগুড়ি শহরের অধিবাসীদের জানানো হচ্ছে গতকাল অতীত-থেকে-আসা একটি মানুষকে গ্রেফতারের পর যখন পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিল তখন সে বিভ্রম তৈরি করে পালিয়ে গিয়েছে। তার পোশাক মজাদার কিন্তু সে অতীব বুদ্ধিমান। ইস্পাতের গরাদ ভেঙে বহুতল বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েও সে জীবিত অবস্থায় এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক ওই ব্যক্তিকে দেখামাত্র কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে পুরস্কৃত করা হবে।"

রঘুপতি দাঁড়িয়ে পড়েছিল ঘোষণাটা শুনতে। স্টেশনের মাইকে ঘোষণাটা শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ রঘুপতি সাঁ করে অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই কেউ তাকে নির্দেশ দিল আঘাত করো। অর্জুনের হাত এবং পা একই সঙ্গে রঘুপতির শরীরে আঘাত করতেই সে ছিটকে পড়ল মাটিতে। কে দেখছে না দেখছে লক্ষ না করে অর্জুন দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

এদিকের রাস্তাঘাট পরিষ্কার এবং বাড়িঘরের সংখ্যা কম। এখন ভোর বলেই সম্ভবত রাস্তায় মানুষ নেই। বেশ কিছুটা যাওয়ার পব সে দেখল একজন বৃদ্ধা তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। গাড়িতে কোনও ড্রাইভার নেই। সম্ভবত বৃদ্ধাই চালাবেন। অর্জুন একেবারে বৃদ্ধার সামনে পৌঁছে গেলে তিনি মুখ ফেরালেন। ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড স্থূলকায়। কিন্তু হাসিখুশি।

তিনি অর্জুনকে বললেন, "সুপ্রভাত।"

"সুপ্রভাত।" অর্জুন চটপট জবাব দিল।

বৃদ্ধা এবার ঝুঁকে গাড়ির দরজা খুলতে গেলেন। চাবি নয়, দরজার গায়ের চাকতির নম্বর ঠিক জায়গায় নিয়ে এলে দবজা খুলে যাবে। বৃদ্ধা সেটা মন দিয়ে করার চেষ্টা করতেই তাঁর হাত থেকে ব্যাগ পড়ে গেল। অর্জুন সেটা কুড়িয়ে ফেরত দিতে বৃদ্ধা খুব খুশি হলেন, "অনেক ধন্যবাদ। আজ-কাল করে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া হচ্ছে না। আপনি খুব ভাল মানুষ। বাতের

ব্যথার জন্য ঝুঁকে কিছু কুড়োতে আমার কষ্ট হয়।”

অর্জুন বলল, “আমাকে আপনি বলবেন না, আমি অনেক ছোট।”

“বাঃ। এরকম কথা তো এখনকার যুবকদের মুখে শুনি না।” বৃদ্ধা গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ বসলেন, “তুমি এদিকে থাকো?”

“না। হাইওয়ের ওপাশে থাকি।”

“হাইওয়ের ওপাশে? সে তো অনেকদূর। এলে কী করে?”

“আমার এক বন্ধুর গাড়িতে। এখন ফিরব কী করে তাই ভাবছি।”

“আহা। এসো, এসো, আমার যদিও অতদূরে যাওয়ার কথা ছিল না, তবু চল, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছি। কী নাম তোমার?”

তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসে সে জবাব দিল, “অর্জুন।”

“চমৎকার নাম। আমার মেয়ের নাম চিত্রাঙ্গদা।” বৃদ্ধা গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন লক্ষ করল, এই গাড়িটা বলাকার গাড়ির মতনই, তবে ড্যাশবোর্ডে সেই টিভির পরদাটা নেই। শান্ত সকালে গাড়ি ধীরে-ধীরে শহর থেকে বেরিয়ে আসছিল। অর্জুনের চোখে পড়ল রাস্তার মোড়ে-মোড়ে সাদা ইউনিফর্ম-পরা পুলিশেরা দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধাও সেটা দেখলেন। নিজের মনেই বললেন, “হঠাৎ এত রক্ষী কেন? আমার বাপু ওদের ভাল লাগে না।”

অর্জুন সিঁটিয়ে ছিল। তার মনে হচ্ছিল, এত পুলিশ রাস্তায় শুধু তাকেই খুঁজে বের করার জন্য। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন বৃদ্ধা। বাড়িটার মাথার ওপরে লেখা রয়েছে, “উপাসনা মন্দির”। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কিছুক্ষণ মন্দিরে থাকব। তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও?”

‘হ্যাঁ’ বললে বৃদ্ধা খুশি হতেন। কিন্তু আশেপাশে গাড়ির সংখ্যা দেখে অর্জুন বুঝল, মন্দিরে ভাল ভিড় হবে। ইতিমধ্যে ঘোষণা শুনে ফেলা কোনও লোক তাকে দেখে সন্দেহ করলেও দফা রফা হয়ে গেল। সে হাসল, “আমি না হয় অপেক্ষা করি।”

“বেশ।” বৃদ্ধা নেমে গেলেন। থপথপ করে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, হাতে ব্যাগ নিয়ে। অর্থাৎ ব্যাগটির ব্যাপারে তিনি বেশ সতর্ক।

অর্জুন গাড়িতে বসে ছিল চুপচাপ। তারপর কী মনে হতে গাড়ির ড্যাশবোর্ড খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এইটে ইঞ্জিন চালু বা বন্ধ করার সুইচ। বৃদ্ধা এইটে নীচে নামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করেছিলেন। এইটে কী? পাশে কিছু লেখা নেই। গোটা-আটেক নানা ধরনের সুইচ সে টিপতে লাগল ইঞ্জিন চালু করার সুইচটিকে বাদ রেখে। হঠাৎ রেডিও বেজে উঠল। গান হচ্ছে, ‘ও আমার সোনার বাংলা’। বাঃ, চমৎকার। অর্জুনের মনে হল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে যাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কপিরাইট আইনের সময় শেষ হওয়ায় তাঁর গান নিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে, তাঁদের এখানে এসে শোনা উচিত। মৃত্যুর একশো সত্তর যোগ পঞ্চাশ বছর পরেও কী সততার সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে।

গান শেষ হতেই ঘোষক বললেন, "সতর্কীকরণ! আজ ভোরবেলায় জাতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এক ব্যক্তি আমাদের সুরক্ষা দফতরের জানলা ভেঙে পালিয়ে গিয়েছে। লোকটির পোশাক বিংশ শতাব্দীর মানুষের মতো, ধূমপান করে এবং নিজের নাম অর্জুন বলে পরিচয় দেয়। লোকটি একা কি না তা জানা নেই। তবে যেভাবে সে নিখোঁজ হয়েছে তাতে বোঝা যায়, তার সঙ্গী থাকতে বাধ্য। যে-কেউ এই লোকটির সন্ধান পাবেন তাঁকেই কালবিলম্ব না করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

অর্জুনের শিরদাঁড়া কনকন করে উঠল। ওরা এখন তাকে খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে উঠেছে। উপাসনা মন্দিরে যদি ওই ঘোষণা শোনা যায় তা হলে বৃদ্ধা এতক্ষণে···! সে রেডিওর সুইচ অফ কবল। তারপর জায়গা পরিবর্তন করে স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসল। স্টিয়ারিং বলতে একটা গোল চাকতি। ক্ল্যাচ নেই, গিয়ার নেই শুধু অ্যাক্সেল্যারেইটর্ আর ব্রেক। সে ইঞ্জিন চালু করে অ্যাক্সেল্যারেইটর চাপ দিতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। প্রথমে হাত কাঁপছিল। কিন্তু মোটরবাইক চালানোর অভ্যাস থাকায় গাড়ির চলাকে আয়ত্ত করতে অসুবিধে হল না। এমন মজার ড্রাইভিং যদি বিংশ শতাব্দীতে জলপাইগুড়ির মানুষ করতে পারত! প্রথম মোড় এগিয়ে এল। দু'জন পুলিশ তার দিকে অলস চোখে তাকিয়ে আছে। দমবন্ধ করে অর্জুন মোড়টা পার হতেই 'বাহির পথ' লেখা বোর্ড দেখতে পেল। সে দ্রুত গাড়ি সেই পথে নিয়ে যেতে-যেতে গতি সামলালো। সামনে এখন প্রচুর গাড়ি। এভাবে চালিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে কোনও লাভ নেই। এ-জীবনের জন্য এখানেই থেকে যেতে হবে।

ধীরে-ধীরে সে অন্য গাড়িদের অনুসরণ করে হাইওয়েতে উঠে এল। ওঠার পরেই মনে হল সে জানে না কোন দিকে যেতে হবে। ডান না বাম। বামে যেতে হলে ফ্লাইওভারে উঠে ওপাশে গিয়ে গাড়ির স্রোতে মিশতে হবে। অর্জুন অনুমান করল তাকে ডান দিকেই যেতে হবে, কারণ সে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হাইওয়েতে যে-গতিতে গাড়ি যাচ্ছে, আনাড়ি হাতে তার সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল। দু'-দু'বার দুটো গাড়ির ধাক্কা লাগতে-লাগতে বেঁচে গেছে। লেন ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছে। তবু স্পিড বাড়াতে দ্বিধা করছে না অর্জুন। হঠাৎ চোখে পড়ল মাথার ওপর সাইনবোর্ড, "বিদায় অতিথি, জলপাইগুড়ির স্মৃতি সুখকর হোক।" সাইনবোর্ডটার তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে সে দেখল এপাশে সুস্বাগতম লেখা। আঃ। সে ঠিক পথেই যাচ্ছে। বলাকা তাকে এই পথেই নিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ পেছন থেকে বিপ-বিপ শব্দ ভেসে এল। গাড়ির আয়নায় অর্জুন দেখল একটা লাল আলো জ্বালানো গাড়ি তার পেছন-পেছন আসছে ওই শব্দ

করতে-করতে। এটা নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি। পুলিশ তার খবর পেল কী করে ? বৃদ্ধা কি তাঁর গাড়ি হারানোর ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছেন ? অর্জুন আরও গতি বাড়াল। তার গাড়িই একমাত্র হর্ন দিচ্ছে। ফলে অন্য গাড়ি সামনে থেকে সরে গিয়ে পথ করে দিতে লাগল। এঁকেবেঁকে অর্জুনের গাড়ি ছুটতে লাগল সামনে। পেছনে পুলিশের গাড়িটা একটু হকচকিয়ে গিয়ে গতি বাড়াল। খানিকটা যাওয়ার পর অর্জুন বুঝতে পারল পুলিশের গাড়িটা অনেক শক্তিশালী। প্রায় তার গায়ের কাছে চলে এসে পুলিশ অফিসার হাত-মাইকে আদেশ করলেন "গাড়ি থামাও নইলে গুলি করব।"

অর্জুন কান দিল না। এদিকটায় রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা জমি। হঠাৎ ডান দিকে জঙ্গল দেখতে পেল। পুলিশের গাড়ি এবার তার ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। রিভলভারটাকে প্রায় নাকের ডগায় দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেল অর্জুন। তার হাত কেঁপে উঠল। ব্রেকে পা দেওয়ার বদলে চাপ বাড়ল অ্যাক্‌সেল্যারেইটরে। দড়াম করে একটা আওয়াজ হল। অর্জুনের গাড়ির ধাক্কায় পুলিশের গাড়ি ছিটকে গেল রাস্তার একপাশে। অর্জুনের গাড়ি পাক খেতে-খেতে শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে ছুটল আরও জোরে। পেছনে কাত হয়ে থাকা পুলিশের গাড়ির দিকে তার নজর দেওয়ার সময় নেই।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বিপ্‌-বিপ্‌ আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার অবস্থা। অর্জুন বুঝল আরও পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে তার দিকে। এরা সম্ভবত হাইওয়ের ধাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ওবা গুলি করবেই। অর্জুন পাশের জঙ্গলের দিকে তাকাল। এই জঙ্গলটাই তো ? তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। সেগুলো কোথায় ? বুলডগের মতো গাড়িগুলো ছুটে আসছে পেছনে। অর্জুন দেখতে পেল হাইওয়ে থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। সে চকিতে স্টিয়ারিং ঘোরাল। ব্রেক কষেও শেষরক্ষা করতে পারল না, গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল রাস্তার পাশের রেলিঙে। মেরে স্থির হয়ে গেল।

দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে অর্জুন জঙ্গলের দিকে দৌড়তে লাগল। পুলিশের গাড়িগুলো ব্রেক কষে থামতে-থামতে সে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এবং তখনই তার কানে খুব নিচু পরদায় ঘেউ-ঘেউ ডাক ভেসে এল। অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "তাতান।"

কিন্তু চিৎকারটা এবার পেছন থেকে। অর্জুন দেখল একগাদা পুলিশ চেনবাঁধা কুকুর হাতে নিয়ে ছুটে আসছে। কুকুরগুলো হিংস্র, ডাকছে তারাই। অর্জুন ছুটল। একটা সময় কুকুরের ডাক মিলিয়ে গেল, কিন্তু খুব কাছ থেকে নিচু গলার ডাক ভেসে এল। অর্জুনের মনে হল তাতানকে নিয়ে সেই অন্য গ্রহবাসী তার সামনে এগিয়ে চলেছে। এর মানে ওরা সারাক্ষণ তাব সঙ্গে ছিল।

মাথার ওপর এখন বিমানের আওয়াজ। অদ্ভুত চেহারার বিমানগুলো এখন জঙ্গল খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎই তাদের একটা অর্জুনকে দেখতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে জোরালো আগুনের একটা রশ্মি নেমে এল ওপর থেকে। অর্জুন দৌড়ে সময়মতো সরে গিয়ে দেখল সেই জায়গার গাছপালা পুড়ে কালো হয়ে গেল।

স্তিমিত হয়ে আসা কুকুরের ডাক অনুসরণ করে কিছুটা যেতেই সে তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ দেখতে পেল। অর্জুন এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, খেয়াল করেনি একজন পুলিশ অফিসার তার দিকে এগিয়ে আসছে। যখন দেখতে পেল তখন মেশিনটার উদ্দেশ্যে না দৌড়ে কোনও উপায় নেই।

মাথার পাশ দিয়ে দু-দু'বার গুলি ছুটে গেল। মেশিনটার কাছে পৌঁছে দরজা খুলে সে পেছনে তাকিয়ে হিংস্র পুলিশটিকে দেখতে পেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে বন্দুক তাক করেছে। হঠাৎই লোকটা হতভম্ব হয়ে পাশে ঘুরে দাঁড়াল। অদৃশ্য কিছু তাকে ধাক্কা মেরেছে বলে মনে হল। অর্জুন আর অপেক্ষা না করে মেশিনে উঠে বসে ইঞ্জিন চালু করার সুইচে হাত দিয়ে নব ঘোরাতে লাগল। একশো সত্তর বছর পিছিয়ে যেতে হবে তাকে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা। অর্জুন চোখ মেলে দেখল চারপাশ কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। সে কোথায়, প্রথমে ঠাওর করতে পারল না। শরীর একটু স্থির হতে সে মেশিন থেকে নামার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড বাদে সে বুঝতে পারল এটা ডক্টর গুপ্তর গবেষণাগার। কোনও পুলিশ অফিসার সামনে নেই বন্দুক উঁচিয়ে।

অর্জুন ধীরে-ধীরে দরজার কাছে এগোল। না। বিদ্যুতের ছোঁয়া নেই ওখানে। দরজা ঠেলল সে। ধীরে-ধীরে খুলে গেল সেটা। সেই সিঁড়ি এখন অন্ধকারে ঢাকা। নীচের ঘরে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। কিছু লোক কথাবার্তা বলছে। অর্জুন হ্যাজাকের আলো লক্ষ করে নীচে নেমে আসতেই একজন চিৎকার করে উঠল, "কে ? কে ওখানে ?" অর্জুন দেখল, খাঁকি পোশাক পরা পুলিশ অফিসার।

ভদ্রলোক একা নন, সঙ্গে আরও তিনজন সেপাই আছেন। চারজনেই উঠে এসেছেন অর্জুনের সামনে। প্রত্যেকের চোখেমুখে বিস্ময়।

অর্জুন বলল, "আমি অর্জুন। ডক্টর গুপ্ত আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।"

অফিসারটির চোখ ছোট হল, "কখন নিয়ে এসেছিলেন ?"

"সন্ধেবেলায়। ঠিক সন্ধে হয়নি তখনও।"

"আপনি ওপরে ছিলেন সেই থেকে ?"

"হ্যাঁ।"

"মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাননি ? আমরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি এই বাড়ি। ওপরের ঘরে কেউ ছিল না। এই, একে অ্যারেস্ট করো।" অফিসার হুকুম করলেন।

এর কিছুক্ষণ বাদে, গভীর রাত্রে অর্জুন শিলিগুড়ির থানায় বসে ছিল। দারোগাবাবু বাইরে গিয়েছেন কাজে। তিনি না ফেরা পর্যন্ত কেউ তার কথা শুনবে না।

অর্জুন হতাশ হয়ে পড়ছিল। একশো সত্তর বছর আগে গিয়ে তাকে পুলিশের হাতে পড়তে হয়েছিল। প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেও সেই একই অবস্থা ?

দারোগাবাবু এলেন রাত দুটোর সময়। রিপোর্ট নিশ্চয়ই আগেই পেয়েছিলেন, ঘরে ঢুকে বললেন, "কে হে তুমি ? ওই বাংলোয় কোন মতলবে ঢুকেছিলে ?"

অর্জুন বলল, "আপনারা খুব ভুল করছেন। আমি একজন সত্যসন্ধানী। আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়ি শহরে থাকি। ডক্টর গুপ্তই আমাকে ওখানে নিয়ে যান।"

হঠাৎ দারোগাবাবুর মুখচোখ বদলে গেল, "আরে তাই তো ! আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? ডক্টর গুপ্তকে যখন হসপিটালাইজড করা হয় তখনও তিনি আপনার নাম বলছিলেন !"

"উনি কেমন আছেন ?"

"খুব খারাপ। বাঁচার কোনও চান্স নেই। হেড ইনজুরি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।"

"বেঁচে যাবেন।" অর্জুন বলল।

"মানে ?"

"কিছু না। আর কী হয়েছে ?"

"যারা এসেছিল ডাকাতি করতে তারা নীচের তলাই তছনছ করেছে, ওপরের ঘরে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু একটা খবর আমরা ডক্টর গুপ্তকে দিতে পারিনি। ওঁর যা কন্ডিশন !"

"কী খবর ?"

"কারেন্ট অফ করে ওপরের ঘরে ঢুকে আমরা কোনও কুকুরের দেখা পাইনি। আপনিও ছিলেন না। ডাক্তার গুপ্ত কেবলই তাতান-তাতান করছিলেন !" দারোগার আবার মনে পড়ল, "আপনি কোথায় ছিলেন ?"

"ওপরের ঘরে অনেকগুলো যন্ত্র ছিল, তার একটাতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অঘোরে ঘুমিয়েছি।" অর্জুন হাসল।

"আচ্ছা। হ্যাঁ, যন্ত্রগুলো দেখেছি কিন্তু কী থেকে কী হয়ে যাবে ভেবে আর খুলে দেখিনি। তা হলে কুকুরটাও তার একটাতে থাকতে পারে !" দারোগা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"না, নেই। তাতান এখানে নেই।" মাথা নাড়ল অর্জুন।

দারোগাবাবুই রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঘুম ভাঙার পর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাজ্জব অর্জুন। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ঘড়ির তারিখ একশো সত্তর বছর এগিয়ে। সে কাঁটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সময়টাকে সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনতেই ঘড়ি আবার চালু হল। প্রায় ঘণ্টা-চব্বিশ সে এই সময়ে ছিল না। কিন্তু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে রওনা হয়েছে এক সকালে, পৌঁছল রাতের বেলায়। যাওয়ার সময় তো এমন কাণ্ড হয়নি। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পুবে এলে সময় বেড়ে যায়, সেইরকম কিছু ?

সকালবেলায় দারোগাবাবুর সৌজন্যে লুচি-তরকারি আর চা খেতে যে কী আরাম লাগল তা কাউকে বোঝাতে পারবে না অর্জুন। আহা, একশো সত্তর বছর পরের মানুষগুলো এসবের স্বাদ জানবে না।

ঠিক ন'টা নাগাদ শিলিগুড়ির হাসপাতালে গিয়ে শুনল কলকাতা থেকে বড়-বড় চিকিৎসকরা এসেছেন। ডক্টর গুপ্তের মাথায় অপারেশন হবে। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার সময় সে এক মুহূর্তের জন্য ডক্টরের দেখা পেল। অজ্ঞান হয়ে আছেন। অর্জুন বিড়বিড় করল। পাশে দাঁড়ানো দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কি বলছেন ?"

অর্জুন বলল, "আর কয়েক বছর বাদে উনি নোবেল পুরস্কার পাবেন।"

"তার মানে ? উনি ভাল হয়ে যাবেন ?" দারোগা অবাক।

"অবশ্যই। মাথার এই আঘাতটা ওঁকে সাহায্য করবে।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না। হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠল। জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলায় রূপমায়া সিনেমার সামনে বাস থেকে নেমে কিন্তু ওর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কী ঘিঞ্জি রাস্তা, রিকশা, গাড়ি মানুষের ভিড়ে হাঁটা মুশকিল। একশো সত্তর বছরের পরে এই জায়গাটাকে চেনা যাবে না। এখনকার ভাল আর তখনকার ভালগুলোকে যদি এক করা যেত!

হঠাৎ তাতানের কথা মনে পড়ে গেল। তাতানকে সেই রাত্রেই তার ভিন্নগ্রহের বন্ধু নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সেই গ্রহে বয়স বাড়ে না। তাই তাতান একশো সত্তর বছর পরেও একই রকম আছে। ইচ্ছেমতন মাঝে-মাঝে বন্ধুর সঙ্গে পৃথিবীতে ঘুরে যায়। ডক্টর গুপ্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে খুশি হবেন।

অর্জুন নিজের গালে হাত বোলাল। যাঃ, এর মধ্যেই খরখরে দাড়ি বেরিয়ে গেছে। ভাল ভাবে শেভ করে স্নান করা দরকার। সে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

কার্ভালোর বাক্স

এখন কোনও কাজকর্ম নেই। তিন-তিনটে মাস শুধু বই পড়ে আর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে মন মেজাজ বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল অর্জুনের। থানার দারোগা অবনীবাবু হেসে বলেছিলেন, "মানুষের স্বভাব বড় অদ্ভুত। এই যে আমার জেলায় কোনও বড় ক্রাইম হচ্ছে না, চার-পাঁচ মাসে কিছু চুরি ডাকাতি ছাড়া কোনও প্রব্লেম নেই, এতে সবার খুশি হওয়ার কথা কিন্তু হাঁপিয়ে উঠছেন আপনি। ধরুন, এই শহরে ছ' মাস ধরে কারও কোনও অসুখ করল না, এমনকী সর্দিজ্বরও নয়, সবাই হঠাৎ একদম ফিট হয়ে গেল তাতেও একদল মানুষ অখুশি হবে। ডাক্তাররা। তাঁরা বেকার হয়ে যাবেন।"

অর্জুন হেসে ফেলেছিল। ব্যাপারটা হয়তো তাই। কিন্তু দুটো সমস্যার চেহারা একরকম নয়। তবে অবনীবাবু ভাল মানুষ। থানার দারোগা হয়েও দেশ-বিদেশের খবর রাখেন। শহরে এসেছেন বছরখানেক হল। অমলদা, অমল সোমের সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল ওঁর, কিন্তু হয়নি। অমলদা বেশ কিছুদিন মৌনী নিয়ে ছিলেন, কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। তারপর একদিন হাবুর হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে আগের বারের মতো দেশ ঘুরতে বেরিয়ে গেছেন।

বিকেলবেলায় অবনীবাবুব ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে একবার চায়ের প্রস্তাব করেছেন ভদ্রলোক, অর্জুন রাজি হয়নি। থানার চা এত খারাপ যে, মুখে দেওয়া যায় না। কথাটা সে ভদ্রলোককে বলতে পারেনি। ওই চা মুখে দিয়ে প্রতিবার অবনীবাবু "আঃ" বলে শব্দ তোলেন।

থানার বিল্ডিংটার ওপর লেখা রয়েছে কোতোয়ালি। এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। কোতোয়ালি হল কোতোয়ালের অফিস। কোতোয়াল মানে কোটাল, নগরপাল। শব্দগুলো এখন শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্যে, 'বলরে নগরপালে'। বাস্তবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। অবনীবাবু বললেন, "হিন্দিভাষাভাষী মানুষেরা শব্দটাকে এখনও ব্যবহার করেন মশাই। আফটার অল হিন্দি তো আমাদের রাষ্ট্রভাষা। ভাবুন. তখন, কী দিন ছিল! আমি কোটাল, নগররক্ষক। কী খাতির। তখন টিয়ার গ্যাস ছিল না. বন্দুক ছিল না, শুধু অসির ঝনঝনানি।"

"অবজেকশন!" পেছন থেকে একটা হেঁড়ে গলা ভেসে এল। অর্জুন দেখল, ঘরের এক কোণে একজন বসে আছেন। ভদ্রলোকের বয়স সত্তরের কাছে, গায়ে ময়লাটে সাদা পাঞ্জাবি, গায়ের রং বেশ কালো। অবনীবাবু ভদ্রলোকের দিকে পিটপিট করে তাকালেন, "মানে?"

"আজ পর্যন্ত অসি হাতে কোনও কোটালের ঘুরে বেড়ানোর গল্প পড়ার

সুযোগ হয়নি। তখন একটা লাঠি আর দড়িই ছিল সাফিসিয়েন্ট। আর কোতোয়াল শব্দটি এসেছে ফারসি 'কোৎরাল্' থেকে। বাংলা ভাষায় লেখা যে-কোনও অভিধানে পেয়ে যাবেন।" ভদ্রলোক একটানা বললেন।

"অ। আপনি যেন কী কাজের জন্যে এখানে এসেছেন ?" অবনীবাবু একটু বিরক্ত।

"ছোট দারোগাকে বলেছি। তিনি এখানে আসতে বললেন। এসে ইস্তক আপনাদের কথা শুনছি।"

"ঠিক আছে। এবার বলতে পারেন।"

"আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। দেওয়ার মতো অবশ্য কিছু নয়। পিতৃদেব নাম রেখেছিলেন রাম, রামচন্দ্র রায়। এককালে ভাল ফুটবল খেলতাম। রাইট ইনে। তখন তো ওইসব আধুনিক ছক চালু হয়নি। ফরোয়ার্ড লাইনেই পাঁচজন থাকত। আমি পুরো মাঠ চষতাম। প্রচণ্ড দম ছিল তো ?"

অবনীবাবু হাত তুলে ভদ্রলোককে থামিয়ে বললেন, "ওটা নিশ্চয়ই আপনার ছেলেবেলার ঘটনা। আমরা আপনার এখনকার পরিচয় জানতে চাইছি।"

রামচন্দ্র বললেন, "ঠিক ছেলেবেলা বলা যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছরে খেলা ছেড়েছি। একটু বেশি কথা বলছি বোধ হয়, শর্টকাট করি, জাহাজে চাকরি করতাম। পৃথিবীটা চক্কর দিয়েছি। আর জাহাজে জানেনই তো, সমুদ্রে ভাসলে হাতে অফুরন্ত সময়। তখন বই পড়েছি। পছন্দ বলে তো কিছু ছিল না, হাতের কাছে যা পেয়েছি। দু-দুটো অভিধান মুখস্থ হয়ে গেল ওই সময়।"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোকের শরীরের গঠন বেশ মজবুত হলেও চেহারায় বোঝা যায় বেশ অর্থকষ্টে আছেন। সে না বলে পারল না, "অদ্ভুত"।

"অদ্ভুত কেন ? আপনার হাতে যদি কোনও কাজ না থাকে, যদি একটা ঘরে কয়েক মাস বন্দি থাকেন এবং প্রচুর উল আর কাঁটা ধরিয়ে দেওয়া হয় তা হলে আপনিও সোয়েটার বুনতে শিখে যাবেন। পরিস্থিতি আপনাকে বাধ্য করবে শিখতে।"

"ইন্টারেস্টিং।" অর্জুন বলল, "আপনি একটু এপাশে এগিয়ে আসুন না।"

রামচন্দ্র উঠে দাঁড়ান, "ধন্যবাদ, না বললে আমি আগ বাড়িয়ে কাছে যাই না।" একটা চেয়ার ফাঁকা রেখে বসলেন ভদ্রলোক। কাছাকাছি হওয়ার পর অর্জুন ভদ্রলোককে লক্ষ করল। গম্ভীর দাদু-দাদু চেহারা। মুখে বেশ সৌম্য ভাব, মানুষটিকে একটুও কুটিল বলে মনে হয় না।

অবনীবাবু বললেন, "আপনার পরিচয়টা এখনও জানলাম না। আপনি ফুটবল খেলতেন, জাহাজে চাকরি করতেন। এখন আপনি কী করেন ?"

রামচন্দ্রবাবু মাথা নাড়লেন, "ওইটাই মুশকিল হয়ে গিয়েছে। ওরা আমাকে মিডিয়াম বানিয়ে ফেলেছে। প্রথম-প্রথম মজা লাগত, এখন এত অসহায় মনে

হয় নিজেকে... ।”

“মিডিয়াম ? কিসের মিডিয়াম ?” অবনীবাবু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন ।

“আমি যা করতে চাই না, তাই ওরা আমাকে দিয়ে করায় ।” রামচন্দ্র নিচুস্বরে বললেন ।

“আই সি ! তার মানে এখন আপনি ক্যারিয়ার ! আপনার মতো বয়স্ক সরল চেহারার মানুষ ক্যারিয়ার হলে পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে সন্দেহ করবে । ওদের হয়ে কী ক্যারি করেন আপনি ? ড্রাগ না স্মাগলড্ গুড্স ?” অবনীবাবু সোজা হয়ে বসলেন ।

“আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, আপনি... ।” রামচন্দ্র বিড়বিড় করলেন ।

“বুঝতে পেরেছি । কিন্তু হঠাৎ আপনি নিজেকে সারেন্ডার করতে এলেন কেন ? এই সুমতি কি স্বাভাবিক ? ঠিক আছে, তার আগে বলুন আপনি কোথায় থাকেন ?” কলম খুললেন অবনীবাবু ।

“আপনি ভুল করছেন । আমি স্মাগলার বা ড্রাগকারবারিদের ঘৃণা করি । খবরের কাগজে আমি এই নিয়ে প্রচুর লিখেছি । কলকাতার লিডিং ড্রাগকারবারি পাশা আমার রিপোর্টের জন্যে ধরা পড়ে । তা ছাড়া যে অভিধান মুখস্থ বলতে পারে সে ওই কাজ করতে পারে না ।” বেশ রাগত ভঙ্গিতেই প্রতিবাদ জানালেন রামচন্দ্রবাবু ।

“খবরের কাগজ ? খবরের কাগজে আপনি কী করতেন ?”

“সাব এডিটার ছিলাম । কিন্তু প্রায়ই ফিচার লিখতাম, মাঝে-মাঝে স্কুপও ।”

“ভাবা যায় না । আপনি ফুটবল খেলতেন, জাহাজে চাকরি করতেন, আবার খবরের কাগজে চাকরি করেছেন । অদ্ভুত জীবন তো । তা হলে এই যে বললেন আপনাকে ক্যারিয়ার হতে ওরা বাধ্য করছে, সেটা তা হলে কী ?” অবনীবাবু ধাঁধায় পড়ে গেছেন বোঝা গেল ।

“আমি একবারও বলিনি কেউ আমাকে ক্যারিয়ার করেছে । আমি বলেছি আমাকে ওরা মিডিয়াম বানিয়ে নিয়েছে এবং এতে আমার কিছুই করার নেই ।” গম্ভীর গলায় বললেন ভদ্রলোক ।

“কারা আপনাকে মিডিয়াম বানিয়েছে ?” অবনীবাবুর গলার স্বরে একটু হালকা হাসি মিশল ।

“আমি ঠিক জানি না কিন্তু অনুভব করতে পারি । মুশকিল হল, এ-ব্যাপারে আমি অসহায় । আমার ইচ্ছের কোনও মূল্য নেই । ওরা যা চাইবে তাই আমাকে করতে হবে । শেষপর্যন্ত ভেবে দেখলাম আপনার কাছে আসাই ভাল । আমি একটা ডায়েরি করতে চাই ।”

“ডায়েরি ? কার বিরুদ্ধে ?” হাসি চাপতে পারলেন না অবনীবাবু । আর সেটা দেখে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন রামচন্দ্র রায়, “সত্যি বলতে কি, কারও বিরুদ্ধে নয় । আমি চাইছি ব্যাপারটা রেকর্ডেড হয়ে থাক । ধরুন, ওরা আমাকে

দিয়ে কাউকে খুন করালো, তখন এই রেকর্ডটা কাজে লাগবে।"

এই সময় টেলিফোন বাজল। বাঁ হাতে রিসিভার তুলে অবনীবাবু সাড়া দিলেন। ওপাশের বক্তব্য শুনতে-শুনতে তিনি সোজা হয়ে বসলেন, তারপর "আসছি" বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। অর্জুন ওঁর এই ভঙ্গি চিনে ফেলেছে। কোথাও কিছু ঘটেছে এবং অবনীবাবুকে এখনই সেখানে যেতে হবে।

"সরি, মিস্টার রায়, আমি আপনাকে ঠিক এই মুহূর্তে সাহায্য করতে পারছি না। আপনি বাড়িতে গিয়ে আর একবার ভাবুন। তারপরেও যদি মনে হয় এখনকার ভাবনাটাই ঠিক তা হলে আর একদিন আসবেন। আমাকে এখনই তিস্তার চরে যেতে হচ্ছে।" অবনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি ?"

"না। জায়গাজমি নিয়ে ঝামেলা। আপনি কি বসবেন ?"

"না। আর বসে কী করব। আপনি এগোন, আমি আসছি।"

অর্জুনের কথা শুনে চোখে এমন একটা ইশারা করলেন অবনীবাবু রামচন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ করে যে, তার একটাই অর্থ হয়, পাগলের পাল্লায় পড়বেন না মশাই। অবনীবাবু ঘরের বাইরে চলে গেলে অর্জুন রামচন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোনদিকে যাবেন ?"

"আমি ? রাজবাড়ির কাছে।" রামচন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আচ্ছা, আমার কথাবার্তা কি খুব অ্যাবনর্মাল শোনাল ? মানে, পাগলের প্রলাপ বলে মনে হল ?"

হকচকিয়ে গেল অর্জুন, "না, না। এ-কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন ?"

"মনে হল।" মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "আপনি পুলিশের লোক ?"

"আজ্ঞে না। আমি মাঝে-মাঝে এখানে গল্প করতে আসি।"

"আশ্চর্য ! থানাতে কেউ গল্প করতে আসে বলে শুনিনি।"

"আসলে অবনীবাবু, মানে উনি, মানুষ ভাল। আর আমার প্রোফেশনের সঙ্গে উনি জড়িয়ে আছেন। এখানে এসে নানান ধরনের মানুষের কথা শুনি, সেটা কাজেও লাগে।"

"কী প্রোফেশন আপনার ?"

"সত্যসন্ধান।"

অদ্ভুত চোখে তাকালে রামচন্দ্রবাবু। যেন শব্দটির মানে বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, ""নাম কী ভাই ?"

"অর্জুন।"

"ও, আপনিই অর্জুন। নাম শুনেছি কিন্তু বয়স এত অল্প, আন্দাজ করিনি। আচ্ছা, আমাদের বোধ হয় এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। চলুন, বাইরে যাই।" রামচন্দ্র রায় দরজার দিকে এগোলেন। এই মুহূর্তে ভদ্রলোককে যথেষ্ট

সুস্থ এবং বিবেচক বলে মনে হচ্ছে। অর্জুনের মনে হল, মানুষটি একটু আলাদা ধরনের। হঠাৎ সে আকর্ষণ বোধ করতে লাগল।

বাইরে বেরিয়েই রামচন্দ্র রায় বললেন, "সন্ধে হয়ে গেল। মুশকিল।"

"মুশকিল কেন?"

"আমি রাতের বেলায় ঘরের বাইরে থাকতে চাই না। যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ আমি নিরাপদ।"

"কী আলো? আপনি সূর্যের আলোর কথা বলছেন?" অর্জুন মোটরবাইকের চাবি বের করল।

"হ্যাঁ। সূর্যালোক। সেই আদিকাল থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা যে এককালে প্রকৃতিকে উপাসনা করে তাদেরই দেবদেবী বানিয়েছিলাম সেটাই ঠিক ছিল। আচ্ছা, চলি।" রামচন্দ্রবাবু হাত জোড় করলেন।

"আপনি কি বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়তে চাই।"

"যদি কোনও অসুবিধে না হয় আপনাকে আমি লিফ্‌ট দিতে পারি।" অর্জুন নিজের লাল মোটরবাইকটাকে দেখাল। তার অবশ্য সঙ্কোচ হচ্ছিল। অনেককেই সে বাইকের পেছনে বসিয়েছে কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের বয়সী কোনও বৃদ্ধকে পেছনে বসিয়ে বাইক চালায়নি! সে ভেবেছিল বৃদ্ধ আপত্তি জানাবেন কিন্তু উলটোটা হল। রামচন্দ্রবাবু সোৎসাহে বললেন, "তা হলে তো ভালই হল। আগে পৌঁছে যাওয়া যাবে।"

বাইকে স্টার্ট দিয়ে অর্জুন ইশারা করতেই বৃদ্ধ ধুতি সামলে পেছনে উঠে বসলেন। তাঁর হাত অর্জুনকে আঁকড়ে ধরতেই সে আপত্তি জানাল, "আমাকে নয়। আপনার আর আমার মাঝখানে একটা হাত আছে, সেটা ধরুন। খুব ইজি হয়ে বসে থাকুন। পাদানিতে পা রেখেছেন? গুড।"

রামচন্দ্রবাবু বললেন, "এত টেনস্‌ড হওয়ার দরকার নেই। আমি প্রশান্ত মহাসাগরে একা-একা প্যাড্‌লিং করেছি। অমন ঢেউ বঙ্গোপসাগরে ওঠে না।"

জাহাজে যিনি চাকরি করেছেন তিনি সমুদ্রে অনেক কিছু করতে পারেন। অর্জুন আলো জ্বালিয়ে থানা থেকে বের হতে-না-হতেই বুঝল রামচন্দ্রবাবু স্বাভাবিকভাবে বসে নেই। তাঁর শরীর শক্ত হয়ে গেছে এবং একদিকে হেলে আছেন। সে সতর্ক হয়ে চালাতে লাগল। একটুও গতি না বাড়িয়ে শহরের জনাকীর্ণ এলাকা বাদ দিয়ে একটু ঘুরে করলা নদী পেরিয়ে রায়কতপাড়ার দিকে এগোতে লাগল। বাইক চলার পর থেকে মাঝে-মাঝে ঘোঁত-ঘোঁত করে শ্বাস নেওয়া ছাড়া রামচন্দ্রবাবু কোনও শব্দ করেননি। রাজবাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে সে বাইক থামাল, "এবার কোনদিকে যাব?"

কোনও সাড়া এল না। অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনার বাড়ি কোন দিকে?"

এবার চোখ খুললেন বৃদ্ধ, "আমরা কোথায় এসেছি ?"

"ঠিক রাজবাড়ির গেটের সামনে।"

"আর একটু এগিয়ে, ডান দিকে।" রামচন্দ্রবাবু নিশ্বাস ফেললেন, "নীল রঙের বাড়ি।"

অর্জুন বাইকটাকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যেতেই একটা নীল রঙের বাড়ি দেখতে পেল। সেই বাড়িতে কোনও আলো জ্বলছে না। কোনও মানুষ আছে বলেও মনে হচ্ছে না। সাদাসাপটা একতলা বাড়ি। অর্জুন স্টার্ট বন্ধ করে বলল, "নামুন।"

রামচন্দ্রবাবু যেভাবে নামলেন তাতে মনে হল ওঁর শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। দাঁড়ানোর পরও তিনি টলতে লাগলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার শরীর খারাপ লাগছে ?"

"সেরকম নয়। আসলে ভেতরে-ভেতরে খুব দুর্বল হয়ে গেছি দেখছি। এই একমাসে ওরা আমাকে এতটা কাহিল করে দিয়েছে বুঝতে পারিনি। কী ছিলাম, কী হয়ে গেলাম।"

অর্জুন বৃদ্ধকে ধরে ধীরে-ধীরে বাড়িটার দরজায় নিয়ে গিয়ে দেখল দরজায় তালা ঝুলছে।

রামচন্দ্রবাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে একথোকা চাবি বের করে রাস্তার আলোর সামনে তুলে ধরলেন। তারপর একটাকে বেছে নিয়ে তালা খুললেন। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালার পর তাঁকে অনেক স্বাভাবিক দেখাল। অর্জুন বলল, "তা হলে এবার আমি যাই।"

"যাই মানে ? এতদূরে পৌঁছে দিলেন, একটু কফি না খাইয়ে ছাড়ব কেন ?"

"কী দরকার—।"

"নাথিং। কোনও দরকাব নেই। আসলে এখন আপনি থাকলে আমার ভাল লাগবে।" দরজা বন্ধ করে বেতেব চেয়ার দেখিয়ে দিলেন রামচন্দ্রবাবু।

"বাড়িতে আর কেউ নেই ?"

"কে থাকবে ? নান্। এই পৃথিবীতে আমি একা। আরে ভাই নাবিকের কাজ করতাম। নিজের কাজ নিজে করার অভ্যেস এমন তৈরি হয়ে গেছে যে, কারও অভাব অনুভব করি না। শুধু এই একমাস ধরে। আর ওই কার্ভালোটাই আমার সর্বনাশ করল।"

"কার্ভালো কে ?" অর্জুনের মনে পড়ল সেই ঐতিহাসিক চরিত্রটির কথা, যাকে নিয়ে নাটক হয়েছে।

"আমার বন্ধু। জাহাজে একসঙ্গে কাজ করতাম। দাঁড়ান, জল বসিয়ে আসি।" রামচন্দ্র চলে গেলেন ভেতরে। অর্জুন তাকিয়ে দেখল এই ঘরে চারটে বেতের চেয়ার আর গোল টেবিল ছাড়া অন্য কোনও আসবাব নেই। শুধু পেছনের দেওয়ালে একটা বিরাট ছবি ঝুলছে। ছবিটি জাহাজের।

নাবিকের বাড়ি বলেই সম্ভবত জাহাজের ছবি। হয়তো ভদ্রলোক ওই জাহাজেই অনেকদিন কাজ করেছেন। রামচন্দ্রের বন্ধু কার্ভালো। অদ্ভুত ব্যাপার। অর্জুন মনে-মনে হাসল। এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোককে যা দেখেছে তাতে পাগল বলে মনে করার মতো কিছু ঘটেনি। কথায়-কথায় অবশ্য একমাসের কথা শোনাচ্ছেন, কেউ বা কারা নাকি ওঁকে মিডিয়াম বানাচ্ছে। এই কারণেই তিনি থানায় গিয়েছিলেন ডায়েরি করতে। ব্যাপারটা পুরো না শুনলে হাস্যকর লাগা স্বাভাবিক। অপরাধ করে বা না করে গ্রেফতারের সম্ভাবনা থাকলে কেউ-কেউ কোর্টে যান আগাম জামিন চাইতে। এই প্রথা চালু আছে। কিন্তু কেউ আমাকে দিয়ে কোনও অপরাধ করিয়ে নিতে পারে বলে আশঙ্কা করে আজ পর্যন্ত কেউ কোথাও ডায়েরি করছে বলে সে শোনেনি। অর্জুনের কেবলই মনে হচ্ছিল রামচন্দ্র রায় মিথ্যে কথা বলেননি। তা হলে উনি কার মিডিয়াম হচ্ছেন?

কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকে বেতের চেয়ারে রাখলেন রামচন্দ্রবাবু। চিনি আলাদা পাত্রে রয়েছে। পাশের ছোট কাপে সামান্য দুধ। বললেন, "আমি চিনি-দুধ খাই না। আপনার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মিশিয়ে নিন।"

চুপচাপ রান্নার কাজটা সেরে কফিতে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এই বাড়িতে আপনি কদ্দিন আছেন? নিজের বাড়ি?"

"আছি বছরখানেক। হ্যাঁ, নিজের বাড়ি। কিনেছিলাম বছর কুড়ি আগে। এতদিন ভাড়াটে ছিল। অনেক কষ্টে তাদের তুলে এখানে এলাম। এই বাড়ির একটা গল্প আছে।"

"কী রকম?"

"এই জমিটা ছিল আমার বাবার। জলপাইগুড়ির রাজার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি। আমি জন্মাবার পরে তিনি মারা যান। অভাবের তাড়নায় মা এই জমিটাকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে আমাকে নিয়ে চলে যান মামার বাড়িতে। মামা থাকতেন বালুরঘাটে। সেখানেই আমার শৈশব কাটে। মায়ের মনে খুব দুঃখ ছিল জমিটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে। কুড়ি বছর আগে আমি এই শহরে ফিরে এলাম জমিটাকে আবার কিনে নেব বলে। নিজেদের জমি অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হল। তখন অবশ্য মা পৃথিবীতে নেই। এই বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিয়ে চলে গিয়েছিলাম সে-সময়।"

রামচন্দ্রবাবু চোখ বন্ধ করে মুখ ওপরে তুললেন, "কিছু শুনতে পাচ্ছেন?"

অর্জুন অবাক হয়ে শোনার চেষ্টা করল, "কই না তো!"

"একটা মেটালিক সাউন্ড। টানা?"

"না। আমার কানে কিছু আসছে না।"

"আপনি তো সত্যের সন্ধান করেন। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। পুলিশ কী করবে জানি না, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?"

"আপনি কী সাহায্য চাইছেন?"

"আমাকে বাঁচান। গত এক মাস ধরে, ওই কার্ভালো আসার পর থেকেই এই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছে। রোজ রাত্রে কেউ বা কারা আমাকে অথর্ব করে দিচ্ছে। তখন আমার কোনও ইচ্ছাশক্তি থাকে না। আমি তাকাই কিন্তু কিছু দেখি না, আমি শুনি কিন্তু বলতে পারি না।"

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেইসব ভৌতিক গল্পের মতো।"

হাত তুলে বাধা দিলেন রামচন্দ্রবাবু, "না, না। ভুল করবেন না। এরা ভূত নয়। কর্মজীবনে আমি অনেক ভূতের গল্প শুনে খুঁজতে গিয়ে কিছুই পাইনি। অবশ্য তারা সবাই সামুদ্রিক ভূত। ইন ফ্যাক্ট, ভূত বলে কিছু আছে আমি বিশ্বাস করি না।"

"যারা আপনাকে অবশ করে দেয়, তাদের আপনি দেখতে পান ?"

"না। কিন্তু অনুভব করতে পারি। আর অনুভব মানে পুরো দেখা নয়। মনে হয় প্রচণ্ড শক্তিধর ওরা। আমাকে যা বলছে তা না করে আমার উপায় নেই। ধরুন, ওরা যদি আমাকে বলে কাউকে খুন করে আসতে, তা হলে সেটা আমি নিজের অজান্তেই করে ফেলব। তারপর দিনের বেলায় পুলিশ যখন আমাকে অ্যারেস্ট করবে তখন বোঝাতে পারব না ওটা স্ব-ইচ্ছায় করিনি। আমি ঝড়, জল, উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছি। একবার অতলান্তিকে দশদিন লাইফবোটে ভেসে ছিলাম। কিন্তু এখানে আমি অসহায়, লড়াই করার কোনও সুযোগই নেই।" বলতে-বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন রামচন্দ্র রায়, "শুনতে পাচ্ছেন এবার ? সিগন্যালিং টিউন ?"

অর্জুন কিছুই শুনতে পেল না। কিন্তু ওর মনে হল বৃদ্ধ বানিয়ে গল্প বলছেন না। ব্যাপারটার পেছনে সত্যতা আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "কার্ভালোর বয়স কত ?"

"অলমোস্ট মাই এজ। আমার তিন মাস বাদে কাজ ছেড়েছে সে।"

"উনি কেন এসেছিলেন আপনার কাছে ?"

"একসঙ্গে জাহাজে কাজ করেছি। ভালই সম্পর্ক ছিল। ও অবশ্য বিবাহিত। দমনে নিজের বাড়ি। যে লাইফবোটে আমরা ভাসতে বাধ্য হয়েছিলাম তাতে ও আমার সঙ্গী ছিল। আমার ঠিকানা কার্ভালো জানত। হঠাৎ এক দুপুরে সে আমার কাছে এসে হাজির।"

"তারপর ?"

"খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে। একটা রাত ছিল। তার পরদিন হঠাৎই চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল অসমের দিকে যাচ্ছে। ফেরার সময় দেখা করে যাবে। আর হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কিছু লাগেজ ছিল, তার একটা রেখে গেল ঝামেলা কমাতে।"

"কী লাগেজ ?"

"একটা সুটকেস।"

"দেখতে পারি সেটা ?"

"মানে ? কার্ভালোর সুটকেস তার অনুমতি ছাড়া খোলা ঠিক হবে ?"

"উনি একমাস হল অসমে চলে গেছেন। থাকেন সেই দমনে। এর মধ্যে আপনাকে কোনও চিঠি লেখেননি। যদি আর কখনও ভদ্রলোক ফিরে না আসেন তা হলে কী করবেন ?"

"তা কেন ? ফিরে আসবে না কেন ?"

"আপনিই বললেন ভদ্রলোককে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ওই সুটকেসে কী জিনিস তিনি রেখে গিয়েছেন তা কে বলতে পারে। হয়তো বেআইনি কিছু, যার জন্যে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে।"

"আমাকে কেন করবে ? সুটকেস তো আমার নয়।"

"কী করে প্রমাণ করবেন ? ওটা তো আপনার হেফাজতে পাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা !" রামচন্দ্র রায় গালে হাত বোলালেন. "কিন্তু ওর চাবি তো আমার কাছে নেই।"

"সুটকেসটা কোথায় ?"

"পাশের ঘরে।"

"চলুন।" অর্জুন কফির কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় রামচন্দ্রবাবু পাশের ঘরে ঢুকলেন। এ-ঘরে একটা খাট, আলমারি এবং কিছু নিত্য ব্যবহারের জিনিসপত্র আছে। ঘরের কোণে একটা সুটকেস দাঁড় করানো। বাজারে চলতি এক নামী কোম্পানির দামি সুটকেস। কোনও ঢাকনা না থাকায় দীর্ঘ যাত্রার চিহ্নস্বরূপ প্রচুর দাগ সুটকেসের শরীরে। রামচন্দ্রবাবু বললেন, "এইটি কার্ভালোর সুটকেস।"

অর্জুন হাঁটু মুড়ে ~.স সুটকেসের লক পরীক্ষা করল। না, চাবি দিয়ে খোলার ব্যবস্থা নেই। নম্বর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কোড মিললে ওটা খুলবে। সুটকেসটি যথেষ্ট মজবুত। এই সুটকেস খোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নিশ্চয়ই খোলা যায় কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "ল্যাংড়া-পাঁচুকে ডেকে আনতে হবে।"

"ল্যাংড়া-পাঁচু ?"

"এই শহরের সবচেয়ে ওস্তাদ তালা-খুলিয়ে ! আগে এটাই ব্যবসা ছিল। আমি একবার ওকে বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু ল্যাংড়া-পাঁচুকে এখন পাওয়া যাবে না। কাল সকালে ওকে নিয়ে আসব। আমি এখন চলি, আপনি বিশ্রাম করুন।"

"কিন্তু, কিন্তু আজ রাত্রেও ওরা আসবে।"

"নাও আসতে পারে।"

"অসম্ভব। আমি সিগ্ন্যাল শুনতে পাচ্ছি। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।"

"আপনি কি চাইছেন আমি এখানে থাকি ?"

রামচন্দ্রবাবু তাকালেন, "নাঃ। থাক। আপনি কাল সকালে আসবেন বললেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। আর যাওয়ার সময় বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যান। আমি যদি এই বাড়ি থেকে বের হতে না পারি তাহলে নিজের অজান্তে কোনও অন্যায় করা সম্ভব হবে না।" চাবির থোকটা এগিয়ে ধরলেন বৃদ্ধ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওঁর কথা মান্য করল অর্জুন। বাইক চালু করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বাড়িটার জানলাগুলো খোলেননি রামচন্দ্রবাবু। আলো বেরিয়ে আসছে ঘুলঘুলি দিয়ে। সে গতি বাড়াল।

জেলখানার কাছে এসে বাইক থামাল অর্জুন। তার মনে হল, এটা ঠিক নয়। একজন মানুষকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সারারাত বাড়িতে বন্দি করে রাখা উচিত হচ্ছে না। শরীর খারাপ হলেও বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না ভদ্রলোক। কেউ এলে দরজা খুলে দিতে পারবেন না। সে বাইকটাকে বাঁ দিকে ঘোরাল।

ল্যাংড়া-পাঁচু এক সময় এই শহরের খুব নামী অপরাধী ছিল। যে-কোনও তালা খুলে দিতে তার জুড়ি ছিল না। চোর-ডাকাতের কাছে তাই ওর খুব চাহিদা ছিল। নিজে চুরি বা ডাকাতি না করলেও টাকা নিয়ে দলের সঙ্গে গিয়ে তালা খুলে দেওয়ার অপরাধে অনেকবার জেল খেটেছে সে। শেষবার একটা ডাকাতির কেসে তালা খোলার অভিযোগে পুলিশ ওকে গ্রেফতার করে। ডাকাতরা বাড়ির দারোয়ানটিকে মেরে ফেলেছিল। সেই খুনের দায় ল্যাংড়া-পাঁচুর ঘাড়েও চেপেছিল। কিন্তু পুলিশ ডাকাতদের ধরতে পারেনি, ল্যাংড়া-পাঁচুকে ধরেছিল অনুমানের ওপর নির্ভর করে। ল্যাংড়া-পাঁচুর বউ ছুটে গিয়েছিল অমলদার কাছে। তার স্বামী নিরাপরাধ, অন্তত এই ডাকাতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, ডাকাতির রাত্রে পেট খারাপ হওয়ায় সে বাড়িতেই শুয়েছিল, এইসব বলে অমলদার সাহায্য চেয়েছিল পাঁচজনের পরামর্শে। অমলদা সেই মহিলাকে প্রশ্ন করেই নিশ্চিত হন ল্যাংড়া-পাঁচু নিরাপরাধ। তিনিই অর্জুনকে নির্দেশ দেন ল্যাংড়া-পাঁচু সম্পর্কে পুলিশের ভুল প্রমাণ দাখিল করে ভাঙিয়ে দিতে। বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল সেবার অর্জুনকে। আর তারপর থেকেই ল্যাংড়া-পাঁচু ওকে খুব সমীহ করে। অর্জুনের কাছে কথা দিয়েছিল তালা খোলার কাজ সে ছেড়ে দেবে। ল্যাংড়া-পাঁচু এখন লটারির টিকিট বিক্রি করে কদমতলার মোড়ে। কিন্তু সন্ধে হলেই লোকটা খারাপ আড্ডায় চলে যায়। এই সময় তাকে দিয়ে কিছু করানো অসম্ভব। এই নেশার পেছনে তার যুক্তি হল, ওখানে গেলেই মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়, তখন কোনও পার্টি এসে হাজার টাকা দিলেও সে তালা খুলতে পারবে না। চোর-ডাকাতরা

ব্যাপারটা জেনে যাওয়ায় এখন আর ল্যাংড়া-পাঁচুকে বিরক্ত করে না।

ল্যাংড়া-পাঁচুকে এই সময় বাড়িতে পাওয়া যাবে না। দু'দিন রাত দশটার পরে তাকে বুঁদ হয়ে বাড়ি ফিরতে দেখেছে সে। কিন্তু কোথায় কোন আড্ডায় যায় তা নিশ্চয়ই ওর বউ জানে। বাইক নিয়ে অর্জুন সোজা ল্যাংড়া-পাঁচুর বাড়িতে চলে এল। শহরের একপ্রান্তে খুবই গরিব পরিবেশে ল্যাংড়া-পাঁচু থাকে। ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। বাইকের আওয়াজ পেয়ে কিছু কৌতূহলী মানুষের সঙ্গে ল্যাংড়া-পাঁচুর বউও বেরিয়ে এসে ওকে দেখে ঘোমটা টানল, "ওমা আপনি ?"

"পাঁচুবাবু আছে ?"

"আজ্ঞে, এই সময়—আপনি তো সব জানেন !"

"হ্যাঁ, কোথায় গিয়ে খায় ওসব ? আমার খুব দরকার ওকে।"

ল্যাংড়া-পাঁচুর বউ ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "একটু দাঁড়ান।"

অর্জুন বাইকে বসে দেখল মহিলা ঘরের ভেতর চলে গেল দৌড়ে। ছেলে, বুড়ো, মহিলারা তাকে দেখছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তাকে নিয়ে। একটু পরে মহিলা ফিরে এসে একটা কাগজের মোড়ক দিল, "কথা বলতে না পারলে এইটে দেবেন। আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারব না বাবু। শুধু এই খারাপ আড্ডাটা যদি ওকে ছাড়িয়ে দেন।"

অর্জুন কোনও মন্তব্য না করে মোড়কটি নিয়ে বাইক ঘোরাল। হাসপাতালের উলটো রাস্তায় ঢুকে নির্দিষ্ট একটা বাড়ির ভেতরের বারান্দায় ল্যাংড়া-পাঁচুকে পাওয়া গেল। দু' হাতে ছিলিম ধরে টান দিতে গিয়ে তাকে দেখে থমকে গেল, "আপনি ?"

"যাক, ঠিক আছ এখনও। একটু এসো, কথা আছে।"

করুণ দৃষ্টিতে হাতে ধরা জিনিসটার দিকে একবার তাকিয়ে সঙ্গীদের একজনের হাতে তুলে দিয়ে ল্যাংড়া-পাঁচু নেমে এল বারান্দা থেকে, "বলুন বাবু।"

"তোমার মাথা ঠিক আছে ?"

"আজ্ঞে ? ও, প্রথম টান দিতে যাচ্ছিলাম। আজ সন্ধে-সন্ধে বেশ খদ্দের হয়ে যাওয়ায় এখানে আসতে দেরি হয়ে গেল। একদম ঠিক আছে মাথা।" ল্যাংড়া-পাঁচু মুখ নিচু করল।

"তা হলে তোমার বউয়ের দেওয়া এই জিনিসটার দরকার হচ্ছে না !"

মোড়কটা দেখল ল্যাংড়া-পাঁচু। দেখে হাসল, "তাই বলুন। এই ঠিকানা সে দিয়েছে। এই কাগজে কী দিয়েছে জানেন ? দ্যাখেননি ? তেঁতুল। নেশার পর তেঁতুল খেলেই আমার বমি হয়ে যায়।"

"বুঝলাম।" বাইক চালু করে অর্জুন হুকুম করল, "পেছনে ওঠো।"

ল্যাংড়া-পাঁচু ইতস্তত করছিল কিন্তু আদেশ অমান্য করল না। বাইক চলতে

আরম্ভ করলে সে বলল, "আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ইচ্ছে করলে আমি দিনের পর দিন নেশা না করে থাকতে পারি। আসলে সময় কাটে না বলেই এই আড্ডায় চলে আসি।"

অর্জুন কিছু বলল না। সে রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির দিকে যেতে লাগল। সেটা লক্ষ করে ল্যাংড়া-পাঁচু বলল, "ও, যা ভেবেছিলাম তা নয়।"

"কী ভেবেছিলে?" বাইক চালাতে-চালাতে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"আমি ভেবেছিলাম আবার আমাকে থানায় ঢোকাচ্ছেন আপনি।"

"আড্ডাটা না ছাড়লে সেটা করতে হবে।"

"আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, যা বলবেন তাই করব।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে বাইক থামাল সে। ল্যাংড়া-পাঁচু নেমে দাঁড়ালে সে বলল, "শোনো, এই বাড়িতে একটা সুটকেস আছে। চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। তোমাকে খুলে দিতে হবে।"

কথা বলে সে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দরজার তালা খুলে ডাকল, "মিস্টার রায়।"

"যাচ্ছি।" ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

বাইরের ঘরের আলো জ্বেলে অর্জুন ল্যাংড়া-পাঁচুকে বসতে বললে সে সন্তর্পণে চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, "সুটকেসটা কার বাবু?"

"কেন?" চমকে তাকাল অর্জুন।

"যাঁর সুটকেস তিনি সামনে না থাকলে আমি ওটা খুলব না বাবু।"

"হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত?"

"আজ্ঞে, হঠাৎ নয়। আপনি ছাড়াবার পর আমি তো এই কারবার ছেড়ে দিয়েছি। কত টাকার লোভ দেখানো হয়েছে কিন্তু আমি বলেছি, মন, তুই নরম হসনি। একটা কেস মানে কয়েক বছর জেল। তাই অন্যের সুটকেসে হাত দিই না।"

ল্যাংড়া-পাঁচুর সিরিয়াস মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন একটু অপ্রস্তুত হল। জেলের ভাত খাওয়া থেকে বের করে নিয়ে সে নিজে ল্যাংড়া-পাঁচুকে বলেছিল, অন্যের তালা মালিকের অজান্তে যেন কোনওদিন না খোলে। সেই কথাই আজ ল্যাংড়া-পাঁচু সুযোগ বুঝে ফিরিয়ে দিল। সে বলল, "দ্যাখো, তুমি যখন অন্যের অজান্তে তালা খুলতে তখন মানুষের সর্বনাশ হত। আজকের কাজটা করলে একজন ভাল মানুষের উপকার হবে। তার চেয়ে বড় কথা, আমি তোমাকে অন্যায় কিছু করতে বলব না।"

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র রামচন্দ্র রায় হাজির হলেন, "কী ব্যাপার? কাল সকালে আসার কথা ছিল না?"

অর্জুন বৃদ্ধকে দেখল, "আপনি ঠিক আছেন তো?"

"তার মানে?"

"বাঃ, আপনিই তো বলেছেন কারও সিগন্যাল শুনতে পাচ্ছিলেন।"

রামচন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওসব ব্যাপার হালকাভাবে না বলাই ভাল। এখন বলুন কী জন্যে আবার ফিরে আসতে হল! আমি তো রাত্রের খাওয়া সেরে নিলাম।"

"ভালই করেছেন। ইনি হলেন পাঁচবাবু। এঁর কথা খানিক আগে আপনাকে বলেছি।" অর্জুন হাসল, "সুটকেসটাকে দেখাতে চাই।"

রামচন্দ্র কথা খরচ না করে ওদের ভেতরের ঘরে নিয়ে এলেন। ল্যাংড়া-পাঁচু সুটকেসটায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর নম্বর ঘোরাবার জায়গাটায় আঙুল বোলাতে লাগল। অর্জুন সেটা লক্ষ করে বলল, "ওহো, এই কথাটা বলা হয়নি। চাবি ঢুকিয়ে তালা খোলার সুটকেস এটা নয়। ঠিকঠাক নম্বর এলে এর ডালা খুলে যায়।"

ল্যাংড়া-পাঁচু হাসল, "নম্বরই বলুন আর চাবিই বলুন, ভেতরে তো একটা তালা আছে। হুকটা আটকে আছে তাতে। একটু অনুভব করতে দিন।"

রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন, "অনুভব ? শক্ত সুটকেসের বাইরে হাত দিয়ে ভেতরটা অনুভব করা যায় ?"

"যে যেমন পারে। তারে আঙুল দিলে কেউ শুধুই টুং টাং শব্দ করে, কেউ গান বাজায়। একটু চুপ করুন আপনারা। পারব কি না জানি না, তবু চেষ্টা করতে দিন।" ল্যাংড়া-পাঁচু চোখ বন্ধ করল।

এক, দুই করে বেশ কয়েক মিনিট যাওয়ার পর ল্যাংড়া-পাঁচু বলল, "ওই যাঃ। যন্ত্রপাতি তো সঙ্গে আনিনি। এমনভাবে চলে আসতে হল! একটা সরু অথচ শক্ত তার পাওয়া যাবে ?"

রামচন্দ্রবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সরু তার পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিকের তার রবারের ভেতর থেকে বের করে পাকিয়ে কি এক অদ্ভুত কায়দায় সোজা করে চেষ্টা চালাল ল্যাংড়া-পাঁচু। প্রায় আধঘণ্টা ধরে নাছোড়াবান্দা ল্যাংড়া-পাঁচু পড়ে রইল সুটকেস নিয়ে। শেষতক খট করে একটা শব্দ হতেই তার গলায় উল্লাস শোনা গেল, "হুঁ। হবে না মানে ? আঙুলগুলো মরে গেছে নাকি! নিন বাবু, ডালাটা খুলুন। আপনিই দেখুন ভেতরে কী আছে!"

সুটকেসটাকে টেনে এনে অর্জুন ডালা খুলল। সুটকেসের ভেতরে টাইট করে বসিয়ে রাখা হয়েছে থার্মোকোলের বাক্স। সেটাকে বাইরে বের করতে খানিকটা অসুবিধে হল। ওপরের ঢাকনা খোলার পর আবার একটি থার্মোকোলের বাক্স। খুব ভঙ্গুর অথচ মূল্যবান জিনিসকেই মানুষ এমন যত্নে সতর্কতার সঙ্গে রাখে। দ্বিতীয় বাক্সটা খুলতেই একটা নীল আলোর দপদপানি টের পাওয়া গেল। চকচকে এক ধাতব বস্তু থেকে নীল আলো জ্বলছে-নিভছে।

ল্যাংড়া-পাঁচু জিজ্ঞেস করল, "এ কী জিনিস বাবু ?"

অর্জুন তল পাচ্ছিল না। সে যন্ত্রের কাছে কান নিয়ে গিয়ে কোনও শব্দ শুনতে পেল না। একটা চকচকে চৌকো বাক্স। আলোটা জ্বলছে-নিভছে ওর ভেতরে। ওপরের ছিদ্র থেকে তার একটা অংশ ছিটকে আসছে। সে যন্ত্রটার গায়ে হাত বোলাতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল রামচন্দ্র রায় যে সিগন্যাল শোনেন তা এখান থেকেই বের হয় না তো !

"ওটা সরিয়ে ফেলুন।" পেছন থেকে রামচন্দ্রবাবুর চাপা গলা শোনা গেল।

"এটা কী ? আমি এরকম জিনিস কখনও দেখিনি। কার্ভালো কি কিছু বলেছে আপনাকে ?"

"না, কার্ভালো কিছু বলেনি। কিন্তু ওটা সরিয়ে ফেলুন।" রামচন্দ্রবাবুর গলা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল।

"কেন ?"

"যে-সিগন্যালটা আমি শুনি তা এই ঘরে ঢুকে ওই বাক্সের মধ্যে যেন মিলিয়ে যায়। কাল রাত্রেও আমার মনে হয়েছিল সেটা। আপনাদের বলতে পারিনি।"

"এই বাক্সে মিলিয়ে যায়, না বাক্স থেকে শব্দটা বের হয় ?"

"আঃ, বললাম তো বাক্সে ঢুকে যায়। তখন তো বাক্স জানতাম না, মনে হত সুটকেসেই ঢুকে যাচ্ছে শব্দটা। প্লিজ, সরিয়ে ফেলুন ওটাকে।"

"আপনি এমন ভয় পাচ্ছেন কেন ? সারা পৃথিবী ঘুরেছেন আপনি !"

"তাতে কিছু লাভ নেই। ওরা যখন আমাকে মিডিয়াম করে তখন নিজের কোনও ক্ষমতা থাকে না। একদম পুতুল হয়ে যাই তখন। আমার সামনে থাকলে ওরা যদি চায় তো আপনাকেও খুন করতে পারি। কিন্তু শব্দটা ওই সুটকেসের ভেতর ঢুকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঠিক থাকি।" রামচন্দ্রবাবুকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। অর্জুন যন্ত্রটাকে দেখল। অমলদা থাকলে কী করতেন ? এটা কি তা হলে রিসিভার গোছের কিছু ? কী রিসিভ করছে ? কে সিগন্যালিং করে ? হঠাৎ তার মাথায় অন্য চিন্তা এল। মহাকাশ থেকে ওই সিগন্যাল ভেসে আসছে না তো ?

সে চটপট যন্ত্রটাকে থার্মোকোলের মধ্যে ঢোকাল। দুটো বাক্সকে সুটকেসে নিয়ে সে রামচন্দ্রবাবুকে বলল, "আমি যদি এটা আজকের রাত্রের জন্যে নিয়ে যাই, আপনার আপত্তি হবে ?"

"আপত্তি ? আপত্তি কিসের। তবে কার্ভালোর জিনিস, আর ওরা যদি এখানে এসে না পায় তা হলে হয়তো আমার ওপরে খেপে যেতে পারে—।" বিড়বিড় করছিলেন বৃদ্ধ।

"যদি কেউ এসেও থাকে এই বস্তুটি না থাকলে আপনার কাছে আসবে

না।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "কদমতলার চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্স চেনেন ?"

রামচন্দ্র মাথা দোলালেন।

"চৌধুরী মেডিক্যালে গিয়ে আমার নাম বললে ওরা বাড়ি দেখিয়ে দেবে। কাল সকালে একবার আসুন। এসো পাঁচু।" সুটকেস নিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়াল অর্জুন।

"বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাবেন না ?" রামচন্দ্র রায় কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার বিশ্বাস, তার প্রয়োজন হবে না।"

সুটকেস নিয়ে বাইকে ওঠা খুব মুশকিল। সে ল্যাংড়া-পাঁচুকে জিজ্ঞেস করল, "এটাকে ধরে বসে থাকতে পারবে ? ডালা খোলাই আছে।"

ল্যাংড়া-পাঁচু এককথায় রাজি। পেছনের সিটে বসে সুটকেসটাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "বাবু, এটা খুব দামি জিনিস, না ?"

"হুঁ।" অর্জুন অন্যমনস্ক ছিল।

"কী রকম দাম হবে ?"

"জানি না। রামচন্দ্র রায়ের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে এর কোনও দাম কেউ দিতে পারবে না। শক্ত করে ধরে রাখো।" অর্জুন বাইকে গতি দিল। পেছনে বসা ল্যাংড়া-পাঁচু সোৎসাহে বলে উঠল, "আঃ। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম !"

অর্জুন সোজা থানায় চলে এল। অবনীবাবু তখনও ফেরেননি। সেকেন্ড অফিসার শঙ্করবাবু অর্জুনকে দেখে মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেলেন পেছনে ল্যাংড়া-পাঁচুকে বসে থাকতে দেখে।

বাইকে বসেই অবনীবাবুর খবরটা জেনে ইতস্তত করছিল অর্জুন। শঙ্করবাবু ল্যাংড়া-পাঁচুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আবার ফেঁসেছ ? একদম সুটকেস সমেত তোমাকে ধরেছেন মনে হচ্ছে !"

অর্জুন বাইক থেকে নেমে সুটকেসটাকে হাতে নিল, "শঙ্করবাবু একটা উপকার করতে হবে।"

"নিশ্চয়ই ! বলুন, এ আবার কাজ আরম্ভ করেছে তো ?"

"না। ওকে আমিই নিয়ে এসেছি। আপনাদের এখানে মাটির নীচে একটা ঘর আছে না ? মানে যেখানে দামি জিনিস রাখা হয় ?"

"হ্যাঁ।"

"এই সুটকেসটাকে ওখানে আজকের রাত্রের জন্যে রেখে যেতে চাই।"

"ও। কী আছে ওতে ?"

"মহামূল্যবান একটা জিনিস, কিন্তু কাল সকালের আগে এটা খোলা যাবে না।"

"তা হলে তো মুশকিল হল।"

"কেন ?"

"খাতায় লিখতে হয় কী জিনিস রাখছি। দামি জিনিসের জন্যে এই নিরাপত্তা।"

"ও। লিখুন সিগন্যালিং মেশিন।"

"তাই বলুন। স্মাগলড্‌ গুড। রাখাটা বেআইনি কিন্তু আপনি বলেই রাজি হচ্ছি। দিন।"

"না। আমি নিজের হাতে রেখে আসব। তুমি এখানেই থাকো পাঁচু।"

শঙ্করবাবুর পেছন-পেছন থানার ভেতরে ঢুকে একটা বিশেষ ঘরের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল অর্জুন। লোহার দরজায় দুটো তালা ঝুলছে। পাশের টেবিলে খাতা। সেই খাতায় লেখাপত্র শেষ করে সেপাইকে দিয়ে দুটো চাবি আনিয়ে দরজা খুললেন শঙ্করবাবু। খুব অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই কয়েকটা র‍্যাক দেখা গেল। সবক'টা র‍্যাকই শূন্য। অর্থাৎ, এই মুহূর্তে থানায় কোনও মূল্যবান জিনিস জমা নেই।

সুটকেসটাকে এমন একটা কোণে ঢুকিয়ে দিল অর্জুন যে, সরাসরি টেনে বের করে আনা যাবে না। আলো নিভিয়ে লোহার ভারী দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে দেওয়া হল। সে শঙ্করবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যবস্থা মজবুত তো ?"

"মজবুত মানে ? পিঁপড়ে ঢোকার পথ নেই। এই তালা স্পেশ্যালি বানানো।"

অর্জুন মনে-মনে হাসল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাংড়া-পাঁচুর কাছে কোনও তালাই কিছু নয়। তবে ভরসা এই যে, এখন শহরে ওর মতো প্রতিভা দ্বিতীয়টি নেই।

আগামীকাল সকালে দেখা করবে কথা দিয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এসে ল্যাংড়া-পাঁচুকে পাঁচটা টাকা দিল, "যাও, রিকশা করে চলে যাও।"

"আপনি জানেন না এই সময়ে জলপাইগুড়িতে রিকশা পাওয়া যায় না।"

ঠিকই। রাত ন'টা মানে রিকশাওয়ালাদের কাছে মধ্যরাত। ল্যাংড়া-পাঁচু বলল, "আমি হেঁটেই যাব। আমার কথা ভুলবেন না বাবু।" পাঁচটা টাকা সে নিয়ে নিল।

মাথার ভেতরটা যেন লোহা হয়ে গেছে। কিছুই ভাবতে পারছিল না সে। বাইকে স্টার্ট দিতেই হঠাৎ মহাদেববাবুর কথা মনে পড়ল। মহাদেব সেন। অমলদার বন্ধু। বয়সে অবশ্য অনেক বড়। দীর্ঘদিন মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখন একটা চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে চলে এসেছেন। খুব পণ্ডিত মানুষ। অর্জুনের মনে হল মহাদেববাবুর কাছে যাওয়া দরকার।

জলপাইগুড়ি শহরে সন্ধে নামতেই সেটা রাত হয়ে যায়। ন'টা বেজে গেলে

রাস্তাগুলো খাঁ-খাঁ হয়ে যায়। নির্জন রাস্তায় দ্রুত বাইক চালাতে-চালাতে অর্জুনের একবার মনে হল এটা অসময়, মহাদেববাবু ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। এখন যাওয়া মানে বিরক্ত করা। কিন্তু, একটু মরিয়া হল সে।

বাবুপাড়ায় করলা নদীর ধারে একটা গেটওয়ালা বাড়ির সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে সে ভেতরে ঢুকল। বাইরেটা অন্ধকার কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। বেল টিপতেই মহিলা কণ্ঠে প্রশ্ন এল, "কে ?"

"আমি অর্জুন।"

মিনিটখানেকের মধ্যেই ওপরের বারান্দায় আলো জ্বলল। অর্জুন দেখল ষোলো-সতেরো বছরের একটি স্কার্ট-পরা মেয়ে ওপর থেকে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করছে। সে জিজ্ঞেস করল, "মহাদেববাবু কি জেগে আছেন ? একটু দরকারে এসেছিলাম।"

"আপনি— !" মেয়েটি ওপর থেকে নেমে আসা আলোয় অর্জুনকে চিনতে পেরে হঠাৎই উচ্ছ্বসিত হল, "ও আপনি ! না না, দাদু ঘুমোয়নি এখনও। দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।" মেয়েটি অন্তর্হিত হল। অর্জুন বেশ অবাক। মেয়েটিকে সে আগে কোনওদিন দ্যাখেনি। অমলদার কাজে মহাদেববাবুর কাছে তাকে কয়েকবার আসতে হয়েছে এখানে।

মেয়েটি দরজা খুলল, "আমি তিস্তা। আপনার কথা খুব জানি।"

"ও।"

"আসুন।"

তিস্তার পেছনে সে দোতলায় উঠে এসে যে-ঘরটিতে ঢুকল সেখানেই মহাদেববাবু পড়াশোনা করেন। চোখের গোলমাল বেড়ে যাওয়ার পর অবশ্য সেটা বন্ধ হয়েছে। ত ক অপেক্ষা করতে বলে তিস্তা খবর দিতে গেল। মহাদেববাবু এলেন খানিক বাদেই। লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খবর অর্জুনবাবু ?"

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল চেয়ার ছেড়ে, "একটু বিরক্ত করলাম।"

"নট অ্যাট অল। আয় দিদু, এই হল আমার নাতনি। খুব গোয়েন্দা গল্প ভালবাসে। শুরু করেছিল এনিড ব্লাইটন, ক্যারোলিন কিন দিয়ে। এখন কোনান ডয়েল শেষ করে আগাথা ক্রিস্টি ধরেছে। থাকে কলকাতায়।" মহাদেববাবু নাতনির কাঁধে হাত রাখলেন।

তিস্তা বলে উঠল, "সত্যি, আপনি লন্ডন, নিউ ইয়র্কে গোয়েন্দাগিরি করেছেন ?"

মহাদেববাবু বললেন, "যা পড়েছ সব সত্যি। এখন যাও দিদু, আমরা একটু কথা বলি।" বেশ অনিচ্ছার সঙ্গে তিস্তা চলে গেলে মহাদেববাবু বসলেন, "তোমার দাদা তো আবার উধাও হয়েছেন। বেশ আছে সে। হিংসে হয়। ঈশ্বর আমার চোখ দুটো এমন না করলে কে থাকত এখানে পড়ে ? যাকগে, এত

রাত্রে এসেছ যখন তখন নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজন আছে !"

"হ্যাঁ আছে। কিন্তু তার আগে বলুন আপনি ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস করেন ?"

"একটা কিছুর ওপর নির্ভর করলে মনে জোর পাওয়া যায়। এই পৃথিবীটার সবকিছু যে নিয়ম মেনে চলে তার পেছনে যদি কারও পরিকল্পনা না থাকত তা হলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেত। ঈশ্বর থাকার বিপক্ষে যত যুক্তি, থাকার পক্ষে অনেক বেশি যুক্তি দেওয়া যায়। আসলে তিনি আছেন ভাবতেই ভাল লাগে।"

অর্জুন মহাদেববাবুর চোখের দিকে তাকাল। মোটা কাচের আড়ালে চোখ দুটো অদ্ভুত বড়। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার চোখে কী হয়েছে ? ছানি পড়লে...।"

মহাদেববাবু হাত নাড়লেন, "না ভাই। এটা ছানি নয়। গ্লুকোমা। আমার চোখের ভেতরের কিছু শিরা শুকিয়ে গেছে। চোখের ভেতরের প্রেশারও অ্যাবনর্মালি বেশি। এ-জীবনে সারবে না, বরং দিন-দিন আরও কম দেখতে পাব। এই সুন্দর পৃথিবীতে অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকার কথা ভাবতে খুব কষ্ট হয়।"

মহাদেববাবুর মুখটাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "অপারেশন করলে হয় না ?"

"হত। কিন্তু আমার যে আবার বেশিরকমের ব্লাড সুগার আছে। হত বলছিই বা কেন ! আমার যে স্টেজ তাতে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। থাকগে। আমার কথা থাক। কী উদ্দেশ্যে এখন এলে তাই শোনা যাক।" মহাদেববাবু হাসার চেষ্টা করলেন।

অর্জুন বলল, "আমি একটু বিপাকে পড়েছি। অমলদা থাকলেও উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। আমি অন্তত আগে শুনিনি।"

মহাদেববাবু বললেন, "কে যেন লিখেছেন পৃথিবীর সব রহস্য কোথাও-না-কোথাও কেউ-না-কেউ সমাধান করে গেছেন। যেহেতু আমরা সেই সমাধানের সূত্র জানি না তাই এখনও আমাদের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। ব্যাপারটা শোনা যাক।"

অর্জুন থানায় সন্ধেবেলায় রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে সমস্ত ঘটনা পর-পর বলে গেল। কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষেরা কোনও কথা শোনার সময় অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করেন। মনে হয় নিজেদের শ্রবণেন্দ্রিয় ক্রমশ শক্তিশালী করাই তাঁদের চেষ্টা হয়ে থাকে। অর্জুন চুপ করলে মহাদেববাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কার্ভালো অসমে যাওয়ার সময় রামচন্দ্রবাবুকে কি কিছু বলে গিয়েছেন ?"

"বোধ হয় না। বললে উনি আমাকে বলতেন।"

"বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক নয়। তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কারণ যদি সুটকেসের বস্তুটা সম্পর্কে কিছু জানিয়ে গিয়ে থাকে, ধরো, কোত্থেকে তিনি ওটাকে পেলেন, তাঁর কিছু হয়েছে কি না, তা হলে একটা ধারণা স্পষ্ট হত।"

"আমি জিজ্ঞেস করিনি। তবে জানা থাকলে রামচন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই বলতেন।"

"কার্ভালো ওঁর বাড়িতে এক রাত ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তখন কার্ভালোকে কেউ মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করেনি?"

"এই প্রশ্নটাও আমি করিনি।"

"রামচন্দ্রবাবু সিগন্যাল না কি যেন শুনতে পাচ্ছিলেন, তুমি পাওনি?"

"না।"

"তোমার সঙ্গে যে-লোকটা তালা ভাঙতে গিয়েছিল সে পেয়েছে?"

"না। পেলে বলত।"

"যন্ত্রটাকে একবার না দেখলে কিছু বলা যাচ্ছে না। এমন হতে পারে, এ-সবই রামচন্দ্রবাবুর কল্পনা। আজ রাত্রে থানায় ওটা রেখে এসেছ। যদি এটা সক্রিয় থাকে তা হলে থানার কোনও চোর অথবা পুলিশের অবস্থা রামচন্দ্রবাবুর মতো হবে। অতএব আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।" মহাদেববাবু বললেন।

"আচ্ছা, যন্ত্র বলেই বলছি, মহাকাশের সঙ্গে জড়িত কিছু নয় তো?"

"মহাকাশে তো কোনও যন্ত্র এমনি ঘুরে বেড়ায় না যে খসে পড়লে পৃথিবীর কোনও মানুষ কুড়িয়ে পাবে! আর যদি বা পড়ে তা হলে পৃথিবীতে পড়তে যাবে কোন দুঃখে! যদি পৃথিবীতে পড়ে তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "তা হলে কাল সকালে থানায় গিয়ে খোঁজ নেব।"

"দাঁড়াও।" মহাদেবাবু হাত তুললেন, "তুমি বললে রাত হলে রামচন্দ্রবাবু যে সিগন্যালটা শোনেন, তা ওই যন্ত্রের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তখন তাঁর আর হুঁশ থাকে না। যা উনি করেন তা তাঁকে দিয়ে অন্য কেউ করায়?"

"হ্যাঁ। উনি তো তাই বলেছেন।"

"তোমার সঙ্গে তো বাইক আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু বাইকে বসার সাহস আমার নেই। নইলে তোমার সঙ্গে গিয়ে রামচন্দ্রবাবুকে এই রাত্রে দেখে আসতাম। বেশি রাত তো হয়নি!"

"আপনি যদি আমার পেছনে বসেন তা হলে আমি খুব সাবধানে চালাতে পারি।"

"না, তুমি রিকশা ডাকো।"

মহাদেববাবু যে অত রাত্রে অর্জুনের হাত ধরে বের হচ্ছেন, তা ওঁর বাড়ির লোকদের পছন্দ ছিল না। অনেকেই মুখের ওপরেই আপত্তি জানালেন। তিস্তা বায়না ধরল সে সঙ্গে যাবে, কিন্তু মহাদেববাবু কারও কথা কানে তুললেন না।

তিনি যখন তৈরি হচ্ছিলেন, তখন অর্জুন জলপাইগুড়ির রাত্রের রাস্তায় রিকশা খুঁজছিল। যেহেতু ন'টা বেজে গেছে, একটাও রিকশা চোখে পড়ছিল না। সে খুব হতাশ হয়ে মহাদেববাবুর গেটের সামনে ফিরে আসতেই শুনল বৃদ্ধ বলছেন, "কে ?"

"আমি অর্জুন।"

"ও, রিকশা পেলে না ?"

"না।"

"রাজবাড়ি তো বেশি দূর নয়, চলো হেঁটেই যাই।"

"অন্তত দেড় কিলোমিটার পথ।"

"এমন কী বেশি ? তোমার বাইকের চেয়ে হাঁটতে আরাম হবে।"

নির্জন জলপাইগুড়ির রাস্তায় হাঁটতে ভাল লাগছিল অর্জুনের। নিজের বাইকটাকে সে মহাদেববাবুর বাড়ির গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে এসেছিল। মহাদেববাবু হঠাৎ বললেন, "জানো, আমাদের বাংলা ভাষায় মহাকাশ নিয়েও গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে। কিন্তু সেদিন একটা কাহিনী শুনলাম, যা আমাকে খুব চমকে দিয়েছে।"

মহাদেববাবু যে আন্দাজে হাঁটছেন, তা বুঝতে পেরেই অর্জুন তাঁর হাত ধরল। দু'পাশে বাড়ি-ঘর-দোকানের আলো নিভে গেছে। মাঝে-মাঝে দু-একটা রিকশা দেখা গেলেও তারা যাত্রী নিয়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটছে। হাঁটতে-হাঁটতে মহাদেববাবু গল্পটা শোনালেন। এক ভদ্রলোকের হার্ট ব্লক হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শরীরের যা অবস্থা তাতে অপারেশন করা সম্ভব ছিল না। অনেক ভাবনাচিন্তার পর সার্জেন এবং তাঁর সহকারী নিজেদের শরীরে যে ইনজেকশন নিলেন তাতে তাঁদের শরীর ছোট হয়ে গেল। একটা ছোট্ট ক্যাপসুলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন তাঁরা। তারপর সেই ক্যাপসুলটাকে ইঞ্জেকশনের সাহায্যে ভদ্রলোকের ধমনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ধরা যাক, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যা করার করতে হবে সার্জেনকে। তারপরে ওই ক্যাপসুল গলে যাবে।"

এই পর্যন্ত বলে মহাদেববাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী, আজগুবি বলে মনে হচ্ছে ?"

"একটু।"

"লেখক সামান্য লাইসেন্স নিয়েছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে লোকে চাঁদে হেঁটে বেড়ানোটাকে আজগুবি বলে মনে করত।"

"তারপর ?" হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ধমনী বেয়ে ক্যাপসুলে চেপে লোক দুটো পথ হারিয়ে ফেলল। ওরা প্রথমে গেল স্টম্যাকে। তারপর লিভারে। নানা জায়গায় ঘুরে ওরা যখন হার্টে পৌঁছল তখন অনেক নাটক হয়ে গেছে। কিন্তু হাতে সময় নেই। শিরা বেয়ে ওরা হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করল। খুদে-খুদে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ওরা অপারেশনের পুরো কাজটা শেষ করল। হাতে বেশি সময় নেই কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ ওরা খুঁজে পাচ্ছিল না। কী করে ওরা বের হল বলতে পার?" মহাদেববাবু প্রশ্ন করলেন।

অর্জুন ভেবে পেল না। ওরা তখন রাজবাড়ির গেট পেরিয়ে যাচ্ছে। মহাদেববাবু বললেন, "পেশেন্টের চোখের জলের সঙ্গে ওদের ক্যাপসুল বেরিয়ে আসামাত্র গলে গেল। বেরোবার ওই একটিমাত্র পথ ছিল। দারুণ গল্প। পড়তে-পড়তে শিরদাঁড়া সোজা হয়ে যায়।"

অর্জুন বলল, "এই বাড়ি।"

রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। জানলাগুলোও। কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। অর্জুন কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে কোনও শব্দ ভেসে এল না। দ্বিতীয়বারের পর গলা পাওয়া গেল। অর্জুন নিজের পরিচয় দেওয়ার পর দরজাটা খুলল। খালি গায়ে লুঙ্গি পরে রামচন্দ্র রায় তাদের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন তাঁর বুঝতে সময় লাগল। শেষমেশ বললেন, "ও, আমি ভাবলাম, আসুন-আসুন। আমি শুয়ে পড়েছিলাম।" কথাগুলো বেশ জড়ানো।

অর্জুন বলল, "আমি খুবই দুঃখিত যে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে—।"

হাত নাড়লেন রামচন্দ্রবাবু, "ঘুমোইনি। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শুয়ে ছিলাম।"

"প্রতি রাত্রে যা হয় আজ সেসব—।"

"হয়নি। এমনকী সেই সিগন্যালিং সাউন্ডটাও কানের পরদা থেকে উধাও। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল কিছু একটা হবে, কিন্তু হচ্ছে না। টেনশন বাড়ছে কিন্তু ঘুম আসছে না।"

"আপনি তো তাই চেয়েছিলেন।"

"মোটেই নয়। ওরা আমাকে দিয়ে কোনও অপরাধ করাক এটা চাইনি। কিন্তু আমার কাছ থেকে চলে যাক, এটা কখনও ভাবিনি। সুটকেসটাকে কোথায় রেখেছেন?"

এবার মহাদেববাবু কথা বললেন, "নমস্কার। আমার নাম মহাদেব সেন। চোখে দেখি না বলাই সঙ্গত। অর্জুনবাবুর সঙ্গে তবু এলাম। আপনার মনে হচ্ছে সুটকেসটা এখানে থাকলে সুবিধে হত?"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "নিশ্চয়ই। কার্ভালো যে আমার এত বড় উপকার করেছে তা আগে বুঝিনি। ওর ওই সুটকেসটার জন্যেই রোজ রাত্রে ওরা এই

বাড়িতে আসত।”

“কারা ?” মহাদেব সেন জিজ্ঞেস করলেন।

“আমি জানি না। কিন্তু ওদের উপস্থিতি টের পেতাম। বেশ ভাল লাগত।”

এবার অর্জুন বলল, “ভাল লাগত ? আপনি আগে একবারও বলেছেন এ কথা ? থানায় গিয়েছিলেন এর বিরুদ্ধে ডায়েরি করতে, তা হলে কী করে ভাল লাগত ?”

“আঃ, বোঝাতে পারছি না, ওদের উপস্থিতি আমার ভাল লাগত কিন্তু ওরা যদি আমাকে দিয়ে অন্যায় কিছু করিয়ে নেয় তাই ভয় করত। সুটকেসটা কোথায় ?” রামচন্দ্র রায় বেশ উদ্বিগ্ন।

“ওটা ঠিক জায়গায় আছে। আমরা আপনার সঙ্গে ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। একটু বসতে পারি ? উনি অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন।” অর্জুন বলল।

বোঝা গেল অনিচ্ছা প্রবল, তবু বসতে বললেন রামচন্দ্র রায়। বসাটা দরকার ছিল মহাদেববাবুর। তিনি একটু আরামসূচক শব্দ করে জিজ্ঞেস করলেন, “সুটকেসটা যে এত জরুরি তা আপনি আগে জানতেন ?”

“না। ওটা পড়ে থাকত ঘরের কোণে।”

“আপনার বন্ধু আপনাকে দিয়েছিল ?”

“দেয়নি। রেখে গিয়েছিল। বলেছিল অসম থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবে।”

“যে-রাত্রে তিনি এ-বাড়িতে ছিলেন সেই রাত্রে কোনও ঘটনা ঘটেছিল ? মানে, ওই সিগন্যালিং সাউন্ড ? কারও আসার অনুভূতি।” মহাদেববাবু প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন।

“না। একদম হয়নি। কার্ভালো চলে যাওয়ার পরের রাত থেকে এটা শুরু হয়েছে।”

“যাওয়ার দিন উনি কি সুটকেস খুলেছিলেন ?”

রামচন্দ্রবাবু মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর মাথা দোলালেন, “না। কেউ নিজের সুটকেস খুলছে তা মুখ বাড়িয়ে দেখা অভদ্রতা। আমি দেখিনি।”

“কার্ভালো আপনাকে যন্ত্রটা সম্পর্কে কিছু বলে গিয়েছেন ?”

“না।”

“মিস্টার রায়, এখন কি মনে হচ্ছে আপনি রোজ রাত্রে একটা নেশার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু আজ সেই নেশার বস্তুটি পাচ্ছেন না ?”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার ঘুম আসছে না।”

“যারা আপনার কাছে আসে বলে মনে হয়, তাদের কোনও কথা আপনার

মনে আছে ?”

“তারা কোনও কথা বলে না।”

মহাদেব সেন এবার উঠে দাঁড়ালেন, “চলি, অনেকটা পথ ফিরতে হবে।”

রামচন্দ্র রায় বললেন, “কিন্তু সুটকেসটাকে আমার চাই, এখনই।”

“এখনই দেওয়া সম্ভব নয়।” অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

“কেন ?”

“ওটাকে থানার সিন্দুকে রেখে এসেছি। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।”

সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোক ভেঙে পড়লেন, “ওঃ, কী দুর্মতি হয়েছিল! থানায় গিয়ে আমার কাল হল। ওঃ।”

মহাদেব সেনের হাত ধরে অর্জুন বেরিয়ে আসতেই লটারির মতো একটা রিকশা পেয়ে গেল। রোড স্টেশনে তার রিকশা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এত রাত পর্যন্ত আটকে পড়ে ছিল। মহাদেব সেন আর অর্জুন সেই রিকশায় বসে শহরের দিকে হু-হু করে চলে আসছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কিছু বুঝলেন ?”

“এক বিন্দু নয়। বুঝবে তুমি। আমার কাজ প্রশ্ন করে যাওয়া। আমরা কি থানার রাস্তায় যাচ্ছি ?”

“থানা ? আপনি এখন বাড়িতে ফিরবেন না ?”

“নিশ্চয়ই। তবে তার আগে একবার থানার ব্যাপারটা শুনে যেতে চাই।”

“বুঝলাম না।’

“রাত অনেক হয়েছে। থানার লোকজন সিগন্যালিং সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে কি না অথবা ওদের কারও রামচন্দ্র রায়ের মতো অবস্থা হল কি না। এটা জানা দরকার।”

অর্জুন রিকশাওয়ালাকে থানার দিকে যেতে বলল। লোকটা আপত্তি করল। ওর বাড়ি থানা থেকে অনেক দূরে। সে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না।

থানায় পৌঁছে মহাদেব সেন নামতে চাইলেন না। তিনি রিকশায় বসে রইলেন। অর্জুন নামল। পাহারায় থাকা সেপাই জানাল অবনীবাবু ফিরেছেন। তিনি এখন নিজের কোয়ার্টার্সে আছেন। সেকেন্ড অফিসার শঙ্করবাবু এত রাত্রে অর্জুনকে দেখে অবাক, “কী হল মশাই ?”

“কিছুই হয়নি। আপনাদের নতুন কোনও খবর আছে ?”

“পুলিশের আবার নতুন খবর! সবসময়ই খবর। কী ব্যাপার বলুন তো ?”

“একবার ভল্টের সামনে নিয়ে যাবেন ?”

“নিশ্চয়ই। কিন্তু রহস্য কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে!”

অর্জুন আর কথা না বাড়িয়ে শঙ্করবাবুকে অনুসরণ করল। ভল্টের দরজায় তেমনই তালা ঝুলছে। সে জিজ্ঞেস করল, “এখানে যারা আছে তাদের

আচরণে কোনও পরিবর্তন এসেছে ?”

“না। আর পরিবর্তন হবেই বা কেন ?”

“একটা কারণ ছিল। কেউ কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছে ? মেটালিক টোন ?”

“আমি তো শুনিনি। কেউ শুনলে নিশ্চয়ই বলত। আপনি শুনছেন ?”

অর্জুন হেসে ফেলল, “নাঃ। চলুন।”

“কী ব্যাপার ! এসব প্রশ্ন করছেন কেন ?”

“যে ভদ্রলোকের কাছে সুটকেসটা ছিল তিনি শুনতে পেতেন।”

“লোকটা নিশ্চয়ই নেশাভাঙ করত ! জলপাইগুড়িতে এরকম লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আরে মশাই এক ভদ্রমহিলা রোজ রাতে ভূত দেখছেন। গিয়ে জানলাম একটা মাটির প্যাঁচা মেলা থেকে কেনার পর থেকেই নাকি ওই কাণ্ড শুরু হয়েছে। বললাম, ভেঙে ফেলুন কিন্তু তা করবে না। জোর করে সেটাকে করালাম, ফেলে দিতে ভূত দেখা বন্ধ হল। বুঝুন। কিসে এলেন, বাইক কোথায় ?”

“রিকশায় এসেছি। সঙ্গে একজন বিশিষ্ট মানুষ আছেন।”

“কে ?”

“মহাদেব সেন।”

শঙ্করবাবু সম্ভবত মহাদেব সেন সম্পর্কে বেশি কিছু জানেন না। কিন্তু তিনি অর্জুনের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। দূর থেকেই রাস্তার আলোয় অর্জুনের চোখে পড়ল রিকশার ওপরে মহাদেব সেন দু' হাতে কান চেপে বসে আছেন। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি ভদ্রলোকের ! নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল। এত রাত্রে ওঁকে বিব্রত কবা ঠিক হয়নি। কাছে পৌঁছে সে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ?”

অদ্ভুত চোখ কবলেন মহাদেব সেন, “অর্জুন, আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার কানের পরদায় একটানা একটা সাউন্ড বিপবিপ করে বেজে যাচ্ছে। কখনও রেডিয়ো খোলার আগের শব্দের মতো টানা। মাই গড। তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ ?”

হতভম্ব অর্জুন বলল, “না।”

“এই রিকশাওয়ালাটাও পাচ্ছে না। আপনি পাচ্ছেন ভাই ?”

শঙ্করবাবু হাঁ হয়ে শুনছিলেন। মুখ বন্ধ করে দ্রুত মাথা নেড়ে না বললেন। সেটা ভাল করে দেখতে পেলেন না মহাদেব সেন। বুঝতে পেরে অর্জুন বলল, “উনিও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।”

মহাদেব সেনকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অর্জুন বলল, “ঠিক আছে। চলুন, বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নেবেন।”

মাথা নাড়লেন মহাদেব সেন, “না ভাই। মিস্টার রায় যা বলেছিলেন অবিকল সেই আওয়াজ। খুব দূর থেকে আসছে, যেন ক্ষীণ কিন্তু কানে পৌঁছে

যাচ্ছে। রিকশাটা এখানে দাঁড়ানো মাত্র ওটা কানে পৌঁছেছে। ব্যাপারটা আমার দেখা উচিত।"

শঙ্করবাবু বললেন, "সার, আপনি বোধ হয় ঠিক সুস্থ নন।"

"রাবিশ। চোখে দেখতে না পাওয়া ছাড়া আমার কোনও প্রব্লেম নেই।" মহাদেব সেন রিকশা থেকে নামার চেষ্টা করছেন দেখে অর্জুন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরল। মহাদেব সেন মাটিতে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমাকে থানার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলো।"

রিকশাওয়ালা এতক্ষণ এসব কাণ্ড দেখছিল। এবার বলল তাকে ছেড়ে দিতে। এমনিতেই প্রচুর রাত হয়ে গিয়েছে, তার ওপর ভুতুড়ে ব্যাপারে সে নেই। অর্জুনের আপত্তি ছিল, কিন্তু শঙ্করবাবু বললেন, "এখানে এসে পড়েছেন যখন, তখন কোনও প্রব্লেম নেই। গাড়ি করে ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মহাদেব সেনের পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "অর্জুনবাবু।"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"মনে করে দ্যাখো তো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে মিস্টার রায় এরকম শব্দ শুনতে পেয়েছেন কি না?"

"হ্যাঁ। উনি পাচ্ছিলেন।"

"গুড। এখনও আমার বোধবুদ্ধি ঠিক আছে। মিস্টার রায় তোমাকে বলেছেন একটা সময় তাঁর কোনও হুঁশ থাকত না। সেই অবস্থা যদি আমার হয় তা হলে একটু লক্ষ রেখো।. আমি চেষ্টা করব আমার হুঁশ ঠিক রাখতে। সুটকেসটাকে কোথায় রেখেছ?" মহাদেব সেনের চোখ এখন একেবারেই বন্ধ। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ওঁর ভেতরে কিছু ঘটে যাচ্ছে।

"মাটির তলার ঘরে।" অর্জুন জবাব দিল।

"আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।"

"আমি তো নিয়ে যেতে পারব না। জায়গাটায় বাইরের মানুষের যাওয়া নিষেধ যদি না এঁরা অনুমতি দেন। শঙ্করবাবু, উনি একবার ভল্টের সামনে যেতে চান। নিয়ে যাবেন?"

অর্জুন প্রশ্ন করতে শঙ্করবাবু তার দিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময়। মহাদেব সেনের ওই পরিবর্তনের কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না। থানায় যারা পাহারা দিচ্ছিল সেই সেপাইরাও কাছাকাছি এসে যেন মজা দেখছে।

শঙ্করবাবু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করবেন, "কী ব্যাপার? ভূতে ভর করছে নাকি?"

কথাটা চাপাস্বরে হলেও মহাদেব সেনের কানে গেল। তাঁর গলা শোনা গেল, "অর্জুন, ওর কথাগুলো শুনতে পেয়েছি। তার মানে আই অ্যাম ইন ফুল

সেন্স। ভূতে ভর করলে এসব কথা বলতে পারতাম না মশাই। ঠিক কি না?"

শঙ্করবাবু চটপট বলে উঠলেন, "ঠিক কথা। অর্জুনবাবু, আমি একবার বড়সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আসি। যদি কিছু হয়ে যায়, মানে, আমার একটু ঝুঁকি থাকছে তো!"

অর্জুন বলল, "এত রাত্রে ভদ্রলোককে ঘুম থেকে তুলবেন? আমরা তো কিছুই করছি না। শুধু দরজা পর্যন্ত যাচ্ছি আর ফিরে আসছি।"

শঙ্করবাবু আর একটু ইতস্তত করে বললেন, "ঠিক আছে, তবে অন্য কিছু হলে আপনি কিন্তু আমার কথা বড়সাহেবকে বলবেন। আমি অবশ্য ওঁকে বলেছি যে, আপনি এসে একটা সুটকেস রেখে গেছেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন, কীসের সুটকেস? আমি বললাম সম্ভবত দামি জিনিস আছে ভেতরে।"

"তা হলে তো ওঁকে জানানোই হয়ে গেছে। চলুন, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।"

ওরা যত এগোচ্ছিল তত নিচুস্বরে মহাদেব সেন বলছিলেন, "খুব জোরে বাজছে হে। রায় ঠিকই বলেছে। কোনও আজগুবি ভূতপ্রেত নয়। একেবারে মাথার ভেতরে হ্যামার করছে।"

বন্ধ দরজার সামনে ওরা যখন এসে দাঁড়াল, তখন মহাদেব সেনের মুখ-চোখ বেশ উত্তেজিত। অর্জুন বলল, "ওই ঘরের ভেতরে সুটকেসটা আছে।"

মহাদেব সেন সজোরে দরজায় ঘুসি মারলেন।

শঙ্করবাবু বললেন উঠলেন, "করছেন কী? তালা দেওয়া আছে। কাল সকালের আগে খোলা যাবে না। আরে, আপনার হাতে লাগবে! ও অর্জুনবাবু, সামলান ওঁকে।"

অর্জুন মহাদেব সেনের হাত ধরল, "আপনি আহত হবেন।"

"হই হব। আই মাস্ট সি দ্যাট সুটকেস। আঃ কী আরাম।" কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল ওঁর। চোখ-মুখ পালটে যাচ্ছিল। শঙ্করবাবুর ইঙ্গিতে পাহারাদাররা ছুটে এসে মহাদেব সেনকে জড়িয়ে ধরল। একজন একটা দড়ি এনে ভাল করে বাঁধতে যাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুন তাকে বাধা দিল। "না। ওটা করবেন না। ধরাধরি করে ওঁকে বরং বাইরে নিয়ে চলুন।"

ওরা যখন মহাদেব সেনকে জোর করে তুলে ওপরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন শঙ্করবাবু ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সুটকেসটার ভেতরে ভূত আছে নাকি? অ্যাঁ। ভদ্রলোকের ওপর তো ভর করে ফেলেছে।"

"আপনি তো ওসবে বিশ্বাস করেন না।"

"করতাম না। কিন্তু এখন চোখের ওপর দেখছি।"

ওপরে এসেও সেপাইরা মহাদেব সেনকে সামলাতে পারছিল না। তিনি

যেন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এখন। সেপাইরা কী করবে বুঝতে পারছে না। অর্জুন ওঁকে বোঝাতে গেল, "আপনি শান্ত হোন, কী করছেন ?"

মহাদেব সেন এমন সব শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, যা অর্জুন এই জীবনে শোনেনি। এমনিতে দৃষ্টিশক্তি প্রায় নেই, কিন্তু এখন তাঁকে দেখে ওসব মনেই আসছে না। চিৎকার চেঁচামেচিতে অবনীবাবুর ঘুমও ভেঙে গেল। তিনি নেমে এলে অর্জুন তাঁকে সব জানাল। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে অবনীবাবু নিজে একবার ভল্টের দরজা থেকে ঘুরে এলেন, তাঁর আচার-আচরণে কোনও পরিবর্তন হল না। ওপরে এসেই অবনীবাবু মহাদেব সেনের বাড়িতে একজন সেপাইকে পাঠালেন খবর দিতে, আর টেলিফোনে ডাক্তার দাসকে থানায় আসতে বললেন।

দুটো হাত পেছন দিকে শক্ত করে ধরে মহাদেব সেনকে একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। অর্জুনের খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই বৃদ্ধ অসুস্থ মানুষটিকে সে কোন্ সমস্যায় জড়িয়ে দিল !

মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রায় একই সঙ্গে মহাদেব সেনের ছেলে এবং বউমা আর ডাক্তার দাস এসে গেলেন। মহাদেব সেনের ছেলে সুব্রত সেন এখানকার কলেজের অধ্যাপক। বাবার ওই অবস্থা দেখে তিনি অবাক !

কী করে এমন হল প্রশ্ন করাতে অর্জুন খুব দুঃখের সঙ্গে ব্যাপারটা জানাল। ভদ্রলোক বললেন, "খুব অন্যায় করেছেন বাবাকে অত রাত্রে নিয়ে গিয়ে। এই বয়সে এ কী হয়ে গেল বলুন তো !"

সুব্রত সেনের স্ত্রী অনেকটা বাস্তব কথা বললেন, "বাবা না চাইলে কেউ কি ওঁকে নিয়ে যেতে পারে ? তা ছাড়া উনি কী করে জানবেন যে, এমন হবে !"

ডাক্তার দাসকে মহাদেব সেন পরীক্ষা করতে দিলেনই না। যতবার তিনি কাছে যাচ্ছেন ততবার যেন তাঁর ওপরেই আক্রোশ পড়ছে। শেষপর্যন্ত ডাক্তার দাস বললেন, "মনে হচ্ছে কোনও কারণে ওর নার্ভাস সিস্টেমে গোলমাল হয়েছে। এখনই কড়া ঘুমের ওষুধ দেওয়া উচিত। আপনারা জোর করে ধরুন, আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছি।"

তাই করা হল। মহাদেব সেনের শরীরে প্রচণ্ড শক্তি, এখন তবু সবাই মিলে জোর করে তাঁকে এমনভাবে ধরা হল যাতে ডাক্তার দাস ইনজেকশন দিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাতেও কাজ হল না। ভদ্রলোক রীতিমতো অবাক। বললেন, "কোনও মানুষ এই ইনজেকশনের পর মিনিট পাঁচেক জেগে থাকতে পারে না। এঁর কী হল ?"

রাতটা ওইভাবেই কাটল। ভোর যত এগিয়ে এল, তত নেতিয়ে পড়তে লাগলেন মহাদেব সেন। সূর্য ওঠার ঠিক আগে তিনি একদম শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ-চোখ শান্ত হয়ে এল। অবনীবাবু বললেন, "এখন ওঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। এই ঘরেই আমি বিছানা

করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। শঙ্করবাবু, আপনি দেখবেন কেউ যেন এখানে না ঢোকে। মহাদেব সেনের মতো নামী বিজ্ঞানীর কোনও ক্ষতি হোক আমরা চাই না।”

কয়েক মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। মহাদেব সেন এখন আরামে ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার দাস পরীক্ষা করে দেখলেন, ওঁর পাল্‌স এবং হার্ট নর্মাল। ভয়ের কোনও কারণ নেই। ঘুমের স্তর পরীক্ষা করে ভদ্রলোক শুধু বললেন, “আশ্চর্য ! মনে হচ্ছে আমি এইমাত্র ইঞ্জেকশন দিয়েছি। কী কাণ্ড !”

মিসেস সেন চলে গেলেন। বললেন, “কাউকে পাঠিয়ে দিলে তুমি যেয়ো।”

সুব্রত সেন মাথা নাড়লেন। তাঁকে তখনও অর্জুনের ওপর সদয় মনে হচ্ছিল না।

অবনীবাবু বললেন, “চলুন, দরজা ভেজিয়ে আমরা বাইরে যাই। অর্জুনবাবু, অনেক ঝড় গেল, আপনি বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করুন।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “অসম্ভব। আমার জন্যে ওঁর এই দশা, উনি যতক্ষণ না সুস্থ হয়ে কথা বলছেন ততক্ষণ আমার ঘুম আসবে না।”

“বেশ, তা হলে চলুন, আমরা একটু চা-পান করি।”

ওরা দরজা ভেজিয়ে বাইরে এল। অবনীবাবু একজনকে ডেকে চায়ের কথা বললেন। সবে ভোর হচ্ছে। হঠাৎ অর্জুনের নজরে এল থানার গেট পেরিয়ে রামচন্দ্র রায় বেশ ইতস্তত ভাব নিয়ে ঢুকছেন। এই সময়ে ওঁকে এখানে দেখবে ভাবেনি সে। রামচন্দ্র রায় অর্জুনকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকলেন। অবনীবাবু বললেন, “আরে. এই ভদ্রলোকই তো গতকাল সন্ধেবেলায় আমার কাছে এসেছিলেন, তাই না অর্জুনবাবু ?”

“হ্যাঁ, উনিই। দাঁড়ান. দেখি কেন ডাকছেন !”

অর্জুন এগিয়ে গেল। রামচন্দ্র রায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুন কাছে গিয়ে বলল, “সুপ্রভাত !”

“ও, হ্যাঁ, সুপ্রভাত।” ভদ্রলোককে আজ আরও বয়স্ক দেখাচ্ছিল।

“কী ব্যাপার ?”

“আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম কাল রাত্রে নাকি ফেরেননি।”

এখন মা বাড়িতে নেই। ক'দিনের জন্যে এক পিসির বাড়িতে গিয়েছিলেন। কাজের লোকটি নিশ্চয়ই চিন্তা করবে না। অর্জুন গতরাত্রে বাড়িতে খবর দেয়নি সেই কারণেই।

“হঠাৎ কোনও প্রয়োজন হয়েছিল ?”

“হ্যাঁ। আমার সুটকেসটা ফেরত দিন।”

“আপনি বলেছেন ওটা কার্ভালোর।”

"কার্ভালো আমার বন্ধু। সে ওটা আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। অতএব ওর সম্বন্ধে যাবতীয় দায়িত্ব আমার। দয়া করে ফেরত দিন।" প্রায় মিনতি করলেন রামচন্দ্র রায়।

"দেখুন, ওটার অস্তিত্ব আছে তাই আমরা জানতাম না। আপনি নিজে এসে থানায় কথা না বললে এসব কিছুই হত না। কিন্তু নিজের অজান্তে আপনি একটা ভাল কাজ করেছেন। আপনার কাছে সুটকেসের ভেতরে যে যন্ত্রটি ছিল তার রি-অ্যাকশন সব মানুষের ওপর পড়ে না। আমি, ল্যাংড়া-পাঁচু, থানার অফিসার অথবা সেপাইরা ওর রি-অ্যাকশন থেকে মুক্ত, অথচ কাল যে-ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। সারারাত ওঁর যে কষ্ট হয়েছে, তা আমি দেখেছি। মনে হয় আপনারও একই কষ্ট হত। এখন ওই যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনাকে ফেরত দিতে পারি না," অর্জুন বলল।

অবনীবাবু ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বন্ধু ওই যন্ত্র কোথায় পেয়েছেন তা কি আপনাকে বলেছেন ?"

নীরবে মাথা নেড়ে না বললেন রামচন্দ্রবাবু।

"একটা অদ্ভুত জিনিস বেআইনিভাবে আপনি রাখতে পারেন না !"

রামচন্দ্রবাবুর কাছে এসব কথা যাচ্ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কারও কিছু হয়নি আর সেই ভদ্রলোকের অবস্থা আমার মতো হয়ে গেল ! একবার তাঁকে দেখতে পারি ?"

"উনি এখন ঘুমোচ্ছেন !" অবনীবাবু বললেন।

"আচ্ছা, আমিও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মড়ার মতো ঘুমোতাম। আপনারা আমার সর্বনাশ করেছেন। এই ক'দিন বাতের ব্যথাটা ছিল না একটুও, আজ আবার ফিরে এসেছে। ওটা না পেলে আমি আজ আত্মহত্যা করব !" রামচন্দ্র রায় চাপা গলায় বললেন।

অর্জুন বৃদ্ধকে বলল, "ওই সিগন্যাল শোনা, ঘোরের মধ্যে থাকা আপনার নেশা হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। একটা রাত না পেয়ে আপনি এসব কথাও ভাবতে পারছেন। অথচ আপনি নাবিক ছিলেন. কত কষ্ট, পরিশ্রম করেছেন, জীবন দেখেছেন। একটা সাধারণ নেশাখোরের কথা আপনার মুখে কি মানায় ?"

"ওঃ, কী করে বোঝাব ওটা কী ধরনের নেশা !"

"আপনি তো ওই নেশায় আক্রান্ত হয়ে কাউকে খুন করতে পারতেন !"

"হ্যাঁ, ঠিক, সব ঠিক।" রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন, "তবু— ।"

"আর কোনও তবু নয়। আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই যন্ত্রটাকে। দরকার হলে সরকারকে জানাতে হবে। এরকম হচ্ছে কেন ! চিংড়িমাছ খেলে সবার ভাল লাগে, আবার কারও-কারও শরীরে এমন অ্যালার্জি বের হয় যে, সে

দ্বিতীয়বার খায় না। তার শরীরের গঠনের সঙ্গে ওই মাছ মেলে না। মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুর দেওয়া ওই যন্ত্রটি সব মানুষকে আক্রমণ করে না। কোনও-কোনও মানুষের মস্তিষ্কে এমন কিছু কোষ আছে, যা ওর পছন্দ। বোঝাই যাচ্ছে তাঁদের সংখ্যা খুব অল্প। আপাতত আপনি আর মহাদেববাবু একই গোত্রের। এখন আপনি বাড়ি ফিরে যান। মহাদেববাবুর ঘুম ভাঙলে মনে হয় কিছু জানা যেতে পারে।" অর্জুন তার লাল বাইকটির কথা ভাবল। সেটা মহাদেব সেনের বাড়ির সামনেই পড়ে আছে গত রাত থেকে। সে অবনীবাবুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটা শুরু করল। সমস্ত রাত অদ্ভুত টেনশনে কাটিয়ে এখন বেশ অবসন্ন মনে হচ্ছে নিজেকে।

ঘুম হয়েছিল কি হয়নি, ঘণ্টা তিনেক বিছানায় শুয়ে স্নান সেরে কিছু মুখে দিয়ে অর্জুন যখন থানায় ফিরে এল, তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা। শঙ্করবাবু তাঁর বাসস্থানে এখনও ঘুমোচ্ছেন, অবনীবাবু এস. পি'র বাংলোয় গিয়েছেন। অর্জুন জানল মহাদেব সেনের ঘুম এখনও ভাঙেনি। সে বারান্দা দিয়ে এগোতেই তিস্তাকে দেখতে পেল। একজন বয়স্কা মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই তিস্তা হাসল, "গুড মর্নিং।"

অর্জুন বলল, "সুপ্রভাত। উনি কি এখনও ঘুমোচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। পুলিশটা বলল না জাগলে ভেতরে যাওয়া নিষেধ। কাল কখন আপনি মোটরবাইক নিয়ে গেলেন আমি টেরই পাইনি।" তিস্তা হাসল।

"আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসতে পারেন।" অর্জুন কথা শেষ করতেই ডাক্তার দাসকে আসতে দেখা গেল। তিনি বললেন, "কী ব্যাপার, উনি কেমন আছেন? ঘুম ভেঙেছে?"

অর্জুন বলল, "বোধ হয় না।"

ডাক্তার দাস ঘড়ি দেখলেন, "প্রায় ছ'ঘণ্টা হয়ে গেছে। চলুন, একবার দেখে আসি।"

ডাক্তার দাসের পেছন-পেছন ওরা ভেতরে ঢুকল। মহাদেব সেন সেই একই ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছেন। মুখ খুব প্রশান্ত। ডাক্তার দাস তাঁর হাত তুলে পাল্‌স্‌ দেখতে লাগলেন। এই সময় চোখ খুললেন মহাদেব সেন। তাঁর মাথার পাশে তিস্তারা দাঁড়িয়ে ছিল, পায়ের কাছে অর্জুন। সে দেখল মহাদেব সেনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠছে। তিনি বললেন, "কী ব্যাপার, তুমি এখানে?"

ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন বোধ হচ্ছে এখন?"

এবার মহাদেব সেন বাকিদের দেখলেন। তিস্তা ঝুঁকে পড়ল, "কেমন আছ দাদু?"

"আরে! আমি কোথায় শুয়ে আছি?"

"থানায়। তোমার খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। আমরা চিন্তায় ছিলাম

খু-উ-ব।"

"আমি থানায় শুয়ে আছি!" মহাদেব সেন উঠে বসলেন, "কাল রাত্রে, কাল রাত্রে তো অর্জুন এসেছিল। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে বেরিয়ে শেষপর্যন্ত থানায় এসেছিলাম। মনে পড়ছে সব। তারপর আমার কী হয়েছিল অর্জুন?" স্পষ্ট চোখে তাকালেন মহাদেব সেন।

অর্জুনের কেমন সন্দেহ হল। সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?"

প্রশ্নটি শোনামাত্র মহাদেব সেন হতভম্ব হয়ে পড়লেন, দুটো হাত তুলে চোখ রগড়ালেন, তারপর চিৎকার করে উঠলেন, "আরে, এ কী হল?"

তিস্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

মুখ ঘুরিয়ে ঘরের সবাইকে দেখলেন মহাদেব সেন, "আমি, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কী করে হল! আমার যে কোনও সম্ভাবনাই ছিল না দেখার। আহ্। দিস ইজ এ মিরাকল।" নীচে নেমে দাঁড়ালেন তিনি কথাগুলো বলতে-বলতে।

ডাক্তার দাস তাঁকে বাধা দিলেন, "আপনি এত এক্সাইটেড হবেন না। টেক ইট ইজি।"

"টেক ইট ইজি? আরে, আমার মতো প্রায় অন্ধ হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, এটা কি রোজকার ঘটনা?" মাথা নাড়লেন মহাদেব সেন। তাঁকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। এই সময় সুব্রত সেন ঘরে ঢুকলেন অবনীবাবুর সঙ্গে। তাঁদের দেখামাত্র তিস্তা চিৎকার করে উঠল, "দাদু এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমি বাড়িতে যাচ্ছি সবাইকে খবর দিতে।" তিস্তা বেরিয়ে গেল।

সুব্রতবাবু হকচকিয়ে গেলেন, "দেখতে পাচ্ছেন মানে?"

মহাদেব সেন ছেলের দিকে তাকালেন, "হ্যাঁ সুব্রত, আমি দেখতে পাচ্ছি।"

"কী করে সম্ভব?"

এবার ডাক্তার দাস বললেন, "অঘটন ঘটে। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে যা অসম্ভব বলা হয়েছে জীবনে তার উলটোটা মাঝে-মাঝে হতে দেখেছি।"

"আপনি ডাক্তার?" মহাদেব সেন বললেন।

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। উনি ডাক্তার দাস। গত রাত থেকেই উনি আপনার কাছে আছেন বলা যেতে পারে।"

"গত রাত থেকে! হ্যাঁ, তাই তো, আমি এ কোথায় শুয়ে আছি?"

"আপনি থানায় রাত্রিবাস করেছেন সার। আমি এখানকার ওসি।" অবনীবাবু হাসিমুখে এগিয়ে এলেন হাতজোড় করে।

নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন মহাদেব সেন, "আমার কী হয়েছিল?"

সুব্রত সেন বললেন, "পরে শুনবেন। এখন বাড়ি চলুন, আপনার বিশ্রামের

দরকার।"

মহাদেব সেন মাথা নাড়লেন, "সারারাত ঘুমিয়ে এখন আবার বিশ্রামের দরকার হবে কেন ? ডাক্তার, আপনি বলুন তো আমার কী হয়েছিল ?"

ডাক্তার দাস বললেন, "আপনি খুবই এক্সাইটেড ছিলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় মস্তিষ্ক কাজ করছিল না। খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠেছিলেন। সেই অবস্থা থেকে সরিয়ে আনতে আপনাকে আমি ঘুমের ওষুধ দিই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সেই ওষুধ কাজ শুরু করে অনেক পরে, ভোরের একটু আগে। ততক্ষণ আপনার অবস্থা নর্মাল ছিল না. এখন অনুগ্রহ করে একটু শুয়ে পড়ুন, আমি পরীক্ষা করব।"

মহাদেব সেন বাধ্য ছেলের মতো আদেশ পালন করলেন। তাঁকে পরীক্ষা করার পর ডাক্তার দাসের মুখে হাসি ফুটল, "নাঃ, একদম ঠিক আছেন। এবার বাড়ি যেতে পারেন।"

শুয়ে-শুয়েই মহাদেব সেন প্রশ্ন করলেন, "ক'টা বাজে এখন ?"

অবনীবাবু সময়টা বললেন। মহাদেব সেন বিড়বিড় করলেন, "এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলাম !"

ডাক্তার দাস বললেন, "আপনার ঘুম শুরু হয়েছিল সাড়ে চারটে থেকে। সময়টা বেশি নয়।"

মহাদেব সেন সোজা হলেন, "আমার একটু টয়লেট যাওয়া দরকার।"

সুব্রত সেন বললেন, "বাড়িতে চলুন।"

মহাদেব সেন বললেন, "বেশ। তাই চলো। কিন্তু অর্জুন, তুমি আমার সঙ্গে কখন দেখা করছ ?"

"আপনি বিশ্রাম নিন। বিকেলের দিকে।"

"না, না। অত দেরি করা চলবে না। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে নেব। তুমি চলে এসো।" ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন মহাদেব সেন। তিস্তার সঙ্গে যে মহিলা এসেছিলেন তিনিও ওঁদের অনুসরণ করলেন। ঘরের জানলা খুলে দিয়ে অবনীবাবু বললেন, "ব্যাপারটা কী হল ?"

ডাক্তার দাস বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না। গত রাত্রে যখন ওঁকে প্রথম দেখলাম তখন ওঁর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে ভাবার প্রশ্নই ছিল না। বদ্ধ উন্মাদ মনে হচ্ছিল ওঁকে। কিন্তু এমন কিছু ঘটে গেছে ওঁর শরীরে, যে-কারণে আমার ইনজেকশন কাজ করতে দেরি করেছিল। ব্যাপারটা কলকাতায় জানাতে হবে।"

অবনীবাবু বললেন, "সেটা জানাবার পরে অনেক সময় পাবেন। কিন্তু সত্যি কি উনি চোখে ভাল দেখতে পেতেন না ? আমি বুঝতে পারছি না।"

অর্জুন হতভম্ব হয়ে বসে ছিল। বলল, "এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই। উনি প্রায় অন্ধ ছিলেন। ওই যন্ত্রটির কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ওঁর আচরণে

পরিবর্তন এল। মনে হয় তারই রি-অ্যাকশনে উনি এখন দেখতে পাচ্ছেন।"

ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন, "কী যন্ত্র ?"

অবনীবাবু চট করে ঘুরে দাঁড়ালেন, "একদম ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন দেখা যাক।"

ডাক্তার দাস ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না। যেতে-যেতে ওঁকে ওয়াকিবহাল করলেন অবনীবাবু। ভদ্রলোককে বলতে শোনা গেল, "কী আজগুবি গল্প শোনাচ্ছেন !"

নীচের ভল্টের সামনে পৌঁছে অবনীবাবু ডাক্তার দাসকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন ?"

ভদ্রলোক জবাব দেওয়ার আগেই অর্জুন বলল, "দিনের বেলায় ওটা শোনা যায় না। অন্তত রামচন্দ্র রায় তাই বলেছেন।"

"ভদ্রলোক সঠিক কথা নাও বলতে পারেন।" অবনীবাবুর ইঙ্গিতে সেপাই তালা খুলল।

ডাক্তার দাস বললেন, "দূর মশাই, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।"

ঘরের যে-কোণে সুটকেসটাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল অর্জুন, সেখানেই ওটা পড়ে আছে। অবনীবাবু একটানে সেটাকে র‍্যাকের আড়াল থেকে বের করতে পারলেন না। অর্জুন সেইভাবেই ঢুকিয়ে রেখেছিল। এখন বলল, "তালা লাগানো নেই। সাবধানে।"

সুটকেস থেকে থার্মোকলের বাক্সগুলো খুলে যন্ত্রটাকে তুলে আনা হল। ধাতব বস্তুটি শব্দহীন। অর্জুনের খেয়াল হল, রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতে যখন এটাকে সে দেখেছিল তখন এর ভেতর থেকে আলো বের হচ্ছিল। এখন কোনও আলোই নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যন্ত্রটিকে দেখে অবনীবাবু বললেন, "জিনিসটা কী তাই, বোঝা যাচ্ছে না।"

"সিগন্যাল রিসিভিং মেশিন। যখনই এটা সেই সিগন্যাল পায় তখনই এর ভেতর থেকে আলো বের হয় দপদপ করে।" অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল।

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সিগন্যালটা পায় কার কাছ থেকে ?"

"সেটা জানি না। কাল রাত্রে যখন রামচন্দ্রবাবু সিগন্যালের শব্দ পাচ্ছিলেন তখন ওটা থেকে আলো বের হতে দেখেছি আমি।" অর্জুন বলল।

এতক্ষণ ডাক্তার দাস যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবার বললেন, "একটা কথা খুবই বিনীতভাবে জানতে চাইছি। এটা যদি একটা সিগন্যাল রিসিভ করার মেশিন হয় তাহলে এর কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছে মহাদেববাবুর নার্ভ বিকল হয়ে গেল কী করে, আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন কোন যুক্তিতে ?"

অবনীবাবু বললেন, "তাই তো !"

অর্জুন বলল, "এইটে জানতে আরও কিছু সময় লাগবে। আমরা এর মধ্যে জেনেছি এই যন্ত্রের কাছাকাছি এলে বেশিরভাগ মানুষের কিছুই হয় না। যেমন

আমি, শঙ্করবাবু, ল্যাংড়া-পাঁচু, থানার সেপাইরা, এমনকী আপনারাও। কারণ আপনারাও কাল রাত্রে কোনও সিগন্যাল শুনতে পাননি। কিন্তু কিছু-কিছু মানুষের পরিবর্তন হয়। আজ সকালে রামচন্দ্র রায় এসেছিলেন, কারণ যন্ত্রটির সঙ্গে রাত কাটানো তাঁর কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। ওঁর শরীরে যে বাতের ব্যথা ছিল তা উধাও হয়ে গিয়েছিল যন্ত্রটির সঙ্গে রাত কাটিয়ে! কিন্তু নির্যন্ত্র থাকার ফলে সেটা আবার ফিরে এসেছে।"

"শব্দটা কী বললেন ভাই? নির্যন্ত্র?" ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ। যদি নির্জন, নির্বান্ধব হতে পারে, তখন নির্যন্ত্র হবে না কেন?" অর্জুন হাসল। তারপর ঘড়ি দেখল।

অবনীবাবু হঠাৎ পুলিশি গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, "কার্ভালোর পেট থেকে খবর বের করতে হবে যে, কোথায় সে যন্ত্রটা পেয়েছে?"

"সে যদি আর না ফেরে?"

"এত দামি একটা জিনিস ফেলে রেখে কতদিন বাইরে থাকবে?"

"ভদ্রলোক কিন্তু এক মাস ধরে উধাও।"

"ওই লোকটারও কোন রি-অ্যাকশন হয়নি। তাই তো?"

"হ্যাঁ, কার্ভালোও আমাদের দলে।"

"এটাই অদ্ভুত। হ্যাঁ মশাই এটার সঙ্গে অ্যাটমিক ব্যাপারের কোনও সংযোগ নেই তো? এইযে আমি ধরলাম।" অবনীবাবুকে এবার নার্ভাস দেখাল।

"সেটাও জানা দরকার।" অর্জুন গম্ভীরভাবে বলল, "আমি এখন মহাদেববাবুর বাড়িতে যাব। যাওয়ার সময় এটাকে সঙ্গে নেব।"

"এটাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাবেন?"

"কেন? দিনের বেলায় অসুবিধে কোথায়?"

"আরে মশাই, এত মূল্যবান জিনিস, ওঁর কাছে যাওয়ার দরকার কী?"

"এই শহরে একমাত্র উনিই এ-বিষয়ে কিছু বলার ক্ষমতা রাখেন। ভদ্রলোক চিরকাল বিজ্ঞানচর্চা করে এসেছেন।"

অবনীবাবু ইতস্তত করছিলেন, "এরকম জিনিস যে-কোনও মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তা ছাড়া পথে যদি কিছু হয় তা হলে—! বরং উনি তো এখন ভাল আছেন, এখানেই এসে দেখতে বলুন না!"

অনেক তর্কের পর অবনীবাবু রাজি হলেন। কিন্তু পুলিশের জিপে অর্জুন যন্ত্রটিকে নিয়ে যাবে এবং সঙ্গে সেপাই থাকবে। অবনীবাবু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই অদ্ভুত যন্ত্র পাওয়ার খবর পাঠাতে দেরি করলেন না। এটা নাকি তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

জিপে বসে থানার বাইরে আসামাত্র অর্জুন দেখল রাস্তার একপাশে রামচন্দ্র রায় ছাতি মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোককে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অর্জুন পুলিশ-ড্রাইভারকে বলল গাড়ি থামাতে। তাকে দেখতে পেয়ে রামচন্দ্র রায়

এগিয়ে এলেন, "আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আরে, ওটাই তো কার্ভালোর সুটকেস, তাই না ?"

অর্জুন দেখল রামচন্দ্রবাবুর চোখ চকচক করে উঠল। সে সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, "আপনি এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন ? পাগল হয়ে গিয়েছেন নাকি ?"

"তা বলতে পারেন। বাড়ি গিয়ে শুনলাম থানায় এসেছেন, তাই।" রামচন্দ্রবাবু কাঁচুমাচু হলেন, "আসলে আমার মনে হচ্ছে জীবনের অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা লাগছে।"

"উঠে আসুন জিপে।" অর্জুনের মায়া হল।

চটপট জিপে উঠলেন রামচন্দ্র রায়, "নাইনটিন ফর্টি নাইনে আমি একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা জিপ চালিয়েছিলাম। নাওয়া-খাওয়া সব মাথায় উঠেছিল।"

অর্জুন বলল, "থামেননি ?"

"ওই যখন তেলের দরকার হত, তখনই।" রামচন্দ্র হাসলেন, "এখানে, মানে ইন্ডিয়ায় নয়। অস্ট্রেলিয়ায়। জাহাজ থেকে একটা জরুরি খবর নিয়ে ছুটতে হয়েছিল।"

"বাব্বা, আপনার তো অভিজ্ঞতা অনেক।"

"তা তো বটেই। বই লিখলে ইয়া মোটা হয়ে যেত।"

"লিখুন না।"

"ছাপবে কে ? এ-দেশে গুণীর কদর নেই। কার বাড়ি ?"

অর্জুনের ইশারায় ড্রাইভার মহাদেব সেনের বাড়ির সামনে জিপ থামিয়েছিল। সুটকেস নিয়ে নামতে-নামতে অর্জুন বলল, "আপাতত এই শহরে আপনার সঙ্গে মিল আছে যে একমাত্র মানুষটির, তিনি এই বাড়িতে থাকেন। গতরাত্রে তাঁকে আপনার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"এখানে কেন আনা হল ?"

"উনি একজন বিজ্ঞানী। আপনার, আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি জানেন। ওঁর সাহায্য দরকার এই রহস্য সমাধান করতে। আপনিও আসুন না!" অর্জুনের অনুরোধে রামচন্দ্র রায় যেন বাধ্য হয়েই অনুসরণ করলেন।

বাড়ির সবাই প্রস্তুত ছিলেন। তিস্তা ওদের মহাদেব সেনের ঘরে নিয়ে যাওয়ামাত্র তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কী ?"

"এটাই কার্ভালোর রেখে যাওয়া সুটকেস।" অর্জুন সযত্নে মেঝের ওপর রাখল সুটকেসটাকে। মহাদেব সেনকে এখন অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। চোখের চশমা খুলে তিনি বললেন, "এঁর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?"

"থানার সামনে।" জবাব দিয়ে অর্জুন দেখল রামচন্দ্রবাবু একদৃষ্টিতে মহাদেব সেনের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন ওঁর ভেতরটা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারপর হাসলেন, "রামচন্দ্র মহাদেবের বাড়িতে এল অর্জুনের

সঙ্গে।"

"ধন্যবাদ।" মহাদেব সেনের চোখ ঘরের ভেতর দাঁড়ানো আত্মীয়স্বজনের ওপর পড়ল, "এবার আমরা একটু কাজ করব। তোমরা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

আদেশ অমান্য করার সাহস কারও হল না, যদিও বেরিয়ে যেতে কারওরই মন চাইছিল না। রামচন্দ্র রায় বললেন, "কাজেব সময় আমার থাকা কি উচিত হবে ?"

"নিশ্চয়ই। এখানে আপনি-আমি গিনিপিগ। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। অর্জুন, দরজা দুটো বন্ধ করে সুটকেস খোলো। আগে যন্ত্রটাকে দেখা যাক।" মহাদেব সেন বললেন।

দরজা বন্ধ করে সুটকেস খুলে থার্মোকলের ভেতর থেকে যন্ত্রটাকে বের করা হল। মহাদেব সেন সামনের টেবিলে সেটিকে রাখতে বললেন। জানলা দিয়ে আসা আলো পড়ায় যন্ত্র চকচক করছে। মহাদেব সেন বললেন, "মেটালটা লক্ষ কবো। স্টিল অ্যালুমিনিয়াম মেশানো বলে ভুল হবে। তুমি বলেছিলে আলো বেরোতে দেখেছ, কোনও আলো নেই।"

"ওটা সিগন্যাল হলে বের হয় বলে মনে হচ্ছে।"

"হয়তো। মিস্টার রায়, আপনি কি কোনও শব্দ পাচ্ছেন ?"

রামচন্দ্র রায় মাথা নাডলেন, "নাঃ। দিনের বেলায় তো পেতাম না।"

"তা হলে তোমাব ধারণাই ঠিক অর্জুন। কিন্তু এই মেটাল কভারটায় কোথাও জোড়ের চিহ্ন নেই। ভেতরে যে যন্ত্রপাতি, না না, অর্জুন, এই জায়গাটা লক্ষ করো।" ঝুঁকে পড়ে দেখতে-দেখতে মহাদেব সেন অর্জুনকে ডাকলেন। অর্জুন দেখল। কিছু একটা খুলে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে। বস্তুটিকে ধরে রাখার হুক এখনও এর গায়ে আছে।

অর্জুন বলল, "এর গায়ে কিছু লাগানো ছিল।"

মহাদেব সেন বললেন, "হুঁ। এখন এই যন্ত্রটি ঠিক কী জিনিস তা জানার জন্যে দুটো পথ আছে। এক, আমরা এই মেটাল কভার ভাঙতে পারি। সেক্ষেত্রে যদি যন্ত্রটাই খারাপ হয়ে যায় তা হলে চিরকাল আফশোস থেকে যাবে। দ্বিতীয় পথটা আরও ক'টা রাত পরীক্ষা করা।"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "দ্বিতীয় পথটাই ঠিক। তা হলে আমার বাতের ব্যথাটা কমে যাবে।"

"আপনার বাত আছে ?" মহাদেব সেন মুখ তুললেন।

"আর বলবেন না, নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে...।"

রামচন্দ্রবাবুকে থামিয়ে অর্জুন বলল, "এটা কোথায় ? আফ্রিকায় ?"

"একদম ঠিক। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল আমার। বাঁচার চান্স ছিল না।"

অর্জুন ভদ্রলোককে থামাবার জন্যে বলল, "উনি বলছেন রোজ রাত্রে এই

যন্ত্রের সঙ্গে থাকার ফলে ওঁর শরীরে বাতের ব্যথা কমে গিয়েছিল। এক রাত ছাড়াছাড়ি হওয়ায় আবার বেড়ে গিয়েছে। আপনার চোখের ব্যাপারটা কীরকম ?"

মহাদেব সেন বললেন, "উনি ঠিকই বলছেন অর্জুন। যখন ঘুম থেকে উঠেছিলাম তখন মনে হয়েছিল সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এরই মধ্যে মনে হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি কমতে আরম্ভ করেছে। আগের থেকে অনেক ভাল, কিন্তু ওই পাওয়ার বেড়ে গেলে যা হয়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি মনে হয় এটা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে ?"

"না হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। যদি কেউ করে থাকেন তা হলে তাঁর পক্ষে এমন ঝুঁকি নেওয়া খুবই বোকামি হবে।"

"বোকামি কেন ?"

"তিনি নিশ্চয়ই লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। যন্ত্রটা নিশ্চয়ই তাঁর কাছ থেকে চুরি গিয়েছে। প্রতি রাত্রে তিনি সিগন্যাল পাঠান যন্ত্রটার অস্তিত্বটা জানার। না, তা হতে পারে না। তা হলে তিনি জেনেই যেতেন যন্ত্রটা কোথায় আছে, এসে নিয়ে যেতেন । যে-যন্ত্র একটি মানুষকে প্রভাবিত করে তার শরীরের ত্রুটি কমিয়ে দেয়, তাকে তিনি অনেক বড় কাজে ব্যবহার করবেন।"

"তা হলে ?"

"হ্যাঁ। সেরকমই মনে হয়। এই ধাতব বস্তুটি আমার অচেনা। গড়নও অদ্ভুত। দিনের আলো নিভে গেলে পৃথিবীতে সিগন্যালটা আসে অথবা দিনের আলোর জন্যেই সিগন্যাল এলেও এটি অচল থাকে। সিগন্যাল পেলেই যন্ত্রটা সক্রিয় হয়। সক্রিয় যন্ত্রটি থেকে যে-তরঙ্গ বের হয় তা সেইসব মানুষের মস্তিষ্কের কোষে প্রতিক্রিয়া আনে, যাদের গঠনের সঙ্গে এই যন্ত্রে রাখা ফর্মুলার মিল আছে। কিন্তু কেন ? কারা এটাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। উদ্দেশ্য কী ? তা ছাড়া এই যন্ত্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এর শরীর থেকে কিছু একটা খুলে নেওয়া হয়েছে। কী সেটা ?" যেন বারংবার নিজেকেই প্রশ্ন করে গেলেন মহাদেব সেন। খুব চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে।

অর্জুন বলল, "বেশ, এবার আমরা একটা হিসেবে আসি। আমরা জেনেছি এই যন্ত্রটির একটা অংশ উধাও হয়েছে। দুই, এটি দিনের বেলায় নিষ্ক্রিয় থাকে। তিন, সন্ধের পরেই দূর থেকে ভেসে আসা সিগন্যালে এ রেসপন্স করে এবং ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নিষ্ক্রিয় হয়। তা হলে দিনের বেলায় সিগন্যাল আসে না অথবা এলেও এ গ্রহণ করতে পারে না।"

মহাদেববাবু বললেন, "আমাদের পৃথিবী যখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তখন ওই সিগন্যাল-প্রেরকের কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়। হয়তো সূর্যতাপ

সহ্য করতে পারে না।”

অর্জুন বলল, “বেশ। এবার দেখা যাচ্ছে, সন্ধে হওয়ার পর থেকেই এই যন্ত্রের কাছাকাছি আসামাত্র কোনও-কোনও মানুষ একটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।”

রামচন্দ্র রায় বললেন, “ক্ষীণ কিন্তু ননস্টপ।”

“হ্যাঁ, সেটা একসময় বাড়তে আরম্ভ করে?”

“মিস্টার রায় বলতে পারবেন। আমি গতকাল রিকশায় বসেই যা শুনতে পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছিল কালা হয়ে যাব।”

“ঠিকই। সন্ধে থেকে শুরু হয়। একটু-একটু করে বাড়তে থাকে। আমি চটপট রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিতাম, কানে শব্দ বাজত। তারপর একসময় মনে হত কানের পরদা ফেটে যাবে। তখন আর জ্ঞান থাকত না।” রামচন্দ্র রায় বললেন।

“হ্যাঁ, আমি এই স্টেজটাই জানতে চাইছি। গত রাত্রে আপনার কানে ব্যথা হচ্ছিল শব্দটার জন্যে, রিকশাতে বসেই। আমার সঙ্গে যখন থানার ভেতরে ঢুকলেন তখনও আপনি স্বাভাবিক কথা বলছিলেন, মনে আছে?” অর্জুন মহাদেব সেনকে জিজ্ঞেস করল।

“মনে আছে। তখন শব্দটা কানের ভেতর তুমুল হয়ে উঠছিল। যখন নীচের বন্ধ দরজার কাছে পৌঁছলাম তখন ওই আওয়াজের প্রাবল্যে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম।”

“হ্যাঁ। আপনি তখন দরজা খোলার চেষ্টা করছিলেন একাই। প্রচণ্ড শক্তি এসে গেল শরীরে। আপনাকে ধরে রাখা একজন সেপাইয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মিস্টার রায়, ওই অবস্থায় পৌঁছে আপনিও কি যন্ত্রটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেন? সেক্ষেত্রে তো আপনি সহজেই যন্ত্রটাকে পেতেন। ওটা আপনার ঘরে সুটকেসের মধ্যেই থাকত।” অর্জুন তাকাল।

“না। আমি বেরিয়ে পড়তাম। খালি হাতে নয়। কিছু একটা ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যেতাম। কোথায় যেতাম, কেন যেতাম তা জানি না। অনেকটা হাঁটতাম মধ্যরাত্রে। দু-একজন প্রতিবেশী পরের দিন সকালে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছে অতরাত্রে তিস্তা ব্রিজের দিকে কেন গিয়েছিলাম? জবাব দিতে পারিনি।” রামচন্দ্র রায় হাসলেন, “সকালে ডান হাতে খুব ব্যথা হত। এখন মনে হচ্ছে এমনও হতে পারে ওই সুটকেস বয়ে নিয়ে যেতাম। শুধু এই কারণেই একসময় ভয় হল, রাত্রে বেরিয়ে আমি কাউকে খুনও করতে পারি। এই ভয় বাড়তেই আমি থানায় গেলাম ডায়েরি করতে। আপনাকে বলেছিলাম আমার বাড়ির বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যেতে।”

“ওই সময়ে আপনি কাউকে দেখেছেন বলে মনে পড়ে?”

“কাউকে বলতে?” মহাদেব সেন জিজ্ঞেস করলেন।

"এমন কেউ যে আপনাকে পরিচালনা করছে।"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "আমার মনে হত কেউ পাশে আছে অথচ তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সে যা বলছে আমাকে, তাই করতে হচ্ছে।"

"আপনি ?"

"ঠিক এক অনুভূতি নয়। আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে তালা দিয়ে কেউ চাবি নিয়ে গিয়েছে। সেই চাবিটা আছে এই যন্ত্রের মধ্যে। ওই যন্ত্র পেলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। কিন্তু তোমরা আমাকে আটকে রেখেছিলে।" মহাদেব সেন বললেন। এই সময় রামচন্দ্র রায় উঠে এসে পরম স্নেহে যন্ত্রের গায়ে হাত বোলালেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা দু'জনেই কি আজ রাত্রে এই যন্ত্রটির সঙ্গে থাকার জন্যে কোনও টান অনুভব করছেন ?"

রামচন্দ্র রায় বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই।"

মহাদেব সেন বললেন, "আমার শুধু কৌতূহল হচ্ছে।"

"ওই কৌতূহল থেকেই টান আসবে। এ মশাই নেশার মতন ব্যাপার।" রামচন্দ্র রায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"আমাকে একটু ভাবতে দিন। এখনও কয়েক ঘণ্টা হাতে আছে। বিকেলে আমার কাছে এসো অর্জুন। একটা কিছু করতে হবে আজ রাত্রে।"

"আমি নিশ্চয়ই বাদ যাচ্ছি না ?" রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন।

"অবশ্যই না।" মহাদেব সেন বললেন।

"তা হলে এটিকে আবার থানায় রেখে আসি ?" অর্জুন বলল।

"কেন ?" মহাদেববাবু আপত্তি করলেন।

"এখন এটা সরকারের সম্পত্তি, যেহেতু এর মালিককে পাওয়া যাচ্ছে না।" অর্জুন বলল।

সমস্ত দুপুর অদ্ভুত এক উত্তেজনার মধ্যে কাটল অর্জুনের। শেষপর্যন্ত আড়াইটে নাগাদ সে জগুদার বাড়িতে গেল। জগুদা এখন শিলিগুড়ির স্টেট ব্যাঙ্কে বদলি হয়ে গিয়েছেন। বউদি তাকে দেখে খুব খুশি। অর্জুন ভি সি আরে স্পিলবার্গের 'ইটি' ছবিটা দেখতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটাকে চালু করে দিলেন। অর্জুন অনেকবার দেখা ছবিটাকে আর একবার খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু তার মনে হল স্পিলবার্গ যেভাবে দেখিয়েছেন, অন্য গ্রহের মানুষেরা এমন হয় না।

বউদিকে ভি সি আর বন্ধ করতে বলে সে বেরিয়ে এসে বাইকে স্টার্ট দিল। এখন বিকেল। কদমতলার মোড় জমজমাট। অর্জুন কালীবাড়ির রাস্তাটা ধরল। সে ক্রমশ নিঃসন্দেহ হচ্ছিল ওই যন্ত্রটির সঙ্গে মহাকাশের অন্য গ্রহের জীবদের একটা সম্পর্ক আছে। এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে না।

ব্যাপারটা নিয়ে যত সে ভাবছিল, তত এক ধরনের রোমাঞ্চে সে আপ্লুত হচ্ছিল।

থানায় পৌঁছে সে অবাক! এরই মধ্যে মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রায় অবনীবাবুর সামনে বসে আছেন। মহাদেব সেনের ছেলে সুব্রত সেনও সঙ্গে আছেন। মহাদেব সেন তাকে দেখে বললেন, "যাক, ঠিক সময়েই এসেছো।"

অর্জুন হেসে আর-একটা চেয়ারে বসল।

অবনীবাবু বললেন, "ডি আই জি হেড কোয়ার্টার্স একটু আগে টেলিফোন করেছিলেন এস পি সাহেবকে। বলেছেন আমাকে কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে।"

"কেন?" অর্জুন অবাক।

"ওঁর ধারণা ওভারস্ট্রেন করে আমার মাথা সুস্থ নেই। আমি ওই যন্ত্রটার ব্যাপারটা রিপোর্ট করেছিলাম।"

"আশ্চর্য!"

"হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে আমার এই দশা। যাকগে, আজকের প্ল্যান কী?"

"আমরা যন্ত্রটার কাজকর্ম ভালভাবে দেখতে চাই।"

"কীভাবে?"

এই সময় মহাদেব সেন কথা বললেন, "আমি একটা উপায় ভেবেছি। সুব্রত জিনিসটা বের করো তো।"

মহাদেববাবুর ছেলে একটা ব্যাগ খুলে দুটো হেডফোন জাতীয় জিনিস বের করে তাঁর বাবার হাতে দিলেন। মহাদেব সেন বললেন, "এটা কানে পরলে কোনওরকম বাইরের শব্দ কানে যাবে না। আমি দেখতে চাই শেষপর্যন্ত ঘটনাটা কোনদিকে যায়!"

রামচন্দ্র রায় বললেন, "সরি! ওটা আমি ব্যবহার করব না।"

"কেন?" মহাদেব সেন একটু বিরক্ত হলেন।

"আমি শব্দটাকে শুনতে চাই।"

মহাদেব সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অর্জুন বাধা দিল, "ঠিক আছে, উনি যা চাইছেন তাই হোক। আপনি হেডফোনটাকে ব্যবহার করুন। আজ রাত্রে আপনার স্বাভাবিক থাকা প্রয়োজন।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাদেববাবু প্রস্তাবটা মেনে নিলেন। অবনীবাবু বললেন, "আমি আর-একটা ব্যবস্থা করেছি। সেটা এখন বলব না।"

সন্ধে হওয়ার আগে চা খাওয়ালেন অবনীবাবু। তারপর সবাই ঘর থেকে বের হলেন। শঙ্করবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুনকে দেখে ইশারায় কাছে আসতে বললেন তিনি। অর্জুন এগিয়ে যেতে শঙ্করবাবু বললেন, "আমার বাবা চোখে দেখতেই পান না। যদি মহাদেববাবু ওই যন্ত্রটির সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান তা হলে আমার বাবাও পেতে পারেন। স্যারকে বলুন না, আমি

ওঁকে নিয়ে আসতে পারি ?"
"উনি কোথায় আছেন ?"
"আমার কোয়ার্টার্সে।"
"বেশ, ওঁকে আগে জিজ্ঞেস করুন কোনও সিগন্যালের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কি না। যদি পান, তা হলে নিয়ে আসুন।" অর্জুন হেসে এগিয়ে গেল।
আজ বিকেলে মহাদেব সেনের দৃষ্টিশক্তি আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সুব্রত সেনের হাত ধরে হাঁটছেন তিনি। সকালবেলায় যে-লোকটা টগবগে ছিল, এখন তাঁকে ছেলের হাত ধরে হাঁটতে হচ্ছে। বাইরে দিন ফুরিয়ে আসছে।
অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু ভেবেছেন ?"
মহাদেব সেন বললেন, "হ্যাঁ। আমি আগে থানায় এসেছি, কারণ অবনীবাবুকে দিয়ে ওই ভল্টের ঘরের মেঝে জুড়ে সাদা চুন ছড়িয়ে দিয়েছি। যে ওই ঘরে ঢুকবে তার পায়ের ছাপ ওখানে পড়বে। আমি হেডফোন ব্যবহার করব। যদি সিগন্যালের শব্দ না শুনতে পাই তা হলে আশা করি নর্মাল থাকব।"
ওরা নীচে নেমে ভল্টের দরজার সামনে দাঁড়াল। অবনীবাবু আগে থেকেই সেখানে কয়েকটা চেয়ারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সেগুলোয় বসে গল্পগুজব হচ্ছিল। হঠাৎ রামচন্দ্র রায় সোজা হয়ে বসলেন, "শুনতে পাচ্ছি।"
মহাদেব সেন কান খাড়া করলেন, "হ্যাঁ, আমিও পাচ্ছি। সুব্রত ?"
সুব্রত সেন তাঁর হাতে হেডফোন এগিয়ে দিতে তিনি সেটা ভাল করে কানে ঢেকে মাথায় পরে নিলেন।
রামচন্দ্র রায় বললেন, "বিপ বিপ শব্দ হচ্ছে।"
অবনীবাবুর নির্দেশে একজন সেপাই ভল্টের আলো নিভিয়ে দিল। যন্ত্রটাকে সুটকেস থেকে বের করে ভল্টের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া হয়েছিল। অন্ধকার হতেই তা থেকে মাঝে-মাঝে আলো বের হতে দেখা গেল। মহাদেববাবু পাশে বসা অর্জুনকে বললেন, "তোমার ধারণাটা ঠিক। সিগন্যাল আসামাত্র যন্ত্রটা থেকে আলো বের হয়।"
করিডোরে আলো আছে, ভেতরে নেই। আলোটা ক্রমশ জোরালো হয়ে নিভছে-জ্বলছে। হঠাৎ রামচন্দ্র রায় বললেন, "ডিনারটা করে নিতে পারলে ভাল হত। আজ সারারাত অভুক্ত থাকতে হবে।"
অর্জুন হাসল। ভদ্রলোক নির্ঘাত খেতে খুব ভালোবাসেন, নইলে এই সময়ে ডিনারের চিন্তা করতেন না।
হঠাৎ মহাদেব সেন বলে উঠলেন, "এ কী ! সর্বনাশ !"
সবাই ওঁর দিকে চমকে তাকাল। মহাদেব সেন বললেন, "আমি শব্দটাকে শুনতে পাচ্ছি। আমার কান ঢেকে রাখা সত্ত্বেও পাচ্ছি। মনে হচ্ছে শরীরের

অন্যসব রন্ধ্রপথ দিয়ে শব্দটা ঢুকে যাচ্ছে। খুবই ক্ষীণ তাই না মিস্টার রায় ?" মহাদেব সেন হেডফোন খুলে ফেললেন মাথা থেকে।

রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন, "ঠিক, ঠিক। গোটা রাত সামনে পড়ে আছে, না খেলে খুব দুর্বল হয়ে যাব। শরীর ঠিক না থাকলে কোনও আনন্দকেই আনন্দ বলে মনে হয় না।"

অর্জুন বলল, "কী খেতে চান ?"

মহাদেব সেন ধমকালেন, "থামো। আপনি এ সময়ে খাওয়ার কথা চিন্তা করছেন ?"

রামচন্দ্র রায় হাসলেন, "একবার জলদস্যুদের পাল্লায় পড়েছিলাম। ভোর হলেই খুন করবে বলে গেল। সবাই কান্নাকাটি করছিল। আমি কিন্তু রাতের খাবারটা চেয়ে নিলাম। আমার যুক্তি হল কান্নাকাটি করে দুর্বল হওয়ার চেয়ে খেয়েদেয়ে শক্তিশালী হওয়া অনেক ভাল। শব্দটা বাড়ছে !"

মহাদেব সেন একমত হলেন, "হ্যাঁ। এখন আর বিপ বিপ নয়, একটানা। বাড়ছে কিন্তু বেশ সহ্য করার মধ্যেই আছে। শরীরে একটা রিমঝিম ভাব এসে গেছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেউ আপনাকে সম্মোহন করছে বলে মনে হচ্ছে ?"

"আমেজ লাগছে কিন্তু কারও অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না। তাই না মিস্টার রায় ?"

"ঠিক, ঠিক।" চোখ বন্ধ রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন।

অর্জুন লক্ষ করল, টেবিলে রাখা যন্ত্রটা থেকে যে দপ-দপ আলোর ঝলকানি বেরিয়ে আসছিল, তা বদলে গেছে। এখন মৃদু নীলচে আলো বের হচ্ছে। আলোর রেখাটা মাঝে-মাঝে দিক পরিবর্তন করছে মাত্র। সে মহাদেব সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ব্যাপারটা লক্ষ করে মহাদেব সেন বললেন, "সঠিক দিকনির্ণয়ে সাহায্য করছে যন্ত্রটা। কিছু একটা আসছে আর তার আসার পথটা জানিয়ে দিচ্ছে ও।"

ঘণ্টাখানেক ধরে এই ধরনের কথাবার্তা চলল। মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রায় সিগন্যালিং সাউন্ড শুনেই যাচ্ছেন। শুধু তার পরদা বাড়ছে। ওঁদের কথাবার্তা এখনও স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে সুব্রত সেন তাঁর বাবাকে সতর্ক করেছিলেন শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা জানিয়ে, কিন্তু তিনি কান দেননি। জরুরি কিছু কাজের খবর নিয়ে শঙ্করবাবু এসেছিলেন অবনীবাবুর কাছে। অবনীবাবু নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে।

রাত দশটা নাগাদ অর্জুনেরই মনে হতে লাগল, বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছে। খেতে হলে এই চেয়ার ছেড়ে উঠতে হয়। কিন্তু ওঠবার ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব। কখন কোন মুহূর্তে কী ঘটে যাবে তা কেউ জানে না। রামচন্দ্র রায়

আর খাওয়ার কথা বলছেন না। তাঁকে এখন ঠিক একটি নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছে। শব্দটা বেড়ে গেছে অনেক। মহাদেব সেন গত রাত্রে রিকশায় বসে যেভাবে কান চেপে ধরেছিলেন, এখন সেই ভঙ্গিতে বসে আছেন। যন্ত্র থেকে বের হওয়া আলোটা এখন অতীব উজ্জ্বল। যেন টর্চের আলোর মতো সেটা বাঁ-ডান করে একটা দেওয়ালের ওপর আছড়ে পড়েছে। সেটা দেখে মহাদেব সেন উঠে দাঁড়ালেন, "গতি উত্তর দিকে। শব্দটা আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। দূরত্ব খুবই কমে এসেছে, খুবই কম, আঃ!" আস্তে-আস্তে ওঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সুব্রত সেনকে ইশারা করে সে মহাদেব সেনকে ধরতে বলে প্রায় পাঁজাকোলা করেই ওপরে নিয়ে এল। সামনে পুলিশ জিপের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শঙ্করবাবু। মহাদেব সেনের শরীর জিপে তুলে দিয়ে অর্জুন বলল, "আপনার ড্রাইভারকে বলুন থানা থেকে সিকি মাইল দূরে গাড়িটাকে নিয়ে যেতে। ওই যন্ত্রটার প্রভাবের বাইরে এখন ওঁকে রাখতে চাই, নইলে গতকালের অবস্থা হবে।"

শঙ্করবাবু ব্যাপারটা বুঝে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন। সুব্রত সেন মহাদেব সেনকে ধরে বসে ছিলেন। জিপটা সাত-তাড়াতাড়ি থানার চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অর্জুন আবার ফিরে গেল নীচে। গিয়ে দেখল রামচন্দ্রবাবুকে দু'জন সেপাই ধরে রেখেছে দু'পাশ থেকে। অবনীবাবু বললেন, "উনি ওই যন্ত্রটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছেন। কথা জড়িয়ে গেছে, কিন্তু গায়ে শক্তি এসেছে। মহাদেববাবুকে কোথায় নিয়ে গেলেন?"

অর্জুন বলল, "থানার বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। গত রাত্রে উনি থানার গেটের কাছে এসে শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন। ওই যন্ত্র থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলে ওঁর ওপর কোনও রি-অ্যাকশন পড়বে না। গত রাত্রের অবস্থা হওয়ার আগে উনি নর্মাল হয়ে যেতে পারবেন।"

রামচন্দ্র রায়ের এখন কোনও হুঁশ নেই। তাঁর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সেপাই দু'জনের জন্যে তিনি উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। অর্জুন যন্ত্রটির দিকে তাকাল। আলো বেশ চড়া এখন। দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে চারধার বেশ আলোকিত। গত রাত্রে সুটকেসের ভেতর ওটা থাকায় সে আলোর এই চেহারা ঠাওর করতে পারেনি। ঘরের মেঝের দিকে তাকাল সে। কোনও দাগ নেই। কোনও প্রাণী বা বস্তু ওখানে গেলে ছাপ ফুটে উঠত।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। এখন প্রায় এগারোটা বাজে। মহাদেব সেনের কথা মনে পড়ল তার। "গতি উত্তর দিকে, শব্দটা আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, দূরত্ব বেশি নয়।" কিন্তু বেশি নয় মানে কতটা? সে পিছিয়ে এসে অবনীবাবুর কানে নিচু গলায় কিছু বলল। ভদ্রলোক অবাক হলেন, "কিন্তু—"

"একবার দেখাই যাক না।"

"বেশ।" অবনীবাবু নিজেই তালা খুললেন। সাদা মেঝেতে তাঁর জুতোর ছাপ পড়ল। র‍্যাক থেকে থার্মোকোল বের করে যন্ত্রটাকে ঢুকিয়ে দিতেই আলো ঢেকে গেল। এবার যেমন ছিল তেমনই সুটকেসে সব জিনিস ভরে ওটাকে টেবিলে রেখে তিনি বেরিয়ে এসে সেপাইদের বললেন, "মিস্টার রায়কে ছেড়ে দাও।"

সেপাইরা আদেশ পালন করামাত্র রামচন্দ্রবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। একরকম ছুটেই তিনি টেবিলের কাছে পৌঁছে সুটকেসটাকে তুলে ধরলেন। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি একদম অন্যরকম এখন। নিজের জিনিস নিজেই নিয়ে যাচ্ছেন, কারও অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই এমন ভঙ্গিতে সুটকেসটাকে তুলে তিনি সোজা হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছিল এখন তিনি কাউকে চিনতে পারছেন না।

অর্জুন এবং অবনীবাবু ওঁকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে আসতেই দেখা গেল শঙ্করবাবু রামচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞেস করছেন, "এ কী! সুটকেস নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?"

রামচন্দ্র রায় জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। হনহনিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে লাগলেন। শঙ্করবাবুকে ইশারায় শান্ত হতে বলে অবনীবাবু বললেন, "আমরা ঘুরে আসছি।"

জলপাইগুড়ির রাস্তা এখন সুনসান। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় কোনও রিকশা নেই। রামচন্দ্র রায় সুটকেস নিয়ে সোজা দিনবাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, তার হাত-পনেরো দূরে অর্জুনরা। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন বলে মনে হয় আপনার?"

"উনি রোজ রাত্রে বের হতেন। ভোরের আগে ফিরে আসতেন সুটকেস নিয়ে। এ গল্প নিজেই করেছেন। কোথায় যেতেন, কী করতেন সেটা পরে খেয়াল করতে পারতেন না।" অর্জুন হাঁটতে-হাঁটতে বলল।

"করলা পার হয়ে রায়কতপাড়ার দিকে যাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ, এদিকেই ওঁর বাড়ি।"

"বাড়িতে যাচ্ছেন নাকি?"

"মনে হয় না। এটা উত্তর দিক না?"

"হ্যাঁ, থানার উত্তর দিক।"

অর্জুন বেশ উত্তেজিত হল। মহাদেব সেন যদি ভুল না করে থাকেন, যদি ওই সময়েও ওঁর মস্তিষ্ক ঠিক কাজ করে থাকে তা হলে এতক্ষণে একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। গতি উত্তর দিকে। দূরত্ব বেশি নয়। রামচন্দ্র রায় উত্তর দিকেই যাচ্ছেন।

রাজবাড়ি ছাড়িয়ে নিজের বাড়ির সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন রামচন্দ্র

রায়। দেখে মনে হল, তিনি কিছু ভাবছেন। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটাই ওঁর বাড়ি ?"

অর্জুন জবাব দিল, "হ্যাঁ। কিন্তু বাড়িতে আলো জ্বলছে কেন ?"

"আর কেউ থাকেন না ?"

"না।"

"হয়তো ভদ্রলোক কাল রাত থেকেই আর আলো নেভাননি। উনি আবার হাঁটা শুরু করেছেন। এই বয়সেও এত শক্তি, ভাবা যায় না।" অবনীবাবু আবার অনুসরণ আরম্ভ করলেন। অর্জুনের ইচ্ছে ছিল রামচন্দ্র রায়ের বাড়িটাকে একবার দেখে যাওয়া। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। জলপাইগুড়ি বাইপাসের রাস্তায় এসে বোঝা যাচ্ছিল রামচন্দ্র রায় আর চলতে পারছেন না। এখানে রাস্তার আলো নেই। তারাদের শরীর থেকে নেমে আসা আলোয় এখন চোখ অভ্যস্ত হয়েছে। রামচন্দ্র রায় টলছেন। হঠাৎ ধুপ করে বসে পড়লেন একপাশে। বসার সময়েও সুটকেসটার দখল ছাড়েননি। অন্তত চার-পাঁচ কিলোমিটার পথ তিনি হেঁটেছেন ভারী সুটকেস নিয়ে। এই বয়সে এটাই অস্বাভাবিক।

একটু অপেক্ষা করে অবনীবাবু বললেন, "চলুন দেখা যাক।"

ওরা পাশে এসে দাঁড়াতেও ভদ্রলোকের সম্বিৎ ফিরল না। অর্জুন সুটকেসটা বেশ সন্তর্পণে ওঁর হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে ডালা খুলল। থার্মোকোলের আড়াল থেকে যন্ত্রটা বের করতে চারধার আলোকিত হয়ে গেল। যন্ত্রের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা সেই আলো এখন উত্তরমুখী। অবনীবাবু রামচন্দ্র রায়ের নাড়ি পরীক্ষা করলেন, "খুব চঞ্চল, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে। ভদ্রলোককে ফিরিয়ে নেওয়া দরকার।"

অর্জুন বলল, "উনি এখন ক্লান্ত এবং আচ্ছন্ন। আসুন ওঁকে ধরে ওই গাছটার নিচে শুইয়ে দিই। যদি এটাকে ঘুম বলে তা হলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকুন। ফেরার সময় নিয়ে যাব।"

"ফেরার সময় মানে ? আপনি কোথায় যাবেন ?"

"মহাদেব সেন বলেছেন গতি উত্তরে. দূরত্ব বেশি নয়। এই আলোটাও দেখুন উত্তর দিকই নির্দেশ করছে। যন্ত্রটাকে অন্য মুখে ঘুরিয়ে দিলেই আলোটা উত্তর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মনে হয় রামচন্দ্র রায় ঘোরের মধ্যে প্রতি রাত্রে এই উত্তর দিকেই যেতে চেষ্টা করতেন। শরীরের ক্ষমতা ফুরিয়ে যেতে আর পারতেন না, ভোর হলে এই যন্ত্র অকেজো হয়ে যাওয়ায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার বাড়ির দিকে হাঁটতেন। সুটকেসটাকে নেব না, যন্ত্রটাকে হাতে নিয়ে উত্তর দিকে না হয় কিছুটা হাঁটা যাক।" অর্জুন এখন বেশ সিরিয়াস।

অবনীবাবু রাজি হলেন। রামচন্দ্র রায়কে ওরা রাস্তার পাশে একটা গাছের নীচে শুইয়ে দিলেন। যন্ত্রটি নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলে দেখা গেল দূরে

একটা গাড়ি আসছে। যন্ত্রটির আলো টর্চের আলোর মতো ওদের পথ দেখাচ্ছিল। গাড়িটা কাছে আসতেই অবনীবাবু হাত তুললেন কিন্তু ড্রাইভার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। অর্জুন বলল, "এরকম ফাঁকা জায়গায় এত রাত্রে আপনাকে ডাকাত বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।"

"যা বলেছেন। এখন মনে হচ্ছে জিপটাকে নিয়ে এলে হত।"

"জিপে চেপে রামচন্দ্রবাবুর পেছনে হাঁটাটা স্বাভাবিক ছিল না।"

"এখন মশাই আমারই পায়ে ব্যথা শুরু হয়েছে। আমরা কোন দিকে যাচ্ছি ?"

"ডান দিকে তিস্তা ব্রিজ, বাঁ দিকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, আলো যাচ্ছে এ-দুটোর মাঝামাঝি সোজা। এই এখন আমাদের গাইড।"

একটু বাদেই রাস্তা শেষ। পথ এখন ডান এবং বাঁ দিকে চলে গিয়েছে। সোজা যেতে হলে মাঠে নামতে হবে। অর্জুন ইতস্তত করছিল। এই মাঠ হাঁটার পক্ষে নিরাপদ নয়। মাটি নরম। কোনও আল চোখে পড়ছে না। কিন্তু হঠাৎ অবনীবাবু উৎসাহী হলেন, "চলুন, এত দূর যখন এসেছি তখন তিস্তা পর্যন্ত যাওয়া যাক।"

অর্জুন দেখল, আলোটা এতক্ষণ একটানা বেরোচ্ছিল, এখন একটু কমছে-বাড়ছে। অবনীবাবুও সেটা দেখলেন। বললেন, "চলুন না। তিস্তা তো পার হতে পারব না। ওই অবধি গিয়ে না হয় ফিরে আসা যাবে।"

অতএব ওরা মাঠে নামল। আলোয় পা ফেলছে সাবধানে। জুতো বসে যাচ্ছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি স্পিলবার্গের ইটি দেখেছেন ?"

"নাঃ। পুলিশের চাকরি করে সময় হয় না।"

"আপনার কথা মানতে পারছি না।"

"কেন ?"

"আমি অনেক পুলিশ অফিসারের কথা শুনেছি যাঁরা প্রচুর বই পড়েন, ভাল ছবি দ্যাখেন। একজন অধ্যাপকের সঙ্গে চট করে তাঁদের তফাত বোঝা যাবে না।"

"তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক ওপরতলার অফিসার, থানা চালাতে হয় না।"

নিজের জুতোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, ও দুটো খুলে ফেলতে পারলেই ভাল হত। মাঝমাঠ পেরিয়ে একটা উঁচু বালির ঢিবিতে উঠতে হল। এবং সেখানে উঠেই ওরা দূরে তিস্তা দেখতে পেল। আলোটা এখন দপদপ করছে। জায়গাটা বেশ গরম।

অবনীবাবু চাপা গলায় বললেন, "হঠাৎ যেন চারধার গুমোট হয়ে গেল।"

অর্জুনের মনে হল এখনই কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ওরা ঢিবি থেকে নেমে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। তিস্তায় এখন জল নেই। একটি মোটা ধারা মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওরা বালির চরের পাশে এসে দাঁড়াতে মনে হল নদীর চরে

বালির ওপর যেন কিছু নড়ে বেড়াচ্ছে। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দেখতে পেয়েছেন ?"

"হুঁ।"

"জিনিসটা কী বলুন তো ? শেয়াল ছাড়া তো এখানে কোনও প্রাণী নেই।" অবনীবাবু বেশ হতাশ গলায় বললেন, "বেরোবার সময় তাড়াহুড়োয় রিভলভার নিয়ে আসার কথা খেয়াল করিনি।"

অর্জুন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। অন্ধকার তিস্তার চরে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে এত দূর থেকে ঠাওর করা যাচ্ছে না। যন্ত্রটির আলো এমন স্তিমিত হয়ে এসেছে যে, দু'হাত দূরেও সেটা পৌঁছচ্ছে না। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এগোবেন না ?"

"এখন ক'টা বাজে ?"

"দুটো।"

"এখনও ঘন্টা দুয়েক সময় আছে।"

"মানে ?"

"ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই যন্ত্রটি সক্রিয় থাকে।"

"তা থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে এগিয়ে ব্যাপারটা·দেখার কী সম্পর্ক ?"

অবনীবাবু প্রশ্নটি করা-মাত্র তিস্তার চরে আলো জ্বলে উঠল। অদ্ভুত নীল আলো। সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রটির আলো জোরালো হল। নীল আলোটি চর ছেড়ে ধীরে-ধীরে অর্জুনদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অবনীবাবু উত্তেজিত হলেন, "আরে ভাই, ওটা এদিকে আসছে, কী করবেন ?"

অর্জুন বলল, "কিছু করার নেই। বালির ওপরে শুয়ে পড়ুন।"

কথা শেষ হওয়ামাত্রই অবনীবাবু সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লেন। নীল আলোটা একটা বিশাল বেলুনের চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসছিল। অর্জুন যন্ত্রটিকে মাটিতে রেখে খানিকটা তফাতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। নীল আলোর বেলুনটা তখন মাত্র কুড়ি গজ দূরে। সামনে তাকানো যাচ্ছে না। সেই নীল জ্যোতিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

নীল আলোর বেলুনটা ধীরে-ধীরে বালির ওপর নামল। অর্জুন দু' হাতে চোখ ঢেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। তার মনে হল বেলুনের ভেতরে শিম্পাজির মতো একটা কিছু বসে আছে। বেলুন স্থির হলে সেটা ওইরকম ভঙ্গি করে। প্রাণীটির মুখ দেখা যাচ্ছে না আলো পেছনে থাকায়, কিন্তু ওর দুটো কান যে অস্বাভাবিক রকমের বড়, তা বোঝা যাচ্ছে। প্রাণীটি খানিকটা স্থির থেকে আবার পর-পর দু'বার ঝুঁকল। একটু অপেক্ষা করল যেন। অর্জুন বুঝতে পারছিল না এমন ক্ষেত্রে কী করা উচিত। এবার প্রাণীটির হাতে কিছু একটা জ্বলে উঠল যার আলোর রেখা সোজা এগিয়ে এল যন্ত্রটির গায়ে।

অর্জুন দেখল আলোটা বারংবার যন্ত্রের গায়ে লেগে পেছনে যাচ্ছে। যেন প্রাণীটি মরিয়া হয়ে যন্ত্রটিকে সচল করতে চাইছে অথচ যন্ত্রটি সাড়া দিচ্ছে না। প্রায় মিনিট দশেক ধরে এইরকম চলার পরে প্রাণীটি আবার বেলুনের মধ্যে ফিরে গেল। এবং সেইসময় অর্জুন পরিষ্কার সিগন্যালিং সাউন্ড শুনতে পেল। পাশ থেকে অবনীবাবু বলে উঠলেন, "শুনতে পাচ্ছেন ?"

অর্জুন চাপা গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে কি আমরাও ?"

"না। এটা অনুভূতিতে নয়, পরিষ্কার কানে শুনেছি। ও বেলুনে ফিরে গিয়ে শব্দটা করছে যন্ত্রটাকে সচল করতে।" অর্জুন বলল।

কিন্তু প্রাণীটির সব চেষ্টা বিফলে গেল। যন্ত্রটি আগের মতোই পড়ে রইল।

এইবার সেই প্রাণীটি যেন মরিয়া হয়ে নীল আলোর বেলুন থেকে বেরিয়ে এল। অর্জুন দেখল, ওটা এদিকে এগিয়ে আসছে। যন্ত্রটির সামনে যখন ওটা পৌঁছে গেছে তখন স্পষ্ট দেখতে পেল। প্রাণীটির শরীরে কোনও লোম নেই। স্পিলবার্গের ছবির মতো বেঁটেখাটো চেহারা, কান দুটো অসম্ভব বড়। মুখের আদল চৌকো, নাক, চোখ, ঠোঁট বোঝা যাচ্ছে না। প্রাণীটি যন্ত্রটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে যেন খুব হতাশ হল। তারপর সেটিকে শায়িত অর্জুনের সামনে বালিতে রেখে হাত রাখল সেই জায়গায়, যেখান থেকে কিছু খুলে নেওয়া হয়েছে বলে মহাদেব সেন মন্তব্য করেছেন। অর্জুন হতভম্বের মতো উঠে বসল। ওর মনে হল প্রাণীটি তাকে জিজ্ঞেস করছে যন্ত্রের বাকি অংশ কোথায় গেল ? তার উত্তর দেওয়া দরকার।

সে মাথা নাড়ল। নাড়তেই প্রাণীটিও মাথা নাড়ল। অর্জুন দু'পাশে নেড়েছিল, প্রাণীটি ওপর-নীচে। অর্থাৎ, অর্জুনের কথা সে বিশ্বাস করেনি।

অর্জুন এবার পরিষ্কার বলল, "আমি কিছুই জানি না।"

প্রাণীটি স্থির হয়ে রইল। তারপর দু' হাতে মুখ ঢাকল।

এই সময় অর্জুনের কানে এল অবনীবাবু বলছেন, "ধরে ফেলুন মশাই। জাম্প, জাম্প।"

অর্জুন কিছু বলার আগে প্রাণীটি হাত সরিয়ে প্রসারিত করতেই অবনীবাবু কোঁক করে একটা শব্দ তুলে স্থির হয়ে গেলেন।

প্রাণীটি এবার অর্জুনের মুখোমুখি হল। তার হাত একবার যন্ত্রে আর-একবার নিজের বুকে ঘুরে আকাশটাকে দেখাতে লাগল। কয়েকবার এমন দেখানোর পর অর্জুন বলল, "এই যন্ত্রটা সম্পূর্ণ হলে তুমি আকাশে যেতে পারবে ?"

প্রাণীটি স্থির হয়ে রইল খানিক। তারপর আবার একই ভঙ্গি করতে লাগল।

অর্জুন বলল, "বুঝতে পেরেছি। এই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া দরকার, তাই তো ?" বলার সময় ওর হাতও নড়ছিল।

প্রাণীটি এবার যেন খুশি হল। এই খুশির প্রকাশ বোঝা গেল ওর দুটো হাত পরস্পরকে আঘাত করে করতালির মতো আওয়াজ তোলাতে। যন্ত্রটাকে অর্জুনের দিকে সরিয়ে দিয়ে সে তিস্তার চর হাত তুলে দেখাল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বুঝতেই পারছি তুমি গ্রহান্তরের প্রাণী। কোন গ্রহ?"

প্রাণীটি মাথা গুঁজে রইল।

"তুমি পৃথিবীতে কেন এসেছিলে?"

প্রাণীটি এরও জবাব দিল না। অর্জুনের মনে হল বাংলা ভাষাটাকে ও রপ্ত করতে পারেনি। মজা করার জন্যে সে বাংলা স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সবক'টা অক্ষর আবৃত্তির ভঙ্গিতে আওড়ে গেল। সেই সময় প্রাণীটির কান খাড়া হয়ে উঠল। অর্জুন শেষ করতেই প্রাণীটি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পর-পর উচ্চারণ করে গেল। যেন অর্জুন ওগুলো টেপ রেকর্ড করেছিল, এবার বাজানো হচ্ছে।

অর্জুন বলল, "এগুলো বাংলা অক্ষর। এর ওপরে আমাদের ভাষা দাঁড়িয়ে।"

"অনেক ধন্যবাদ।" অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল, "আপনি আমাদের ভাষা এর মধ্যেই শিখে গেলেন?"

"খুব সহজ ভাষা।"

"আমার শুনতে ভাল লাগল। কিন্তু ওঁকে আপনি কী করলেন?"

"তখন আপনার ভাষা আমি জানতাম না। ওঁর কথা থেকে মনে হয়েছিল মতলব ভাল নয়। কিছুক্ষণ বাদে ঠিক হয়ে যাবেন।"

"আমি বুঝতে পেরেছি এই যন্ত্রটা কাজ করছে না ঠিকভাবে, তাই তো?"

"হ্যাঁ। এর সঙ্গে আর-একটা অংশ ছিল। ওটা না পেলে আমি এই গ্রহের আবর্ত ছেড়ে বেরোতে পারব না। আমার হাতে বেশি সময় নেই।"

"আপনি এখানে এসেছিলেন কেন?"

প্রাণীটি হাত নাড়ল এমনভাবে, যাতে বোঝা গেল সে উত্তর দেবে না। তারপর বলল, "আমি একটা জলের ধারের শহরে নেমেছিলাম। কৌতূহল হয়েছিল। ফিরে যাওয়ার সময় আকাশে উঠে আবিষ্কার করলাম ওটা আমার সঙ্গে নেই। তারপর থেকে আমি খবর পাঠাতাম, ওটা তা গ্রহণ করত। কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দিত না। সেই জলের ধারের শহর থেকে শেষপর্যন্ত ওকে অনুসরণ করে এখানে আমাকেও আসতে হল। তোমাকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। ওর বাকি অংশটি পেতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?"

"নিশ্চয়ই। আমার সন্দেহ হচ্ছে কার্ভালো নামের একটি লোক সেটা নিয়ে অসমে গিয়েছে। লোকটা না ফেরা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

"কিন্তু আমার সময় নেই। এর মধ্যে আমার সন্ধান শুরু হয়ে গেছে। অসম

কোথায় ?"

"অনেক দূরে। অবশ্য আমাদের হিসেবে।"

"আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

"কিন্তু কার্ভালোকে আমি চিনি না, যে চেনে তাকে নিয়ে আসতে হবে।"

"আনো। রোজ রাত্রে আমি এই যন্ত্রটাকে চালু করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু একই সঙ্গে অন্য যন্ত্র সাড়া দিত। ফলে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।"

"ওহো, সেটা অন্য যন্ত্র নয়। আমাদের শহরে দু'জন মানুষ আপনার পাঠানো শব্দ শুনতে পেত। কিন্তু আমরা পেতাম না। এটা কী করে সম্ভব ?"

"আমি জানি না। হয়তো ওদের মস্তিষ্কের গঠন এই যন্ত্রটির মতো।"

"দু'জনের দু'রকম অসুখ ছিল। আপনার এই যন্ত্রের সঙ্গে থেকে সেই অসুখগুলো কমে গিয়েছিল। কিন্তু দিন বাড়তেই আবার সেগুলো ফিরে আসে।"

"স্বাভাবিক। ওরা শুধু যন্ত্রটার প্রভাবে পড়েছিল। ওদের এখানে নিয়ে এলে ভাল কাজ হত। তুমি ভাল লোক, আমার উপকার করো। কাল রাত্রে এখানে এসো ওই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ করে। আজ চলি।"

অর্জুন দেখল অদ্ভুতদর্শন প্রাণীটি সেই নীল বেলুনের মতো জিনিসটায় ফিরে গেল। বেলুন ধীরে-ধীরে আকাশে উঠে গেল। তারপর চোখের বাইরে। অর্জুন হতভম্বের মতো বসে রইল কিছুক্ষণ। এইমাত্র যে ঘটনা ঘটে গেল তা শুনলে যে কোনও মানুষ তাকে পাগল বলবে।

ভোর হয়ে আসছে। সে উঠে অবনীবাবুর পাশে গিয়ে কয়েকবার ডাকলেও তিনি সাড়া দিতে একটু দেরি করলেন। জামার বোতাম খুলে দিয়ে অর্জুন বসিয়ে দিতে চেষ্টা করল। অবনীবাবুর ঘুম ভাঙছিল না। অন্ধকার নদীর চরে নামল সে। পুবের আকাশ ইতিমধ্যেই লালচে ছোপ মাখছে। অর্জুন দেখল, তিস্তার চরে কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। একটু আগে যে কিছু আবছা দেখছিল, তা যেন এখন উধাও হয়ে গিয়েছে। সুনসান বালিব চরে এখন হাওয়ারা উত্তাল। অনেকটা হাঁটার পবে সে জলের কাছে পৌঁছল। কোনও পাত্র নেই, পকেট থেকে রুমাল বের করে ভাল করে ভিজিয়ে সে দ্রুত ফিরে এল অবনীবাবুর কাছে। এই সময় শেয়াল ডেকে উঠল। এতক্ষণ শিয়ালগুলো কোথায় ছিল ?

অবনীবাবুর সম্বিৎ ঠিকমতো ফিরতে আকাশে যেন আলোর জলসা বসে গেছে। কত রং আর রঙের মিশেল। এখন আর অন্ধকার নেই। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি হাঁটতে পারবেন ?"

নিজের এই অবস্থার জন্যে বেশ লজ্জিত অবনীবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা পারব।"

ওঁকে কোনওমতে ধরে-ধরে তিস্তা ব্রিজের কাছে নিয়ে আসতেই অর্জুন

একটা টেম্পো পেয়ে গেল। এই ভোরে টেম্পোটা ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছে। হাত দেখাতেই সেটা দাঁড়িয়ে গেল। অবনীবাবুকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে অর্জুন পেছনে উঠল। ড্রাইভার যেই বুঝল তার পাশে দারোগা বসেছে তখনই খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে চালাতে লাগল।

সারারাত জেগে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! গত রাত্রেও জাগতে হয়েছিল। তখন একটা প্রায়-ভুতুড়ে ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজ? সাইন্স্যান্স্ ফিকশন ছবি বা গল্পকে লোকে ফ্যানটাসি বলে। আজকের এই অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানালে কী শুনতে হবে? ওই প্রাণীটি, যদিও প্রাণী বলতে এখন একটু অস্বস্তি হচ্ছে অর্জুনের, মানুষকে আমরা সরাসরি প্রাণী বলে সম্বোধন করি না যখন, তখন মানুষের চেয়ে উন্নত শ্রেণীকে কি প্রাণী বলা উচিত? উন্নত যে, তা হাড়ে-হাড়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওর জন্যে এক ধরনের কষ্ট হচ্ছিল। বারংবার বলছিল যে, ওর বেশি সময় নেই। দলছাড়া, দেশছাড়া হয়ে পৃথিবীর আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ না পেলে কোনওদিন ফিরতে পারবে না ও! অর্জুন হাতে-ধরা যন্ত্রটির দিকে তাকাল। অন্ধকার চলে যাওয়ামাত্র এটি আবার নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। কোনও আলো জ্বলছে না।

রামচন্দ্র রায়কে যেখানে শুইয়ে রেখে এসেছিল সেখানে পৌঁছে টেম্পো থামাতে বলল অর্জুন। নীচে নেমে চারপাশে দেখল। ভদ্রলোক কোথাও নেই। এমনকী ওই সুটকেসটাকেও চোখে পড়ছে না। অবনীবাবু এখন অনেকটা সুস্থ। তিনিও নামলেন, "গেলেন কোথায় ভদ্রলোক?"

"বোধ হয় ঘুম ভাঙার পর বাড়ি ফিরে গেছেন!" অর্জুন বলল।

"অর্জুনবাবু।" হঠাৎ অবনীবাবুর গলা অন্যরকম শোনাল।

"বলুন।"

"আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

"গতরাত্রের কথা কাউকে বলবেন না। আমি যে কী করে এমন একটা স্বপ্ন দেখে শরীর খারাপ করে ফেললাম, তা এখন মাথায় ঢুকছে না। ওপরওয়ালারা জানতে পারলে আমার সার্ভিস বুকে নোট দেবে। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে।"

"আপনার মনে হচ্ছে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন?"

"তা ছাড়া আর কী! নীল আলো, অদ্ভুত জীব, হাত নাড়ল আর আমার জ্ঞান নেই?"

"ঠিকই। কিন্তু এটাকে আপনার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে কেন?"

"তার মানে? আপনি কি বলতে চান এগুলো সত্যি ঘটেছে?"

"সত্যি না হলে আপনি অসুস্থ হলেন কী করে?"

"ও। ওই জীবটি আমাকে আহত করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ? আমার কথা ও বুঝতে পেরেছিল নাকি ?"

"অনুমান করেছিল। আপনার গলার স্বরে ও অনুমান করেছিল আপনি আক্রমণ করতে বলছেন।"

"বিশ্বাস করতে পারছি না। আর হাত নাড়তেই আমি পড়ে গেলাম। গুলি করল না, ছুরি মারল না অথচ আহত হলাম। কিন্তু এখন কোনও চিহ্ন নেই শরীরে।"

"আপনাকে নিঃসাড় করে দিয়েছিল।"

"জীবটি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?"

"আমাদের পৃথিবীর কেউ নয়। আমরা ওর মতো উন্নত নই।"

"আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

অর্জুন কথাটা শুনে হাসল, "আচ্ছা অবনীবাবু, আপনাকে যদি জাপানি ভাষার অ্যালফাবেটগুলো কেউ একবার শোনায় তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনি জাপানি বলতে পারবেন ?"

"দূর ! তা কি সম্ভব ?"

"আমার মুখে বাংলা অক্ষরগুলো শুনেই ও পরিষ্কার বাংলা বলতে পেরেছে। উন্নত না হলে পারত না। চলুন. ফেরা যাক।" অর্জুন টেম্পোর দিকে এগোল।

"দাঁড়ান ভাই। আপনি বলছেন আমরা গ্রহান্তরের জীবের দেখা পেয়েছিলাম ? ওই যন্ত্রটির সঙ্গে গ্রহান্তরের জীবের সম্পর্ক আছে ? ও যে সিগন্যাল পাঠাত তা মহাদেব সেন আর রামচন্দ্র রায় শুনতে পেতেন ? সেই সিগন্যাল পাঠিয়ে ও তাঁদের প্রায় উন্মাদ করে দিত ? আপনি বলছেন এসব সত্যি ?" অবনীবাবু উত্তেজিত হলেন।

"এরা কেন উন্মাদের মতো আচবণ করতেন তা আমি জানি না, কিন্তু বাকিগুলি সত্যি।"

অর্জুনের কথা শুনে আকাশে হাত ছুড়লেন অবনীবাবু, "মাই গড ! এ কথা ঘোষণা করলে পৃথিবীর সব সাংবাদিক আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে।"

অর্জুন ফিরে দাঁড়াল, "এখনই এটা আমরা ঘোষণা করব না।"

"কেন ?" অবনীবাবু অবাক।

"কারণ, আপনার ওপরওয়ালাবা আপনাকে সুস্থ নাও ভাবতে পারেন। আপনি যে-কথা বলবেন তার স্বপক্ষে তো কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন না।"

হঠাৎ যেন বুঝতে পারলেন ভদ্রলোক, "ও, হ্যাঁ, তাই তো ? কোনও প্রমাণ নেই। ইস, কাল যদি রিভলভারটাকে সঙ্গে নিয়ে বের হতাম। জানেন, আমি ভাল করে ওর মুখটাকে দেখিনি।"

"ভাল করেছেন। এখন মুখ বন্ধ রাখুন। চলুন।"

দেড় কিলোমিটার পথ আসার পর অবনীবাবু চিৎকার করলেন ড্রাইভারের পাশে বসে, "অর্জুনবাবু, দেখতে পাচ্ছেন ? সুটকেসটা নিয়ে ভদ্রলোক হেঁটে ফিরছেন। দাঁড়াও, দাঁড়াও।"

টেম্পো রামচন্দ্র রায়ের পাশে গিয়ে থামল। অর্জুন দেখল ভদ্রলোক বেশ থতমত হয়ে গেলেন। অন্যায় ধরা পড়ে গেলে মানুষের মুখের অবস্থা যেমন হয়। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠলেন চটপট, "আপনারা ? এই ভোরে কোত্থেকে আসছেন ?"

অবনীবাবু কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, "একটু কাজে গিয়েছিলাম। আপনি ?"

রামচন্দ্র রায় হাসলেন, "মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম। অনেক দিনের অভ্যেস।"

"জাহাজে যখন চাকরি করতেন তখন কী করতেন ?"

সঙ্গে-সঙ্গে যেন নিজের জায়গা পেয়ে গেলেন ভদ্রলোক, "আর বলবেন না, ডেকে পায়চারি করতাম। জাহাজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা হাঁটতাম।"

অবনীবাবু চুপচাপ শুনছিলেন, "আপনার হাতে ওটা কী ?"

"হাতে ? ও, সুটকেস !"

"সুটকেস হাতে আপনি মর্নিং ওয়াক করেন বুঝি ?"

"এটা !" ভদ্রলোক বিচলিত হলেন, "অনেকেই বলেন। কিন্তু নেওয়ার সময় খেয়াল থাকে না।"

অর্জুন বলল, "উঠে আসুন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

"না, না, এটুকুই তো পথ, ঠিক চলে যাব।"

"আপনার বাড়ির সামনে দিয়েই তো যেতে হবে আমাদের। আসুন।" অবনীবাবু ওপরে উঠে এসে রামচন্দ্র রায়কে ড্রাইভারের পাশের আসন ছেড়ে দিলেন।

টেম্পো চললে অবনীবাবু বললেন, "কীরকম মিথ্যে কথা বললেন, অ্যাঁ ?"

"মিথ্যে কথা, কিন্তু না জেনে বলেছেন। কাল রাত্রে কোথায় ছিলেন তা ওঁর খেয়ালই নেই।"

"তাই নাকি ?"

"আমার তাই বিশ্বাস। উনি যখন হেঁটে গিয়েছিলেন তখনও জানতেন না কোথায় যাচ্ছেন।"

"নিশির ডাকে লোকে হেঁটে যায় শুনেছি।"

"এ-ও সেরকম।"

রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে টেম্পো থামলে তিনি নামলেন। অর্জুন বলল, "আপনি সুটকেসটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখুন।"

রামচন্দ্রবাবু বললেন, "কিন্তু সুটকেসটাকে খুব হালকা লাগছে।"

"কারণ যন্ত্রটা আমার সঙ্গে আছে। এই দেখুন।"

রামচন্দ্র রায় তাজ্জব হয়ে গেলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো ?"

"আপনার কিছুই মনে পড়ছে না ?"

"একদম না।"

"এক কাপ চা খাওয়ালে ভেতরে গিয়ে আপনাকে সব বলতে পারি।"

"নিশ্চয়ই। আসুন, আসুন।"

অবনীবাবু বললেন, "আমাকে বাদ দিতে হবে। কাল রাত থেকে থানার বাইরে আছি। এর মধ্যে কোথাও কিছু হয়ে গেলে শঙ্করের পক্ষে সামলানো মুশকিল হবে। আপনি চা খান, আমি চলি।"

অর্জুন মাথা নেড়ে নেমে পড়ল টেম্পো থেকে। যন্ত্রটাকে দিতে বলল সে।

অবনীবাবু বললেন, "এটার তো থানায় থাকা উচিত।"

"মালিক না পাওয়া গেলে থানায় থাকা উচিত। মনে হচ্ছে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য আপনার যদি দিতে আপত্তি থাকে—।" অর্জুন হাসল।

"মানে, আর কিছু নয়, আমি ওপরওয়ালাকে যন্ত্রটার কথা জানিয়েছি তো! ফট করে কেউ যদি চলে আসে তখন অপ্রস্তুত হব। আপনার যদি তেমন দরকার না থাকে তা হলে আমি ভল্টে রেখে দিতে পারি। আর দরকার হলে না হয় চলে আসবেন।"

অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

টেম্পো বেরিয়ে গেল।

রামচন্দ্র রায় বললেন, "পুলিশরা কাউকে বিশ্বাস করে না, না ?"

অর্জুন বলল, "নিরাপদে রাখাই তো ভাল। যাক গে, আপনার মাথার পেছনে, জামায় প্রচুর ঘাসের টুকরো লেগে আছে। রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন কোথায় ?"

নিজের শরীরে হাত বোলাতে-বোলাতে ভদ্রলোক বোকার মতো তাকালেন। অর্জুন হেসে বলল, "চলুন ভেতরে যাই। এক কাপ চা খেয়েই চলে যাব। এখন ঘুম দরকার।"

রামচন্দ্র রায় বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করতে গিয়ে থমকে গেলেন, "আরে, তালা দেওয়া নেই ?"

অর্জুন দেখল, তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে বন্ধ অবস্থায়, দুটো কড়াকে আটকায়নি। সে দরজা ঠেলল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি তালা দিয়েছিলেন ?"

"না দিয়ে বের হব কেন ?"

"কখন বেরিয়েছিলেন ?"

"কখন ? মনে পড়ছে না।"

"আপনি বিকেলে বেরিয়েছিলেন। তারপর আর বাড়িতে ফেরেননি। কাল রাত্রে বাইপাসের পাশে একটা গাছের তলায় ঘুমিয়েছিলেন। এসব আমরা জানি। তাই বিকেলে বেরোবার সময় তালা দেননি। তাড়াহুড়োয় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ঘরের সব আলো জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন। দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছিল। তার কারণ কাল রাত্রে আপনার মাথায় ওগুলো নেভানোর কথা ঢোকেনি।"

"তাই যদি হয়, ভেতর থেকে বন্ধ কেন ?"

"আর কোনও দরজা আছে ?"

"না, একটাই দরজা। ভেতরে উঠোনের পাশে পাঁচিল।"

অর্জুন এবার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এই সময় পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, "এই যে মিস্টার রায়, সারারাত কোথায় ছিলেন ?"

"এই একটু···।" রামচন্দ্রবাবু উত্তর খুঁজে পেলেন না।

"আবার সেই সুটকেস! যাক গে, কাল ঘরদোর খোলা রেখে চলে গিয়েছিলেন ? চুরি হয়ে যেতে পারত মশাই। সন্ধের পর আপনার বন্ধু এসে দেখেন সব খোলা। তখন তিনি বলাতে আমরা জানতে পারি।" ভদ্রলোক বললেন।

"বন্ধু ? কোন বন্ধু ?" রামচন্দ্র রায় হতভম্ব।

"তা জানি না। একদিন দেখেছিলাম আপনার সঙ্গে এই বাড়িতে। রাত্রে কিছু খেলেন না তিনি। ওঁকেই বলেছিলাম ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে। মনে হয় একটু নেশাটেশা করেন, তাই ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে। আওয়াজ করুন।" ভদ্রলোক চলে গেলেন। রামচন্দ্র রায় বললেন, "যাচ্চলে! কে এসে ঘুমোচ্ছে এখানে ?"

বিস্তর শব্দ করার পর ভেতরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল।

দরজাটা খুলছে। অর্জুন দেখল খুব রোগাপটকা একটি মানুষ ঘুমচোখে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে রামচন্দ্র রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। উনি যে ভাষায় কথা বললেন তা অর্জুনের বোধগম্য হল না। লোকটাও হাঁ-হাঁ করে উঠল। দু'জনে নিজেদের উত্তেজনা কমাতে কিছুক্ষণ সময় নিল। এবার রামচন্দ্রবাবু অর্জুনের দিকে ফিরলেন, "এই ব্যাটাই হল কার্ভালো। কাল সন্ধেবেলায় অসম থেকে ফিরেছে।"

অর্জুন হাত বাড়াল, "পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম।"

ভদ্রলোক হাত মেলালেন, "আমিও।"

রামচন্দ্র রায়ের চেহারাই যেন পালটে গিয়েছে। তিনি বাড়িতে ঢুকে হইহই করতে লাগলেন। তিনি যে মাঝে-মাঝে কার্ভালোর মাতৃভাষায় কথা বলছেন তাও অর্জুনকে বলে ফেললেন। মুখে জলটল দিয়ে চা পেতে মিনিট কুড়ি লাগল। চায়ে চুমুক দিয়ে চেয়ারে বসে অর্জুন কার্ভালোকে বলল, "আপনার

ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল, তাই না ?”

“হ্যাঁ। দেরি হয়ে গেল।” কার্ভালোর গলার স্বর খুব মিহি।

“আগে তো জাহাজে কাজ করতেন, এখন কী, ব্যবসা ?”

“অ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইরকমই। বয়স হচ্ছে আর কি তেমন পারি !” এবং এতক্ষণে কার্ভালোর খেয়াল হল, “রায়, আমার সুটকেসটা নিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?”

“সুটকেস ? ওটা একটা শয়তান। শয়তান রেখে গিয়েছিলে তুমি আমার কাছে। জাহাজে চাকরি করার সময় আমাকে যেমন জ্বালাতে, এখনও তাই করছ !” প্রচণ্ড রেগে গেলেন ভদ্রলোক।

কার্ভালো অবাক, “কেন, কী হয়েছে ?”

“কী হয়েছে তুমি জানো না ?”

“কী করে জানব ? আমি কি এখানে ছিলাম ?”

“ওই যন্ত্রটার কথা তুমি জান না ? থার্মোকলের ভেতর যেটা প্যাক করে রেখেছিলে ?”

“কেন, যন্ত্রটা কী করেছে ?”

“কী করেছে ? আবার প্রশ্ন করছ ?”

“বিশ্বাস করো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।”

“রোজ সন্ধেবেলায় আমার কানে বিপ্ বিপ্ শব্দ বাজত। রাত যত বাড়ত শব্দটাও বেড়ে যেত। তারপর একসময় কানে তালা লাগার উপক্রম। তখন আর কিছু খেয়াল থাকত না। সারারাত কী করতাম আমি জানি না। তখন মানুষ খুন করে ফেললেও টের পেতাম না। বুঝতে পারছ। রোজ হত, রোজ।”

“শুধু তোমাকেই ওটা এমন করত ?”

“হ্যাঁ। আর কাউকে নয়। অর্জুনকেও নয়। না, পরে আর একজনকে করেছিল।”

“স্ট্রেঞ্জ। যন্ত্রটা কোথায় ?”

“পুলিশের কাছে।”

“পুলিশ ?” চমকে উঠল কার্ভালো, “পুলিশ এর মধ্যে এল কী করে ?”

“আসবে না ? আমিই গিয়ে বলেছি ওই যন্ত্রটার মালিক তুমি। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে।” কার্ভালোকে এবার খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সে সুটকেসটার দিকে তাকাচ্ছিল বারংবার।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি যন্ত্রটা কোথায় পেলেন ?”

“আমি পেলাম, মানে ?”

“যন্ত্রটা আপনার সুটকেসে ছিল।”

“হ্যাঁ ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় আমি পেয়েছি।”

"কিন্তু ওটা এমনি-এমনি আপনার সুটকেসে ঢুকে পড়তে পারে না।"

প্রশ্ন শুনে কার্ভালো প্রথমে গোঁজ হয়ে রইল।

রামচন্দ্র রায় বললেন, "কার্ভালো, তুমি কি কোনও গোলমালে পড়েছ?"

কার্ভালো মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ ভাই। পড়েছি। কিন্তু সত্যি কথা বললে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?"

"আমরা এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, তখনও মিথ্যে কথা বলিনি কেউ, আজ কেন তুমি বলতে যাবে?" রামচন্দ্র রায় খুবই আন্তরিক গলায় কথাগুলো বললেন।

কার্ভালো অর্জুনের দিকে তাকাল, "সারাজীবন যা রোজগার করেছি তা হেসেখেলে উড়িয়ে দিয়েছি। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ইদানীং বেশ অর্থকষ্টে দিন যাচ্ছিল। এই বয়সে নতুন করে কাজকর্ম শুরু করা খুবই মুশকিল। আপনি হয়তো জানেন না আমি সমুদ্রের ধারের মানুষ। সমুদ্র ওদিকের বেশ কিছু মানুষকে অন্ন দেয়। অবশ্যই সেটা বেআইনি পথে। যা কিছু বিদেশি জিনিস রাতের অন্ধকারে সমুদ্রপথে আমাদের ওখানে আসত তাই বয়ে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে গরিব মানুষেরা টাকা পেত। কিছুই না পেয়ে শেষপর্যন্ত আমি ওই বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করব বলে স্থির করলাম।"

কার্ভালো থামতেই রামচন্দ্র রায় চিৎকার করে উঠলেন, "ছি ছি ছি। কার্ভালো, তুমি শেষপর্যন্ত স্মাগলারদের দলে ভিড়েছ?"

"ভিড়িনি। চাইলেই যে ওরা আমাকে কাজ দেবে ভাবছ কেন? ওরা আমাকে প্রথমে যাচাই করবে, আমার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আছে কি না জানতে চাইবে। তা ছাড়া ঠিক কাকে বললে কাজটা পাওয়া যায় তাও জানতাম না। রাত্রে সমুদ্রের ধারে কেউ যেত না। আমাদের ওখানে প্রবাদ আছে তোমার যদি সমস্যাহীনতার কষ্ট বেশি হয় তা হলে মাঝরাত্রে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াও। একরাত্রে আমি গেলাম। এলোমেলো ঘুরলাম। হঠাৎ শুনি একটা লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বালির ঢিবির আড়ালে। কৌতূহলী হয়ে কাছে যেতেই সে আমাকে গুলি করতে চাইল। আমি তাকে বললাম, 'আপনার যন্ত্রণা শুনে এসেছি, আমার অন্য মতলব নেই। দয়া করে আমাকে মারবেন না।' নিজের পরিচয় দিতে হল। কাছাকাছি আমার বাড়ি শুনে সে জিজ্ঞেস করল আমি তাকে সাহায্য করতে পারি কি না! আমি রাজি হলাম। আমার শরীরের ওপর ভর দিয়ে লোকটা কোনওমতে বাড়িতে এল। দেখলাম ওর পায়ে ক্ষতচিহ্ন। সম্ভবত গুলি লেগেছে। কিছুতেই সে সেটা বলল না। লোকটার নাম হেম বড়ুয়া, বাড়ি গুয়াহাটির কাছে।" কার্ভালো থামল।

"আপনি হেম বড়ুয়ার কাছে গিয়েছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। সেটা পরে বলছি। হেম কিছুতেই ডাক্তার ডাকতে দেবে না। তার

ধারণা ডাক্তার ফিরে গিয়ে পুলিশকে খবর দেবেই। অথচ ক্ষতর চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছিল। আমার বাড়িতে আসার সময় ও একটা বড় থলি এনেছিল। থলিটাকে ও ছুঁতে দিত না। দ্বিতীয় দিনে হেমের জ্বর এল। আমার পরিচিত এক ডাক্তারকে ডেকে আনতে বাধ্য হলাম। তিনি দেখে বললেন, তখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে। নইলে পা বাঁচানো যাবে না। কিন্তু হেম কিছুতেই হাসপাতালে যাবে না। ডাক্তার সাধারণ ওষুধ দিয়ে আমাকে আড়ালে বলে গেল এমন রোগীকে যেন বাড়িতে না রাখি। সেই রাত্রে আমার সামনে হেম ওই যন্ত্রটাকে থলি থেকে বের করল। করে বলল, 'এটা কী ধাতু দিয়ে তৈবি জানো ?'

বললাম, 'না।'

সে বলল, 'তুমি মানুষটা খারাপ নয় তাই বলা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ধাতু এটা। বিক্রি করলে কোটি টাকা পাওয়া যাবে।'

জানতে চাইলাম, 'জিনিসটা কী ?'

'এর জন্যেই তো গুলিটা লাগল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘণ্টাতিনেক আগে আমি একটা জিনিস নিতে সমুদ্রে এসেছিলাম। মাইকেলের নাম শুনেছ ? এ-তল্লাটের এখন ওই সেরা স্মাগলার। মাইকেলের সঙ্গেই কাজ ছিল। আমি আর মাইকেল যখন কথা বলছি তখন হঠাৎ আকাশে নীল আলোর বেলুন দেখতে পেলাম। বেলুনটা নীচে নামল। আমাদের থেকে একশো গজ দূরে। কিছু একটা বেলুন থেকে বেরিয়ে এল। মাইকেল ব্যাপারটা দেখে মিনিটখানেক সময় নিল। আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। আমরা দু'জনেই দৌড়লাম বেলুনের দিকে। আর যেহেতু আমি ভাল দৌড়তাম তাই এগিয়ে গেলাম। মাইকেল মরিয়া হয়ে আমাকে গুলি করল। আমি পড়ে গেলাম। মাইকেল আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। ওই অবস্থাতেও দেখলাম বেলুন আকাশে উঠে গেল। মাইকেলের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। মিনিট পনেরো বাদে আমি কোনওমতে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলাম সামনে। মাইকেলের শরীরের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, এই জিনিসটা বালির ওপর পড়ে আছে। পাতলা অন্ধকারেই এটা এমন চকচক করছিল যে, বুঝলাম এর মূল্য অনেক। এর শরীর থেকে অদ্ভুত এক আলো বের হচ্ছিল। আমি যন্ত্রটাকে নিয়ে কোনওরকমে ফিরে আসি যেখানে মাইকেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মাইকেলের একটা ব্যাগে এটাকে পুরে একটা বালির টিবির পাশে শুয়ে পড়েছিলাম আমি। গতরাত্রে এই ঘরে শুয়ে আবার জিনিসটা দেখলাম। অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। কিন্তু এটা আমি অসমে নিয়ে যেতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে ? যা দাম পাব তার টেন পার্সেন্ট তোমাকে দেব। বলো রাজি আছ ?'

'কিন্তু আপনি এই শরীর নিয়ে আসামে যাবেন কী করে ?'

'আমি মরব না। হাসপাতালে গেলেই পুলিশ আমাকে ধরবে। আর যদি মরেই যাই তা হলে আমি ঠিকানা দিচ্ছি, সেই ঠিকানায় এইটে পৌঁছে দেবে। তারা যে টাকা দেবে তার নব্বুইভাগ তুমি আমার পরিবারকে দেবে। কথা দাও।'

আমি রাজি হলাম। সে আমাকে দুটো ঠিকানা লিখে দিল। এইভাবে হঠাৎই টাকা রোজগারের সুযোগ আসায় আমি খুব আনন্দিত হলাম। কিন্তু সেই রাত্রে ওর অবস্থা এত খারাপ হল আমি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে পারিনি। পরে খবর নিয়ে জেনেছি ওর ডান পা বাদ দিতে হয়েছে। পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছে। আমার ভয় হত আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিশ আমাকেও ধরবে। তাই আমার সুটকেসে ওটাকে ভরে অসমে যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতায় এসে মনে পড়ল রায় এখানে আছে। তাই একটা রাত ওর কাছে কাটিয়ে আমি গুয়াহাটি চলে গিয়েছিলাম।"

"সম্পূর্ণ যন্ত্রটাকে নিয়ে যাননি কেন ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"তার মানে ?" কার্ভালো চমকে উঠল।

"আপনি জানেন। যাওয়ার আগে আপনি সুটকেস খুলেছিলেন। যন্ত্রটার আর-একটা অংশ আপনি বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কেন ?" অর্জুন স্পষ্ট বলল।

কার্ভালো মুখ নিচু করল। তারপর বলল, "আপনি বুঝতে পেরেছেন দেখছি। হ্যাঁ, ঠিক তাই। বাড়িতে বসেই দেখেছিলাম মূল যন্ত্রটার গায়ে আর-একটা যন্ত্র লাগানো আছে। দুটোই একই ধাতুতে তৈরি। সেই ছোট যন্ত্রটিকে খুলে আমি অসমে নিয়ে যাব বলে ঠিক করলাম। যদি ওখানে ভাল দাম পাই তা হলে বাকিটাকে নিয়ে যাব। রায়ের কাছে রেখে গেলে সেটা কখনওই হাতছাড়া হবে না বলে বিশ্বাস ছিল।"

"বিশ্বাস ছিল ?" রামচন্দ্র রায় চিৎকার করে উঠলেন, "তুমি আমাকে পাগল হওয়ার আয়োজন করে চলে গেলে, আর বলছ বিশ্বাস ছিল।"

কার্ভালো বলল, "আমি এইটে বিশ্বাস করতে পারছি না। এই যন্ত্র কী করে তোমাকে পাগল করবে ? আর শুধু তোমাকেই করবে কেন ?"

অর্জুন বলল, "এ নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা। পরে শুনবেন। কিন্তু হেম বড়ুয়ার যে লোকের কাছে ওটা বিক্রি করেছেন তার ঠিকানাটা বলুন।"

"বিক্রি ? কে বলল বিক্রি করেছি ?"

"তার মানে ? কী করেছেন ওটা নিয়ে ?"

"ফিরিয়ে এনেছি।"

অর্জুন উল্লসিত হল, "গুড। কী ভাল কাজ করেছেন আপনি জানেন না। কোথায় সেটা ?"

"কেন ?"

"আগে দেখান, তারপর বলছি।"

কার্ভালো একটা ব্যাগ খুলল। তার মধ্যে কাপড়ের পুঁটলি। তার ভেতর থেকে টর্চ লাইটের আকৃতির একটি ধাতব যন্ত্র বের করল সে। অর্জুন কার্ভালোর হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটাকে বিক্রি করেননি কেন ?"

"আমি গুয়াহাটিতে পৌঁছবার দিন-দুই আগে মাইকেলের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ লোকটাকে গ্রেফতার করেছিল। আমি শহরে পৌঁছতেই পুলিশ আমার পেছনে লাগে। অনেক কষ্ট করেছি ওদের চোখে ধুলো দেওয়ার। আমার পকেটের পয়সাও শেষ হয়ে গিয়েছিল।" কার্ভালো বলল।

"এত দেরি করলে কেন এখানে ফিরতে ?" রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন।

"পুলিশের ভয়ে। রাজাভাতখাওয়া নামের একটা জায়গায় ধর্মশালায় অন্য নাম নিয়ে পড়ে ছিলাম কিছুদিন। তারপর আমি কুচবিহারে। আমার দ্বারা স্মাগলিং ব্যবসা হবে না। কিন্তু তুমিও পুলিশকে সব বলে দিয়েছ। এখন আর আমার পরিত্রাণ নেই।" কার্ভালো খুব দুঃখের সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলল।

"কিন্তু তুমি তো কোনও বড় অন্যায় করনি ?" রামচন্দ্র রায় বললেন।

"পুলিশ সে-কথা বিশ্বাস করবে বলে ভেবেছ ? করবে না।" মাথা নাড়ল কার্ভালো।

অর্জুন যন্ত্রটিকে দেখছিল। আগাগোড়াই ধাতব বস্তুতে মোড়া। নীচে একটা আংটা রয়েছে। ওর মনে পড়ল যে যন্ত্র নিয়ে অবনীবাবু চলে গিয়েছেন, তার গায়ে এমন একটা ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ, এই বস্তুটি ওই যন্ত্রের গায়ে আটকে যাবে। সে শুনতে পেল, কার্ভালো তার মাতৃভাষায় কিছু বলল রামচন্দ্রকে। রামচন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন কিন্তু সেটা কার্ভালোকে খুশি করল না। এবার রামচন্দ্র রায় অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি মনে হয় পুলিশ কার্ভালোকে অ্যারেস্ট করতে পারে ? ও যে অর্থাভাবে স্মাগলিং বিজনেসে যেতে চেয়েছিল তা সত্যি, কিন্তু ও সেটা আরম্ভ করেনি। এই যন্ত্রটার মালিক কে তাই বোঝা যাচ্ছে না। ও নীল আলোর বেলুনে চাপা একজনের কথা বলছে। সে কে বলে আপনার মনে হয় ?"

"ভিন্ন গ্রহের মানুষ।"

"অ্যাঁ। যাঃ, কী যে বলেন ! পৃথিবীর বাইরের কোনও গ্রহে মানুষ আছে নাকি ? দানিকেনের গপ্পো নিশ্চয়ই শোনাবেন না। যা বলছিলাম, কার্ভালোকে একটু সাহায্য করুন। আপনার সঙ্গে দারোগাবাবুর বেশ ভাব আছে, দেখুন না।" রামচন্দ্র রায় বললেন।

অর্জুনের ঘুম পাচ্ছিল না আর। দ্বিতীয় যন্ত্রাংশ হাতে পাওয়ার পর বেশ তাজা লাগছিল নিজেকে। সে কার্ভালোকে জিজ্ঞেস করল, "নীল আলোর বেলুনটাকে আপনার কী মনে হয় ?"

"আমি তো দেখিনি। মনে হয় ব্যাপারটা সত্যি নয়।"

"আপনি কী চান ?"

"বাড়ি যেতে চাই। কোনওদিন অন্যায় কাজ করিনি, এবার করার কথা ভেবেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, করিনি। আর কখনও করব না।"

"তা হলে আপনার চলবে কী করে ?"

"জানি না।"

"আপনি জানেন আপনার ওই যন্ত্রের কল্যাণে রামচন্দ্রবাবুর পায়ের পুরনো বাতের ব্যথা কমে গিয়েছিল। মাঝরাত্রে মাইলের পর মাইল ওই শরীরেও তিনি হেঁটে গেছেন রোজ। অজান্তে একটা উপকার করেছেন আপনি ?"

এই সময় রামচন্দ্রবাবু ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, "কোথায় আর সারল ? আজ সকালেই ওটা একটু-একটু করে ফিরে আসছে।"

অর্জুন উঠল, "মিস্টার কার্ভালো, এখন কয়েকটা দিন আপনি আপনার বন্ধুর কাছে বিশ্রাম নিন। উনি যন্ত্রটির অভাবে রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না। আপনার সঙ্গ পেলে সমস্যাটির সমাধান হবে। যেহেতু এই যন্ত্রাংশটি আপনি যে-কোনও কারণেই হোক ফিরিয়ে এনেছেন, তাই মনে হয় পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নেবে না। আচ্ছা, চলি, নমস্কার।"

কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল কার্ভালোর মুখে। অর্জুন যন্ত্রাংশ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন রোদ উঠে গেছে। সে একটা রিকশায় চেপে সোজা কদমতলায় যেতে বলল। আজ বিকেল পর্যন্ত একটানা ঘুমোবার জন্যে ছটফট করছিল সে।

ঠিক বারোটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। ঘরের সবক'টা দরজা-জানলা বন্ধ করে শুয়ে ছিল, যাতে চোখে আলো না ঢোকে। তবু ঘুম ভাঙল এবং আর এল না। খিদে পাচ্ছিল বেশ। মা বাড়িতে নেই। কাজের মেয়েটি রান্নাবান্না করে বসে আছে। স্নান সেরে ভরপেট খেয়েও নতুন করে ঘুম এল না। অমলদা বলতেন পৃথিবীর প্রতিভাবান মানুষরা দিনে-রাতে চারঘন্টার বেশি ঘুমোন না। এই হিসেবে সে প্রতিভাবান মানুষের পর্যায়ে পড়ছে আজ ! এটা এমন সময় যে, যার বাড়িতেই যাবে সে বিরক্ত হবে। অর্জুন বাইক বের করতে গিয়ে হোঁচট খেল। গতকাল সে ওটাকে থানায় রেখেই বেরিয়েছে। অতএব রিকশা নিয়ে থানায় পৌঁছে গেল সে। খবর নিয়ে জানল অবনীবাবু নিজের কোয়ার্টার্সে ঘুমোচ্ছেন।

বাইকে চেপে অর্জুন ছুটল জলপাইগুড়ি বাইপাসের দিকে। ব্রিজ থেকে বাঁ দিকের চরে নেমে গেল সে। বালির ওপর বাইক চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল। ওটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে সে হেঁটে চরের সেই জায়গায় গেল যেখানে নীল আলোর বেলুনকে সে প্রথম দেখেছিল। বালির ওপর কোনও ভারী

জিনিস চেপে বসেছিল এখানে, অর্জুন স্পষ্ট দেখতে পেল। আর কোথাও কিছু নেই। বালি নিয়ে হাওয়া খেলা করে যাচ্ছে তিস্তার চরে। সে ফিরে এল বাইকের কাছে।

বেলা তিনটে খুব অসময় নয়। অর্জুন মহাদেব সেনের বাড়ির সামনে বাইকে এসে একটু ভাবল। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ার আগেই সেটা খুলে গেল। তিস্তা দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুনকে দেখে হাসল সে, "কাল দাদুকে সাত-তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা সবাই আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছি, শুধু দাদু একটু অপ্রসন্ন হয়েছেন আপনার ওপর।"

"কেন ?"

"কাল ওঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই।"

"উনি কি বিশ্রাম করছেন ?"

"না। আসুন।"

দোতলায় উঠে মহাদেব সেনের কাছে পৌঁছে অর্জুন দেখল তিনি মগ্ন হয়ে বই পড়ছেন। চোখে চশমা ঠিকই, কিন্তু এটাই তো দু'দিন আগে অবিশ্বাস্য ছিল। তিস্তা ডাকতে তিনি মুখ ফেরালেন কিন্তু মাথা পরিষ্কার হল না তৎক্ষণাৎ। অর্জুন বলল, "পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না ?"

"অ্যাঁ ? ও, অর্জুন। খুব সামান্য। আগে তো পড়তেই পারতাম না। তোমরা আমাকে হঠাৎ এড়িয়ে চলছ কেন হে ? গত রাত থেকে কোনও পাত্তা নেই ?"

"কোথায় এড়িয়ে চলেছি ? আপনার সূত্র অনুসরণ করেছি।"

"তার মানে ?"

"গত রাত্রের কথা আপনাব মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, তোমরা আমাকে জোর করে থানাব বাইরে নিয়ে এসেছিলে !"

"কারণ, আপনি একটু একটু করে প্রভাবিত হয়ে পড়ছিলেন। বেরবার আগে আপনি শব্দের দূরত্ব এবং দিক অনুমান করেছিলেন। কী করে ?"

"খুব সোজা। উত্তর দিকে কান পাতলে আওয়াজটা স্পষ্ট হচ্ছিল।"

এবার অর্জুন মহাদেব সেনকে গতরাত্রের অভিজ্ঞতা খুলে বলল। শুনতে-শুনতে বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন। অর্জুন কথা শেষ করলে বললেন, "কী বলব একে ? অলৌকিক ? এত বছর মহাকাশ নিয়ে কাজ করেছি, কখনওই তো এমন অভিজ্ঞতা হয়নি ? ফ্লাইং সসার জাতীয় ব্যাপারগুলো উত্তেজিত করত এবং সেই পর্যন্ত। কিন্তু ওকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে ? আমার মনে হয় ওর জ্বালানি শেষ হয়ে আসছে। পৃথিবী থেকে না চলে গেলে ও আর কখনওই যেতে পারবে না। অথচ ওর মহাকাশের জাহাজকে ওড়াবার জন্যে ওই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ পাওয়া দরকার !"

"হ্যাঁ। কার্ভালো ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছে আমি যন্ত্রের আর-একটা

অংশ পেয়েছি।”

“বাঃ। গুড। তা হলে চলো, ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।”

“হ্যাঁ। আমি সন্ধেবেলায় আপনার কাছে আসব। কিন্তু আমি চাই না বেশি লোক ব্যাপারটা জানুক। আমাদের অতিথি বাজে লোকদের সহ্য করতে পারে না।”

“ঠিক আছে, আর কেউ জানবে না।”

পাশে দাঁড়িয়ে তিস্তা এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার আবদারে গলায় বলল, “দাদু, আমি তোমার সঙ্গে যাব। প্লিজ দাদু, কেউ কিছু জানতে পারবে না।”

মহাদেব সেন মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।

সন্ধে নাগাদ অর্জুন থানায় এল একটা ব্যাগ নিয়ে। অবনীবাবু নিজের চেয়ারে বসে ছিলেন। দেখামাত্র হাসলেন, “কী ব্যাপার অর্জুনবাবু?”

“যন্ত্রটা চাই।” অর্জুন বলল।

“কেন?”

“যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না?”

“জিনিসটা কার?”

“আরে, কাল দেখলেন না?”

“সত্যি বলতে কি, গতরাত্রের ব্যাপারটা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। তা ছাড়া কলকাতা থেকে বড়সাহেবরা জানিয়েছেন, ওটাকে অবিলম্বে সেখানে পাঠিয়ে দিতে।”

“অসম্ভব।”

“কেন?”

“ওটা আজই ফিরিয়ে দিতে হবে।”

“না মশাই। ওপরওয়ালারা আমাকে ছাড়বে না ওটা দেখতে না পেলে।”

“অবনীবাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, একটি প্রাণের নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাবে ওটা আজ ফেরত না পেলে!”

“এটা একা তো কিছু উপকার করবে না। ওব আর-একটা অংশ না পেলে কোনও কাজ দেবে? মাথাটা ঠাণ্ডা করুন।”

হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, অবনীবাবু আজ স্বাভাবিক নন। এখন এই অবস্থাতে কার্ভালোর ফিরে আসার কথা বলা ঠিক হবে না। সে কার্ভালোকে কথা দিয়ে এসেছে অবনীবাবু তা নাও মানতে চাইতে পারেন। ওপরওয়ালা জেনে যাওয়ার পরে ভদ্রলোক নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না।

অর্জুন বলল, “এক কাজ করি। চলুন, ওটাকে নিয়ে কালকের স্পটে যাই। গতরাত্রে যে এসেছিল তাকে বলি সমস্ত ব্যাপারটা।”

হঠাৎ অবনীবাবুর চোখ চকচক করে উঠল। একটু ভাবলেন। তারপর উঠে

দাঁড়ালেন, "চলুন। আপনার কথা রাখছি। তবে আজ আমি সঙ্গে রিভলভার রাখব।"

"কেন?"

"গতরাত্রে ও আমাকে আঘাত করেছিল। আজ আমার পালা।"

অর্জুন বুঝল গোলমাল হবে। কিন্তু এ ছাড়া পুলিশের লকার থেকে যন্ত্রটাকে বের করার অন্য কোনও উপায় নেই।

অবনীবাবু চেয়েছিলেন একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে যাবেন যাতে প্রাণীটিকে গ্রেফতার করা সহজ হয়। ওই প্রাণী, যন্ত্রটি একসঙ্গে প্রচারমাধ্যমে হাজির করলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু অর্জুন এতে কিছুতেই রাজি হল না। সে বোঝাল, প্রাণীটি বেশি মানুষের উপস্থিতি টের পাবেই এবং সেক্ষেত্রে সে আর নীচে নামবে না।

যন্ত্রটাকে বের করে কোলে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন অবনীবাবু। মহাদেব সেন যেতে চান শুনে খুব একটা খুশি হলেন না। জিপের সামনে ওঁর পাশে অর্জুন বসে ছিল। মহাদেব সেন তৈরি ছিলেন। অর্জুন তাঁকে সামনের আসন ছেড়ে পেছনে চলে গেল। তিস্তা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "ঠিক আছে, মনে রাখব, তোমরা আমাকে নিলে না।"

হেসে ফেলল অর্জুন, "তুমি গিয়ে কী করতে?"

"অটোগ্রাফ নিতাম।" তিস্তা বলল।

তিস্তার চরের কাছে পৌঁছে মহাদেব সেন বললেন, তিনি সেই শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন। খুব ক্ষীণ। অর্জুন দেখল, অবনীবাবুর হাতে ধরা যন্ত্র থেকে সবে আলোর ছিটে বের হচ্ছে। সে অবনীবাবুকে বলল, "যন্ত্রটা একবার দেখি। আলোটা অদ্ভুত লাগছে।"

নিজে লক্ষ করে বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত অর্জুনের হাতে ওটা দিলেন। অন্ধকারে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল না, কারণ মহাদেব সেনের হাতে টর্চ ছিল। অর্জুন চট করে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে অন্য যন্ত্রাংশটি বের করল। তারপর আন্দাজে চেষ্টা করল আংটা দুটোকে জুড়ে দিতে। পাঁচ-ছ' পা যাওয়ার পর সে দুটো লেগে যেতেই মহাদেব সেন বলে উঠলেন, "যাঃ।"

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

"শব্দটা হারিয়ে গেল।"

"ভাল করে শুনুন।"

"নাঃ, আর পাচ্ছি না।"

"চেষ্টা করুন।"

"দূর! চেষ্টা করে কি এসব শোনা যায়! কাল কোথায় এসেছিলে তোমরা?"

অর্জুনের বুকের ভেতর যেন ড্রাম বাজছে এখন। সে বলল, "এখানে।"

কিন্তু এটা কী হল ? দুটো যন্ত্র জুড়ে গেলে মহাদেববাবুরাও কিছু শুনতে পান না ? অবশ্যই। প্রথম রাত্রে যন্ত্রটা জোড়া ছিল বলে কার্ভালো থাকা সত্ত্বেও রামচন্দ্র রায় কিছুই শুনতে পাননি। তার মানে এটা এখন শুধু শব্দ গ্রহণ করছে না, পাঠিয়েও যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এটা গ্রহণ করত, এরা যেটা পাঠাত তা অতি সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করত।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় কাটল। শেষপর্যন্ত অবনীবাবু যন্ত্রটি নিয়ে মাটিতে রাখলেন। দপ্‌দপ্‌ করছে আলো। হঠাৎই দেখা গেল তিস্তার চরে কিছু একটা নেমেছে। মহাদেব সেনকে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?"

"না।"

অবনীবাবু বললেন, "আমি পাচ্ছি। আসুক কাছে, রেঞ্জের মধ্যে।" তিনি রিভলভার বের করে নিলেন। অর্জুন ওঁর হাত ধরল, "কী করছেন আপনি ?"

"আই ওয়ান্ট হিম।"

"না। কখনওই নয়।"

"মারব না। এমন আহত করব যাতে পালাতে পারবে না কিন্তু পরে চিকিৎসা করে সারানো যায়। আমি ওকে জীবন্ত চাই।" অবনীবাবু বললেন।

"এসব কী কথা। ছি ছি ছি। ইউ ক্যাননট ডু দিস।" মহাদেব সেন বললেন।

"আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন। কারও যদি কোনও আইডেন্টিটি না থাকে তা হলে তাকে অ্যারেস্ট করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে।"

এই সময় দেখা গেল তিস্তার চর থেকে একটা নীল আলোর বেলুন ওপরে উঠে এদিকে এগিয়ে আসছে। বেলুনটা যখন কাছে নেমে এল ঠিক তখনই গুলি চালালেন অবনীবাবু। মনে হল জলের মধ্যে একটা পাথর তলিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার করে হাত শূন্যে তুললেন ভদ্রলোক। অর্জুন দেখল, ওঁর হাত থেকে মাটিতে কিছু পড়ে গেল। যন্ত্রের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় মনে হল, একদলা গলিত লোহা। বাঁ হাতে ডান হাতের কবজি ধরে মাটিতে বসে পড়েছেন ভদ্রলোক। যন্ত্রণায় কাতরে যাচ্ছেন।

নীল আলোর বেলুন থেকে সেই প্রাণীটি বেরিয়ে এল, "আপনাকে প্রথম দেখছি। কিন্তু মনে হয় কোথাও আমাদের সংযোগ হয়েছিল।"

অর্জুন বলল, "ইনি আপনার ওই যন্ত্রের পাঠানো সিগন্যাল শুনতে পেতেন। তা ছাড়া পেশায় একজন বিজ্ঞানী।"

"ধন্যবাদ। আমার যন্ত্র যখন সিগন্যাল ফেরত পাঠাতে শুরু করেছে তখন বোঝা যাচ্ছে তুমি আমার উপকার করেছ। কী দিয়ে এই ঋণ শোধ করতে পারি ?"

"ঋণ কেন বলছ ?"

"নিশ্চয়ই। আজ ভোরের আগে আমি যদি মহাকাশে না পৌঁছতে পারি তা হলে শেষ হয়ে যাব। তোমাকে আমার বন্ধুত্ব দিলাম।"

"ধন্যবাদ। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। ওই যন্ত্রের অর্ধেকটা যে শব্দতরঙ্গ তুলত তা শুনে মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রায় অস্বাভাবিক হয়ে যেতেন। কিন্তু একজন দৃষ্টিহীনতা আর একজন বাত থেকে মুক্ত হওয়ার পথে পৌঁছেছিলেন। কী করে ?"

"খুব স্বাভাবিক। ওঁদের মস্তিষ্কের যে কোষ শব্দটাকে নিতে পেরেছিল তারাই বলিষ্ঠ হয়ে এই দুটো প্রতিক্রিয়া আনে। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় না হওয়ায় ব্যাপারটা খুবই সাময়িক হবে। তুমি চাও এটা পূর্ণতা পাক ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি শুয়ে পড়ুন।"

মহাদেব সেন নির্দেশ পালন করামাত্র তাঁর গলা থেকে তীব্র চিৎকার বের হল। তিনি স্থির হয়ে গেলেন। প্রাণীটি বলল, "কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাও। ওঁর শরীরের সমস্ত বিকল কোষ এখনই জীবন ফিরে পাবে। এই লোকটিকে কী করা যায় ?"

"কিছু না। উনি বিভ্রমে পড়েছেন। তোমার পূর্ণ যন্ত্র নাও।" অর্জুন যন্ত্রটিকে তুলে ধরতে মূর্তিটি ইশারা করল থামতে। তারপর আলোর বেলুনে ঢুকে সে কিছু চালাতেই একটা আলোর রেখা বেরিয়ে এল। তারই আকর্ষণে যন্ত্রটি সোজা চলে গেল নীল আলোর বেলুনের ভেতরে। প্রাণীটি আবার বেরিয়ে এল, "আমার হাতে আর সময় নেই বন্ধু।"

"তোমাকে আমি সারাজীবন মনে রাখব।" অর্জুন বলে উঠল।

"বিদায় বন্ধু।" প্রাণীটি আবাব নীল বেলুনে ঢুকে গেল। বেলুনটি উড়ে গেল তিস্তার চরে। তাব কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিছু একটা হুস করে উড়ে গেল আকাশে।

অর্জুনের বুক ভার হয়ে গিয়েছিল। সে মহাদেব সেনকে দেখল। তারপর অবনীবাবুকে। ভদ্রলোক যেন বসে-বসেই ঘুমোচ্ছেন।

ওঁদের জ্ঞান ফেরাব জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল অর্জুন, অন্ধকার নির্জন নদীতীরে। আকাশে তখন হাজার তারার মালা। শোঁ-শোঁ বাতাস বইছে। হঠাৎ কানে এল মহাদেব সেনের গলা, "অর্জুন !"

"বলুন।"

"চলে গিয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"আপনি ?"

"হ্যাঁ। আমি দেখতে পাচ্ছি। এই অন্ধকারেও তারাদের দেখতে পাচ্ছি।"

আনন্দে ভরপুর অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল, "ধন্যবাদ, বন্ধু।"



রত্নগর্ভা

আজ সকাল থেকেই ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি এক আকাশ মেঘ থেকে ঝরেই চলেছে। এরকম দিনে বাইরে বেরোতে কারই বা ভাল লাগে। অর্জুন নিজের বিছানায় শুয়ে ছিল চুপচাপ। এখন দুপুর। জানলার বাইরে মরা আলো। কবিরা হয়তো একেই বাদলের দিন বলে সুন্দর লাইন লেখেন, কিন্তু আজ অর্জুনের মাটিতে পা রাখতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। দুপুরের খাওয়ার পর ঘুমের অভ্যেস তার কোনওকালে নেই বলেই এখন ঘুমটাই যা আসছিল না। এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

হ্যাঁ, এই বাড়িতে টেলিফোন এসেছে মাসতিনেক। জলপাইগুড়িতে এখন অনেক বাড়িতেই ফোন। দরখাস্ত করতেই কর্তৃপক্ষ খাতির করে বসিয়ে দিয়ে গেছেন যন্ত্রটা। ওটা আসায় লাভ হয়েছে অনেক। আবার বাজে ফোনও আসছে বিস্তর।

অর্জুন টেলিফোনটার দিকে তাকাল। এর মধ্যে চারবার আওয়াজ করেছে যন্ত্রটা। বিছানা ছেড়ে ওঠার আলস্যটাকে সরাতে-সরাতে সে মায়ের গলা শুনতে পেল, "কী রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

অর্জুন উঠল। রিসিভার তুলে গম্ভীর গলায় বলল, "হ্যালো!"

ভদ্রলোক প্রথমে নম্বর যাচাই করলেন। তারপর বললেন, "আমি শুনেছি তোমার বয়স খুবই কম। আমার বয়স পঁচাশি। তাই তুমি বলছি। তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত?"

"আপনি কে বলছেন?"

"আমার নাম বিজনবিহারী ঘোষ! শিল্পসমিতি পাড়ায় থাকি। বাড়ির নাম, 'সারদাময়ী'। যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলে দেখিয়ে দেবে। তুমি একবার আসতে পারবে ভাই?" বৃদ্ধের গলায় একটা আকুতি ফুটে উঠল। কিন্তু মুশকিল হল বেশিরভাগ মানুষ অপ্রয়োজনকেও প্রয়োজন বলে ভাবতে ভালবাসে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এরকম আবহাওয়া। যেতে বলছেন, প্রয়োজনটা কি

খুব জরুরি ?”

“হ্যাঁ ভাই। আজ এ-বাড়িতে আমার নিজস্ব চাকর ছাড়া কেউ নেই। সবাই গিয়েছে শিলিগুড়িতে। এরকম আবহাওয়ায় ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। তোমার সঙ্গে কথা বলার এই সুবর্ণ সুযোগ।”

“আপনি আপনার বাড়ির লোকদের এড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান ?”

“হ্যাঁ ভাই। আমি ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই।”

“বেশ। আমি আসছি।”

রিসিভার নামিয়ে রাখামাত্র মায়ের গলা পাওয়া গেল, “এমন দিনে বেরোচ্ছিস ?”

“কী করব ! ভদ্রলোকের জরুরি দরকার। পঁচাশি বছর বয়স।”

“ও বাবা !” মা পাশ ফিরলেন, “বাড়িতে টেলিফোন এসে এই ঝামেলা করল। আগে কষ্ট করে আসতে হত, এখন নম্বর ঘুরিয়ে কথা বলে নিলেই হল।” মা চলে গেলেন।

জলপাইগুড়ি শহরের বেশিরভাগ জায়গায় বৃষ্টিতে জল জমে না কিন্তু কাদা প্যাচপ্যাচ করে। আপাদমস্তক বর্ষাতিতে মুড়ে নিয়ে অর্জুন তার লাল বাইকটা বের করল। পায়ে কাদা লাগাবার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই তার। কদমতলা থেকে শিল্পসমিতি পাড়া আর কত দূর ! রাস্তা ফাঁকা। মাঝে-মাঝে দু-একটা রিকশা ঢেকেঢুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রিকশাওয়ালারা, ভিজে কাক হয়ে। শিল্পসমিতি পাড়ায় পৌঁছে বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না।

বিজনবিহারী ঘোষ অবস্থাপন্ন মানুষ। দোতলা বাড়িটা বিশাল। সামনে পাঁচিলঘেরা বাগান। গেটের গায়ে সাদা পাথরের ওপর লেখা, সারদাময়ী। গেট বন্ধ। ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে বোঝাই যাচ্ছে না বাড়িতে মানুষ আছে কি না ! অর্জুন দু'বার বাইকের হর্ন বাজাল। কোনও সাড়া নেই। তৃতীয়বার বাজানোর সময় গেট খুলে একজন প্রৌঢ় ভৃত্যগোছের লোক ছাতা মাথায় ওর দিকে তাকাল। অর্জুন তাকে বলল, “আমার নাম অর্জুন। বিজনবিহারীবাবু একটু আগে আমাকে ফোন করেছিলেন।”

“আসুন। বড়বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।”

নীচের তলায় বর্ষাতি খুলে রেখে সে ভৃত্যটিকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠে এল। বেশ সাজানোগোছানো বাড়ি। কোথাও একটুও অপরিষ্কার হয়ে নেই। একটি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে লোকটি বলল, “বাবু, উনি এসেছেন।”

“এসো ভাই ! ঘরে এসো।” উদাত্ত কণ্ঠ কানে আসামাত্র অর্জুন পা বাড়াল।

গলার স্বর শুনে যে চেহারা কল্পনা করেছিল অর্জুন, বাস্তবে তার কোনও মিল নেই। সাদা ধবধবে বিছানায় যে-মানুষটি বসে আছেন, তাঁর বয়স মুখ-চোখে স্পষ্ট। কিন্তু ওই রোগা মানুষটির বুকের নীচে একটি চাদর আড়াল করা রয়েছে,

যার তলার দিকে খুবই শীর্ণ পায়ের আদল।

"তোমার বয়স অল্প বলে শুনেছিলাম, কিন্তু এত অল্প, কল্পনা করিনি। তুমি অর্জুন তো?" ভদ্রলোকের গলার স্বর খুবই জোরালো। ওই শরীর থেকে এরকম গলা কী করে বেরিয়ে আসছে, সেটাও বিস্ময়ের! অর্জুন মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

"বোসো। তুমি ওই চেয়ার টেনে নিয়ে বোসো। আসলে কী জানো, আজকাল অল্পবয়সীরা কেউ কিছু করে না বলে আমরা তাদের আন্ডারএস্টিমেট করতে শুরু করেছি। কী খাবে বলো?" বিজনবিহারীবাবুকে এখন বেশ আন্তরিক বলে মনে হচ্ছিল অর্জুনের।

"এই সময় আমি কিছু খাই না।" অর্জুন চেয়ারে বসল।

"বেশ। ভবা নীচে গিয়ে দাঁড়া। এ-সময় কেউ যেন আমার ঘরে না আসে।" দরজায় দাঁড়ানো ভৃত্যটিকে হুকুম করতেই সে দ্রুত সরে গেল। বিজনবিহারী বললেন, "অবশ্য কারও আসার সম্ভাবনা খুবই কম। বাড়ি এখন খালি।"

কথাটা টেলিফোনেও বলেছিলেন তিনি। অর্জুন দেখছিল। ঘরের একটা দেওয়ালে পর-পর অনেক অয়েলপেন্টিং টাঙানো। বিজনবিহারী সেটা লক্ষ করে বললেন, "একদম ডান দিকে আমার পিতামহ, নুটুবিহারী, তাঁর পাশে পিতামহী আশালতা, তিন নম্বর আমার পিতা পবনবিহারী, পাশে মাতা শ্যামাসুন্দরী, মাঝখানের জায়গাটা আমার জন্যে এখনও ফাঁকা, শেষ ছবি আমার স্ত্রী সরস্বতীর।"

ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি হল অর্জুনের। দাদু, দিদিমা, বাবা, মায়ের ছবি তিনি টাঙাতেই পারেন, মৃতা স্ত্রীর আগে নিজের জন্য জায়গা রেখে দেওয়াটা বেশ অস্বস্তিকর। সেটা বুঝে বিজনবিহারী বললেন, "আমার ছবি আমি আঁকিয়ে রেখেছি। কাপড়ে মুড়ে খাটের তলায় রাখা আছে। কিন্তু না মরা পর্যন্ত ছেলেরা টাঙাতে পারছে না হে।" বলে শব্দ করে হাসলেন।

"আপনি আমাকে কোনও কাজের ভার দেবেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। তোমার নামডাক হয়েছে শুনেছি। আমাকে যিনি চিকিৎসা করেন, সেই ডক্টর সান্যালও তোমার কথা বলেছেন। তুমি তো বিদেশেও গিয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খুব ভাল। আগে আমার কথা বলি তোমাকে। এই জলপাইগুড়ি শহরে আমার পিতা পবনবিহারী ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন ১৮৯৯ সালে। তখন তিনি উনিশ বছরের যুবক। আমাদের পৈতৃক বাড়ি ঢাকার কাছে কালীগঞ্জে। ভাগ্যান্বেষণে আসার কারণ অর্থাভাব নয়। পিতামহ নুটুবিহারী খুবই বিত্তবান মানুষ ছিলেন। জমিজমা ছাড়াও তাঁর নানা ব্যবসা ছিল। কিন্তু সে-সবই তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। পিতামহরা দুই ভাই। ছোটজন একটু

উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোনও কাজ করতেন না। দাদার কাছে প্রয়োজন হলেই হাত পাততেন। তাঁর দুই ছেলেও একই ধাত পেয়েছিল। ফলে আমার পিতা অনুমান করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে গোল বাধবে। তিনি পিতামহের অনুমতি নিয়েই এখানে চলে আসেন। তখন ডুয়ার্সে চা-শিল্পের পত্তন হয়েছে। ব্যবসা কেমন হবে তা কেউ সঠিক অনুমান করতে পারছেন না। পিতামহের কাছে ঋণ নিয়ে পিতা একটি চা-বাগানের পত্তন করেন। নিজের মায়ের নামে নাম রাখলেন 'আশালতা'।

"পিতামহ চায়ের ব্যবসা বুঝতেন না, কিন্তু পিতাকে নিরুৎসাহ করেননি। প্রথমদিকে তিনি যে নিয়মিত পিতাকে অর্থসাহায্য করেছেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। তরুণ বয়সে আমিও পিতার ব্যবসায় যুক্ত হই। তখনও পিতামহ জীবিত। যাতায়াতের অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও আমি ছাত্রাবস্থাতে প্রতি বছরই কালীগঞ্জে যেতাম। পিতামহ স্নেহ করতেন খুব। পিতার ব্যবসার উন্নতির খবর পেয়ে খুশি হতেন। আমি চাইতাম তিনি জলপাইগুড়িতে চলে আসুন। তিনি রাজি হতেন না। বলতেন, 'এই জমিজায়গা, মানুষ ছেড়ে আমি স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাব না ভাই।'

"ক্রমশ আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, পিতামহের সঙ্গে তাঁর ভাই এবং ভাইপোদের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। তারা অলস জীবন যাপন করবে এবং পিতামহকে সে-ব্যাপারে অর্থ জোগাতে হবে। পিতামহ বিরক্ত বোধ করলেই ঝামেলা বাধত। শেষপর্যন্ত তারা অভিযোগ আনল সরাসরি। পিতামহ পারিবারিক সম্পত্তি সরিয়ে ডুয়ার্সে চা-বাগান কেনার জন্যে আমার পিতাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা চা-বাগানের অংশ দাবি করলেন।

"আমার পিতা পবনবিহারী ঝামেলা পছন্দ করতেন না। তিনি অংশ দিলেন না বটে, কিন্তু ওঁদের দাবির কাছাকাছি থোক টাকা ধরে দিলেন। বললেন, 'আমি যা ঋণ নিয়েছিলাম, তার তিন গুণ ফিরিয়ে দিলাম।' পিতার ব্যবসা তখন ভাল চলছিল। কয়েক বছরেই তিনি সামলে উঠলেন। এই সময় পিতামহ মারা গেলেন। তাঁর কাজকর্ম করতে আমি এবং পিতা কালীগঞ্জে গেলাম। বাড়িটির অবস্থা তখন বেশ খারাপ। বাড়ির লোকজন বলতে পিতামহের ভাইয়ের বংশধররা। গ্রামের লোকজন অনুযোগ করতে লাগল যে, তারা সামান্য নগদ টাকার লোভে বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে। এমনকী আমার পিতামহীর সঞ্চয়ে নিজস্ব যেসব গহনা ছিল, সেগুলোর হদিস পাওয়া গেল না। পিতা ঢাকা শহরে এসে একটি মামলা করলেন। যেহেতু বসতবাড়িটিতে তাঁরও অংশ আছে, তাই তাঁর অনুমতি ছাড়া ওই বাড়ি বিক্রি করতে না পারে। আদালত থেকে সেই মর্মে একটা আদেশ বেরিয়ে যাওয়ায় পিতা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু সেই থেকেই কালীগঞ্জের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।" বিজনবিহারী থামলেন একটু। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,

"ভাই, হয়তো এসব গল্প তোমার ভাল লাগছে না। কিন্তু জানা না থাকলে বুঝতে অসুবিধে হবে।"

অর্জুন চুপচাপ মাথা নাড়ল। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার আগেই পূর্ববঙ্গ থেকে বেশ কিছু মানুষ এদেশে এসেছেন। তাঁরা উদ্বাস্তু নন। এদেশে এসে অনেকেই সাফল্য পেয়েছেন। বিজনবিহারীও তাঁদের একজন।

বিজনবিহারী আবার শুরু করলেন, "চায়ের ব্যবসা পিতা ভালই বুঝতেন। ওটা আমিও রপ্ত করলাম। একটার বদলে দুটো বাগানের মালিকানা পেলাম। জলপাইগুড়ি শহরের রায় এবং ঘোষ পরিবারের সঙ্গে আমাদের নামও লোকে বলত। কিন্তু ব্যবসার ঝুঁকি কী জানো? তোমার ছেলে যদি ব্যবসাবিমুখ হয়, তা হলে তুমি ব্যবসাটাকে যতই বাড়াও, তা এক সময় গোটাতে বাধ্য হবেই। আমার দুই ছেলে। পিতা দেহ রাখার পর আমি তখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। বড় ছেলে পড়াশোনায় ভাল। সে চার্টার্ড পাশ করে বিলেতে চলে গেল পড়তে, কিন্তু ছোটটা কলেজের গাঁট পেরোতে পারল না। অথচ আমি দু'জনকে সমান সুযোগ দিয়েছিলাম। বিলেতে থাকার সময়ে বড় জানাল তার পক্ষে আর দেশে ফেরা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ওই একচিলতে শহরে চায়ের ব্যবসায় জীবন কাটাতে সে নাকি জন্মায়নি। ওখানে কাজের সুযোগ বেশি। আর বিলেতে যখন থাকতেই হবে তখন বাঙালি মেয়েকে বিয়ে না করে ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করাই যুক্তিসঙ্গত।

"এই ব্যাপারটা ওদের মা মানতে পারল না। বিদেশিনীকে বিয়ে করার জন্যে নয়, যে-ছেলে নিজের জন্মভূমিকে হেয় মনে করে, তার মুখদর্শন করতে চাইল না সে। বলল 'আমার বড় ছেলে মরে গেছে।' কথাটা বড়কে জানিয়ে দেওয়া হল। ছোট ছেলে পড়াশোনায় ভাল না হলেও বাস্তববুদ্ধি প্রখর। সে আমার সঙ্গে ব্যবসায় যোগ দিল। এর কিছুদিন পরেই আমার স্ত্রী হার্টফেল করে। এই শোক আমাকে বেশ কাবু করে ফেলল। আমি ব্যবসা থেকে সরে এলাম। বয়স হয়েছে, ছেলেও উপযুক্ত। ব্যবসার ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার মত সব ব্যাপারে মিলবে এমন কথাও নেই। আমি প্রাচীন ভাবনার মানুষ, সে নবীন। প্রায়ই দিল্লি-কলকাতা করে। পছন্দমতো এক আধুনিকাকে বিয়ে করল। মেয়েটি খারাপ নয়, কিন্তু তার জীবনযাপন এত আধুনিক যে আমার পক্ষে তাল রাখা মুশকিল হয়ে পড়ল।

"আমার ছেলের প্রচণ্ড উগ্র জীবন আমাকে মেনে নিতে হল। এবং সেটা যে মেনে নিতে পারিনি তার প্রমাণ আমার অসুস্থতা। আমি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলাম। একটা দিক অসাড় হয়ে গেল প্রথমে। অনেক চিকিৎসার পরে উর্ধ্বাঙ্গে স্বাভাবিকতা ফিরে এলেও কোমরের নীচ থেকে সব অসাড় হয়ে গেল। কারও সাহায্য ছাড়া আমি বিছানা থেকে নামতে পারি না আর।

"কিন্তু খারাপ খবর বাতাসের আগে ছোটে। ছোট ছেলে অতিরিক্ত লাভের

নেশায় যে ঝুঁকি নিয়েছে তাতে ব্যবসা ডুবছে। প্রচুর ঋণ করে ফেলেছে কালোয়ারদের কাছে। এবং শেষপর্যন্ত দু-দুটো বাগান বিক্রি করে নিজেকে বাঁচিয়েছে, এ-সবই এই বিছানা থেকে শুনলাম। সে আমার ঘরে আসেও না অথচ এই বাড়িতে থাকে। যা কিছু টাকা পয়সা এখনও আছে তা তার স্ত্রী সরাতে পেরেছিল বলেই আছে। কলকাতার সল্টলেকে ওর স্ত্রী একটি বাড়ি কিনেছে। ব্যাঙ্কেও রেখেছে কিছু। বছরের বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকে। আমি ভবাকে নিয়ে এখানে পড়ে আছি।"

বিজনবিহারী চুপ করতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি টেলিফোনে বললেন বাড়ির সবাই শিলিগুড়িতে গিয়েছে। এই সবাই কারা ?"

"আমার পুত্রবধূ এবং তার মেয়ে। ছেলেও গেছে। ওরা দিনসাতেক হল এখানে এসেছে।" অনেকক্ষণ কথা বলায় এখন বিজনবিহারীকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

অর্জুন বলল, "আপনাদের পারিবারিক গল্প খুবই দুঃখজনক। আপনার বাবার সব কাজ এভাবে নষ্ট হতে দেখতে আপনার কীরকম লেগেছে তা অনুমান করছি। কিন্তু আপনি আমাকে এখানে কেন আসতে বললেন, বুঝতে পারছি না। এ-ব্যাপারে আমার কী করণীয় ?"

মাথা নাড়লেন বিজনবিহারী, "এ-কথা মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। কাহিনী শোনালাম, যাতে সব ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারো। আমাদের এখন অর্থাভাব চলছে। তার মানে এই নয় যে, খেতে-পরতে পারছি না। যা কিছু ব্যাঙ্কে রাখতে পেরেছি তার সুদে বাকি ক'টা দিন চলে যাবে। কিন্তু... !"

"বলুন !"

"হঠাৎ একটা পুরনো চিঠি খুঁজে পেলাম। আমার শরীরের এই অবস্থায় খোঁজা সম্ভব নয়। ভবাকে দিয়ে বাবার আলমারি পরিষ্কার করছিলাম। যা কিছু কাগজপত্র সে আমাকে এনে দিতে তাতে চিঠিটাকে দেখতে পেলাম। আমার পিতামহের চিঠি।" বিজনবিহারীর মুখ উজ্জ্বল হল।

"চিঠিতে কী লেখা আছে ?"

"ব্যাপারটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তুমি নিশ্চয়ই গোপন রাখবে।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনি তো সেই কারণেই আমাকে ডেকেছেন।"

"হুঁ। আমি চাই না আমার ছেলে বা পুত্রবধূ এসব জানুক।"

"তাঁদের সঙ্গে আমার এখনও পরিচয় হয়নি। কিন্তু আমি আমার বোধবুদ্ধি দিয়ে যে কাজ করি তার সঙ্গে যদি আপনার পাওয়া চিঠির কোনও সম্পর্ক না থাকে তা হলে বলার দরকার নেই।"

"আছে। চিঠিটা পাওয়ার পর পিতা কেন যে কোনও অ্যাকশন নেননি, তা আমি জানি না। খামের ওপর প্রাপ্তি স্বীকারের তারিখ লিখে রেখেছিলেন এইমাত্র।" বিজনবিহারী তাঁর হাতের কাছে রাখা একটা চামড়ার পোর্টফোলিও

ব্যাগ টেনে নিয়ে সেটা খুললেন।

অর্জুন দেখল ব্যাগ হাতড়ে ভদ্রলোক একটা খাম বের করলেন। খুব পুরনো আমলের খাম কিন্তু ময়লা হয়নি। খাম থেকে একটি চিঠি বের হল। বিজনবিহারী অল্প কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন,

কল্যাণীয়েষু পবনবিহারী,

আশা করি তোমার ব্যবসা ভালই চলিতেছে। তুমি গোয়ালন্দ ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বী হইয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ পাই। আমি বৃদ্ধ। নিজস্ব জায়গায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেই শান্তি পাইব বলিয়া এই স্থানে রহিয়া গিয়াছি।

কিন্তু জীবিত অবস্থায় যে অশান্তি কপালে জুটিয়াছে, তাহার সমাধান কী আমি জানি না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্ররা প্রতিনিয়ত অর্থের জন্য আমাকে বিব্রত করিতেছে। তাহাদের ধারণা আমি সমুদয় অর্থ তোমাকে গোপনে দিয়া দিয়াছি। প্রকৃত সত্য ইহারা বিশ্বাস করে না। অথচ আমার সঞ্চয়ে সামান্যই নগদ অর্থ আছে। আমি বিশেষভাবে চিন্তিত তোমার জননী এবং পিতামহীর স্বর্ণালঙ্কারের জন্য। মূল্যবান পাথর ছাড়াই তাহাদের ওজন প্রায় পাঁচশো ভরি হইবে। এইসব অলঙ্কার তাঁহাদের মূল্যবান স্মৃতি। মূর্খরা ইহাদের দিকে হাত বাড়াইতে চায়। আমি আমার স্বল্প ক্ষমতায় ইহাদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

গতরাত্রে এখানে প্রচুর ঝড়জল হয়। মধ্যরাত্রে আমি সমুদয় অলঙ্কার মাটিতে পুঁতিয়া আসিয়াছি। আমাদের বাড়ির সমুখে যে শিবমন্দির আছে, তাহার দক্ষিণ দিকে যে প্রাচীন বটবৃক্ষ, তাহাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিতে পার। ওই বটবৃক্ষ হইতে দশ কদম পূর্ব দিকে যাইলে এই বাড়ির দোতলার শেষ গবাক্ষ দেখা যায়। গবাক্ষকে নজরে রাখিয়া আর-একটু দক্ষিণে হাঁটিলেই পুষ্করিণীর ধাপ শুরু হইবে। সেই ধাপের আগে চার হাত গর্ত খুঁড়িয়া একটি টিনের বাক্সে অলঙ্কারাদি ভরিয়া আমি রাখিয়া দিয়াছি। মাটি সমান করিয়া ফিরিয়া আসিতে কষ্ট হইয়াছিল। আজ সকালে গিয়া দেখিলাম, বৃষ্টি মাটি খোঁড়ার চিহ্ন মুছিয়া দিয়াছে। এই তথ্য তোমাকে ছাড়া কাহাকেও বলিব না। আমার মৃত্যুর পর তোমার যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলেই ওইসব অলঙ্কার তুমি গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

—আশীর্বাদক, তোমার পিতা, নুটুবিহারী ঘোষ।

পড়া শেষ করে বিজনবিহারী মুখ তুললেন।

অর্জুন বলল, "আপনার বাবা তো আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি বাবা এসব মাথায় আনেননি। মাটি খুঁড়ে অলঙ্কার বের করলে সবাই দেখতে পেত। আমিও জানতাম। তখন বাবার

অর্থের তেমন প্রয়োজনও ছিল না। পিতামহের শ্রাদ্ধ নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন সে-সময়।"

"পরে যাননি ?"

"না। আর না। তা ছাড়া বাবার সব কিছু আমি পেয়েছি। তিনি যদি ওগুলো সংগ্রহ করতেন, তা হলে আমি তা দেখতে পেতাম।"

"একটা কথা। আপনার বাবা মারা গিয়েছেন কবে ?"

"স্বাধীনতার পরের বছরে।"

"এতদিনেও আপনি চিঠিটার হদিস পাননি কেন ?"

"পেতে চেষ্টা করিনি বলে। বাবা চলে যাওয়ার পর ওঁর যাবতীয় কাগজপত্র আমি ওই আলমারিতে ভরে রেখেছিলাম। বিশেষ করে যে-খামটার ওপর ব্যক্তিগত লেখা ছিল, সেটা খোলা অশোভন মনে করায় খুলিনি। একসময় কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিলাম এসবের কথা। দ্যাখো ভাই, জীবিত অবস্থায় আমরা এমন অনেক কিছু করি, যা একান্ত আমারই। মরে যাওয়ার পর তার সবকিছু ছেলেমেয়েদের পছন্দ নাও হতে পারে। আমি বাবার ব্যক্তিগত খামে সেই কারণেই হাত দিইনি।"

"চিঠিটা দেখতে পারি ?"

বিজনবিহারীবাবু খামসুদ্ধু চিঠি এগিয়ে দিলেন। খামের এক কোণে লেখা আছে, 'আঠারোই শ্রাবণ, ১৩৩৯ সন'। অর্থাৎ ষাট বছর আগে চিঠিটা এসেছিল। নুটুবিহারীর চিঠিতে কোনও তারিখ নেই। হাতের লেখা স্পষ্ট। সেই সময় শিক্ষিত মানুষেরা চিঠিপত্রে তারিখ অবশ্যই লিখতেন। নুটুবিহারী লেখেননি কেন ? কাগজটি বেশ পুরনো। কিন্তু বোঝা যায়, এই কাগজ বেশি ব্যবহৃত হয়নি। হয়তো চিঠি লেখার পর বারপাঁচেক খোলা হয়েছে ভাঁজ। অর্জুন চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল। তারপর সেটাকে ফিরিয়ে দিতেই বিজনবিহারীবাবু সযত্নে খামে বন্ধ করে ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেললেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার পিতামহের পাঁচশো ভরি সোনা মাটির নীচে পড়ে আছে ষাট বছরের ওপর। পাথরগুলো বাদ দিলেও সোনার দাম কুড়ি লক্ষ টাকা হবে। একমাত্র আমি ওঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তুমি আমাকে গহনাগুলো উদ্ধার করে দেবে ?"

অর্জুন বৃদ্ধকে দেখল। তারপর বলল, "আপনার ঠাকুর্দা থাকতেন কালীগঞ্জে। জায়গাটা ভারতবর্ষে নয়। বাংলাদেশের আইনকানুন কী, তা আমি জানি না।"

বিজনবিহারী বললেন, "এতে আবার আইনকানুনের কথা উঠছে কেন ? আমাদের জিনিস ওখানে পড়ে আছে। আমি সেটা নিয়ে আসব, এতে অন্যায় কোথায় ?"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেখানে যেতে

হলে ভিসার দরকার পড়ে। স্বাধীনতার আগে আপনার জিনিস ওখানে থাকলে এখন সেই জিনিসে আপনার অধিকার আছে কি না সে-প্রশ্ন উঠতে পারে। পাঁচশো ভরি সোনা যদি মাটির তলায় খুঁজে পাওয়া যায় তা হলে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারকে জানানো উচিত। ওই সোনা নিয়ে এদেশে চলে আসা খুব বড় ধরনের অপরাধ। আমার কথা আপনি একটু ভেবে দেখুন।" অর্জুন বোঝাবার চেষ্টা করল।

"এসব যে আমি ভাবিনি, তা কী করে জানলে? কিন্তু সোনা আমার দরকার।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "কিন্তু কাজটা নেব কি না সে-ব্যাপারে আমি একটু ভাবি। আপনাকে আমি দিন তিনেকের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারব। নমস্কার।"

॥ দুই ॥

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এরকম একটা গল্প শুনতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। বাড়ি ফেরার সময় অর্জুনের মনে হচ্ছিল এ-কথা। বৃদ্ধ বিজনবিহারী পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও সোনার গয়নার লোভে লোভী হয়ে উঠেছেন, এটা তার ভাল লাগছিল না। সেই তুলনায় ওঁর বাবা পবনবিহারী অনেক বেশি নির্লোভ মানুষ ছিলেন। তখন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়নি। তিনি স্বচ্ছন্দে গয়নাগুলো তুলে নিয়ে আসতে পারতেন। অর্জুনের মনে হচ্ছিল এই ব্যাপারটায় কোনও রহস্য নেই। একজন মানুষের লোভ মেটানোর জন্য সে এগিয়ে যেতে পারে না। তিনদিন পরে এ-কথাই বিজনবিহারীবাবুকে জানিয়ে দেবে ঠিক করল।

কিন্তু দু'দিন বাদে ভোর চারটের সময় অর্জুনের ঘুম ভেঙে গেল তারস্বরে টেলিফোন বাজার শব্দে। এই সময় খুব বিপদে না পড়লে কেউ কাউকে টেলিফোন করে না। সে বিছানা থেকে উঠে ঘুম-ঘুম অবস্থাতেই রিসিভার তুলল, "হ্যালো।"

"অর্জুন বলছ?" খুব চাপা গলায় প্রশ্ন এল।

"হ্যাঁ।"

"আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে অর্জুন। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি।" ভদ্রলোকের গলা কাঁপছিল।

"আপনি কে কথা বলছেন?"

"আমি? ও, আমি বিজনবিহারী ঘোষ।"

"ও। কী হয়েছে আপনার?"

"কাল রাত্রে চিঠিটা চুরি হয়ে গিয়েছে।"

"চুরি হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ। গতকাল দুপুরেও আমি ব্যাগ খুলে ওটাকে দেখেছিলাম। ঠিকই ছিল। আধ ঘণ্টা আগে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম আসছে না দেখে এটা-ওটা হাতড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ কী খেয়াল হতে ব্যাগটা খুলে দেখি ওর মধ্যে চিঠিটা নেই।" বিজনবিহারীবাবুর গলায় প্রচণ্ড হতাশা।

"আপনি অন্য কোথাও রাখেননি তো?"

"অন্য কোথাও? অসম্ভব। কেউ নামিয়ে না নিলে আমি বিছানা থেকে নামতেই পারি না। আমি নিজে কোথায় ওটা রাখব? তা ছাড়া আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি কাল ব্যাগের ভেতর খামটাকে রেখে দিয়েছিলাম। অর্জুন, প্লিজ, তুমি আমাকে বাঁচাও।" বৃদ্ধ চাপা গলায় বললেন।

"আপনি বলছেন নিজে খাট থেকে নামতে পারেন না। তা হলে যে চিঠিটা সরাবে সে আপনার সামনেই আসবে। তা ছাড়া আপনার কাজের লোক সবসময় থাকে। সে বিশ্বাসী?"

"তাকে আমি নিজের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি।" বিজনবিহারীবাবু বললেন।

"বেশ। এখন তো যাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না। আমি সকালবেলায় একবার যাব।"

"কিন্তু তুমি কীভাবে আসবে?"

"বুঝতে পারলাম না।"

"আমি যে তোমাকে টেলিফোন করেছি, তা যেন আমার ছেলে জানতে না পারে। তুমি অন্য কোনও একটা অছিলা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ো। প্লিজ।" লাইন কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

এত ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে আবার ঘুমের আশা করা যায় না। অর্জুন খানিকটা অপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়ল। আজ বৃষ্টি নেই। আকাশ পরিষ্কার। জলপাইগুড়ি শহরে প্রাতঃভ্রমণকারীর সংখ্যা কম নয়। কদমতলার মোড়ে হারুদার চায়ের দোকানে বসে চা খেতে-খেতে সে এদের দেখতে লাগল।

হঠাৎ তার মনে হল বিজনবিহারী নিজেই কোনও রহস্য তৈরি করছেন না তো! হয়তো চিঠি ওঁর কাছেই আছে, অর্জুনকে জড়াবার জন্য এই গল্প শোনালেন। ওঁর মতো মানুষ সারাক্ষণ ব্যাগ নিয়ে শুয়ে থাকলে কারও ক্ষমতা নেই চিঠিটাকে চুরি করা। তা ছাড়া চিঠি চুরি যাবে তখনই, যখন কেউ জানতে পারবে ওটার ভেতর কী লেখা আছে! বিজনবিহারীবাবুর কথা অনুযায়ী যিনি লিখেছিলেন, যাঁকে লিখেছিলেন, তাঁরা দু'জনেই মৃত। একমাত্র বিজনবিহারীবাবুই ব্যাপারটা জানেন। অতএব অন্য কেউ ওটা চুরি করতে যাবে কেন?

অর্জুন এসব কথা ভাবলেও যেটা উড়িয়ে দিতে পারছিল না সেটা হল বৃদ্ধের গলার স্বর। খুব বড় অভিনেতা না হলে ওই অসহায় অবস্থা গলায় ফোটানো

সম্ভব হবে না।

এখন আলো ফুটে গিয়েছে, কিন্তু কারও বাড়িতে যাওয়ার সময় এটা নয়। অর্জুন দেখল জগুদা হেঁটে চলেছেন দ্রুত পায়ে। সে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ওঁর সামনে দাঁড়াতেই জগুদা খুব অবাক, "আরে তুমি! সাতসকালে এখানে কী করছ? তোমার তো মর্নিং-ওয়াকের অভ্যেস নেই!"

"ঘুম আসছিল না, তাই। কেমন আছেন?"

"আছি। আর তো বেশিদিন চাকরি নেই। তার মানে জীবনটাও বেশিদিন নেই।"

"যাঃ। এসব কী বলছেন?"

"না হে, এটাই সত্যি। কেসটেস কীরকম পাচ্ছ?"

"মোটামুটি। আচ্ছা জগুদা, বিজনবিহারী ঘোষ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?"

"বিজনবিহারী? এক্স টি-প্লান্টার?"

"হ্যাঁ। শিল্পসমিতি পাড়ায় থাকেন।"

"হয়ে গেল বেড়ানো। হারুদা, দু' কাপ চা।" জগুদা হাঁক দিলেন।

"আমি এইমাত্র খেয়েছি।"

"আহা, ভোরে দু' কাপ চা আরামসে খাওয়া যায়। যে-নামটা তুমি করলে, সেই নাম কেউ ভোরবেলায় উচ্চারণ করত না। বলত, দিনটা খারাপ যাবে। প্রচণ্ড কিপটে ছিলেন।"

"উনি তো এখনও বেঁচে আছেন!"

"আছেন, তবে শুনেছি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ওঁর সম্পর্কে কী জানতে চাও?"

"ওঁরা তো পূর্ববাংলা থেকে এসে চা বাগান তৈরি করেছেন?"

"জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ মানুষই পূর্ববাংলা থেকে এসেছেন। একসময় রাজশাহি, রংপুর জেলার মতো জলপাইগুড়িকেও পূর্ববাংলার সঙ্গে ধরা হত। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রুহাম নামে এক সাহেব তিস্তা নদীর ধারে গাজোলডোবা বলে একটা জায়গায় প্রথম চা বাগান পত্তন করেন। প্রথম দিকে ইংরেজরা এই জেলার সব ভাল-ভাল জমি দখল করে নিয়ে একটার পর একটা চা বাগান তৈরি করেছেন। বাঙালিরা এল অনেক পরে। তবে রহিম বক্স জলঢাকার কাছে প্রথম বাঙালি হিসেবে যে চা বাগান পত্তন করেন, সেটা ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। ভদ্রলোকের আদি বাড়ি ছিল নোয়াখালি জেলায়। কাছাকাছি সময়ে আর-একটি নাম পাওয়া যায়, তিনি বিহারীলাল গাঙ্গুলি। প্রথম যৌথ কোম্পানি হল মোগলকাটা চা বাগান। তবে রহিম বক্স, গোপাল ঘোষ, জয়চন্দ্র সান্যালরা যে কাজ শুরু করেছিলেন তাকে সার্থক করে তোলেন তারিণীপ্রসাদ রায় এবং মৌলবী মোশারফ হোসেন। এই বিজনবিহারীর বাবা গগনবিহারীও সেই সময় চা-শিল্পে যুক্ত হন। ওঁদের একাধিক বাগান ছিল। গগনবিহারী মারা যাওয়ার

পর বিজনবিহারী হাল ধরেন।" হারুদার দেওয়া চায়ে চুমুক দিলেন জগুদা, "তখন জলপাইগুড়ি শহরের রমরমা অবস্থা। শিল্পপতিরা যেমন ভাল ব্যবসা বুঝতেন তেমনই শহরের মানুষের প্রয়োজনে এগিয়েও আসতেন। খেলাধুলো এবং সংস্কৃতি জগতে এঁদের অবদান ভোলার নয়। বিশেষ করে সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় এবং বীরেন ঘোষ মশাইয়ের তো তুলনা হয় না। জলপাইগুড়ির প্রাণ ছিলেন এঁরা। কিন্তু বিজনবিহারী শহরের জন্য কিছুই করেননি। নিতান্ত বাধ্য না হলে তিনি কোনও ভাল কাজের জন্য একটি পয়সাও খরচ করতেন না। ঠিক কিপটে বললে কম হবে, তিনি ছিলেন সঙ্কীর্ণমনা। আর ওঁর ছেলেরা তো বাগান তুলেই দিল। যা ছিল সব উড়িয়ে এখন কলসি গড়িয়ে খাচ্ছে।" চা শেষ করে জগুদা যেন খেয়াল করলেন, "তা এত লোক থাকতে তুমি হঠাৎ এই মানুষটির খবর নিচ্ছ কেন ? কিছু হয়েছে ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। উনি একটা ব্যাপারে সাহায্য চাইছেন।"

"আইনসম্মত হলে করো। তবে নিজের পারিশ্রমিক বুঝে নেবে।"

অর্জুন হাসল। এখনও সে এই ব্যাপারটায় পেশাদার হতে পারেনি। অনেকেই কেস নিয়ে আসে। কাজটা হয়ে গেলে প্রশ্ন করে, কত দিতে হবে ? অর্জুন, যা বলা উচিত তার চেয়ে অনেক কম বলে চক্ষুলজ্জার কারণে। আর প্রচণ্ড খাটুনির পরে যদি কাজটার সুরাহা না হয়, তা হলে পয়সা চাওয়াও যায় না, খাটুনিটাই বৃথা যায়। কিন্তু অন্য বৃত্তির মানুষ তা সত্ত্বেও নিজের দক্ষিণা নেন। মামলায় হেরে গেলেও উকিলকে টাকা দিতে হয়, ডাক্তার রোগ সারাতে না পারলেও ফি নিতে ছাড়েন না। তা ছাড়া আর-একটা সমস্যা আছে। তাকে এক-একসময় এক-একরকম কাজ করতে হয়। সব কাজের গুরুত্ব সমান নয়। তাই সবার কাছে এক দবে দক্ষিণা চাওযাও যায় না। তবে জগুদা যখন সতর্ক করলেন, তখন কথাটাকে সে নিশ্চয়ই মনে রাখবে। এবার আর বোকামি নয়।

সকাল ন'টা নাগাদ লাল বাইক চালিয়ে অর্জুন বিজনবিহারীবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। দোতলায় চোখ তুলতেই সে লক্ষ করল, একটি আঠারো-উনিশ বছরেব মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। মেয়েটি বেশ ফরসা এবং ফরসা মেয়েদের দূর থেকে সুন্দরী বলেই মনে হয়। মেয়েটি নিশ্চয়ই বিজনবিহারীবাবুর নাতনি। সে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ওপর থেকে মেয়েটি সামান্য ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল,"আপনি কাকে চান ?"

"বিজনবিহারীবাবু আছেন ?"

"উনি এখন বিশ্রাম করছেন।" মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল অর্জুন। মুখে ব্রনর দাগ থাকলেও দেখতে ভালই। অর্জুন বলল, "আমার একটু দরকার ছিল।"

"আপনি ওখানে দাঁড়ান।" মেয়েটি সরে গেল।

অর্জুন সেই ভৃত্যটিকে কোথাও দেখতে পেল না। সকাল ন'টায় কেউ

বিশ্রাম করছে বলে দেখা করবে না, কেউ শুনেছে কখনও ? বিজনবিহারীবাবু বলেছিলেন যে, ওঁর সঙ্গে পরিচয় আছে অথবা উনি যে আসতে বলেছেন তা যেন কেউ জানতে না পারে।

"কাকে চাইছেন ভাই ?"

প্রশ্ন শুনে অর্জুন দেখল মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক নেমে এসেছেন। এই সকালেও ওঁর পরনে পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি। চেহারায় বিজনবিহারীবাবুর আদল আছে।

"আমার নাম অর্জুন। আমি বিজনবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"প্রয়োজনটা কী জানতে পারি ?"

"আপনি ?"

"আমি ওঁর ছেলে। এই শহরে তো সবাই আমাদের চেনে ? আপনি এখানে থাকেন না ?"

"থাকি। কিন্তু চেনার সৌভাগ্য হয়নি।"

"আপনি কী করেন ?"

"আমার কাজ সত্য-অনুসন্ধান করা। আমাকেও এই শহরে সবাই জানে।"

"ওহো। হ্যাঁ। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। জলপাইগুড়ির মতো ছোট্ট শহরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব বড় ধরনের। আসুন এই ঘরে, কথা বলি। আমি গগনবিহারী ঘোষ।" বলতে-বলতে পাশের একটি ঘরের দরজা খুলে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

একটা শ্বেতপাথরের গোল টেবিল, চারপাশে চারটে চেয়ার। গগনবিহারী ইঙ্গিত করতেই অর্জুন চেয়ার টেনে বসল। গগনবিহারী বসে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী ?"

"বাংলাদেশের ঢাকা শহরের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার আমার ওপর ভরসা করছেন। তিনি কালীগঞ্জের নুটুবিহারী ঘোষমশাই-এর যেসব বংশধর জলপাইগুড়িতে আছেন তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। পুলিশের মাধ্যমে খোঁজখবর নিতে চান না তিনি। নুটুবিহারী ঘোষের ছেলের নাম পবনবিহারী। তাঁর খোঁজ নিতে আমি আপনাদের কথা জানতে পারলাম। আপনার বাবা যখন এখনও জীবিত, তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমি এসেছি।" অর্জুন বেশ গুছিয়ে কথাগুলো বলল।

গগনবিহারীর মুখ-চোখ বদলে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ময় ফুটে উঠলেও নিজেকে ঠিক সামলে নিলেন তিনি, "কী ব্যাপারে খোঁজখবর, বলুন তো ?"

"বিশদ আমিও জানি না। উনি আমাকে লিখেছেন যে, লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয়সম্পত্তির সুষ্ঠু ভাগ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে নুটুবিহারীর তরফের বংশধরদের অবস্থান জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমার নাম তিনি এক

পরিচিতের মুখে শুনেছেন বলে অনুরোধটা করেছেন।”

“লক্ষ-লক্ষ টাকার বিষয়সম্পত্তি ? বাংলাদেশে। ওসব তো এনিমি'জ প্রপার্টি !”

“বোধহয়, না। আপনাদের আত্মীয়রা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসেনি অথবা সেসব সম্পত্তি জবরদখলও হয়ে যায়নি। অবশ্য আমার পক্ষেও এখান থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়।”

“উনি কি আমাদের যেতে লিখেছেন ?'

“না। এখনও লেখেননি।”

“আপনার কি মনে হয় আমরা ওই সম্পত্তির ভাগ পাব ?”

“সেরকমই তো ইঙ্গিত দেখছি।”

“ক'দিন থেকেই আমার ডান চোখটা নাচছিল। আসুন, আমার সঙ্গে ওপরে আসুন। বাবা তো হাঁটতে পারেন না। ওপরেই আছেন।” গগনবিহারীর ভাবভঙ্গি একদম বদলে গেল। অর্জুনকে নিয়ে তিনি ওপরে উঠতেই মেয়েটিকে দেখা গেল। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছে। গগনবিহারী হাসিমুখে বললেন, “টুকু, একে চিনিস ? বিখ্যাত গোয়েন্দা। অর্জুন !”

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, “ও। আপনার কথা আমার বন্ধুরা খুব বলে। আপনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন না ? একটা লাইটারের রহস্য সমাধান করেছিলেন ?”

“ওই আর কি !”

গগনবিহারী বললেন, “বাঃ, স্টেট্স ঘুরে আসা হয়ে গেছে ? বাংলাদেশ তো নস্যি। আসুন, বাবা ওই ঘরে আছেন। বাবা, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।”

গগনবিহারী এগিয়ে যেতেই অর্জুন মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটির মুখ আচমকা পালটে গেল। গম্ভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

বিজনবিহারীবাবু সত্যিকারের অভিনেতা। এমন মুখে তাকালেন, যেন এর আগে তিনি কখনও অর্জুনকে দেখেছেন বলে মনে হল না। বিছানার মাঝখানে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বললেন, “কী ব্যাপার ?”

গগনবিহারী বললেন, “বাংলাদেশের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কিছু কথা বলতে এসেছেন। ওখানে নাকি লক্ষ-লক্ষ টাকার প্রপার্টি পড়ে আছে, যার একটা অংশ আমাদেরও।”

অর্জুন হাত তুলল, “আমি কিন্তু এ-কথা বলিনি। আমাকে জানানো হয়েছে যে, ওই প্রপার্টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ায় আপনাদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।”

“ইনি কে ?” বিজনবিহারী প্রশ্নটা করতেই অর্জুনের মনে হল চিঠি চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা বানানো।

গগনবিহারী বললেন, “এঁর নাম অর্জুন। এই শহরের একমাত্র প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। খুব নাম করেছেন। স্টেট্সেও গিয়েছেন। সবাই এঁকে

চেনে।"

"বয়স দেখছি খুবই অল্প। তুমি বলছি, বোসো।"

অর্জুন চেয়ারে বসল। এই সময় চাকরটি এক গ্লাস শরবত ট্রেতে নিয়ে ঢুকল। অর্জুনের দিকে তাকাতেই তার মুখে চেনা ছাপ ফুটে উঠল। অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে নিতেই সে ট্রে বিছানায় বিজনবিহারীবাবুর সামনে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে চলে গেল।

বিজনবিহারীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ?"

"আপনাদের কোনও আত্মীয়স্বজন এখনও বাংলাদেশে আছেন ?"

"হ্যাঁ। আমার ঠাকুর্দার ভাইয়েরা আছেন বলে জানি।"

"শেষ কবে আপনি ওখানে গিয়েছেন ?"

"ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর যাইনি। তাও ষাট বছর হয়ে গেল।"

"ওঁদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে ?"

"না। তবে আমার এক সম্পর্কিত ভাই বছর কুড়ি আগে এসেছিল অর্থসাহায্য নিতে, আমি দিইনি। একরাত ছিল সে। অবস্থা খারাপ না হলে কেউ সাহায্য চাইতে এতদূরে আসে না।"

"চা ব্যবসা আপনার বাবা শুরু করেছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি টাকা পেলেন কোথায় ?"

"ঠাকুর্দার কাছ থেকে পেয়েছেন।"

"আপনাদের তো যৌথ পরিবার ছিল। ঠাকুর্দার অর্থে তো তাঁর ভাই দাবি করতে পারেন। কখনও করেননি ?"

"হ্যাঁ। করেছিলেন। বাবা সেসব পাইপয়সায় শোধ করে গিয়েছিলেন।"

"ও। তা আপনি এখনকার কোনও আত্মীয়ের নাম মনে করতে পারেন না, যাঁরা ওখানে থাকেন ? একটু ভেবে বলুন।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ওই তো, যে ছেলেটি এসেছিল সাহায্য চাইতে, তার নাম মনে আছে। বিমানবিহারী। অবশ্য এখন তার বয়স আমার ছেলের সমান হবে।"

"আপনার বাবার নাম পবনবিহারী। তাঁর কয় ছেলে ?"

"আমিই একমাত্র সন্তান।"

"আপনার ছেলে-মেয়ে ?"

"দু'জন ছিল। এখন একজন বলেই মনে করতে পারেন।"

"আর-একজন কি মারা গিয়েছেন ?"

"না, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"তিনি কোথায় আছেন ?"

"আমি খবর রাখি না।"

"আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে... !"

"আমি একটা উইল করেছিলাম কয়েক বছর আগে, তাতে তার নাম নেই।"

গগনবিহারী মনোযোগ দিয়ে এসব কথা শুনছিলেন, হঠাৎ বললেন, "অবশ্য দাদাকে বাবা এখনও আইনসম্মতভাবে ত্যাগ করেননি। আমি বলছি আদালতে গিয়ে ...।"

বিজনবিহারী মাথা নাড়লেন, "তার কোনও প্রয়োজন হয় না। উইলে আমি যার নাম লিখব, সে-ই বিষয়সম্পত্তি পাবে। আর বিষয় বলতে রেখেছই বা কী! সবই তো উড়িয়ে দিয়েছ।"

অর্জুনের মনে হল, গগনবিহারী ইশারা করলেন এ-বিষয়ে কথা না বলতে। তিনি অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলে ওঁকে ভাল করে দেখার জন্য মুখ ফেরাতেই তিনি বললেন, "আপনি বসুন, আমি একটু আসছি।"

গগনবিহারীর চলে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক। বিশেষ করে চিঠি চুরির সঙ্গে উনি যদি যুক্ত থাকেন তা হলে কখনওই অর্জুনকে একা তাঁর বাবার সঙ্গে রেখে যাবেন না। কথাবার্তা যা হচ্ছে, শুনতে চাইবেন। তিনি চলে গেলে অর্জুন বলল, "আমার পক্ষে এই অভিনয় করা সম্ভব নয়।"

"আমার জন্য করো ভাই। এই বাড়িতে শত্রুবেষ্টিত হয়ে আছি।"

"শত্রু? এই ছেলেকেই তো সব কিছু দিয়ে যাচ্ছেন।"

"আমি এখনও যাচ্ছি না। যাওয়ার দেরি আছে অনেক। হ্যাঁ, একটা উইল করেছিলাম, এবার সেটাকেও পালটাতে চাই। কিন্তু চিঠিটা হাতছাড়া হওয়ার পর আমার মন ভেঙে গেছে। কুড়ি লক্ষ টাকার সম্পত্তি মাটির তলায় পড়ে আছে, আর এই হতভাগা সেগুলো ঠিক তুলে আনবে।" বিজনবিহারী ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন।

"আশ্চর্য! আপনি নিজে যদি ওগুলো পেতেন তা হলে পরে আপনার ছেলেই মালিক হত!"

"সে আমি ভেবে দেখতাম। এখন ও তো সব জেনে গেল ...!"

"আপনি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছেন চিঠির কথা?"

"হ্যাঁ। বলেছিলাম আমার ব্যাগ থেকে একটা কাগজ খোয়া গিয়েছে। সে জানে কি না? বলল, আমার ব্যাগে এই জীবনে হাত দেয়নি।"

"এ-ঘরে আর কে-কে আসে?"

"পুত্রবধূ আসেন না। শ্বশুরের প্রতি তাঁর কোনও শ্রদ্ধাভক্তি নেই। টুকু, আমার নাতনি, আসে। সে একটি ছেলেকে পছন্দ করে। ছেলেটিকে আমি দেখিনি। তার মা-বাবা ব্যাপারটা জানেন না। জানলে রেগে যাবেন। সেইজন্যই টুকু আমার সাহায্য চায়। স্বার্থ নিয়েই আসে।"

"ছেলেটি কী করে?"

"কদমতলায় একটা সাইকেল রিপেয়ারিংয়ের দোকান আছে। নাম কাজল।" বলতে-বলতে সচকিত হলেন, "ওঃ, তুমি বড় আজেবাজে কথা

বলছ ! চিঠি চুরির সঙ্গে কাজলের কী সম্পর্ক ?”

“আমার মনে হচ্ছে আপনার চিঠি চুরি যায়নি।”

“তার মানে ?” এবার যেভাবে চমকালেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে বিজনবিহারী অভিনয় করছেন না, “আমি তোমাকে বানিয়ে-বানিয়ে এসব বলছি ?”

“চিঠিটা যদি সত্যি চুরি গিয়ে থাকে, তা হলে আপনার বাড়ির সবাইকে আমার জেরা করা দরকার। অথচ আপনি চাইছেন ব্যাপারটা গোপনে থাকুক। এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি ?”

“তাই বলে আমাকে বদনাম দেবে ?” প্রশ্ন করামাত্র বিজনবিহারী মুখ ফিরিয়ে নিতেই অর্জুন দেখল ওঁর ছেলে ঘরে ঢুকছেন। অর্জুন বলল, “আপনাকে সন্দেহ করি না, বদনাম দেওয়ার প্রশ্ন নেই। আপনি প্রবীণ মানুষ। কিন্তু আমাকে অন্তত একটা প্রমাণ দেখান।”

“কী প্রমাণ দেখতে চাইছেন আপনি ?” এবার গগনবিহারী প্রশ্ন করতেই বিজনবিহারীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অর্জুন হাসল, “আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, নুটুবিহারী ঘোষের সঙ্গে ওঁর অথবা ওঁর বাবার যে সম্পর্ক ভাল ছিল, তার কোনও প্রমাণ দিতে।”

“এই প্রমাণ কীভাবে দেওয়া যায় ! ওঁরা তো অনেককাল মারা গিয়েছেন।”

“কাগজপত্র নেই ? আপনাদের কিছু দান করে যাননি ? আপনাদের মানে আপনার ঠাকুর্দা অথবা ওঁকে ? যা থেকে বোঝা যাবে সম্পর্ক ভাল ছিল !” অর্জুন বানিয়ে যাচ্ছিল প্রশ্নগুলো।

গগনবিহারী বললেন, “এটা বাবা বলতে পারেন।”

বিজনবিহারী ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। অর্জুনকে চাহনি দিয়ে তারিফ করলেন। তারপর বললেন, “হ্যাঁ। চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া ছিল। বাবা প্রতি সপ্তাহে ঠাকুর্দাকে চিঠি লিখতেন। উনিও সবার খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু সেসব চিঠি এতই সাধারণ যে, বাবা জমিয়ে রাখার কথা ভাবেননি। আমিও না। বাবার যা কাগজপত্র, তা ওই আলমারিতে ছিল। সেদিন ভবাকে দিয়ে সব নামিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। ঠাকুর্দার চিঠি পেয়েছি বলে মনে হয় না।”

“সেটা খুব দরকার হবে। আরও ভাল করে খুঁজে দেখুন। আজ আমি উঠি।” অর্জুন উঠে দাঁড়াতেই গগনবিহারী হাঁ-হাঁ করে বাধা দিলেন, “এ-বাড়িতে এসে একটু মিষ্টিমুখ না করে যাওয়া চলবে না। আমার মেয়ের ভাল বিয়ে হবে না ভাই।”

“অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মিষ্টি একদম ভালবাসি না।”

বিজনবিহারী বললেন, “আমার নাতনিও মিষ্টি খেতে চায় না। তাতে তার ফিগার খারাপ হয়ে যাবে। তোমারও কি সেই এক চিন্তা ?”

“না।” অর্জুন দরজার দিকে এগোল, “আবার হয়তো আপনার কাছে আসতে হবে।”

বিছানায় বসেই বিজনবিহারী বললেন, "ওই বিশ্রামের সময়টুকু বাদ দিয়ে এলে কথা হবে।"

বারান্দায় বেরিয়ে গগনবিহারী ছাড়লেন না। এককাপ চা খেয়ে যেতেই হবে। অতএব পাশের ঘরে ঢুকতে হল অর্জুনকে। এটাই এঁদের বসার ঘর। কারণ কোনও খাট দেখা যাচ্ছে না। ঘরের মাঝখানে একটা সোফাসেট রয়েছে। অর্জুনকে বসিয়ে গগনবিহারী বেরিয়ে গেলেন। ঘরে কোনও ছবি নেই। জলপাইগুড়ির বড়লোকদের বাড়িতে এমনটা দেখা যায় না।

"আমার স্ত্রী, আরতি, একটু আগে এঁর কথা বলছিলাম অর্জুন।"

অর্জুন নমস্কার করল। ভদ্রমহিলা হাতজোড় করলেন। বললেন, "বসুন। কী খাবেন, চা, না কফি ? আপনাদের এই শহরে ভাল কোল্ড ড্রিঙ্কস পাওয়া যায় না।"

"চা।" অর্জুন বলতেই মহিলা বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবত হুকুম করতে। কিন্তু অর্জুন বিস্মিত ! জলপাইগুড়ি শহরের কোনও মহিলা এই সাতসকালে এত সেজেগুজে বাড়িতে বসে থাকেন বলে সে জানে না। ভদ্রমহিলা কি একাই কোথাও বের হচ্ছেন ? চল্লিশের ওপর বয়স। কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনি সাধারণ বাঙালি মহিলাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছেন।

গগনবিহারী সোফায় বসে বললেন, "মুশকিল হল বাবার শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকে সব কথা মনে থাকে না। বয়সও অনেক হল।"

আরতি দেবী ফিরে এলেন। সোফায় বসে বললেন, "কীরকম টাকা পাওয়া যাবে ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কোন টাকার কথা বলছেন ?"

"ওই যে, ও বলল বাংলাদেশে নাকি এখনও সম্পত্তির শেয়ার আছে !" কথাগুলো বলতে-বলতে আরতি দেবী স্বামীর দিকে তাকালেন।

অর্জুন বলল, "আমি সে কথা একবারও বলিনি। সেখানে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় আপনাদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। কী হবে তা আমার জানা নেই।"

আরতী দেবী কাঁধ নাচালেন, "তাই বলুন। আমাকে এমনভাবে বলা হল !"

গগনবিহারী বললেন, "শেয়ার না দিলে কেন খোঁজ-খবর করবে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে একবার ঢাকায় গেলে হত !"

আরতি দেবী মাথা নাড়লেন, "কক্ষনো না।"

"না, মানে বেড়াতেও তো যাওয়া যেতে পারে।"

আরতি দেবী বললেন, "আমার বোনেরা ইউরোপ-আমেরিকায় বেড়াতে যায়। আমি কোথাও যেতে পারি না সেটা এক জিনিস, কিন্তু বিদেশ বলতে ঢাকায় যাচ্ছি তা আমি কাউকে বলতে পারব না। বলুন তো, ঢাকা কি একটা বেড়াতে যাওয়ার জায়গা হল ?"

অর্জুন বলল, "আমি শুনেছি ঢাকা খুব আধুনিক শহর।"

চা এল। সেটা খেয়ে অর্জুন উঠে পড়ল। ভদ্রমহিলা বারংবার অনুরোধ করলেন ও-বাড়িতে যাওয়ার জন্য। বিয়ের পর জলপাইগুড়িতে এসে ভাল করে কথা বলার মানুষ পাননি তিনি। অর্জুন যখন বিলেত-আমেরিকায় গিয়েছে, তখন সেসব গল্প শোনা যেতে পারে।

গগনবাবু গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। অর্জুন বাইক চালু করার সময় দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। বাড়ির সবাই তার সঙ্গে আলাপ করেছে! শুধু টুকু নামের মেয়েটি এড়িয়ে গেল! ওকে দেখে খুব লাজুক বলে মনে হয় না।

ব্যাপারটা নিয়ে অর্জুন মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছিল। ওর ক্রমশ বিশ্বাস হচ্ছিল, পুরো ব্যাপারটাই বিজনবিহারীবাবুর বানানো গল্প। সময় কাটাতে এমন একটা কাণ্ড তিনি করেছেন। যদিও তারপরেও ক'দিন হঠাৎ-হঠাৎ টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন কোনও হদিস পাওয়া গেল কি না, কিন্তু অর্জুন উৎসাহিত হয়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও ভাবতে হল।

॥ তিন ॥

জলপাইগুড়ির সদর থানার দারোগা অবনীবাবুর সঙ্গে গল্প করা অর্জুনের এখন অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশের কিছু লোক এখনও বইপত্র পড়েন। অবনীবাবু তাঁদের একজন। কিন্তু তিনি প্রায়ই অর্জুনকে বলেন, "দুর মশাই, আপনি নিজেকে নষ্ট করছেন। এই শহরে না থেকে কলকাতায় চলে যান। টাকা হবে, নামও হবে।"

অর্জুন কখনওই জবাব দেয় না। মিটিমিটি হাসে।

আজ সন্ধেবেলায় চায়ের কাপে আড্ডা জমেছিল। অবনীবাবু বললেন, "আজ একটা দারুণ দিন। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনও ক্রাইম হয়নি এ-শহরে।"

অর্জুন বলল, "এখন ছ'টা বেজে পঁয়তাল্লিশ। রাত বারোটা পর্যন্ত তারিখ বদলাবে না।"

"জানি। কিন্তু আমার মন বলছে তেমন কিছু হবে না আজ।" অবনীবাবু চোখ বন্ধ করলেন। এই সময় একটি ছেলে দরজায় এসে দাঁড়াল, "আসতে পারি?"

চোখ খুললেন অবনীবাবু, "অবশ্যই।"

ছেলেটি ঘরে ঢুকল। জিন্‌সের ওপর হলুদ টি-শার্ট। মাথার চুল প্রায় কাঁধ পর্যন্ত স্টাইল করে রাখা। ছেলেটি বলল, "আমার নাম কাজল মুখার্জি। কদমতলায় আমাদের একটা দোকান আছে। এর আগে আপনার সঙ্গে

কয়েকবার কথা হয়েছিল।" ছেলেটির মুখভর্তি সাজানো দাড়ি।

"আপনি একটা ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে জড়িত?" অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ। আমি কিছুদিন আগে পাশপোর্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। ওরা বলছে পুলিশের রিপোর্ট পেলেই পাশপোর্ট ইসু করবে। রিপোর্টটা যদি দয়া করে পাঠান।" ছেলেটি চেষ্টা করছিল ভদ্র গলায় কথা বলতে। বলার সময় দাড়িতে হাত বোলাচ্ছিল।

"আমার এখানে কোনও কাজ পেন্ডিং থাকে না কাজলবাবু। তবু আপনি যখন বলছেন তখন একটু অপেক্ষা করুন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।" বেল বাজিয়ে সেপাইকে ডেকে অবনীবাবু হুকুম দিলেন পাশপোর্ট-সংক্রান্ত এনক্যুয়ারির ফাইল আনতে।

অর্জুন লক্ষ করছিল কাজল মুখার্জিকে। নামটা তার খুব চেনা-চেনা লাগছিল। সে ফট করে জিজ্ঞেস করল, "কদমতলায় আপনাদের কিসের দোকান?"

কাজল জবাব দিল, "সাইকেল রিপেয়ারিংয়ের।"

এবং তখনই মনে পড়ল তার। বিজনবিহারীবাবু তা হলে এরই কথা বলেছিলেন। বিজনবিহারীর নাতনি টুকুকে বিয়ে করতে চায় এই ছেলেটি।

ইতিমধ্যে ফাইল এসে গেল। অবনীবাবু বিশেষ রিপোর্টটি খুঁটিয়ে দেখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "কিন্তু কাজলবাবু, আপনি দরখাস্তে লিখেছেন স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন, কিন্তু লেখেননি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেওয়ার সময় নকল করার অভিযোগে আপনাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। তাই না?"

কাজল দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "ফর্মে লেখা আছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কী? আমার যা, তাই লিখেছি। বাড়তি কিছু লিখিনি।"

"হুম্।" অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, "সাব ইনস্পেক্টর লিখছেন আপনি এর আগে দুটো মারামারিতে জড়িয়ে ছিলেন। তার একটাতে মার্ডার পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আপনাকে ধরা হয়নি।"

"একদম বাজে কথা। একটা ফুটবল-সংক্রান্ত ব্যাপার এবং আমি তখন শহরে ছিলাম না। দ্বিতীয়টা ইলেকশনের সময়। আমার কোনও ভূমিকা ছিল না।" কাজল বলল।

"আপনি পাশপোর্টের জন্য চেষ্টা করছেন কেন?"

"প্রথম কথা, যে-কোনও নাগরিকের একটা পাশপোর্ট থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, আমি কয়েকদিনের জন্য বাংলাদেশে যেতে চাই।"

"বাংলাদেশে কেন?" অবনীবাবু ফাইলে কিছু লিখছিলেন, "সেখানে কি আপনার কোনও আত্মীয় আছেন? বাংলাদেশের কোথায় যাবেন?"

"ঢাকা এবং কালীগঞ্জে। ওখানে যাব বেড়াতে। আমার কোনও আত্মীয় ওখানে নেই। আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোক।" কাজল বলল।

অবনীবাবু বললেন, "আপনার কপাল খুব ভাল।"

কাজল বলল, "আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

অবনীবাবু হাসলেন, "আজ আমি কারও পেছনে শুধুই সন্দেহের বশে লাগব না। আই ওয়ান্ট টু কিপ দি ডে ক্লিন। তবে দেখবেন এরপর যেন কোনও ঝামেলায় না জড়ান।"

কাজল ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল। চুপচাপ বসে এঁদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল অর্জুন। এবার বলল, "অবনীবাবু, আপনার এলাকায় আজ কোনও অপরাধ হবে কিনা জানি না, তবে আমি কাজ পেয়ে গেলাম।"

অবনীবাবু বললেন, "তার মানে?"

"আমি একটা টেলিফোন করতে পারি?"

"অবশ্যই।"

এখন জলপাইগুড়িতে অপারেটারের মাধ্যমে কানেকশন চাইতে হয় না। একবারেই অর্জুন লাইন পেয়ে গেল। বিজনবিহারীবাবু রিসিভার তুলে বললেন, "কে বলছেন?"

"আমি অর্জুন।"

"হ্যাঁ। কিছু জানতে পারলে?"

"শুনুন। আমি আপনার কেসটা নেব বলে এখন ঠিক করলাম।"

"তার মানে? তুমি আমার ব্যাপারটা এতদিন ভাবনি?"

"না। কিন্তু এখন থেকে ভাবতে হবে।"

"আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"খুবই সরল ব্যাপার। আমি কেসটা নিচ্ছি। আপনি সমস্ত খরচ দেবেন তো?"

"দ্যাখো ভাই, কে চুরি করেছে তা যদি ধরতে পারো তার জন্য যা পাবে তা নিশ্চয়ই ওসব জিনিস ওখান থেকে তুলে আমার কাছে নিয়ে এলে যা দেওয়া উচিত তার সমান হবে না। তুমি বুঝতেই পারছ।"

"আপনি কালই ভবাকে দিয়ে হাজার চারেক টাকা পাঠিয়ে দিন।"

"হাজার চারেক। সে কী!"

"এই টাকার হিসেব আপনাকে দেব।"

"এত টাকা!" বিজনবিহারীবাবু বিড়বিড় করলেন।

"আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পকেটের টাকা খরচ করে তদন্ত করতে বলবেন না।"

"তা তো নয়।" বিজনবিহারীবাবু বললেন, "বেশ। ভবা কাল যাবে।"

রিসিভার নামিয়ে রাখল অর্জুন। অবনীবাবু হতভম্ব। জিজ্ঞেস করলেন,

"কী ব্যাপার বলুন তো ? কাকে ফোন করলেন ?"

"বিজনবিহারী ঘোষ। এক্স টি-প্ল্যান্টার।"

"আচ্ছা। হঠাৎ কী কারণে তাঁর কেস নিলেন ? মনে হচ্ছে আগে রাজি হননি।" অবনীবাবু কৌতূহলে ফেটে পড়ছিলেন।

"আগে ভেবেছিলাম কোনও রহস্য নেই। এখন মনে হচ্ছে আছে।"

"এই কাজল মুখার্জিকে দেখার পর মনে হচ্ছে রহস্য আছে ?"

"এখন পর্যন্ত কোনও ক্রাইম হয়নি। কেন আর প্রশ্ন করছেন ?" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

অবনীবাবু বললেন, "আপনার রিঅ্যাকশন ইন্টারেস্টিং।"

অর্জুন বলল, "আমি যেটা সন্দেহ করছি সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে একটা ক্রাইমের সূত্রপাত হচ্ছে। একটু দেখা যাক, তারপর আপনাকে বলব।"

অমল সোম বলতেন, হঠাৎ কোনও সূত্র পেয়ে সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পোড়ো না। নানাভাবে সেটাকে বিশ্লেষণ করো, সুযোগ থাকলে অপেক্ষা করো। অর্জুন তাই করবে বলে ঠিক করল।

কাজলকে থানায় ভাল করে দেখে তার পছন্দ হয়নি। ছেলেটার মধ্যে অদ্ভুত একটা শীতলতা আছে যা অর্জুনকে বিচলিত করছিল। সে সময় পেলেই বাইক নিয়ে কদমতলায় যায়। কাজলের সাইকেল কারখানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি। সকাল-বিকেলে সেখানে যে-ধরনের চেহারার ছেলেরা কাজলের সঙ্গে আড্ডা মারে, তাদের কোনও ভবিষ্যৎ ভাবনা নেই তা দেখেই বোঝা যায়। পোশাক দামি এবং যথেষ্ট উদ্ধত, সিনেমার আর্টিস্টের নকল করা চুল, হাতে বালা। এদের মধ্যে কাজল খুব স্বাভাবিক। অর্জুন ইচ্ছে করেই কাজলের দোকানে ঢোকেনি। সে ল্যাংড়া-পাঁচুকে ধরল। লোকটা এককালে এই শহরের বিখ্যাত তালা-খুলিয়ে ছিল। টাকা নিয়ে চোর-ডাকাতদের এ-ব্যাপারে সাহায্য করত সে। অর্জুন তাকে একটা সময় বাঁচিয়ে দিয়েছিল। ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল আর ওইসব কাজ করবে না। এখন পর্যন্ত কথা রেখে চলেছে ল্যাংড়া-পাঁচু। কদমতলায় লটারির টিকিট বিক্রি করে সে।

কাজলের নাম শুনে পাঁচু একটু চুপসে গেল, "কাজলদা হেভি মাস্তান।"

"তাতে কী হল ?"

"যদি জানতে পারে আমি টিকটিকি হয়েছি, তা হলে মেরে হাড় ভেঙে দেবে।"

"যতক্ষণ তুমি অন্যায় না করছ ততক্ষণ তোমার কোনও ভয় নেই।"

"অবশ্য আপনার জন্য আমি সব করতে পারি।"

"সব করতে হবে না। শুধু লক্ষ রাখবে ও রোজ দোকানে আসে কি না। ব্যবসার বাইরে কারা-কারা ওর দোকানে আসে। ও কোথাও যাচ্ছে কিনা।"

অর্জুন বুঝিয়ে বলল।

বিজনবিহারী টাকাটা ভবাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই তাঁর তাগাদা শুরু হয়ে গেছে। দিনে অন্তত একবার টেলিফোন করে প্রোগ্রেস রিপোর্ট চান। অর্জুন শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি আপনার নাতনিকে কতখানি বিশ্বাস করেন?"

"নাতনি? সে এর মধ্যে আসছে কোত্থেকে?" বিরক্ত হলেন বিজনবিহারী।

"ওই বাড়িতে থাকে বলেই বলছি।"

"পৃথিবীতে যদি কাউকে বিশ্বাস করি, তবে সে টুকু। ওর সব কথা আমাকে বলে। মেয়েটা ওর মা-বাবার ধরন পায়নি বলে রক্ষে।"

কথা বাড়ায়নি অর্জুন। কাজলের ঢাকায় যাওয়াটা কাকতালীয় হতে পারে, কিন্তু সে থানায় গিয়ে অবনীবাবুকে পাশপোর্টের জন্য তদ্বিরের সময় কালীগঞ্জের নাম উল্লেখ করেছিল। কোনও আত্মীয়স্বজন যে-দেশে নেই, সেখানে বেড়াতে গেলে কালীগঞ্জের কথা আগে মাথায় আসতেই পারে না। যে ছেলে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরে কাটায়, সে হঠাৎ উদ্যোগী হয়ে একা বাংলাদেশে বেড়াতে যাবে, এমনটা ভাবাও যায় না। কোনও বিশেষ মতলব ছাড়া ও ওদেশে যাচ্ছে না। আর এই মতলবটা ওকে জুগিয়েছে টুকু। অর্জুনের মনে হচ্ছিল টুকুই বিজনবিহারীবাবুর ব্যাগ থেকে খামটা সরিয়েছে। চিঠি পড়ার পর সে বুঝতে পেরেছে ওর গুরুত্ব। তারপর কাজলকে ব্যাপারটা বলেছে। কাজল ধান্দাবাজ ছেলে। সঙ্গে-সঙ্গে কাজে নেমে পড়েছে। গোয়ালন্দে পৌঁছতে গেলে পাশপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন হয় বলে অপেক্ষা করছে এখন।

দিন-পাঁচেক বাদে এক বিকেলে ল্যাংড়া-পাঁচু এসে হাজির, "কাজলদা নেই।"

"নেই মানে?" অর্জুন এইটেই আশা করছিল।

"গতকাল পিওন একটা রেজিস্ট্রি চিঠি নিয়ে এসেছিল। সেটা পেয়ে খুব খেপে গিয়েছিল কাজলদা। পুলিশকে গালাগাল করছিল। আমি পিওনকে পরে আলাদা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম কী চিঠি এসেছে। পিওন বলল, পাশপোর্ট অফিস থেকে এসেছে।"

অর্জুন খুব নিরাশ হল, "তার মানে পাশপোর্ট পায়নি?"

"না।"

"তা হলে গেল কোথায়?"

"তা তো বলতে পারব না। আজ বাড়ি থেকেই দোকানে আসেনি। এখানে আসার আগে আমি একবার ওর দোকানের কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, দাদা বেড়াতে গেছে বাইরে।"

"হুম্। আর কোনও খবর আছে?"

"না। ও হ্যাঁ। আজ দুপুরে একটি অল্পবয়সী মেয়ে দোকানে এসেছিল রিকশায় চেপে।"

"কীরকম দেখতে ?"

"খুব সুন্দরী। কর্মচারী হয়তো একই কথা বলেছে। শোনার পর দেখলাম মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠে পড়ল।"

"এই মেয়েটিকে তুমি আগে দেখেছ ?"

"না। লক্ষ করিনি।"

"গতকাল কাজল দোকান থেকে কখন বেরিয়েছিল ?"

"সন্ধের একটু আগে। ওর বন্ধুরা এসে ওকে পায়নি। আমাদের হরির রিকশায় চলে গিয়েছিল। দোকান বন্ধ করার সময়ও ফেরেনি।"

"হরিকে কোথায় পাওয়া যাবে ?"

"কদমতলার স্ট্যান্ডে।"

অর্জুন দশটা টাকা ল্যাংড়া-পাঁচুকে দিতে গেল, কিন্তু সে জিভ বের করে সরে দাঁড়াল, "ছি ছি ছি। এত সামান্য কাজের জন্য পয়সা নেব, তা হয় না।"

অর্জুন থানায় টেলিফোন করল। অবনীবাবু ছিলেন।

"কাজল মুখার্জিকে পাশপোর্ট পেতে দিলেন না শেষপর্যন্ত ?"

"ও, খবর পেয়ে গেছেন ? আমি না দেওয়ার কে ? পাশপোর্ট অফিসকে যা সত্যি তাই জানিয়ে দিয়েছিলাম। ওঁরা যদি না ইসু করেন, তা হলে— "

"আপনি ওকে বলেছিলেন ওর পাশপোর্ট যাতে হয় সেইভাবে রিপোর্ট দেবেন।"

"ভেবেছিলাম। কিন্তু ওকে দেখার পর আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেখে বুঝলাম যা সত্যি তাই বিশদে লেখা ভাল।"

অর্জুন টেলিফোন রেখে দিল। পাশপোর্ট না পেলে কাজল বাংলাদেশে যেতে পারছে না। তা হলে গেল কোথায় ? সে সন্ধের পর কদমতলায় এসে হরিকে ধরল। অল্পবয়সী ছেলে। অর্জুনকে চিনতে পারল। বলল, "পাঁচুদা আপনার কথা আমাকে বলেছে বাবু। কিন্তু আমি কখনও কোনও অন্যায় করিনি।"

"তুমি অন্যায় করেছ কে বলল ?"

"পাঁচুদা বলেছিল আপনার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আছে।"

"তা একটু আছে। তবে তোমার কাছে এসেছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তোমার সাহায্য চাই আমি।"

"বলুন বাবু।"

অর্জুন দেখল আশেপাশে দাঁড়ানো রিকশাওয়ালারা কানখাড়া করে তাদের কথাবার্তা শুনছে নেহাতই কৌতূহলী হয়ে। সে বলল, "চলো, তোমার রিকশায় ওঠা যাক।"

অর্জুন সিটে বসতেই হরি কয়েক পা প্যাডেল করে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে বাবু ?"

"পাঁচু কিছু বলেনি ও-ব্যাপারে ?"

"না।"

"গতকাল সন্ধের সময় তুমি সাইকেল-কারখানার কাজলকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে ?"

হরি আবার দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পেছনে রিকশাওয়ালা, সাইকেল-বেল বাজাচ্ছে। সে রাস্তার একপাশে সরে এসে বলল, "কাজলবাবু কোনও অন্যায় করেছে, না ?"

অর্জুন হাসল, "আরে, সে অন্যায় করতে যাবে কেন ?"

"কাজলবাবু এমনিতেই ...। তার ওপর যার কাছে গিয়েছিল সেই লোকটা সুবিধের নয়। আপনি তার কাছে একা যাবেন না। ধান্দা ছাড়া কেউ ওর কাছে যায় না।"

"আমি একা নই। তুমি লোকটার কাছে নিয়ে চলো। কোন পাড়ায় থাকে ?"

"সেনপাড়ায়।" বলে হরি রিকশা চালাতে লাগল।

ছেলেটা একটু বেশি কথা বলে কিন্তু অনেক খবর রাখে বলে মনে হল অর্জুনের।

"লোকটার নাম জানো ?" চলন্ত রিকশায় বসে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"কাজলবাবু ওকে দাসবাবু বলে ডেকেছিল।" রিকশাওয়ালা জবাব দিল।

"তুমি কি কাজলকে ওখানে নামিয়ে দিয়েই চলে এসেছিলে ?"

"না। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়ার পর আমাকে দাঁড়াতে বলে কাজলবাবু ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। কী কথা হল জানি না। সেই সময় আরও দু'জন লোক ভটভটি নিয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গুণ্ডা ধরনের লোক। এখানে কখনও দেখিনি।"

"তারপর ?"

"আধঘণ্টা পরে কাজলবাবু হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন দাসবাবুর সঙ্গে। তিনি বললেন, আপনি এই শহরের ছেলে। পুরো ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। তবে টাকাটা—। সঙ্গে-সঙ্গে কাজলবাবু বললেন, রাত্রে যখন আসব পুরো টাকাটাই পাবেন। আমি কাজলবাবুকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে এসেছিলাম।" রিকশা তখন করলা নদীর ব্রিজে।

"এতে তোমার কি করে মনে হল লোকটা সুবিধের নয় ?"

"বাবু, দেখলেই বোঝা যায়।"

"ঠিক আছে। তুমি আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে।"

সেনপাড়ার একেবারে ভেতরে যে বাড়িটার সামনে রিকশা থামাল হরি,

সেটার চেহারা নিতান্তই মধ্যবিত্ত। রাস্তায় আলো জ্বলছে না। অর্জুন বলল, "একটু লক্ষ করা যাক।"

হরি বলল, "আজও ভটভটি ওখানে আছে বাবু।"

মিনিট তিনেকের মধ্যে দৃশ্যের হেরফের না হওয়াতে অর্জুন নামল। বাড়ির সামনে কোনও গেট বা বেড়া নেই। মোটর বাইক রয়েছে দরজার গায়ে। সে ডাকল, "দাসবাবু, দাসবাবু।"

একটু বাদে দরজা খুলে গেল। সিল্কের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা এক প্রৌঢ় দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি দাসবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"একটু কথা আছে।"

"দাঁড়ান।" ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন, "তা হলে তুমি চলে যাও। ওদের বলো যা কথা ছিল তাই দেওয়া হচ্ছে। এরপর এরকম হলে আমরা অর্ডার বদলাব।"

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ামাত্র একটি চামড়ার জ্যাকেট পরা লোক মাথা নেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইকে উঠল। সে স্টার্ট নিয়ে চলে যাওয়ার পর দাসবাবু বললেন, "আসুন।"

বাইরের ঘরটি অতি সাধারণ। চারটে বেতের চেয়ার এবং টেবিল, যা জলপাইগুড়ির ফুটপাথে বিক্রি হয় শস্তায়, তাই পাতা। তারই একটাতে বসল অর্জুন। সামনে দাসবাবু।

দাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, কী করতে পারি?"

অর্জুন বুঝতে পারছিল না সে ভুল করছে কি না! তার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। শুধুই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সাহসী হওয়া। সে খুব সিরিয়াস গলায় বলল, "বাংলাদেশে যেতে চাই।"

"যান না। আমি কী করতে পারি?"

"আমার পাশপোর্ট নেই। ভিসা পাব না। এত তাড়াতাড়ি পাশপোর্ট পাব না।"

"আমার কথা আপনাকে কে বলল?"

"আমার এক বন্ধু কাজল।"

"কাজলবাবু আপনার বন্ধু?"

"হ্যাঁ। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম।" অর্জুন বলল, "ওরও বাংলাদেশে যাওয়ার কথা। আজ সকাল থেকে ব্যাটার দেখা পাচ্ছি না।"

"আপনি কোন পাড়ায় থাকেন?"

"কদমতলায়।'

"কী করেন?"

"একদম বেকার। সেইজন্য ওখানে যেতে চাই। যদি কিছু হয়।"
"আত্মীয়স্বজন আছে ?"
"তা আছে।"
"কালীগঞ্জে ?"
"কালীগঞ্জ মানে ?"
"বাংলাদেশের একটা গ্রাম। কাজলবাবুর আত্মীয় থাকেন সেখানে। দেখুন মশাই, আমি আপনাকে চিনি না। এখনই কোনও কথা বলব না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এভাবে বর্ডার পেরিয়ে যাওয়া বেআইনি। জেল হতে পারে ধরা পড়লে। ওখানেও পুলিশ জেরা করলে বিপদে পড়বেন।"
"আমি খরচ করতে রাজি আছি।"
"দেখুন, আমি এত খুচরো কাজ করি না। তার জন্য অন্য লোক আছে।"
"কাজল বলেছিল আপনি সব দায়িত্ব নেবেন।"
"কাজলের রেফারেন্স আলাদা। আপনি কাল আসবেন। এই সময়। কী নাম যেন ?"
"অর্জুন।" সে উঠে দাঁড়াল। নমস্কার করল।
দাসবাবু বললেন, "কদমতলায় নিশ্চয়ই অনেকে আপনাকে চিনবে ? আসলে আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। দিনকাল খারাপ।"
"কত টাকা লাগবে ঢাকায় পৌঁছতে ?"
"বললাম তো, আগামীকাল কথা হবে।"
অর্জুন মাথা নেড়ে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠে চাপা গলায় বলল, "থানায় চলো।"

হাসিমুখে অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "রাগ কমেছে ?"
অর্জুন সেটা এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কোনও আইডিয়া আছে, মাঝরাত্রে জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়ে বর্ডার পেরিয়ে গোয়ালন্দে পৌঁছাতে কীরকম সময় লাগে ?"
"অ্যাঁ ! না। কে যাবে ?"
"গিয়েছে। যাকে আপনি পাশপোর্ট নিতে দেননি, সে চলে গেছে।"
অবনীবাবু বললেন, "সে কী ! উইদাউট পাশপোর্ট ?"
"হ্যাঁ।"
"এটা তো ক্রাইম !"
"ধরতে পারলে।"
"আপনি জানলেন কী করে ?"
"যে লোকটি টাকা নিয়ে বর্ডার পারাপার করায়, তাকে মিট করে এলাম।"
"এই শহরে ?" চোয়াল শক্ত হল অবনীবাবুর।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এটা তার খুচরো ব্যাপার, অন্য কিছু আছে, যা মনে হয় সলিড।"

"নামটা বলুন।"

"প্রমাণ ছাড়া ধরে কোনও লাভ নেই।" অর্জুন বলল, "সেনপাড়ায় দাসবাবু নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক থাকেন। বাড়ির সামনে সন্ধেবেলায় মোটরবাইক পার্ক করা থাকে। নজর রাখুন। সেইরকম সময়ে বাইকে যারা আসে তাদের সমেত ধরুন।" অর্জুন উঠল।

"উঠছেন কোথায় ?"

"হাতে সময় নেই। গোছগাছ করতে হবে। একটা টেলিফোন করতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই।"

অর্জুন ডায়াল করল। বিজনবিহারীবাবু ধরলেন।

"অর্জুন বলছি। আমি কলকাতায় যাচ্ছি। ওখান থেকে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ। ফিরে এসে দেখা করব।"

"যাক। এতদিনে ...। কিন্তু চিঠিটা ?"

"আপনার ঠাকুর্দার চিঠি যার কাছে আছে, সে এখন বাংলাদেশের পথে।"

"তার মানে ? কে সে ?" বিজনবিহারী উত্তেজিত।

অর্জুন জবাব না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

॥ চার ॥

ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছিল দ্রুত। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় এসে বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে ভিসার জন্য আবেদন করা, টাকা দিয়ে বৈধভাবে ডলার কেনা, প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করা—এইসব ঝামেলা খুব অল্পের ওপর দিয়ে গেল অবনীবাবুর জন্য। তাঁর এক বন্ধু কলকাতার লিন্ডসে স্ট্রিটে ট্র্যাভেল এজেন্সি চালান। সকালবেলায় ট্রেন থেকে নেমেই হোটেলে জিনিসপত্র রেখে পরিষ্কার হয়ে অফিস খোলার সময়েই অর্জুন চলে এসেছিল ভদ্রলোকের কাছে। পরিচয় দিয়ে সব বলতেই তিনি অভয় দিলেন, "কোনও চিন্তা নেই। আজ রাতেই আপনি ঢাকা পৌঁছে যাবেন বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী হিসেবে।"

"রাত্রে ?" অজানা জায়গায় রাত্রে পৌঁছতে পছন্দ করল না অর্জুন।

"তার আগের ফ্লাইট দুপুরে। তখন সব ফর্মালিটিস শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। অবশ্য সন্ধেবেলায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সের একটা ফ্লাইট আছে। আচ্ছা দেখছি, কী করা যায় !"

পাশপোর্ট, টাকা-পয়সা ভদ্রলোকের হাতে জমা করে দিয়ে অর্জুন বেরিয়ে এসেছিল। একটা গোটা দিন তার হাতে পড়ে আছে এবং কোনও কাজ নেই।

কলকাতায় অর্জুন অনেকদিন পরে এল। পাতাল রেলে চড়ে মনে হল, এই শহরের মানুষের দুটো চরিত্র। মাটির ওপর যারা হেঁটে বেড়াচ্ছে, মাটির নীচে এসে তারা কীরকম পালটে যায়। কেউ পাতালে নেমে সিগারেট খাচ্ছে না, ময়লা ফেলছে না। সুশৃঙ্খলভাবে যাওয়া-আসা করছে। অথচ ওপরে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। এমন কী করে হয় ?

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সে আবার লিণ্ডসে স্ট্রিটের অফিসে ফিরে এল। অবনীবাবুর বন্ধু তখন কাজে বেরিয়েছেন। ভিজিটার্স রুমে আরও কয়েকজন অপেক্ষা করছেন। সোফায় বসে একটা পত্রিকা তুলে নিল অর্জুন। ঢাকা এখন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজধানী। ভারতীয় হিসেবে সে সেখানে বিদেশি বলে গণ্য হবে। অথচ সেখানকার মানুষেরা বাংলাভাষায় কথা বলেন, রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের জাতীয় সঙ্গীত। একজন গুজরাতি অথবা পঞ্জাবির পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব নয়।

"দেশলাই আছে ?"

প্রশ্নটা কানে আসামাত্র অর্জুন তাকাল। মোটাসোটা এক ভদ্রলোক তাকেই প্রশ্ন করছেন। উনি বসে আছেন পাশের সোফায়। ভদ্রলোকের বয়স অন্তত পঞ্চাশ হবে। তার ডবল বয়সী একটি মানুষের হাতে দেশলাই তুলে দিতে সঙ্কোচ হল অর্জুনের। সে নীরবে মাথা নাড়ল, না।

"ও। স্মোক করেন না বুঝি ! গুড। আমি তো লাস্ট থার্টি ইয়ার্স ধরে ভাবছি ধূমপান কবব না, কিন্তু পারছি না। আজকাল ইচ্ছে করেই পকেটে দেশলাই রাখি না, যাতে কম খাওয়া হয়।"

"সিগারেটই বা রাখেন কেন ?"

"না রেখে পারি না। কীরকম খালি-খালি লাগে। এমনকী রোজার সময় হোল ডে যখন পানিও খাই না তখন সিগারেটের কথাও ভুলে যাই। কিন্তু সন্ধেবেলায় ইফতার করার পরই সিগারেট ধরাই।" ভদ্রলোক ম্লান হাসলেন। অর্জুনের মনে হল লোকটা জটিল নয়। জটিল মানুষেরা সাধারণত এত কথা বলেন না। পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বিদেশে যাচ্ছেন ?"

"বিদেশ ? হ্যাঁ ভাই, খাতায়-কলমে আপনার বিদেশ, কিন্তু আমার স্বদেশ। আমি আজ ঢাকায় যাচ্ছি।"

লোকটির সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ জন্মাল অর্জুনের। সে বাংলাদেশে এর আগে কখনও যায়নি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে এবার সে যদিও টুরিস্ট হিসেবে যাচ্ছে, কিন্তু তার লক্ষ অন্য। ভদ্রলোকের নাম মোহম্মদ ইউসুফ। ব্যবসা করেন। সেইসব কাজেই মাঝে-মাঝে ওঁকে কলকাতায় আসতে হয়। এখানকার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ওঁর আত্মীয়স্বজন আছেন। ঢাকা এবং কলকাতা ওঁর কাছে প্রায় একই। আলাপ করতে-করতে ইউসুফ বললেন,

"কলকাতায় এলে একটা ব্যাপার দেখে খুব খারাপ লাগে ভাই। আপনারা তো বাঙালি, অথচ বাংলা ভাষার জন্য আপনাদের একটুও মায়া-মমতা নেই। আপনারা যেন ঠিক বাঙালি হিসেবে নিজেদের চরিত্র ঠিক রাখতে পারছেন না। আমরা বাংলাদেশের বাঙালিরা যত কষ্টেই থাকি না কেন, ভাষার ব্যাপারে সবাই এক, অভিন্ন।"

ইউসুফভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে চমৎকার সময় কেটে যাওয়া ছাড়াও অনেকরকম তথ্য জানতে পারল অর্জুন, ঢাকা সম্পর্কে। কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি শহরের যে দূরত্ব, ঢাকা তার অনেক কাছে। কিন্তু ঢাকা কলকাতার থেকেও আধুনিক এবং পূর্ণ বাঙালি শহর।

ভিসা, টিকিট এবং ডলার পাওয়া গেল ঠিক সময়ে। ইউসুফ ভাই টিকিট কেটেছিলেন ঢাকা থেকেই, আসার সময়। এই অফিসে অন্য প্রয়োজনে এসেছিলেন। কথা হল, এয়ারপোর্টে তিনি অর্জুনের সঙ্গে দেখা করবেন।

বিদেশে যাওয়ার সময় একটা আলাদা ধরনের উত্তেজনা থাকে। আন্তর্জাতিক বিমানের নিয়ম অনুযায়ী ঠিক দু' ঘণ্টা আগে যখন অর্জুন দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছাল তখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সের টিকিট পাওয়া যায়নি, অনেক চেষ্টায় বাংলাদেশ বিমানে একটা ব্যবস্থা হয়েছে।

ইউসুফভাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। নির্দিষ্ট নিয়মগুলো পর-পর করে যেতে তিনিই সাহায্য করলেন। তারপর ইমিগ্রেশন এবং কাস্টম্‌সের বেড়া ডিঙিয়ে ওরা এসে বসল লাউঞ্জে। সেখানে তখন অনেক যাত্রীই এসে গিয়েছেন। বিদেশে যাওয়ার অন্যান্য ফ্লাইটের ঘোষণা চলছে। অর্জুনের মনে হল পৃথিবীটা খুবই ছোট। মানুষ ইচ্ছে করলেই এবং টিকিট কাটার সামর্থ্য থাকলে যে-কোনও দেশে মুহূর্তেই চলে যেতে পারে।

এই সময় একজন ভদ্রমহিলা লাউঞ্জে এলেন। তিনি যে খুবই সুন্দরী, সে-ব্যাপারে তাঁর সচেতন মনোভাব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সঙ্গে একজন বিশালদেহী পুরুষ, গায়ের রং বেশ কালো। ইউসুফভাই বললেন, "ইনি বাংলাদেশের সিনেমার নায়িকা। খুব নাম করেছিলেন এককালে। এখন পড়তির দিকে। এঁর নাম মঞ্জুশ্রী রায়।"

অর্জুন অবাক হল, "আপনাদের ওখানে হিন্দুরা সিনেমায় নামে?"

"আশ্চর্য? কেন নামবে না? বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সবার সমান অধিকার আছে।"

অর্জুন মঞ্জুশ্রী দেবীকে দেখছিল। খানিকটা দূরেই বসে আছেন তিনি। শালোয়ার-কামিজ এবং বেগুনি রঙের ওড়নায় ওঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। বাংলাদেশি মানুষেরা এই লাউঞ্জে বসে তাঁর দিকে যে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন, সেটা বুঝে বেশ গম্ভীর হয়ে আছেন। অর্জুনের মনে হল প্রযোজক ভদ্রলোক বেশ চিন্তিত। ঘন-ঘন সিগারেট খাচ্ছেন। মানুষটির মুখ খুবই রুক্ষ, চোখ এবং

ঠোঁটের কোণে একধরনের নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি অজান্তেই ফুটে উঠেছে।

এই সময় টাকমাথা ফরসা বেঁটে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখেই প্রযোজক সোজা হয়ে বসলেন। বোধ হয় এঁর জন্যই তিনি গেটের দিকে মুখ করে এতক্ষণ বসে ছিলেন। টাকমাথা ভদ্রলোক চেয়ারের পাশে হাতব্যাগ নামিয়ে কোনওদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন কোনার দিকে, যেখানে দেওয়ালে পর-পর টেলিফোন ঝোলানো আছে। তাঁকে ডায়াল করতে দেখল অর্জুন। এবং তারপরেই সেই প্রযোজক উঠে গেলেন সেই দিকে। পাশের টেলিফোনটি তুলে নিয়ে তিনিও ডায়াল শুরু করলেন। ব্যাপারটায় খটকা লাগল। অর্জুন ইউসুফভাইকে বলল, "আমি একটু আসছি।" তারপর চলে এল তৃতীয় টেলিফোনটির সামনে। এসে বুঝল যাত্রীদের জন্যে বিনা পয়সায় কথা বলার ব্যবস্থা হয়েছে এই ফোনের মাধ্যমে। সে এলোমেলো নম্বর ঘোরাল, যদিও তার কান খাড়া ছিল। তার বাঁ দিকে প্রযোজক, যাঁর বাঁ দিকে টাকমাথা। প্রযোজক যেন টেলিফোনে কথা বলছেন এমন ভঙ্গি করে কানে রিসিভার লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এত দেরি হল ? ব্যাগেজ আইডেন্টিফাই করেছেন তো ?" অর্জুন শুনতে পেল টাকমাথা বলছেন, "সব ঠিক আছে।"

এই তিনটে শব্দ শোনামাত্র প্রযোজক যেন টেলিফোনে কথা বলা হয়ে গিয়েছে এমন ভঙ্গিতে রিসিভার নামিয়ে আবার সিনেমার নায়িকার কাছে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে টাকমাথা আবার ডায়াল করছিলেন। অর্জুন শুনতে পেল লোকটির চাপা হাসি, "একদম ভেতর থেকে বলছি। এইমাত্র সে দেরি কেন হল তা জিজ্ঞেস করে গেল। ক'দিন পরেই বাছাধন টের পাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" রিসিভার নামিয়ে রেখে হেলতে-দুলতে নিজের ব্যাগের কাছে গিয়ে বসল টাকমাথা। প্র·যাজকের সঙ্গে তার দূরত্ব এখন অনেকটা। অর্জুন আরও কয়েক সেকেন্ড টেলিফোনের পেছনে খরচ করল, যাতে কেউ তাকে সন্দেহ না করে। স্পষ্টতই একটা চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে সে। ওই টাকমাথা লোকটা একটি শয়তান। সে প্রযোজককে একরকম বোঝাচ্ছে আবার যাকে টেলিফোন করল তাকে আর-একরকম। কী ব্যাপারে এরা যুক্ত, সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন নিজেকে বোঝাল, পৃথিবীতে এরকম ঘটনা কতই না হচ্ছে, সব ব্যাপারে নাক গলানোর কী দরকার, যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাহায্যের জন্য তার কাছে আসছে। ইউসুফভাইয়ের পাশে এসে বসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পেলেন ?"

"পেলাম মানে ?" অর্জুন বুঝতে পারল না।

"টেলিফোনের লাইন তো বেশিরভাগ সময় পাওয়া যায় না।"

অর্জুন বাস্তবে ফিরে এল, "ও হ্যাঁ, তা ঠিক।"

এই সময় সিঙ্গাপুরগামী একটি প্লেনের যাত্রীদের জন্য কিছু ঘোষণা করা হল। ইউসুফভাই বললেন, "ভারী অদ্ভুত জায়গা এই সিঙ্গাপুর আর ব্যাঙ্কক।

ওসব জায়গা থেকে যারা আসে তাদের সম্পর্কে খুব সচেতন থাকে বাংলাদেশ এবং ভারতের কাস্টম্স অফিসাররা। স্মাগলাররা অবশ্য খুব স্মার্ট।"

"স্মাগলিং হয় ওখান থেকে ?"

"অত্যন্ত। বেকার ভাল যুবকদের সামান্য টাকার লোভ দেখিয়ে ওরা পাপচক্রে লাগিয়ে দিয়েছে। যাকগে, আপনি তো প্রথম ঢাকায় যাচ্ছেন, ওঠার জায়গা কি ঠিক আছে ?"

"না। কোনও হোটেলে উঠব।"

"হোটেল ?" ইউসুফভাই যেন আঁতকে উঠলেন, "আমি থাকতে আপনি হোটেলে উঠবেন মানে ? এ কীরকম কথা !"

অর্জুন হাসল, "আপনি আমাকে চেনেন না, জানেন না।"

"ছাড়েন।" হঠাৎ নিজস্ব শব্দ বেরিয়ে এল ইউসুফভাইয়ের মুখ থেকে, "আমি মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারি কে ভাল, কে মন্দ।"

অর্জুন কথা বাড়াল না। অচেনা মানুষকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আতিথ্য দেওয়ার চল পশ্চিমবাংলায় নেই, বাংলাদেশে হয়তো আছে। কিন্তু সে পরে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে কোনও হোটেলে চলে যাবে। খানিক বাদেই ঢাকাগামী যাত্রীদের বিমানের দিকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। সবাই হুড়মুড়িয়ে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্জুন উঠে দাঁড়ালে ইউসুফভাই বললেন, "ভিড় একটু হালকা হোক। আমাদের ফেলে রেখে তো বিমান যাবে না।"

অর্জুন দেখল টাকমাথা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন। প্রযোজক এবং অভিনেত্রী সম্ভবত ইউসুফভাইয়ের মতোই অপেক্ষায় বিশ্বাসী। শেষপর্যন্ত প্রায় সব যাত্রী চলে গেলে অর্জুনরা এগোল। প্যাসেজ দিয়ে নেমে এসে প্লেনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির দেখা পেল ওরা। সেখানে আগে আসা কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। ইউসুফভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে উঠতেই অর্জুন টাকমাথাকে দেখতে পেল। হঠাৎ ইউসুফভাই বলে উঠলেন, "আরে মিস্টার ঘোষ, কবে এসেছিলেন কলকাতায় ?"

টাকমাথা তাকালেন। তারপর হাসার চেষ্টা করলেন, "এই তো, ক'দিন আগে।"

"অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম।"

"হ্যাঁ, আমিও।"

"এখনও কালীগঞ্জে আছেন ?"

"মাঝে-মাঝে যাই।" টাকমাথা, যাঁর নাম মিস্টার ঘোষ, তাঁর যেন কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না। প্লেনের সামনে পৌঁছে যেতেই সবাই যে যার মতো নেমে প্লেনে উঠল। ছোট প্লেন। অর্জুন আর ইউসুফভাইয়ের আসন পাশাপাশি। মিস্টার ঘোষ অনেক পেছনে। একটু পরে প্রযোজক এবং অভিনেত্রীকে প্লেনে উঠে সামনে বসতে দেখা গেল।

হঠাৎই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বাসে যার সঙ্গে কথা বললেন তিনি কী করেন ?"

"সঠিক জানি না। বোধ হয় বিজনেস। আমার সঙ্গে আলাপ বিমানে কলকাতায় যাতায়াতের পথে। আগে মাঝে-মাঝেই দেখা হত, এখন হয় না। কালীগঞ্জে বাড়ি।" ইউসুফ বললেন।

"কালীগঞ্জটা কোথায় ?"

"ঢাকা থেকে এখন ঘণ্টা দেড়েক লাগে। আগে ট্রেনে গিয়ে নৌকো করে যেতে হত। এখন সুন্দর রাস্তা হয়ে গিয়েছে। প্রচুর হিন্দু পরিবার সেখানে এখনও বাস করেন।"

"এই ভদ্রলোকের পুরো নাম কী ?"

"জানি না ভাই। আলাপ হওয়ার সময়, হ্যাঁ মনে পড়েছে, এ. বি. ঘোষ বলেছিলেন। এ-র পরে বি বলেই মনে আছে।"

বিমান কলকাতা ছাড়ল। অর্জুন তাকিয়ে দেখল, নীচে হিরের মতো কলকাতার আলো জ্বলছে। তারপরেই আকাশের ওপরে আকাশ। এয়ার হোস্টেসদের আনাগোনা, খাবার দেওয়া ইত্যাদিতে মন ছিল না ওর। কালীগঞ্জের এ. বি. ঘোষ তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। বি কি বিহারীর আদ্যক্ষর ? এই লোকটির কথা জলপাইগুড়ির পবনবিহারী জানেন না। কালীগঞ্জের লোক যখন, তখন পবনবিহারীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় হতে পারেন। কিন্তু মানুষটি যে সুবিধের নয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছোট, কিন্তু ছিমছাম। হাতব্যাগ নিয়ে অর্জুন দ্রুত এ. বি. ঘোষের পেছনে চলে এল প্লেন থেকে নামার সময়। ভদ্রলোক কোনওদিকে তাকাচ্ছেন না। বাঁ দিকে ডিউটি-ফ্রি শপের প্রলোভন তাঁকে টানল না। ইমিগ্রেশনের কাউন্টারে পৌঁছে সোজা নিজের পাশপোর্ট বের করলেন স্ট্যাম্প মারানোর জন্য। ওঁর পেছনে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল না অর্জুন। এখানে বিদেশিদের জন্য আলাদা কাউন্টার। এ. বি. ঘোষ বাংলাদেশের মানুষ বলে যে কাউন্টার থেকে পাশপোর্টে ছাপ মারালেন, সেখানে অর্জুনের দাঁড়ানো নিষেধ।

কিন্তু ভদ্রলোককে পাওয়া গেল লাগেজ নেওয়ার জায়গাটিতে। চুপচাপ একটা ট্রলি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এরকম লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলা ঠিক নয়। নিজের সুটকেসের জন্য অর্জুন অপেক্ষা করছিল এমন সময় ইউসুফভাই পাশে এসে দাঁড়ালেন, "কী ভাই, ওইভাবে দৌড়লেন কেন ?"

অর্জুন হাসল। এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না।

"আমার মনে হচ্ছে ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনি উৎসুক।"

"কিছুটা।" অর্জুন স্বীকার করল।

"আসেন আমার সঙ্গে।" ইউসুফভাই এগিয়ে গেলেন এ. বি. ঘোষের

দিকে। অতএব অর্জুন নিরীহ মুখে অনুগামী হল। কাছে গিয়ে ইউসুফভাই বললেন, "আজ রাত্রে নিশ্চয়ই ঢাকায় থাকবেন ?"

"আমি তো এখন ঢাকায় থাকি !" ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

"ঢাকায় কোথায় ?"

"বনানীতে।"

"আমি গুলশনে। কার্ডটা রাখুন।" পকেট থেকে নিজের কার্ড বের করে দিলেন ইউসুফভাই।

"থ্যাঙ্ক ইউ।" কার্ড নিলেন এ. বি. ঘোষ, "আপনি প্রায়ই ইন্ডিয়ায় যান ?"

"ব্যবসার কাজে যাইতেই হয়। এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার ভাইয়ের মতন। অর্জুন। বাংলাদেশ দেখতে এসেছে। তা আমি বললাম ঢাকা শহর মানে বাংলাদেশ না। যেতে হবে গ্রামে। আমার মৈমনসিংহে বাড়ি। কিন্তু সেখানে কেউ নেই।" ইউসুফভাই কথাগুলো বলছিলেন ঢাকা-কলকাতার ভাষা মিশিয়ে।

অর্জুন নমস্কার করল। এ. বি. ঘোষ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত বাড়ালেন, "আমি এ. বি. ঘোষ। ঢাকায় আগে কখনও এসেছেন ?"

"না। এই প্রথমবার।"

"হোটেলে উঠবেন ?"

অর্জুন জবাব দেওয়ার আগে ইউসুফভাই বললেন, "না, না আমার বাসায়।"

এ. বি. ঘোষ বললেন, "আমাদের কালীগঞ্জ একসময় খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বরিশাল অথবা নোয়াখালির গ্রামের মতো নয়, তবু একটা চরিত্র আছে। ইউসুফভাইয়ের সঙ্গে চলে আসতে পারেন।"

এই সময় সুটকেসগুলো নিয়ে বেল্ট পাক খেতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল নিজের জিনিসপত্র তুলে নিতে। ভিড়টাও বেড়ে গিয়েছিল। ট্রলিতে সুটকেস চাপিয়ে ইউসুফভাইয়ের সঙ্গে কাস্টম্‌সের বেড়া ডিঙিয়ে যখন অর্জুন বেরিয়ে, এল বাইরে তখন এ. বি. ঘোষ অদৃশ্য হয়েছেন। প্রযোজক এবং অভিনেত্রীকে রিসিভ করতে অনেক মানুষ এসেছেন এয়ারপোর্টে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই একটা লোক সামনে দাঁড়াল, "সালাম ছার। গাড়ি আনছি।"

ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন, "সব খবর ভাল ?"

"জি।"

"চল। আসুন অর্জুনবাবু।"

হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন বলল, "আপনি যদি আমাকে একটা মাঝারি হোটেলে নামিয়ে দেন ...।"

"হোটেল ? আমি থাকতে আপনি হোটেলে উঠবেন, এ-কথা বললেন কী করে ?"

"ইউসুফভাই, আপনি আমাকে এখনও ভাল করে চেনেন না!"

"আরে রাখেন ভাই! ব্যবসায়ী লোক, মুখ দেখেই মানুষ চিনতে পারি। চলেন।"

ঢাকার রাস্তায় যেসব গাড়ি চলে তার প্রায় সবগুলোই জাপানের গাড়ি। তাদের চেহারা সুন্দর, চলেও ভাল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে অর্জুনের মনে হচ্ছিল সে বুঝি আমেরিকা অথবা ইউরোপের কোনও শহরে এসেছে। তারপরেই চোখ এবং মন জুড়িয়ে গেল। রাস্তার দু'দিকে যত নির্দেশাবলী, তা বাংলায় লেখা। মাঝে-মাঝে কিছু স্লোগান লেখা রয়েছে, যেমন, 'সবার জন্য ডাল-ভাত।' আরামদায়ক গাড়ির মধ্যে বসে অর্জুনের মনে হল, বাঙালি হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করার ব্যাপারে এরা খুবই সচেতন। তার ভাল লাগছিল।

॥ পাঁচ ॥

গুলশন একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। নতুন ঢাকার পথঘাট, বাড়ি যে-কোনও সুন্দর বিদেশি শহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ইউসুফভাইয়ের বাড়িটিকে জলপাইগুড়িতে অত্যন্ত বড়লোকের বাড়ি বলা হবে, কিন্তু ইউসুফভাই বললেন, "ঢাকায় আমি একটি সাধারণ লোক।" ওঁর স্ত্রী অত্যন্ত মিশুকে এবং অতিথিপরায়ণ মানুষ। একমাত্র ছেলে আশীব্রত ক্লাস এইটে পড়ে এবং ইতিমধ্যেই কাকাবাবু এবং সন্তুর ফ্যান হয়ে গেছে। রাত্রে সুন্দর বিছানায় শুয়ে অর্জুন ভাবল, ইউসুফভাইরা নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম। প্রায়-অচেনা একজনকে এমন যত্ন করে বাড়িতে নিয়ে আসাটা তার চোখে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না।

সে এখন বিদেশের মাটিতে। অথচ একবারও নিজেকে বিদেশি বলে মনে হচ্ছিল না। এদের বই-এর র‍্যাকে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বুদ্ধদেব গুহর বই সাজানো। আশীব্রত এখানকার দু'জন লেখকের বই দেখিয়ে তাকে বলেছে বাংলাদেশে ওঁরা খুব জনপ্রিয়, অথচ সে পশ্চিমবঙ্গে বসে ওঁদের নাম শোনেনি। একজন হলেন, হুমায়ুন আহমেদ, অন্যজন ইমদাদুল হক মিলন। রাস্তাঘাটে যেসব সাইনবোর্ড লাগানো, তার একটাতেও ইংরেজি শব্দ নেই। হঠাৎই মনে হয় বাংলা ভাষার রাজত্বে চলে এসেছি।

কিন্তু তা তো হল। অর্জুন চোখ বন্ধ করল। যে-কাজে এখানে আসা, সেটা কীভাবে শুরু করা যায়! নুটুবিহারীর কালীগঞ্জের বাড়িতে ইতিমধ্যে কাজলবাবু পৌঁছে গিয়েছেন কি না তা তার জানা নেই। যদি চিঠির কথা সত্যি হয় এবং কাজল ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তা হলে তার পক্ষে গুপ্তধন উদ্ধার করা কতদূর সম্ভব, তাও সে আন্দাজ করতে পারছে না। কাকতালীয়ভাবে এ. বি. ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, যাঁর বাড়ি কালীগঞ্জে। পবনবিহারী বলেছিলেন কালীগঞ্জ থেকে জনৈক বিমানবিহারী তাঁর কাছে টাকার জন্য অনেকদিন আগে

গিয়েছিলেন। তিনি এখন কালীগঞ্জে আছেন কি না তাও তিনি জানেন না। এই এ. বি.-ই বি.বি.-র কেউ হতে পারেন। কিন্তু এখনই কালীগঞ্জে যাওয়া দরকার এসব জানার জন্য। কিন্তু কীভাবে যাওয়া যায়? এখন পর্যন্ত সে ইউসুফভাইকে তার পেশার কথা জানায়নি। জানালে তিনি কতটা সাহায্য করবেন, সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সত্যসন্ধানীকে যদি তিনি গোয়েন্দা বলে ভুল করেন, তা হলে দেশের মাটিতে বিদেশি গোয়েন্দাকে সাহায্য করতে নিশ্চয়ই ইতস্তত করবেন। হোটেলে থাকলে এসব ভাবতে হত না। খোঁজখবর নিয়ে সে ঠিক কালীগঞ্জে পৌঁছে যেতে পারত।

সকালবেলায় নাস্তা খেতে টেবিলে বসে অর্জুনের চক্ষু চড়কগাছ। এই সাড়ে সাতটার সময় সবাই পরোটা, মাংস, তরকারি খাচ্ছেন। অর্জুনের এ-সময় এত খাওয়ার অভ্যেস নেই। অনেক অনুরোধ করার পর সামান্য খেয়ে মুক্তি পাওয়া গেল। টেবিলে দুটো খবরের কাগজ। একটি 'ইত্তেফাক', অন্যটি 'আজকের কাগজ'। অর্জুন আজকের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল।

ইউসুফভাই বললেন, "আজ আপনি ঢাকা শহর দেখুন। লাঞ্চের পর আমি ফ্রি। ততক্ষণ আপনাকে আমার ড্রাইভার ঘুরিয়ে দেখাবে।"

অর্জুন বলল, "ঢাকা পরে সময় থাকলে দেখব।"

"তার মানে? আগে কী কাজ আপনার?"

প্রশ্নটা কানে যেতে অর্জুন সতর্ক হল। ইউসুফভাই এবং সে ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই এখন। মানুষটি ভাল। এঁকে সব কথা খুলে বলা দরকার। অর্জুন বলল, "আপনাকে আমি আমার এখানে আসার কারণটা বলতে চাই। তারপর যদি আপনার মনে হয় আপনি আমাকে কোনও হোটেলে পৌঁছে দিলে খুশি হব। আমি একজন সত্যসন্ধানী।"

"সে তো জানি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সি আমার খুব প্রিয় সত্যসন্ধানী। কিরীটি রায়কে আগে ভাল লাগত, এখন লাগে না। তার চেয়ে ফেলুদা দারুণ ইন্টারেস্টিং ছিলেন, কাকাবাবুরও তুলনা হয় না। প্রতিবন্ধী মানুষ।"

"আপনি যাঁদের কথা বলছেন, তাঁরা বইয়ের চরিত্র।" অর্জুন বাধা দিল।

"তা অবশ্য।" ইউসুফভাই হাসলেন, "ট্রাভেল এজেন্টের কাছে আপনার পরিচয় পেয়ে প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। বয়স তো খুবই কম। ভাল লাগল সেই কারণেই।"

অতএব আর কোনও বাধা রইল না। অর্জুন ভদ্রলোককে তার ঢাকায় আসার কারণ বলল। গুপ্তধনের ব্যাপারটা সে বলল এই ভাবে, "ওই বাড়ির কোথাও নুটুবিহারী ঘোষ তাঁর সোনাদানা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। কাজল অত্যন্ত লোভী এবং অসৎ ছেলে। সে লুকিয়ে চলে এসেছে ওগুলো হাতাবার

জন্য।"

ইউসুফভাই চিন্তিত হলেন, "একজন বাইরের লোকের পক্ষে গ্রামে গিয়ে সন্ধান করা খুবই কঠিন কাজ, যদি না ভেতরের কেউ ওকে সাহায্য করে। সেটা দু-চারদিনে সম্ভব নয়।"

"নিশ্চয়ই। আপনি আমাকে একটা দিন সময় দিন। দেখি, কোনও যোগাযোগ বের করতে পারি কি না।" ইউসুফভাই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কাজে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।

একটা ঢাউস গাড়ির আরামদায়ক গদিতে বসে ঢাকা শহরটাকে দেখল অর্জুন, সেই সকালবেলায়। সুন্দর-সুন্দর বাড়ি, তাদের নামকরণও চমৎকার। কিন্তু রাস্তায় এত রিকশার ভিড় যে, সতর্ক হয়ে না চালালে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা বেশি। ট্রাম নেই, বাস খুব কম, মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে রিকশার ওপরেই। তাদের সংখ্যা কত হবে কে জানে! হাজার-হাজার বিদেশি গাড়ি আর দিশি রিকশা ঢাকার রাজপথ দখল করে রেখেছে।

শান্তিবাগ হয়ে পল্টনের মোড়ের কাছে এসে অর্জুন দেখল, 'হোটেল প্রীতম' লেখা একটা বাড়ি থেকে কালকের এয়ারপোর্টে দেখা সেই প্রযোজক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছেন একা। ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক। হোটেলটা কি ওই ভদ্রলোকের? ফুটপাতের পাশ ঘেঁষে পার্ক করা বিদেশি গাড়িতে ভদ্রলোক ওঠা-মাত্র সেটা অর্জুনের বিপরীত দিকে চলে গেল। কোনওভাবেই ওঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে এ. বি. ঘোষের কোনও গোপন ব্যাপার আছে। ওঁকে অনুসরণ করলে কোন লাভ হবে, তা অর্জুনের জানা নেই, কিন্তু মন বলছিল হয়তো কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেলেও যেতে পারে। ওদের গাড়ি সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ড্রাইভারকে বলল, সামনে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে হোটেলের সামনে যেতে। ভদ্রলোক চলে গেলেও হোটেলের রিসেপশনে খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে।

গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে হোটেলে ঢুকেই ডান হাতে আটপৌরে রিসেপশন কাউন্টার নজরে আসতেই বোঝা গেল এটি কোনও অভিজাত শ্রেণীতে পড়ে না। রিসেপশনের ছেলেটি তাকে জিজ্ঞেস করল, "বলুন সার। কী সাহায্য করতে পারি?"

"আপনাদের এখানে রুম পাওয়া যাবে?"

"একটা সিঙ্গল-রুম খালি আছে। তিনশো টাকা।"

"বাঃ, ভাল হল। আমি একটু অপেক্ষা করতে পারি? আমার এক বন্ধু আসবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। তাঁর সঙ্গে একজন প্রযোজকের এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্টও আছে।"

"প্রযোজক? রাজুভাই? তিনি তো একটু আগে চলে গেলেন।"

"সে কী! কোথায় গেলেন?"

"তা তো জানি না। হয়তো বাসায় গেছেন।"

"কোথায় বাসা ওঁর ?" সরল গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"মালিবাগে।"

হঠাৎ ওপরের সিঁড়িতে চোখ পড়তেই অর্জুন অবাক। এ. বি. ঘোষ নেমে আসছেন, পরনে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি। অর্জুন হাসল, "আবার দেখা হয়ে গেল।"

"আপনি এখানে ?"

"জায়গা আছে কি না, খোঁজ করছিলাম।"

"কোথায় উঠেছেন ?"

"ইউসুফভাইয়ের বাড়িতে।"

"সেখানে অসুবিধে হচ্ছে ?"

"না, না। আসলে কারও বাড়িতে থাকতে সঙ্কোচ হয়।"

"ইন্ডিয়ান হ্যাবিট।" এ. বি. ঘোষ রিসেপশনিস্টকে প্রশ্ন করলেন, "রুম নাই ?"

"আছে।" অদ্ভুত উচ্চারণে জবাব দিল ছেলেটি।

"এই হোটেলের খোঁজ পেলেন কী করে ?"

"রাস্তায় যেতে-যেতে সাইনবোর্ড চোখে পড়ল।" অর্জুন হাসল, "গ্রামে কবে যাচ্ছেন ?"

"গ্রামে ? ও। আপনার তো গ্রাম দেখার সাধ আছে। চলে যান কালীগঞ্জে। গিয়ে বিমানবিহারী ঘোষের সঙ্গে দেখা করবেন। সঙ্কোচ না হলে দু-তিনদিন থাকার কোনও অসুবিধে হবে না। দু-তিনদিন বাদে অবশ্য একটা শ্যুটিং-পার্টি যাবে সেখানে। সেটাও দেখতে পারেন।" এ. বি. ঘোষ বেরিয়ে গেলেন।

অর্জুন কিছুক্ষণ সময় কোনওমতে কাটিয়ে ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। বিমানবাহিরীকে চেনেন এ. বি.। এখন আর কোনও সন্দেহ নেই, ইনিও ওই পরিবারের একজন, অথচ নিজের পুরো নামটা বললেন না। প্রীতম হোটেলে এ. বি. রায় কী করছিলেন ? প্রযোজক কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই হোটেলটাকে বেছে নিয়েছিলেন ? রিসেপশনিস্টের কথাবার্তায় বোঝাই যায় ওখানে ওঁদের যাতায়াত আছে। এ. বি. ঘোষের বাড়ি বনানীতে, প্রযোজকের মালিবাগে, অথচ দুজনে দেখা করছেন প্রীতম হোটেলে এসে। যাক গে! কালীগঞ্জে পৌঁছবার একটা সূত্র তো পাওয়া গেল। এই সময় ড্রাইভার বিড়বিড় করে কিছু বলতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ভাই ?"

"দ্যাখেন না ছার, টয়েটো গাড়িটা তখন থেকে পেছনে লেগেই আছে।"

অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে গাড়িটাকে দেখল। সাদা গাড়ি, ড্রাইভার একা। ওদের গাড়ি যেদিকে ঘুরছে, ওটাও পেছন পেছন আসছে। হঠাৎ অর্জুনের ড্রাইভার

গাড়ি থামিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে পেছনেরটাও থেমে গেল। ড্রাইভার দরজা খুলে পেছনের দিকে গেল, "কী মিঞা, মতলবখান কী, কন তো? পিছনে লাইগ্যা আছেন ক্যান?"

অন্য গাড়ির ড্রাইভার বলল, "রাস্তা তো কারও বাপের সম্পত্তি না।"

গজগজ করে ফিরে এল ড্রাইভার, "কে গুন্ডা, কে ভালমানুষ, আজকাল বোঝাই যায় না? চলেন ছার, বাসায় যাই।"

"চলুন।" অর্জুন বলল। ওই গাড়িটাকে কি কেউ তাকে অনুসরণ করতে পাঠিয়েছে? তা যদি হয়, তা হলে ওর তো নিজেকে আড়ালে রাখার কথা। এমন গায়ে পড়ে কেউ অনুসরণ করে? কিন্তু দেখা গেল ইউসুফভাই-এর বাড়ির দরজা পর্যন্ত দ্বিতীয় গাড়িটা পেছন ছাড়ল না। ওরা ভেতরে ঢোকার পর গাড়িটা বেরিয়ে গেল। অর্জুনের মনে হল, গাড়িটাকে এ. বি. ঘোষ পাঠাননি তো? পাঠানোর অর্থ, ওঁর মনে অর্জুন সম্পর্কে সন্দেহ এসেছে। সাধারণ জীবনযাপন করেন যে সমস্ত মানুষ, তাঁদের মনে এমন সন্দেহ হুট করে আসে না।

লাঞ্চের আগে ইউসুফভাই ফিরে এলেন, "কেমন ঘুরলেন অর্জুনবাবু?"

"আপনি আমাকে তুমি বলবেন, আর বাবুটা ছাড়ুন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

অর্জুন ওঁকে সকালের অভিজ্ঞতাটা জানাল।

"তোমার ওই হোটেলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। আমার এখানে কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?"

"বিন্দুমাত্র নয়। আমি ঘর খুঁজতে প্রীতম হোটেলে যাইনি।"

"তা হলে তো আরও ভুল হল। এই লোকগুলো অত্যন্ত ডেঞ্জারাস ধরনের। আর এদের জন্য তো বাংলাদেশে আসোনি। আমাকে ভুল বুঝো না। ওই প্রযোজকের নাম রাজউদ্দিন আহমেদ। লোকে রাজুভাই বলে ডাকে। পর-পর দুটো ছবি মার খাওয়ার ফলে লোকটা এখন আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত। তৃতীয় ছবিটা শুরু করছে ধার করে। এটাও যদি না চলে, তা হলে আত্মহত্যা অথবা বাংলাদেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া ওর কোনও পথ নেই। এসব কথা আমার এক চিত্রসাংবাদিক বন্ধুর কাছে শুনতে পেলাম। এ. বি. ঘোষের কথা ভাল করে কেউ জানে না। হয়তো লোকটা টাউট, রাজুভাইকে টাকা জোগাড় করে দিচ্ছে। ঢাকার অনেককেই বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না কার পকেট ভর্তি, কার শূন্য।"

"কিন্তু ওরা যে আমার খবর জানার জন্য প্রকাশ্যে পেছনে আসবে, তা ভাবিনি।"

"তা হলেই বোঝো।"

"কিন্তু একটা ব্যাপারে লাভ হল তো!"

"কী ব্যাপারে ?"

"ওই বিমানবিহারীর কাছে পৌঁছনো যাবে !"

"হয়তো। আবার ওটা বিপদও তো ডেকে আনতে পারে।"

"মানে ?"

"আমরা জানি না বিমানবিহারীর সঙ্গে এ. বি. ঘোষের সম্পর্ক কী ধরনের। ওঁর পরিচয় নিয়ে ভদ্রলোকের কাছে গেলে তিনি ভাল চোখে না-ও দেখতে পারেন। আমরা বিমানবিহারীর কাছে যাচ্ছি না। আমি অন্য সূত্র পেয়েছি।"

"কীরকম ?"

"আমার এক বন্ধুর নাম সাহাবুদ্দিন। তাঁর প্রেস আছে, বই ছাপে। চিত্রসাংবাদিক বন্ধুটি আমাকে বলল সাহাবুদ্দিনের বাড়ি ওই কালীগঞ্জে। কর্মচারী ছাড়া কেউ নেই ওখানে। তার দেশের বাড়িতে বেড়াতে যেতে চাই শুনে সে খুব খুশি।"

"কবে যেতে পারি আমি ?"

"আমি না ভাই, আমরা।"

"বেশ, তাই হোক।"

"আগামীকাল সকাল দশটায় সাহাবুদ্দিন তার গাড়ি নিয়ে আমার এখানে আসবে। ও জানে তুমি একজন সাধারণ টুরিস্ট। এর বেশি ওর জানার দরকার নেই।"

অর্থাৎ আজকের বিকেলটা ঢাকায় থাকতে হচ্ছে। অর্জুন ঠিক করল, বিকেলে বুড়িগঙ্গা দেখতে যাবে। পুরনো ঢাকাকে দেখতে হবে।

॥ ছয় ॥

সাহাবুদ্দিন গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ভদ্র চেহারার মানুষটির মুখে হাসি লেগেই আছে। পরিচয় করার সময় বললেন, "আমাকে মনুভাই বলবেন।"

অতএব মনুভাইয়ের পাশে অর্জুন বসল। পেছনের আসনে ইউসুফভাই। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ, যাঁরা স্বাধীনতার পর জন্মেছেন, তারা বাংলা নাম পছন্দ করেছেন। তার আগের মানুষরা ডাকনামটাকেই আসল নামের সঙ্গে ব্যবহার করা শুরু করেছেন। মনুভাই গাড়ি চালাতে-চালাতে বললেন, "নামের ব্যাপারে এখন আমরা আপনাদের থেকে এগিয়ে আছি। আচ্ছা, আপনাদের একটি মেয়ের আধুনিক নাম বলুন তো !"

অর্জুন মনে করার চেষ্টা করে না পেরে বুদ্ধদেব গুহর শরণাপন্ন হয়ে বলল, "যোজনগন্ধা।"

মনুভাই বললেন, "ভাল। তবে আমাদের মেয়েদের নাম এখন 'একা' রাখা হচ্ছে। একা, স্নেহা।"

অর্জুন অবাক হল। কোনও বাঙালি তাঁর মেয়ের নাম 'একা' রেখেছেন, তা সে ভাবতে পারছিল না।

সুন্দর চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। এদিকটায় রিকশার ভিড় কমে আসছে। ডান-দিকের পাঁচিলঘেরা বিশাল বাড়িটি যে ঢাকার টেলিভিশন কেন্দ্র, তা ইউসুফভাই জানালেন। ক্রমশ নির্জন এলাকার সুন্দর-সুন্দর বাড়ি নজরে এল। এসব বাড়িতে বিদেশি মানুষেরা বিপুল ভাড়া দিয়ে বাস করেন। তারপরেই শিল্প এলাকা। পেট্রল পাম্পের নামগুলোও চমৎকার। কোনওটা 'পদ্মা', কোনওটা 'মেঘনা'। যমুনাও নাকি আছে। চল্লিশ মিনিট পরে দু'পাশে গ্রামবাংলা এসে গেল। এবার হাইওয়ে ছেড়ে ডান-দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তায় বাঁক নিল গাড়ি। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইন পার হতেই দু'পাশে আম-কাঁঠালের গ্রামগুলো। মনুভাই বললেন, "এগুলো এখন আর আগের মতো গ্রাম নেই। লোকে এখান থেকে ঢাকা শহরে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে। চাকরিটাই গ্রামের মানুষদের আসল জীবিকা।"

একসময় গাড়িটা থামতে বাধ্য হল। একটি ছোট নদী সামনে। পাশে ব্রিজ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। নৌকো করে গাড়িটা পার করা হবে। মনুভাই বললেন, "এটি শীতলক্ষ্যার একটা শাখা।"

অর্জুন দেখল খানিকটা দূরে গোটাকুড়ি ছাউনি দেওয়া নৌকো বাঁধা আছে। নৌকোর ওপর যারা বসে, তাদের বেদে-বেদেনি বলে মনে হচ্ছিল। মনুভাই বললেন, "হ্যাঁ, ওরা তাই। এই শাখা নদীটির একটি বিশেষত্ব আছে। এর বালি থেকে ঝিনুকের বুকে মুক্তো তৈরি হয়। কুড়ি-পঁচিশটা ঝিনুক তুলতে পারলে একটা মুক্তো আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। বেদেরা ওই মুক্তোর লোভে এই নদীতে আসে। অবশ্য এখন সরকার অনেক কড়াকড়ি করেছেন।"

গাড়িটা যতক্ষণে ওপারে না গেল, ততক্ষণ কাজে লাগাল অর্জুন। বেদেদের নৌকোর গায়ে চলে এল সে পাড় ধরে। বেদেদের চেহারা, পোশাক একই রকম হয়। তারা অর্জুন সম্পর্কে একটুও আগ্রহ দেখাল না। সে গায়ে পড়েই একজনকে জিজ্ঞেস করল, "মুক্তো পেয়েছেন?"

লোকটা বিড়ি খাচ্ছিল নৌকোর গায়ে হেলান দিয়ে। বলল, "কিনবেন নাকি কর্তা?"

"না, মুক্তো কেনার ক্ষমতা আমার নেই।"

"ঢাকায় থাকেন নাকি?"

"না। আমি জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি।"

"জলপাইগুড়ি?" লোকটা সোজা হয়ে বসল। তারপর চিৎকার করে সঙ্গীদের যা বলল, তা উচ্চারণের জন্য অর্জুনের বোধগম্য হল না। কিন্তু কথাটা শুনে সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অর্জুন দেখল, সবাই তাকে নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা শুরু করল। এবার প্রথম লোকটা বলল, "দুধ-কলা

খাওয়াইলেও সাপে ছোবল মারে। যে আসছিল সে কি আপনার পার্টনার ?"

ইতিমধ্যে মনুভাই এবং ইউসুফভাই এসে পড়েছেন অর্জুনের কাছে। অনেক কষ্টে চিৎকার-চেঁচামেচি এবং হাতজোড় করে তাঁরা বেদেদের শান্ত করে উত্তেজনার কারণটা জানতে পারলেন। বেদেরা জানাল, ক'দিন আগে একটি ছেলে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে এখানে এসেছিল। বেদেরা তাকে আশ্রয় দেয়। দু'দিন থাকে সে নৌকোয়। তখন বেদেরা জানতে পারে, সে এসেছে ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি থেকে। হঠাৎই গতকাল ছেলেটি উধাও হয়ে গিয়েছে। যাওয়ার সময় একটি বেদের সংগ্রহ করা চারটে মুক্তোও নিয়ে গেছে। ওই মুক্তোগুলোর দাম যাই হোক না কেন, ওর বিশ্বাসঘাতকতা ভুলবে না এরা কখনও। অর্জুন যেহেতু জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে, তাই ওরা ধরে নিয়েছে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ আছে। মুক্তো ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত ওরা অর্জুনকে ছাড়বে না।

শেষপর্যন্ত অনেক কথা খরচ করার পর ইউসুফভাইরা বেদেদের শান্ত করতে পারলেন। অর্জুন কথা দিল ছেলেটিকে দেখতে পেলে সে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু এইসঙ্গে অর্জুনের একটা চিন্তা দূর হল। কাজল তা হলে এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে এবং অকুস্থলে পৌঁছলেও এত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে না পারার কথা। বেদেরা বলছে গতকাল সে এখান থেকে চলে গিয়েছে।

নৌকো ওদের গাড়ি ওপারে পৌঁছে দিলে আবার চলা শুরু হল। মনুভাই বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো ? জলপাইগুড়ি থেকে হঠাৎ এই অঞ্চলে আপনার আগে আর-একজন তস্কর উপস্থিত হলেন কেন ?"

"আমার আগে আর-একজন তস্কর মানে ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"সরি ! আমার কথাটা ওইভাবে বলা ঠিক হয়নি।" মনুভাই লজ্জিত হলেন।

ইউসুফ বললেন, "জলপাইগুড়ি থেকে কেউ যদি এসে বেদেদের প্রতারণা করে, তা হলে তার আসার কারণ অর্জুন জানবে কী করে মনুভাই ?"

মনুভাই মাথা নাড়লেন, "তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু অর্জুনভাই, যে-লোকটি এসেছে, সে সুবিধের নয়। আমার মনে হয় আপনার পরিচয় জলপাইগুড়ির লোক না বলাই ভাল। মানুষ খুব সহজে ভুল বোঝে।"

কথাগুলো ভাল না লাগলেও অর্জুন কিছু বলল না। হ্যাঁ, কাজল নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে। ওই গরিব বেদের মুক্তো চুরি করেছে আশ্রয় পাওয়ার পরেও। এর কোনও ক্ষমা নেই। এই চরিত্র একদিনে তৈরি হয় না। অবনীবাবু ঠিক কাজ করেছেন ভিসার জন্য সুপারিশ না করে। কিন্তু টুকু কী করে এমন খারাপ ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল!

এখন রাস্তা ছোট, কিন্তু পরিষ্কার। দু'পাশের ছবি যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। যে-গ্রামবাংলার কাহিনী এবং কবিতা একসময় পাঠ্য বইয়ে পড়া

যেত, তাই দু'পাশে দৃশ্যমান। খুব ভাল লাগছিল অর্জুনের। মনুভাই বললেন, "সামনেই খ্রিস্টানপাড়া। এখানকার সবাই খ্রিস্টান। অনেকেই ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশনে চাকরি করেন। ঢাকার বড় হোটেলগুলোর কর্মচারীরা এখান থেকেই যান। মিশনারিরা জায়গাটা চালান।"

পাঁচিলঘেরা একটি বিশাল এলাকায় সুন্দর ঘরবাড়ি, গির্জা দেখা গেল। শান্ত, শব্দহীন। জানা গেল, অনেকেই সুযোগসুবিধে বেশি পাওয়ার আশায় এখানে এসে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু এই নিয়ে এলাকায় কোনও ঝামেলা হয়নি। ভেতরের ব্যবস্থা নাকি অত্যন্ত আধুনিক।

খানিক বাদেই ক্ষুধিত পাষাণের বাড়িটির মতো একটি বিশাল বাড়িকে দেখা গেল। এটি নাকি জমিদারের পরিত্যক্ত বাসভবন। এখন সরকার এটাকে ভবঘুরেদের আশ্রম করেছেন। ঢাকা শহরের রাস্তা থেকে ভবঘুরেদের তুলে এনে এখানে রাখা হয়। তাদের অবশ্য এই নিরাপদে বেশিদিন থাকার বাসনা কখনওই হয় না।

শেষপর্যন্ত কালীগঞ্জ এসে গেল। ঢোকার মুখেই বাজারের গায়ে একটি সুন্দর মসজিদ। এখানে একসময় বিশাল মাটির ঢিবি ছিল। জমিটা মনুভাইদের। তাঁর পূর্বপুরুষ ওই ঢিবি খুঁড়ে এই বাড়ি আবিষ্কার করে তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন।

মনুভাই গাড়ি চালিয়ে চলে এলেন গ্রামের শেষপ্রান্তে। ওঁদের বাড়ির মধ্যেও একটি ছোট মসজিদ আছে। গাড়ি দেখে ছুটে এল অনেক মানুষ। এরা সবাই এই বাড়ির বিভিন্ন কাজে আছে। মনুভাই কাউকে চাচা, কাউকে খালা বলে ডেকে কাজের কথা বলতে লাগলেন। তারপর ইউসুফভাই এবং অর্জুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল৷_ ান, "আজ কী খাওয়াবেন?"

ওঁদের মধ্যে যিনি বৃদ্ধ তিনি বললেন, "ছার, মেহমান আইছেন, তাঁদের সম্মান তো রাখতেই হইব। গ্রামের মানুষের যা ক্ষমতা তাই দিয়াই মেহমানদের সেবা করব।"

মনুভাই বললেন, "অর্জুনবাবু, এ হচ্ছে ইদ্রিস, আমার ঠাকুর্দার আমলের মানুষ। ছেলেবেলায় ওর কোলে-পিঠে চড়েছি কত। আর এ হল দুর্গাদাস। বাবার সবসময়ের সঙ্গী ছিল।"

দুর্গাদাস খুবই বৃদ্ধ, কিন্তু এখনও তার শরীর সোজা। নমস্কার করে বলল, "পুরা নাম দুর্গাদাস কৈবর্ত। কর্তা আমারে ভালবাসতেন। যৌবনে ডাকাতি করতাম। এই বাড়ির পেছনে যে বিল, তার সব পানি আমার কথা শুনত। একদিন ধরা পড়লাম, জেল হল। কর্তা আমাকে এই বাড়িতে কাজ দিয়া বললেন, দুর্গা, এবারে আমারে বাঁচা। চারপাশে অনেক শত্রু। কে কাকে বাঁচায়। তিরিশ বছর তাঁর ছায়ার পাশে কোনও দুশমনরে আসতে দিই নাই, কিন্তু ভগবান যেদিন কর্তারে ডাক দিলেন সেদিন আমার মতো মানুষ..." দুর্গাদাস

চোখের জল মুছল।

এদের ভাল লাগছিল অর্জুনের। প্রচুর গাছগাছালি চারপাশে, বাড়ির ভেতর পুকুর। ওরা বাড়ির পেছনে যেতেই অর্জুন অবাক! আকাশের শেষ দেখা যাচ্ছে না, শুধু জল আর জল। মনুভাই বললেন, "এই হচ্ছে কালীর বিল। এর কথাই দুর্গাদাস আপনাকে বলছিল। আগে এই বিল পেরিয়েই আমাদের যাতায়াত করতে হত। ওই যে আকাশছোঁয়া বটগাছ দেখছেন, দূর থেকে ওটাকে দেখেই নৌকোর মাঝিরা দিক ঠিক করত।"

বিলের ধারে গাছের তলায় টেবিল, চেয়ার পেতে দেওয়া হল। অর্জুন, ইউসুফভাই সেখানে বসতেই মনুভাই কাজকর্মের কথা বলতে গেলেন। এখানে তাঁরা নতুন করে মাছচাষের প্রকল্প নিয়েছেন। ইদ্রিস এবং দুর্গাদাস ডাব নিয়ে এল প্রথমে। সেই ডাবের জল গাছের ছায়ায় বসে খোলা জলের দিকে তাকিয়ে খেতে-খেতে অর্জুনের মনে হল এর চেয়ে আরাম সে কখনও পায়নি। ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মিঞা, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাব কীরমকম ?"

ইদ্রিস বলল, "জবাব দাও হে দুর্গাদাস।"

দুর্গাদাস বলল, "ওই যে দেখতেছেন বাড়িঘর, ওখানে মোছলমানের বাস আর তার এদিকের বাড়িগুলান হিন্দুদের। বাপ-ঠাকুর্দার মুখেও ধম্ম নিয়ে কাউরে কাজিয়া করতে শুনি নাই। ওসব জিনিস শহরে হইলেও হইতে পারে, কালীগঞ্জে হয় নাই, হইব না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখানে হিন্দু কত আছেন ?"

"অনেক। তবে বেশিরভাগই গরিব। থাকার মধ্যে আছেন ঘোষমশাইরা। তবে তাঁদেরও অনেকে শহরে গিয়া আছে। এখন শেষদশা।" ইদ্রিস জবাবটা দিল।

"ঘোষমশাইরা কি একসময় বড়লোক ছিলেন ?"

"হ্যাঁ ছার। বাপের মুখে শুনছি সেসব বৃত্তান্ত। এখন কিছু নাই।"

"শহরে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা আর আসেন না ?"

"না বললেই হয়। আকাশবাবু মাঝে-মধ্যে আসেন।"

"আকাশ !"

ইউসুফভাই মাথা নাড়লেন, "সম্ভবত এ.বি.।"

অর্জুনের মুখে হাসি ফুটল। তা হলে এ.বি.-র পুরো নাম আকাশবিহারী।

"গতকাল ইন্ডিয়ার এক মেহমান আসছেন ওই বাড়িতে।"

"ইন্ডিয়া থেকে প্রায়ই লোক আসে বুঝি ?"

"না ছার। সেই বড় ঘোষবাবুর দেহ রাখার পর আসছিল, তারপর তো কাউরে দেখি নাই।"

"ওঁদের বাড়িটা কত দূরে ?"

"কাছেই।" দুর্গাদাস ঘুরে দাঁড়াল, "ওই যে শিমুলগাছটা দেখতেছেন, ওইখানে।"

এই সময় মনুভাই ফিরে এলেন, "কীরকম লাগছে আমাদের গ্রাম!"

"দারুণ। বাংলাদেশে এসে যদি ঢাকা থেকেই ফিরে যেতাম, তা হলে কিছুই দেখা হত না। এত সুন্দর জায়গা, ইচ্ছে হচ্ছে ক'টা দিন থেকে যাই।" অর্জুন বলল।

"থাকুন। কোনও সমস্যা নেই। এরা আপনার দেখাশোনা করবে। ঘরগুলো তো সব খালি পড়ে আছে।" মনুভাই হাসলেন, "কিন্তু আমাকে আজই ফিরে যেতে হবে। ইউসুফভাই, আপনিও থাকবেন নাকি?"

"আমি তো বাড়িতে বলে আসিনি কিছু।"

"সেটা আমি জানিয়ে দিতে পারি।"

"তা হলে একটা দিন থাকা যায়।"

ভাত এবং মাছের ঝোল খেয়ে মনুভাই প্রায়-বিকেলে গাড়ি নিয়ে ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন যখনই অর্জুনদের ঢাকায় যাওয়ার ইচ্ছে হবে, কালীগঞ্জের পোস্ট অফিস থেকে টেলিফোন করে দিলে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ড্রাইভার এখানে গাড়ি নিয়ে আসবে।

ধুলো উড়িয়ে ওঁর গাড়ি মিলিয়ে গেলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ইউসুফভাই, আমার জন্য নিশ্চয়ই আপনার কাজকর্মের ক্ষতি হবে?"

"সেটা সামলে নিতে পারব। কিন্তু ভাই, জীবনে কোনও রহস্য সন্ধানে শামিল হইনি। সুযোগ যখন পাওয়া গেল তখন হাতছাড়া করি কেন? একবার যাবেন নাকি ঘোষবাড়িতে?" ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এখনই নয়। আপনি নিশ্চয়ই দুর্গাদাসের কথাটা শুনেছেন। ওই বাড়িতে গতকাল একজন অতিথি এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে।"

"হ্যাঁ, শুনেছি।"

"আমার ধারণা, এই অতিথিটিই বেদেদের মুক্তো চুরি করেছেন।"

"কাজলবাবু? তা কী করে হবে? উনি তো ঘোষ নন।"

"মুখার্জি। কিন্তু দূর দেশে এসে ঘোষ সাজতে অসুবিধে কোথায়? অবশ্য এ-সবই আমার অনুমান। হয়তো কাজল নয়। অন্য লোক এসেছেন। কিন্তু কাজল যদি হয়, তা হলে বলব সাহস আছে ওর। চলুন, গ্রামটা ঘুরে দেখি। বিকেলে হাঁটতে খারাপ লাগবে না।" অর্জুন বলল।

ইউসুফভাই হাত নেড়ে দূরে দাঁড়ানো ইদ্রিসকে ডাকলেন, "আমরা একটু আপনাদের গ্রাম ঘুরে দেখতে যাচ্ছি।"

ইদ্রিস বলল, "চলেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই।"

কালীগঞ্জের রাস্তায় এখনও পিচ পড়েনি। অবশ্য যে প্রধান পথে বাস-চলাচল করে, সেটি পিচের। আজকাল এখানে ঢাকার বাস সরাসরি

আসে। ইদ্রিস সঙ্গে থাকায় সুবিধে হচ্ছিল। বিভিন্ন বাড়ি, গাছ, মাঠ দেখিয়ে সে একটার পর একটা কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছিল। একটা বিরাট ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ দেখিয়ে ইদ্রিস বলল, "এখানে ঘোষবাবুদের এক ছেলে গলায় রশি দিছিল।"

ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন, "কত বছর আগে?"

"তা ধরেন, যে-বছর পাকিস্তান হইল সেই বছর।"

অর্জুন হেসে ফেলল। ছেচল্লিশ বছর ধরে কোনও ভূত তেঁতুলগাছে বসে থাকবে, এমন হতে পারে না। ভূতেদেরও কাজকর্ম থাকে। সেটা দেখে ইদ্রিস বলল, "হাসবেন না ছার, অমাবস্যার রাইতে এখনও তিনি আসেন। ঘোষবাবুদের পুকুর থেকে মাছ ধরেন।"

"আপনি দেখেছেন?"

"বিমানবাবু দেখছেন।"

"উনি কি নেশাভাঙ করেন?"

প্রশ্নটা ইদ্রিসের পছন্দ হল না। সে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, "ইনশা আল্লা!"

দেখা গেল পুলিশের পোশাক পরা দু'জন লোক সামনের পথ ধরে এগিয়ে আসছেন। ওঁদের একজন অবশ্যই অফিসার। ইদ্রিস বলল, "সামনেরডা দারোগাবাবু, খুব রাগী।"

ওরা যখন মুখোমুখি হল তখন দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন, "নতুন মুখ দেখছি। মহাশয়দের পরিচয় জানতে পারি?"

ইদ্রিস বলল, "ছার, ইনারা আমাদের বাবুর মেহমান।"

"কোন বাবু?"

"মনুভাই।"

"ও। সাহাবুদ্দিন সাহেব এসেছেন নাকি?"

এবার ইউসুফভাই জবাব দিলেন, "ওঁর সঙ্গেই আমরা এসেছিলাম। কিন্তু উনি কাজ থাকায় চলে গেছেন, আমরা থেকে গেলাম। আমি মোহম্মদ ইউসুফ। ঢাকায় থাকি, ব্যবসা করি। আর ইনি অর্জুন, ইন্ডিয়া থেকে বেড়াতে এসেছেন।"

"ইন্ডিয়া থেকে? ওয়েস্ট বেঙ্গল? ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোন পার্ট?"

"জলপাইগুড়ি।"

"সে কী! আপনি কবে এসেছেন এদিকে?"

"আজই।"

"অসম্ভব। আমার কাছে রিপোর্ট আছে আপনি কয়েকদিন আগে এদিকে এসেছেন অসুস্থ হয়ে। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

ইউসুফভাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, অর্জুন তাঁকে বাধা দিল, "আমি আপনার

সমস্যাটা বুঝতে পারছি। থানাটা কত দূরে?"

"কাছেই। চলেন। মেঘ না চাইতেই পানি পেয়ে গেলাম।"

ওঁরা প্রায় পাহারা দিয়ে অর্জুনকে থানায় নিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকে ইউসুফভাই বেশ রাগত গলায় বললেন, "আপনি খুব ভুল করছেন। এখনই মনুভাইকে পাবেন না, ঘণ্টা খানেক বাদে ঢাকায় ফোন করুন, উনি বলবেন অর্জুনবাবু আজই ওঁর সঙ্গে এসেছেন। আচ্ছা, আর-একটা কাজ করা যেতে পারে, আপনি আমার বাসায় ফোন করে জিজ্ঞেস করুন অর্জুন কবে এসেছে?"

"আপনি কার হয়ে সওয়াল করছেন তা জানেন?"

"জানি। উনি একজন সত্যসন্ধানী।"

"কী সন্ধানী?"

"সত্যসন্ধানী।" খুব জোরে জবাব দিলেন ইউসুফভাই।

"ব্যাপারটা কী ভাই?"

অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। সে জবাব দিল, "কিছু না। আপনার সমস্যা হল জলপাইগুড়ি শব্দটা। আমরাও আজ বেদেদের মুখে ঘটনাটা শুনেছি। আপনি যাকে খুঁজছেন তিনি আমি নই।"

অফিসার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বসতে বললেন। ওরা বসার পর তিনি বললেন, "আপনার কোনও আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে আছে?"

"পাশপোর্ট আছে।"

"দেখি।"

অর্জুন পাশপোর্ট বের করে দিলে ভদ্রলোক পাতা ওলটাতে লাগলেন, "পরশু রাত্রে এসেছেন। অতএব সন্দেহ দূর হল। এটা বললেই হত। প্রফেশন ট্রুথ ইনভেস্টিগেটার। মানে কী?"

"সত্যসন্ধানী।" জবাব দিলেন ইউসুফভাই।

"কী সত্য খোঁজেন আপনি?"

"যে-সত্য আগে থেকে বোঝা যায় না।"

"তার মানে আপনি ডিটেকটিভ?"

"না। ডিটেকটিভরা অন্য ধরনের মানুষ। আমি সাধারণ।"

"হুম! এখানে কোন সত্য খুঁজতে এসেছেন?"

"এখানে এসেছি বাংলাদেশের গ্রাম দেখতে। সত্যিকারের গ্রাম।"

অফিসার চিৎকার করে চায়ের হুকুম দিয়ে বললেন, "মশাই, সত্য খোঁজা আমাদের চাকরির মধ্যে পড়ে। সেটা খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খাই আমরা। আর আপনারা মোটা টাকা দক্ষিণা নিয়ে সেই কাজটা করেন। গোয়েন্দা-উপন্যাসে পুলিশ যা পারে না, তাই গোয়েন্দারা পারে। আপনারা কি আমাদের চেয়ে বেশি বোঝেন?"

"মোটেই নয়। আমি গোয়েন্দাও নই।"

“শুনুন। জলপাইগুড়ি থেকে এক জোচ্চোর এখানে এসেছে। অবশ্য কালীগঞ্জেই যে আছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। এখানে আর-এক ভদ্রলোক এসেছেন ঘোষবাড়িতে, কিন্তু তাঁর দাড়ি নেই।”

“দাড়ি নেই মানে ?”

“বেদেরা বলেছে, যাকে ওরা আশ্রয় দিয়েছিল তার দাড়ি ছিল।”

“ও। দেখুন, দাড়ি তো কেটে ফেলা যায়।”

“তা যায় কিন্তু... ।” চিন্তায় পড়লেন অফিসার।

“উনি ক'দিন থাকবেন এখানে ?”

“দু-চারদিন।”

“নামটা কী ?”

“সাগরবিহারী ঘোষ।”

অর্জুন হেসে ফেলল। কাজল মুখার্জি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান। এই পরিবারের সঙ্গে মেলানো নাম খুঁজে পেয়েছে। খাওয়া হয়ে গেলে অর্জুনরা বিদায় চাইল। অফিসার পাশপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, “যদি কোনও প্রয়োজন হয় নির্দ্বিধায় চলে আসবেন।”

“অনেক ধন্যবাদ।”

ইদ্রিস তাদের বাইরে আসতে দেখে খুশি হল। তখন ধূপছায়া নেমে গেছে পৃথিবীতে। অর্জুন ইদ্রিসকে বলল, “রাত হওয়ার আগে আমরা একবার ঘোষবাবুদের বাড়িটা দেখতে চাই।”

“চলেন কর্তা।” ইদ্রিস এগিয়ে চলল।

ঘোষবাবুদের অবস্থা যে এককালে ভাল ছিল, তা দূর থেকে বাড়িটাকে দেখেই বোঝা যায়। এখন অযত্ন এবং অর্থাভাব একসঙ্গে মিশে যাওয়ায় হতশ্রী হয়ে আছে। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অর্জুন ছাদে একজন যুবককে দেখতে পেল। কৌতূহলী চোখে তাদের দেখছে। তারপর ধীরে-ধীরে সরে গেল। বাড়িটা দোতলা। ঘর অনেক।

অর্জুন জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থমকে গেল। বাড়ির সামনেই একটি শিবমন্দির। মন্দিরের দশা খুবই করুণ। এখন নিয়মিত পুজো হয়তো হয়, কিন্তু অনেককাল সংস্কার হয়নি, শিবমন্দিরের ডান দিকে কোনও বটগাছ নজরে পড়ল না। বস্তুত কোনও বটগাছই ধারেকাছে নেই। সে বলল, “বাড়িটার যা চেহারা, তাতে আশেপাশে একটা বটগাছ থাকলে ভাল হত।”

ইদ্রিস সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল, “ছিল ছার। একটা বটগাছ এখানে ছিল। যে-বছর দেশ স্বাধীন হইল, সেই বছরের ঝড়ে গাছ ভাঙ্গে। এনারা তখন গাছ কেটে ফেলেন।”

“বটগাছটা কোথায় ছিল ?” অর্জুন উত্তেজিত।

“হেইডা তো মনে নাই।”

এই সময় একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কী ব্যাপার ইদ্রিস মিঞা ?"

ওরা দেখল প্রায়-অন্ধকার বাড়ি থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মানুষটি ফর্সা কিন্তু রুগ্ণ্ চেহারা। পরনের ধুতি, গেঞ্জি পরিচ্ছন্ন।

"সালাম কর্তা। ওই বটগাছটার কথা বলতে ছিলাম।"

"হঠাৎ বটগাছের কথা কেন ?"

"ছার নিজেই—।"

ইদ্রিসকে বাধা দিলেন ইউসুফ ভাই, "আমরা আজই আপনাদের গ্রামে এসেছি। মনুভাই, মানে সাহাবুদ্দিন আমাদের বন্ধু। বেড়াতে-বেড়াতে এখানে এসে মনে হল আপনার বাড়ির সঙ্গে বটগাছ থাকলে ভাল হত।"

"তা অবশ্য, আরও প্রাচীন দেখাত। আমার নাম বিমানবিহারী ঘোষ।"

"আচ্ছা! আপনার কথা আমি আকাশবিহারীর কাছে শুনেছি।"

"ও। সে আমার ভাইপো। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে দু'দিন বাদে শুটিং করতে আসবে। ওসবের সঙ্গে সে কবে জড়িত হল আপনি জানেন ?"

"খুব সম্প্রতি বলে মনে হয়।"

"হুম! আমাদের অবস্থা খুব ভাল নয়। চাষবাস থেকে কোনওমতে চলে। ক'দিন থাকবেন আপনারা ?" বিমানবিহারী জানতে চাইলেন।

"দু-একদিন।" অর্জুন জবাব দিল; "তা হলে এখানে বটগাছ ছিল ?"

"অবশ্যই ছিল। একাত্তর সালে বাজ পড়ে। সেইরাত্রে ঝড়ও হয়েছিল। ফলে কেটে ফেলতে হয়। গাছটা ছিল খুব পুরনো। এ-বাড়িব একজন হয়ে গিয়েছিল।" বিমানবিহারী যখন কথা বলছিলেন তখন অর্জুন আশপাশে পুকুর খুঁজছিল। বটবৃক্ষ থেকে দশ পা পূর্ব দিকে গেলে এ-বাড়ির দোতলার শেষ জানলাটাকে দেখা যাবে. সেই জানলাটাকে নজরে রেখে একটু ডান দিকে হাঁটলেই পুকুরের ধাপ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু পুকুরের কোনও চিহ্ন আশপাশে নেই। বটগাছ যখন ছিল, তখন পুকুরটারও তো থাকার কথা।

হঠাৎ বোধ হয় খেয়াল হয়েছে বিমানবিহারীর, বললেন, "আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কেন ? আসুন, ভেতরে আসুন।"

অর্জুন বলল, "আজ নয়। আর-একদিন আসা যাবে। এখানে এসে দেখছি বিল থাকা সত্ত্বেও সবার বাড়িতে পুকুর আছে। আপনাদের নেই ?"

"আছে। আগে দু-দুটো ছিল, এখন একটা। সেটা পেছনে।"

"আগেরটা ?"

"ওই জমিটা বিক্রি করে দিয়েছি খালেদকে। ওখানে একটা পুকুর ছিল। কেনার পরে খালেদ পুকুরটাকে বুজিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, অবস্থাপন্ন বাড়িতে বটগাছ এবং পুকুর থাকাটা কি খুব স্বাভাবিক ?" বিমানবিহারী হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"কেন বলুন তো ?" অর্জুন জানতে চাইল।

"আমার এক জ্ঞাতি এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে, তিনিও বটগাছ এবং পুকুরের খোঁজ করছিলেন।"

"তাই নাকি ? বটগাছটা ছিল কোথায় ?"

"ওইখানে।" আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখালেন বিমানবিহারী।

অর্জুন ওপরে মুখ তুলল। তার মনে হল, অন্ধকার নেমে আসা বাড়ির ছাদে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা কাজল হতে পারে। ওকে তো সবসময় সতর্ক থাকতেই হবে। কিন্তু ওর কথা বিমানবিহারীকে কীভাবে বলা যায় ? মানুষটাকে জটিল মনে হচ্ছে না, ওঁকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

"আপনাদের নাম জানতে পারলাম না !" বিমানবিহারী বললেন।

"আমি ইউসুফ, ঢাকায় থাকি, ব্যবসা করি। উনি অর্জুন।"

"এখনও ছাত্র ?"

"না, না। আচ্ছা নমস্কার।" অর্জুন আর কথা বাড়াতে চাইল না। বিদায় নিয়ে ওরা ফিরে যাচ্ছিল মনুভাইয়ের বাড়ির দিকে। ইদ্রিস পিছিয়ে পড়েছে দেখে ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন, "ওই বাড়ির মাটির তলায় যে সোনা লুকনো আছে, তা পেলে বিমানবিহারী বাকি জীবনটা আরামে থাকতে পারবেন। কিন্তু ওঁকে সে-কথা বললেন না কেন ?"

অর্জুন বলল,, "প্রথম আলাপেই ওসব বলা ঠিক নয়। তা ছাড়া খবরটা যদি মিথ্যে হয় ?"

"তা বটে। আমি একটু বুদ্ধি খরচ করব ?"

অর্জুন হাসল, "অবশ্যই।"

"ওই বটগাছটার সঙ্গে কি সোনাদানার কোনও সম্পর্ক আছে ?"

"বাঃ। আরও বলুন।"

"বিমানবিহারীর বাড়িতে জ্ঞাতি হিসেবে যে এসেছে সে হল কাজল। তাই তো ?"

"অনুমান সেইরকমের। তা হলে কথাটা আমি কাউকে জানাচ্ছি না কেন ?"

"অবশ্যই। বাজে লোককে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

"আর-একটু দেখাই যাক না।"

মনুভাইয়ের বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট আছে। সন্ধের পর ঘরে বসে মুড়ি আর চা খাওয়া চলছিল। অর্জুন দুর্গাদাসকে খবর দিয়েছিল দেখা করার জন্য। ইদ্রিস মিঞা তখন গল্প শোনাচ্ছিল, "বড়বাবুর ইন্তেকাল হওয়ার পর এই বাড়ির পতন হইছে ছার। তাঁকে সবাই এত ভালবাসত যে, আট হাজার মানুষকে খাওয়াইতে হইছিল। সেসব দিন আর নাই।"

"ডাকছেন ছার ?" দুর্গাদাস দরজায় এসে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ। তুমি তো এককালে নৌকো নিয়ে বিলে ঘুরে বেড়াতে। আজ রাত্রে আমাদের নিয়ে বের হবে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"নিশ্চয়ই, এর বুদ্ধি আছে কিন্তু মাথায় নাই।" খেঁকিয়ে উঠল ইদ্রিস মিঞা, "বুড়া হইছিস, কত্তদিন নৌকা চালাস না, রাতের বেলা মেহমানদের যদি বিপদ হয়, কী জবাব দিবি?"

"আরে মিঞা, মরা হাতি লাখ টাকা। ভরসা রাখো।" তাকে আশ্বাস দিল দুর্গাদাস।

আজ কৃষ্ণপক্ষের রাত হলেও আকাশে মায়াময় আলো ছিল. রাতের খাওয়া সেরে ওরা দুর্গাদাসের নৌকোয় উঠল। বৃদ্ধ বয়সেও দুর্গাদাসের শরীর ঈর্ষা করার মতো। খালি গা, মালকোঁচা মারা ধুতি, লগি নিয়ে বসেছে নৌকোর একপ্রান্তে। পাশে একটা সড়কি। ওই অস্ত্রটির কী প্রয়োজন, জিজ্ঞেস করাতে জানাল, "কখন কী হয় তা কে বলতে পারে?"

দিগন্তবিস্তৃত বিলে মিনিট পনেরো এলোমেলো ঘুরে বেড়াল অর্জুনরা। চমৎকার বাতাস বইছে। একটু শীত-শীত করছে। ধীরে-ধীরে গ্রামের সব আলো নিভে গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এখনও এই অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছ দুর্গাদাস?"

"হুকুম করেন।"

"শিমুলগাছটা কোথায়?"

মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে দুর্গাদাস হাত তুলল, "ওই যে।"

কালচে আকাশের সামনে ঝাপসা কিছু নজরে এল অর্জুনের। সে বলল, "কাউকে জানান না দিয়ে আমরা ওখানে যেতে চাই দুর্গাদাস।"

নৌকো ঘুরল। সামান্য জলের শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই কোথাও। যদি কেউ এগিয়ে আসা বাড়ির ছাদ থেকে তাদের লক্ষ করে, তা হলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ। গাছটার কাছে পৌঁছে যাওয়ামাত্র চাপা গলায় অর্জুন দুর্গাদাসকে থামতে বলল। মুহূর্তেই যেন অতীতের রক্তের ডাক শুনতে পেল দুর্গাদাস। লগি রেখে সড়কি তুলে নিয়ে যেরকম সতর্ক ভঙ্গিতে বসল, তাতে সেইরকম মনে হল অর্জুনের। ঘোষবাড়ির কারও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এবার হাওয়ায় দুলছে নৌকো। অর্জুনের বিশ্বাস, আজ রাত্রে কাজল একটা চেষ্টা করবে। সে যদি বটগাছটা কোথায় ছিল জেনে গিয়ে থাকে, তা হলে দেরি করার ঝুঁকি নিশ্চয়ই নেবে না।

রাত যখন বারোটা, মশার কামড়ে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছে, সেই সময় দুর্গাদাস চাপা গলায় বলল, "ছার। দ্যাখেন! একজনার মতলব ভাল নয়।"

ওরা দেখতে পেল। একটি মানুষ বারংবার বিশেষ একটা জায়গায় পায়চারি করছে। শিবমন্দির সামনে থাকায় তাকে মাঝে-মাঝেই দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন বুঝতে পারল ওটা পায়চারি নয়, জমি মাপছে কাজল। বটগাছ থেকে দশ পা

পুব দিকে গেলে বাড়িটির দোতলার শেষ জানলা দেখা যাবে। দশ পা মিলিয়ে নিচ্ছিল সে।

॥ সাত ॥

অর্জুন চাপা গলায় দুর্গাদাসকে বলল, "চুপ।"

পাতলা অন্ধকারে কাজলের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ছেলেটা দুঃসাহসী। পাশপোর্ট ছাড়া যেভাবে এখানে এসে আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে বাস করছে, তা অর্জুন নিজেও পারত না। হঠাৎ বিলের ওপাশে একটা আওয়াজ হতেই কাজল সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার মুখ, আওয়াজটা যেদিকে হল সেদিকে। অর্জুনও আওয়াজটা পেয়েছিল। দুর্গাদাসের নজরও সেদিকে। ওরা কাজলকে ধীরে-ধীরে বাড়ির ওপাশে ঝোপটার দিকে যেতে দেখল। এবং চোখের পলকেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

তিন-চারটে ছায়ামূর্তি ঝোপঝাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল কাজলের ওপর। সে শব্দ করার আগেই ওরা ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে মিলিয়ে গেল ঝোপের মধ্যে। ততক্ষণে দুর্গাদাস নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সড়কি তুলেছে ছুড়বে বলে। অর্জুন তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিল, "না, চুপ।" দুর্গাদাস যেন অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। সামলে বলল, "ছার!"

ততক্ষণে জলে বৈঠা পড়ার শব্দ হচ্ছে। ওরা দেখতে পেল দুটো সরু নৌকো পাঁই-পাঁই করে বিলের জল চিরে ছুটে যাচ্ছে। এবার দুর্গাদাসের গলা স্পষ্ট হল, "এরা বেদিয়া। লোকটারে ধইর‍্যা নিয়া গেল। কন যদি পিছন ধরতে পারি।"

"কিছু দরকার নেই। তুমি এমন একটা জায়গায় নামিয়ে দাও যেখান থেকে থানা কাছে হবে।" অর্জুন বলল। অগত্যা আদেশ পালন করছিল দুর্গাদাস।

ইউসুফভাই এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বললেন, "ওদের কি বেদে বলে মনে হল?"

"আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। তবে দুর্গাদাসের দেখতে ভুল হবে না।"

"আপনি কি অনুমান করেছিলেন বেদেরা আজ আসবে?"

"না। এটা আমার মাথায় ছিল না। আমার মনে হয়েছিল কাজল আজই গুপ্তধন খুঁড়তে নামবে। তা ছাড়া বেদেরা যে ওর লুকিয়ে থাকার জায়গাটা জানতে পেরেছে, তাই আমার জানা ছিল না। আচ্ছা, প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে এরা কীরকম ভয়ঙ্কর হয়?"

"এরা মাঝে-মাঝেই আইনকানুন মানে না বলে পুলিশের খুব অসুবিধে হয়।"

তীরে নেমে দুর্গাদাসের দেখানো পথে ওরা দ্রুত থানায় চলে এল। থানায় একজন সেপাই বসে ঢুলছিল। তাকে পাঠানো হল অফিসারকে বিছানা থেকে

তুলে আনতে। তিনি এলেন খুব বিরক্ত হয়ে। অর্জুনদের দেখে একটু অবাকও!

অর্জুন বলল, "মাফ করবেন, ডিস্টার্ব করতে বাধ্য হচ্ছি। ওই বেদের দল এইমাত্র ঘোষবাবুদের অতিথিকে তুলে নিয়ে গেছে নৌকোয়।"

"সে কী! কী করে তুলল?"

"ভদ্রলোক পায়চারি করছিলেন মন্দিরের কাছে। ওরা বাধা পায়নি।"

"আপনারা দেখলেন কী করে?"

"আমরা বিলে বেড়াচ্ছিলাম খাওয়াদাওয়ার পরে। নৌকো চড়তে মন্দ লাগছিল না।"

"আপনি শিওর, ওরা বেদে?"

"আমাদের মাঝি তাই বলল। কিন্তু এই লোকটাই যে ওদের মুক্তো চুরি করেছে— !"

হাত তুলে অর্জুনকে থামালেন অফিসার, "আমারই ভুল হয়েছে। বিকেলে আপনারা চলে যাওয়ার পরে বেদেরা এসেছিল, জানতে, আসামিকে পাওয়া গেছে কি না। তাদের ভরসা দিতে পারিনি। তখন ওরা বলেছিল কালীগঞ্জে তিনজন নতুন মানুষ এসেছে। সেই খবর আমি জানি কি না। তাদের আপনাদের কথা বললাম। আর জানালাম ঘোষবাবুর বাড়িতে যিনি এসেছেন তার দাড়ি নেই। ওরা নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর নিয়েছে। ঘোষবাবু জানেন ব্যাপারটা?"

"বোধ হয় না। আপনি কি ছেলেটাকে উদ্ধার করতে পারেন না?"

"নিশ্চয়ই করতে হবে। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে শাস্তি পাবেই। এই বেদেরা খুব ডেঞ্জারাস। এর মধ্যে যদি ওকে কেটে বিলে ফেলে না দেয়, তা হলে...।" অফিসার ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন লোক ডাকতে। একটু বাদে ভ্যান রেডি হয়ে গেল। ওদের সামনে দিয়ে সেটা রওনা হতে আর কিছু করার ছিল না। ইউসুফভাই বললেন, "দারোগা নিশ্চয়ই বেদেদের ডেরায় যাচ্ছেন।"

বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিল ওরা। অর্জুনের ঘুম আসছিল না। ওপাশের খাটে ইউসুফভাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। অর্জুনের মনে হল, সন্ধেবেলায় কাজলের পরিচয় অফিসারকে জানিয়ে দিলে ওকে বেদেদের হাতে মারা যেতে হত না। কয়েক বছর জেল খাটিয়ে বাংলাদেশ সরকার হয়তো ওকে ভারতবর্ষে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। মাঝরাতের পর দরজায় শব্দ হল। কেউ টোকা দিচ্ছে।

অর্জুন উঠে দরজা খুলতেই দুর্গাদাসকে দেখতে পেল। দুর্গাদাসের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। সে চমকে উঠল, "কী হয়েছে?"

"লোকে বলে মানুষের উপকার করতে নাই। বড় কর্তা বলতেন কথাডা

মিথ্যা। কিন্তু আজ বুঝছি লোকের কথাই সত্যি।" দুর্গাদাস বলল।

তাকে ঘরে ঢুকিয়ে যতটা পারে ক্ষত মুছিয়ে দিল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এই গ্রামে ডাক্তার আছেন?"

"হ্।"

ইউসুফভাইয়ের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দৃশ্যটি দেখে তিনি উদ্যোগ নিলেন ডাক্তার ডেকে আনার। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইজিচেয়ারে দুর্গাদাসকে শুইয়ে দিল অর্জুন। বলল, "বিশ্রাম নাও।" ততক্ষণে বাড়ির অনেকেই জেগে উঠেছে। ইদ্রিস মিঞাও হাজির। অতএব সবার সামনেই ঘটনাটা বলতে হল। অর্জুনদের তীরে নামিয়ে দিয়ে দুর্গাদাসের মনে হয়েছিল, চোখের সামনে ওরা অন্যায় করে পার পেয়ে যাবে এমনটা সহ্য করা যায় না। সে নিজে ডাকাতি করা ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন, কিন্তু অন্যায় সহ্য করবে কেন? সঙ্গে-সঙ্গে সে নৌকো নিয়ে ওদের পেছনে ধাওয়া করেছিল। যেহেতু বেশ কিছুটা সময় চলে গেছে, তাই প্রথমে ওদের খুঁজে পায়নি সে। গাজিপুরের কাছে এসে শেষপর্যন্ত ওদের দেখা পায়। বেদেরা অত্যাচার করছিল লোকটার ওপর। তাকে দেখতে পেয়ে বলে সরে যেতে। বলে ওই লোকটা চোর, তাদের মুক্তো চুরি করেছে। মুক্তো বের করলে হাত কেটে ছেড়ে দেবে, না করলে মুণ্ডু কাটবে। দুর্গাদাস প্রতিবাদ করে বলে, চুরি করেছে যখন, তখন থানায় নিয়ে যাও। বিচার যা করার, তা পুলিশ করবে। তখন বেদেরা তাকে শাসাতে থাকে। সেই শাসানি শুনে তার মাথায় রক্ত উঠে যায়। নৌকো কাছে ভিড়িয়ে সড়কি নিয়ে লাফিয়ে পড়ে সে। বেদেদের সঙ্গে মারপিট হয়। শরীরে কাটা-ছেঁড়া হলেও দমে যায় না সে। তারপর লোকটাকে মুক্ত করে বলে ওর সঙ্গে হাত মেলাতে। বেদেদের সে তখন জলে ফেলে দিয়েছিল। চারটে রুগ্‌ণ বেদে তার সঙ্গে পারবে কেন? ঠিক তখনই ওই লোকটা তার কাঁধে বৈঠা দিয়ে আঘাত করে। নৌকোর ওপর পড়ে যায় দুর্গাদাস। সেই সময় লোকটা আর-একটা নৌকো পাড়ে ভিড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। বেদেরা নৌকোয় উঠে দুর্গাদাসের অবস্থা দেখে বলে, "সাপকে দুধ খাওয়ালেও যে ছোবল মারে, তা আর কবে বুঝবেন ভাই।" দুর্গাদাস ওদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে, যেভাবেই হোক লোকটাকে ধরে শাস্তি দেবে। ততক্ষণে বেদেরা ওকে চিনতে পেরেছিল। তার ডাকাতি-জীবনের কাহিনী একজন জানত। ওরাই দয়া করে তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে অবাক! যে-পরিমাণ আহত হয়েছে দুর্গাদাস, তাতে এই বয়সে এতদূরে আসতে পারাটাই বিস্ময়কর। তখনই তাকে গাজিপুরের হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হল। ভোর হল। ঘুমের কোনও অবকাশই ছিল না। আলো ফুটতেই অর্জুন ইউসুফভাইকে নিয়ে হাঁটতে বের হল। ইউসুফভাই বললেন, "মনে হয় কাজল এবার এই তল্লাট ছেড়ে

পালিয়ে যাবে।”

“অসম্ভব। লোভ এমন জিনিস, একবার কামড়ালে আর ছাড়তে চায় না। গাজিপুর এখান থেকে কতদূরে জানেন?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“আসবার সময় মনুভাই দেখিয়েছিলেন। হেঁটেই আসা যায়।”

“তা হলে ও গাজিপুরে আস্তানা গাড়বে আর রাত্রে ঘোষবাড়িতে হানা দেবে।”

“পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হয়!” ইউসুফভাই বললেন, “ডেঞ্জারাস লোক, যার জন্য বাঁচলি, তাকেই তুই মারলি?”

কথা বলতে-বলতে ওরা ঘোষবাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে তখন পুলিশ অফিসারের ভ্যান দাঁড়িয়ে। ওরা এগোতেই অফিসার আর বিমানবিহারীকে দেখা গেল কথা বলতে-বলতে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “খবর আছে কিছু?”

“কী করে থাকবে? গোয়েন্দা স্পটে থাকলে পুলিশ বোকা হয়ে যায়।”

“আপনি কিন্তু আমাকে অনর্থক ঠুকেছেন। আমি গোয়েন্দা নই।”

“তা ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ছাড়া আপনি গোয়েন্দাগিরি করতেও পারেন না।”

“নিশ্চয়ই। তবে সত্যসন্ধান করে আপনাকে জানাতে পারি।”

“গুড। আপনার আসামি পালিয়ে গেছে। বেদেগুলো মিথ্যে বলবে না।”

“আমার সন্দেহ, গাজিপুরেই আছে।”

“থাকলে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ধরা পড়বে। বাপধনের বিরুদ্ধে এখন দুটো চার্জ। মুক্তো চুরি এবং দুর্গাদাসকে আঘাত করা, যা থেকে মৃত্যু হতে পারত।”

“আরও আছে।” অর্জুন হাসল।

“তাই নাকি? কীরকম?”

“লোকটার আসল নাম কাজল মুখার্জি। তার সঙ্গে ঘোষ-পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই। বিমানবিহারী বাবুর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে এ বাড়িতে জাঁকিয়ে বসেছিল ভুয়ো পরিচয় দিয়ে।”

বিমানবিহারী চমকে উঠলেন, “সে কী! ও বিজনকাকা আর ওর ছেলে গগনবিহারীর নাম করল! ওদের কথা বলল!”

“স্বাভাবিক। যাতায়াত আছে। ওখানে সে আর একটা ক্রাইম করেছে, যা অবশ্য আপনাদের কাজে লাগবে না। যে অপরাধ শুনলে আপনি অবাক হবেন তা হল, কাজলবাবুর সঙ্গে এ-দেশে আসার কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই।”

“তার মানে ও উইদাউট পাশপোর্ট এসেছে?” অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন।

“ঠিক তাই।”

“তা হলে মশাই এ-কথাটা আমাকে কাল থানায় গিয়ে বলেননি কেন?”

"আমার নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল যে, ওই লোকটাই কাজল। কাজলের দাড়ি ছিল। আর আপনি বলেছেন এর দাড়ি নেই। তা হলে কী করে বলি ?"

"হুম। আমি গাজিপুরে যাচ্ছি।" অফিসার ভ্যানে চেপে চলে গেলেন।

এবার বিমানবিহারী বললেন, "আচ্ছা, এই ধাপ্পাবাজ লোকটি আমার বাসায় উঠতে গেল কেন বলুন তো ? আমার আত্মীয়দের খবরই বা নিয়ে এল কেন ?"

"এর কারণ একটা চিঠি।"

"কী চিঠি ? কার লেখা ?"

"নুটুবিহারী বলে কেউ আপনাদের বংশে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। তিনি আমার বাবার পিতামহের বড় ভাই। ওঁর ছেলে ইন্ডিয়ায় চলে গেলেও তিনি আজীবন আমাদের সঙ্গে ছিলেন।" বিমানবিহারী বললেন।

"আপনাদের ধারণা ছিল একান্নবর্তী পরিবারের শরিক হওয়া সত্ত্বেও নুটুবিহারী তাঁর ছেলেকে সাহায্য করতে প্রচুর টাকা ইন্ডিয়ায় পাঠিয়েছেন।"

"হ্যাঁ। আমার ঠাকুর্দা বলতেন তিনি সোনাদানাও ছেলেকে দিয়ে দিয়েছেন।"

"আর তাই আপনি বিজনবিহারীর কাছে অর্থসাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন ?"

"আপনি জানলেন কী করে ?"

"কথাটা কি মিথ্যে ?"

"না। সত্যি। পাকিস্তান আমলে আমি গিয়েছিলাম।"

"বিজনবিহারী বলেন তিনি এবং তাঁর পিতা সমস্ত টাকা শোধ করে দিয়েছেন।" অর্জুন বলল, "আর সোনাদানা কিছুই নেননি।"

"তা হলে সেগুলো গেল কোথায় ?"

"হ্যাঁ। সেটাই রহস্য ! আর সেই কারণে কাজল মুখার্জির মতো একজন লোভী মানুষ বিনা পাশপোর্টে এখানে উপস্থিত হয়েছে। সে জানতে পেরেছে ওই সোনাদানা এই বাড়ির কোথাও লুকোনো আছে। সেই কারণেই তাকে ছদ্মপরিচয়ে আপনার এখানে উঠতে হয়েছিল।" অর্জুন শান্ত গলায় বুঝিয়ে বলল।

"এ-বাড়িতেই সোনাদানা লুকোনো আছে ?" বিড়বিড় করলেন বিমানবিহারী।

"কাজল সেই খবরই পেয়েছে।"

"আচ্ছা অর্জুনবাবু, আপনি কি সত্যি গোয়েন্দা ?"

"গোয়েন্দা নই, সত্যসন্ধানী।"

"ও। কিন্তু আপনাকে এইসব খবর কে দিল ?"

"আমার মক্কেলের নাম আপনাকে বলতে বাধ্য নই।"

"আপনি বাংলাদেশে এসেছেন কেন ? বেড়াতে, না সত্যসন্ধান করতে ?"

"দুটোই। বাংলাদেশের হৃদয় দেখার খুব সাধ ছিল। পদ্মা, গঙ্গা, মেঘনা,

যমুনা, শীতলক্ষ্যা অথবা আড়িয়াল খাঁ না দেখলে নিজেকে বাঙালি বলা যাবে না। সত্যসন্ধানের কাজটা যখন পাওয়া গেল তখন রথও দেখব কলাও বেচব।"

"আপনি জানেন সেইসব সোনাদানা কোথায় লুকোনো আছে?"

অর্জুন হাসল, "জানি। কিন্তু আরও অনেক কিছু না জানা পর্যন্ত বলব না।"

কাজল মুখার্জি এখনও ধরা পড়েনি। গত দু'দিনে গাজিপুরের মানুষ হঠাৎ-হঠাৎই একজন অচেনা মানুষকে দেখেছে, কিন্তু কিছু বলার আগেই সে উধাও হয়ে গিয়েছে। পুলিশের কল্যাণে তারা সবাই জানে একজন অপরাধী সেখানে লুকিয়ে আছে। গ্রামের মানুষ সজাগ থাকা সত্ত্বেও কাজল গ্রেফতার এড়িয়ে যাচ্ছে।

গাজিপুরের হাসপাতালে বৃদ্ধ দুর্গাদাস শুয়ে আছে সমস্ত শরীর ব্যান্ডেজে মুড়ে। অর্জুন এবং ইউসুফভাই তাকে দেখে এসেছে। দিনদশেক থাকতে হবে তাকে হাসপাতালে।

বিমানবিহারী গত দু' রাত বাড়ি পাহারা দিয়ে কারও দেখা পাননি। অবস্থা এখন এমন, কাজলের পক্ষে যে-পথে এ-দেশে এসেছিল সেই পথে ভারতে ফিরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ইউসুফভাই ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁর অনেক কাজ। অর্জুন ওঁকে ঢাকায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তিনি যেতে রাজি নন। মাঝে-মাঝেই পোস্ট অফিসে গিয়ে বাড়িতে ও অফিসে ফোন করছিলেন। কালীগঞ্জের রহস্য তাঁকে আটকে রেখেছিল। অর্জুন এই দুটো দিন মাছ ধরে কাটাল। ইদ্রিস মিঞার হাতছিপ দিয়ে সে অনেক ছোট-মাছ ধরল।

তৃতীয় দিনে শুটিং পার্টি এল কালীগঞ্জে। নায়ক-নায়িকাকে দেখতে যেন মেলা বসে গেল। বিমানবিহারীর বাড়িতে তাদের রাখা হল, বাকিরা বিলের পাশে তাঁবু ফেলল। ইউসুফভাই শুটিং দেখতে গিয়েছিলেন, সন্ধের মুখে ফিরে এলেন আকাশবিহারীকে সঙ্গে নিয়ে। আকাশবিহারীর পেছনে সেই প্রযোজক।

আকাশবিহারী বললেন, "কী মশাই, আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানালাম ঘোষবাড়িতে থাকার ব্যাপারে, আর আপনি মনুর বাড়িতে এসে উঠেছেন?"

অর্জুন ইউসুফভাইকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ওঁকে সব কথা বলেননি?"

"বলেছি, কিন্তু ওর কানে ঢুকছে না।" ইউসুফভাই বললেন।

"চলুন আপনি আমাদের ওখানে। জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।" আকাশবিহারী বললেন।

"অনেক ধন্যবাদ। এখানে আমি খুব ভাল আছি। আড্ডা মারার দরকার

হলে যাওয়া যাবে, বেশিদূর নয় তো। কাজ ভাল হচ্ছে ?”

“তা হচ্ছে। ও হ্যাঁ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একজন প্রতারককে বাড়ি থেকে তাড়াতে পেরেছেন বলে। আরে, আমাদের বাড়িতে গুপ্তধন লুকোনো আছে, অথচ সেটা আমিই জানতাম না। শোনামাত্র আমি মাসুদকে বললাম, আর তোমার ভয় নেই, ছবি শেষ হবেই।”

“মাসুদ কে ?”

“ওই যে। বিখ্যাত প্রযোজক।”

সেই বিশাল কালো মানুষটি মাথা নোয়ালেন সামান্য।

কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা বলার পর কাজের কথায় এলেন আকাশবিহারী, “এবার বলুন, গুপ্তধন কোথায় লুকোনো আছে ? আপনি ইন্ডিয়া থেকে খবর নিয়েই এসেছেন। আমি যদি কালীগঞ্জের কথা নাও বলতাম তবু আপনাকে ওই কারণে এখানে আসতে হত !”

“শুনেছি সেটা আপনাদের বাড়ির মধ্যেই আছে।”

“সত্যি বলছেন না। মাটির তলায় থাকলে দু'বিঘে জমি চষতে হবে। কতটা নীচে আছে তাও জানি না। কিন্তু আপনি জানেন।” আকাশবিহারী এবার সিরিয়াস।

অর্জুন হাসল, “আপনাদের বাড়ির মাটির নীচে যদি সোনাদানা পাওয়া যায় তা হলে এখন তার মালিক হবে কে ?”

“কে আবার ? আমি। আপনাদের ওই বিমানবিহারীর ক্ষমতা আছে আমার বিরুদ্ধে কথা বলার ?” ফোঁস করে উঠল আকাশবিহারী।

“তা হলে আপনার উচিত এখনই কাজলকে খুঁজে বের করা।”

“কাজলকে ?”

“হ্যাঁ। ওর কাছেই গুপ্তধনের নকশা আছে।”

“আপনি যে সত্যি বলছেন তার প্রমাণ কী ?”

“সত্যি বলতে পারছি বলেই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।”

“কিন্তু আপনিও তো একজন প্রতারক হতে পারেন। ওই কাজলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এখানে আসতে পারেন। কী প্রমাণ আছে আপনার স্বপক্ষে ?”

“এ-প্রশ্নের জবাব আপনাকে দেব না আকাশবিহারীবাবু। নিজেকে দিয়ে আপনি আমাকে বিচারের চেষ্টা করবেন না। দমদম এয়ারপোর্টে কিসের ভয়ে ওই মানুষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে সাহস হয়নি, টেলিফোনের অভিনয় করতে হয়েছিল সেটা আমি জানি !” অর্জুন কথাটা বলামাত্র আকাশবিহারী চমকে উঠলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর চোখ জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, “তার মানে আপনি আমাকে অনুসরণ করছিলেন ?”

“না। মজার ব্যাপার হল কাঁচা ক্রিমিনালরা সহজেই নিজেকে ধরিয়ে দেয়।”

"আপনি সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে খোঁচা মারছেন। এর ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে।" আকাশবিহারী আর দাঁড়ালেন না। দলবল নিয়ে চলে গেলেন। ইউসুফভাই বললেন, "আপনি কাজটা ভাল করলেন না।"

অর্জুন হাসল, "মাঝে-মাঝে এরকম খারাপ কাজ করতে হয় ইউসুফভাই।"

সেই রাতটাও ভালভাবে কাটল। শেষরাতে কেউ বা কারা বিল পেরিয়ে ঘোষবাড়িতে উঠেছিল নৌকো নিয়ে। আকাশবিহারী শুটিং পার্টি নিয়ে আসার পরে বিমানবিহারী আর বাড়ির বাইরে আসেননি। আকাশবিহারীর লোকজন আগন্তুককে তাড়া করতে একটা নৌকোকে বিলে ছুটে যেতে দেখা যায়। ইউসুফভাইয়ের শুটিং দেখতে মজা লাগছে। তিনি সেখানে গেলেন। অর্জুন সাত-সকালে থানায় এল। অর্জুন বলল, "অফিসার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাজল গাজিপুরেই আছে। গত রাত্রে সে-ই এসেছিল।"

"ইম্‌পসিব্‌ল। আমি যেভাবে খুঁজেছি তাতে তার থাকার কোনও চান্স নেই।"

"বেশ। যে-লোকটা নৌকো নিয়ে এসেছিল তাকে গাজিপুরের দিকেই যেতে দেখা গেছে।"

"হুম। চলুন, যাবেন গাজিপুরে?"

এরকম প্রস্তাব পাবে আশা করেনি অর্জুন। অফিসার তাকে এড়িয়েই চলছিলেন।

গাজিপুরে পৌঁছে অর্জুনের অনুরোধে বিলের দিকটায় গেলেন অফিসার। সেখানে গিয়ে জানা গেল ভোরবেলায় একটা নৌকোকে তীরে দেখা গেছে ভাসতে, যেটার ওখানে থাকার কথা নয়। নৌকোর মালিক বলল, কেউ রাত্রে নির্ঘাত ওটা চুরি করেছিল.

কাজল যদি সেই চোর হয়, তা হলে সে এই জায়গা দিয়েই গাজিপুরে ঢুকেছে। বিলের পাশে সবক'টি ঝোপঝাড়, গাছ গ্রামের মানুষদের আবার খুঁজে দেখতে বলা হল। অর্জুন চারপাশে নজর রেখে গ্রামের দিকে এগোল। সামনেই একটা কবরখানা। বেশ পুরনো হলেও নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। আগাছা নেই বললেই চলে। এখানে কাজলের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। অর্জুনের দৃঢ় বিশ্বাস, সে লুকিয়ে আছে কোনও মানুষের কাছেই। তিনদিন না খেয়ে কেউ থাকতে পারে না। বনে-জঙ্গলে থাকতে হলে কাজলকে অভুক্ত থাকতে হবে।

অফিসার ওর পাশে এসে দাঁড়ালে অর্জুন বলল, "আপনার পরামর্শ চাই।"

"বলুন।"

"আকাশবিহারী ঘোষকে আপনার কীরকম মনে হয়?"

"একটু বেপরোয়া। রাগী।"

এই সময় দুটো দিশি কুকুর কবরখানার মুখটায় দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করল।

অফিসার একটা ঢিল ছুড়লেন তাদের তাড়াবার জন্য। কুকুরদুটো একটু সরে গিয়েও ফিরে এল।

"কাজলের ধারণা, ঘোষবাড়ির মাটির তলায় গুপ্তধন আছে। আকাশবিহারী সেইটে কব্জা করতে চান। অথচ তিনি জানেন না কোথায় সেটা লুকোনো আছে। আপনি একটু খোঁজ নিন, এর মধ্যে আইনসঙ্গত কোনও ব্যাপার আছে কি না!"

"তার মানে?"

"বাংলাদেশ সরকারের কোনও আইন আছে কি না!"

"নিশ্চয়ই। যার কোনও দাবিদার নেই তা সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে।"

"দাবিদার আছেন, কিন্তু তাঁরা জানেন না সম্পত্তির পরিমাণ কী অথবা কে রেখেছিল!"

"বাঃ, তা হলে দাবি টিকবে কেন?"

"কাজলের কাছে গুপ্তধনের বিশদ বিবরণ আছে। আকাশবিহারী যদি তাকে ধরতে পারেন, তা হলে ওঁর পক্ষে আগাম দাবি জানানো সুবিধে হবে।"

"বুঝতে পেরেছি। আমি আজই বড়কর্তাদের ব্যাপারটা জানাচ্ছি। কিন্তু আপনি যখন এত কথা জানেন, তখন গুপ্তধনের হদিসটা আপনারও জানা স্বাভাবিক।"

"আমি জানি। কিন্তু অফিসার, যিনি ওই সম্পত্তি মাটির তলায় পুঁতে গিয়েছিলেন, তিনি চাননি আকাশবিহারীরা ওগুলোর অধিকারী হোক।"

"এর কোনও প্রমাণ আছে?"

"হ্যাঁ। উনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটা কাজলের কাছে আছে।"

কুকুরদুটো চিৎকার করছিল। ওরা এখন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। একটা পুরনো কবরের সামনে গিয়ে ওরা গলা তুলছিল। অফিসার ঢিল মারতেই ওরা পালিয়ে গেল। অর্জুন কবরটার দিকে তাকাল। বেশ পুরনো কবর। পাশে মাটি উঠেছে। আর একটা মোটা পাটকাঠি ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে। অফিসার ফিরে যাচ্ছিলেন। অর্জুন ওঁকে অনুসরণ করতে করতে আর-একবার কবরের দিকে তাকাতেই মনে হল পাটকাঠিটা স্থান পরিবর্তন করেছে। যেদিকে ছিল তার উলটোদিকে ঢলেছে এখন, অথচ বাতাস বইছে না।

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়তেই অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

"এসব কবরের নীচে কফিন আছে?"

"থাকার কথাই। তবে বেশি পুরনো হয়ে গেলে শরীরের সঙ্গে সেগুলোও পচে যায়।"

"সেখানে মানুষ চেষ্টা করলে লুকিয়ে থাকতে পারে?"

"খুব কষ্ট হবে। নিশ্বাসের অসুবিধে হবেই।"

"যদি নাকের সামনে কোনও নলজাতীয় কাঠি লাগানো থাকে ?"

অফিসার হেসে ফেললেন, "এমন অভিনব বুদ্ধি কার মাথায় আসবে ?"

"আমার মাথায় যখন এল, তখন কাজলের মাথাতেও আসতে পারে।"

"তা হলে সবক'টা কবর খুঁড়ে দেখতে হয়। ব্যাপারটার সঙ্গে এলাকার মানুষের সেন্টিমেন্ট ও ধর্মবিশ্বাস জড়িয়ে আছে। প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে পারবেন না।"

"সবক'টা কবর খুঁড়ব কেন ? আমরা বেরিয়ে গেলে কুকুরদুটোকে কবরখানায় ঢুকতে দিন। যে-কবরটার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা চেঁচাবে, সেটাই পরীক্ষা করুন।"

"কোনও ক্লু পেয়েছেন নাকি ?"

"আপনি আমার কথামতো পরীক্ষা করে দেখুন না ! এটা তৃতীয় ব্যক্তি জানবে না।"

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলে কুকুরদুটোকে দেখা গেল না। তারা তাদের ধান্দায় চলে গেছে। অফিসার খুব নিরাশ হলেন, "এখন কুকুর পাই কোথায় ?"

দূর থেকে কবরটাকে দেখার চেষ্টা করল অর্জুন। কাঠিটা আবার জায়গা বদলেছে। সে হাত বাড়িয়ে কবরটা দেখিয়ে দিল অফিসারকে। অফিসার সেদিকে এগিয়ে গেলেন। প্রথমে জায়গাটাকে ঘুরে দেখলেন ভদ্রলোক। তারপর হাত বাড়িয়ে কাঠিটাকে হ্যাঁচকা টানে ওপরে তুলে নিলেন। চোখের সামনে সেটা ধরে মাথা নাড়লেন।

তাঁর ইঙ্গিতে সবাই কবরটার কাছে পৌঁছে গেল। দেখা গেল, কবরের নীচের দিকে একটা গর্ত আছে, যার ভেতর দিয়ে নীচে ঢোকা অসম্ভব নয়। অফিসারের হম্বিতম্বিতে কা   হল। ধীরে-ধীরে কাজলের মুণ্ডু এবং দেহ বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাকে বেঁধে ফেলা হল। এখন তার চেহারা খুবই খারাপ দেখাচ্ছে। তিনদিনে পেটে তেমন কিছু পড়েনি বোঝা যাচ্ছিল।

অর্জুন বলল, "কাজলবাবু, আমাকে মনে পড়ছে ?"

ফ্যালফ্যাল করে তাকাল ছেলেটা। কথা বলল না।

"আমি অর্জুন। আপনি যখন পাশপোর্টের চেষ্টায় জলপাইগুড়ির থানায় গিয়েছিলেন, আমি তখন সেখানে বসে ছিলাম। জলপাইগুড়ির বদনাম করে ফেললেন আপনি !"

"ও ! তোর জন্যই আমার এই অবস্থা ?" হিসহিস করে উঠল ছেলেটা।

আসামি ধরা পড়েছে শুনে পিলপিল করে লোকজন ছুটে আসছিল। অফিসার আর দাঁড়ালেন না। কাজলকে ভ্যানে তুলে সোজা থানায় ফিরে এলেন।

থানায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় কাজল প্রথমে কিছুই বলছিল না। অল্পস্বল্প অত্যাচারের পর সে মুখ খুলল, "আমি কোনও অন্যায় করিনি।"

"পাশপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশে ঢোকোনি ?"

"না। পাশপোর্ট চুরি গিয়েছে।"

"বেদেদের মুক্তো চুরি করোনি ?"

"না।"

"নিজেকে ঘোষবাবুদের আত্মীয় বলে মিথ্যে পরিচয় দাওনি ?"

"না। আমি সত্যিই আত্মীয় হতে যাচ্ছি। জলপাইগুড়ির গগনবিহারী ঘোষের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা।"

"দুর্গাদাসকে তুমি মারোনি ?"

"না। সে নিজেই পড়ে গিয়েছিল।"

"তা হলে কবরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলে কেন ?"

"বেদেদের ভয়ে। ভেবেছিলাম সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে থানায় গিয়ে নিজেই সাহায্য চাইব।"

অফিসার বললেন, "এ যে ঘোর মিথ্যেবাদী !"

অর্জুন বলল, "এই ঘটনার পরে টুকু বেঁচে যাবে, ওটুকুই লাভ।"

"টুকুকে তুই চিনিস ?" লাল চোখে তাকাল কাজল।

"চিনব না কেন ? ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে আপনি চিঠিটা চুরি করে গুপ্তধনের লোভে এতবড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন।" অর্জুন বলল।

অফিসার বললেন, "চিঠিটা দেখি ?"

"কেন ?"

"আমার দরকার, তাই। প্রশ্ন করা হচ্ছে। দাও চিঠিটা।"

"আমার কাছে নেই।"

তৎক্ষণাৎ ওকে সার্চ করা হল। দেখা গেল চিঠিটা কাজলের সঙ্গে নেই। এই সময় থানার বাইরে হইচই শোনা গেল। আকাশবিহারী দলবল নিয়ে থানায় ঢুকলেন, "আপনি কি ওঁকে অ্যারেস্ট করেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"অভিযোগ ?"

"অনেক।"

"উনি আমাদের অতিথি। আমি ওর জন্য জামিন হিসেবে এসেছি।"

"কোর্টে গিয়ে বলবেন।"

"অফিসার। আমার সঙ্গে ঝামেলা করবেন না। আমি সই করে ওকে নিয়ে যাচ্ছি। যখনই বলবেন কোর্টে পৌঁছে দিয়ে যাব কিন্তু ঘোষবাড়ির বদনাম হতে দেব না।"

"আপনি তো মশাই একে আগে চিনতেন না ?"

"ঘোষবাড়ির রক্ত আমার শরীরে বইছে যে !" টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, "একটা ফোন করছি।"

ফোনে যার সঙ্গে কথা বললেন ভদ্রলোক, তিনি কোনও বড়কর্তা হবেন। নিজে কথা শেষ করে অফিসারকে দিলেন রিসিভার। অফিসার আপত্তি জানাচ্ছিলেন। অফিসার রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, "কাজ হল না আকাশবাবু। বস আমাকে আইনমাফিক চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে আপনি ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে আলাদা কথা বলতে পারেন।"

"বেশ। তাই হোক।"

পাশের ঘরে ওদের পাঠানো হলে অর্জুন অফিসারকে বলল, "আপনার গাড়িটাকে কিছুক্ষণের জন্য পেতে পারি ?"

"কেন ?"

"খুব জরুরি ব্যাপার। এসে বলব।"

ভদ্রলোকের অনুমতি এবং একজন সেপাই সঙ্গে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে অর্জুন ছুটল গাজিপুরে। কবরখানায় পৌঁছে ও দৌড়ে গেল সেই কবরের কাছে, যেখান থেকে কাজলকে ধরা হয়েছিল। অনেক কষ্টে নীচে নামল সে। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। হাতড়ে-হাতড়ে কিছুই পাওয়া গেল না প্রথমে। তারপর উঠে এসে সে সেপাইকে একটা টর্চের ব্যবস্থা করতে বলল। মাটির নীচে শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। টর্চ পুলিশের গাড়িতেই ছিল। সেটা নিয়ে আসার পর অর্জুন আবার নীচে নামল। এবং তখনই সে কঙ্কালটাকে দেখতে পেল। একপাশে কাত করে রাখা হয়েছে। ভেতরে কাজলের কোনও জিনিসপত্র নেই। কঙ্কালটাকে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে-করতে হঠাৎ নজরে এল। করোটির গর্তে সেলোফেনে মোড়া কিছু ঢোকানো আছে। জিনিসটা বের করতেই সে খামটাকে পেয়ে গেল। পবনবিহারীকে লেখা নুটুবিহারীর চিঠি। যে-চিঠি চুরি করে টুকু দিয়েছিল কাজলকে।

ওপরে উঠে আসামাত্রই অর্জুন চিৎকারটা শুনতে পেল, "হ্যান্ড্‌স আপ।"

সে দেখল আকাশবিহারী এবং মাসুদ কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশবিহারীর হাতে রিভলভার। আকাশবিহারী বললেন, "চিঠিটা দে।"

"গুলি করুন। কিন্তু চিঠিটা পাবেন না।"

"ইয়ার্কি হচ্ছে ? ওই চিঠি আমার দরকার। আর দরকার মেটাতে আমি কখনও আপস করি না। তিন গুনব, তার মধ্যে না পেলে ...।"

অর্জুন খামটাকে মুঠোর মধ্যে করে সেপাইটার দিকে তাকাল। সে তালপাতার মতো থরথর করে কাঁপছে। খামটাকে মাটিতে ফেলে দিল অর্জুন।

"মাসুদ, ওটাকে তোল। আমাদের আর স্মাগলিং-এর ব্যবসা করতে হবে না।"

মাসুদ এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ আর্তনাদ করে মাথা দু'হাতে চেপে ধরে বসে পড়লেন আকাশবিহারী। অর্জুন দেখল রিভলভার তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। সে দ্রুত ছুটে গিয়ে রিভলভার তুলে নিতেই ইদ্রিস মিঞাকে দেখা

গেল এগিয়ে আসতে। বৃদ্ধের হাতে লম্বা গুলতি।

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, "আপনি ?"

"কেন ছার ? একা দুর্গাদাসই পারে, আমি পারি না ? আপনি আমাদের মেহমান, সেই মেহমানের ওপর এ-ব্যাটা বন্দুক ওঠায় ?"

"আপনি এখানে এলেন কী করে ?"

"দুর্গাদাসরে দেখতে আইছিলাম। নাতি কইছিল গুলতি আনতে। এইটা কাজে লাগল।" ইদ্রিস গলা তুলল, "এই মিঞা, পালাইবেন না, এই বুড়ার হাতে এখনও তাগদ আছে।"

আকাশবিহারী, মাসুদ এবং কাজলকে সদরে চালান করে দিয়ে অফিসার বললেন, "বড়কর্তা আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বলেছেন।"

"দুর। আমি কী করলাম ! সবই তো আপনি করলেন।"

"আপনি কাল থাকবেন না ?"

"না। আজই চলে যাচ্ছি।"

"কিন্তু কাল বড়কর্তার সামনে মাটি খোঁড়া হবে।"

"সেইজন্যই থাকব না। চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছি। ক্লায়েন্টের চিঠি চুরি গিয়েছিল, সেটা তাঁকে ফেরত দেব। আপনি এর জেরক্স রেখে দিন। গুপ্তধন পাওয়া গেলে তা ওই চিঠি অনুযায়ী এখানকার ঘোষ-পরিবারের প্রাপ্য নয়। জলপাইগুড়ির ঘোষ-পরিবার যেহেতু এ দেশের নাগরিক নন, তাই তাঁরাও দাবি করতে পারেন না। কালীগঞ্জকে ভালবাসতেন বলে নুটুবিহারী এখানেই থেকে গিয়েছিলেন। অতএব ওঁর সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকারের পাওয়া উচিত, যাতে তা দেশের মানুষের উপকারে লাগে।"

"দৃশ্যটা দেখবেন না ?"

"না।"

"কেন ?"

"যদি কিছুই না থাকে ? যদি নুটুবিহারী মিথ্যে কথা লেখেন ? যদি এই চিঠিটাই জাল হয় ? অথবা ইতিমধ্যে কেউ গুপ্তধন তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে ? কী দরকার মশাই আর সমস্যা বাড়িয়ে !" অর্জুন হাসল।

এই সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল থানার সামনে। ইউসুফভাই বললেন, "মনুভাই এসেছেন। আমাদের এবার ফিরতে হবে।"

অফিসার বললেন, "একটু চা খেয়ে যান। ততক্ষণে আমি চিঠিটার জেরক্স করানোর জন্য গাজিপুরে লোক পাঠাই।"

অর্জুন সম্মতি জানাল।



ম্যাকসাহেবের নাতনি

শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে অর্জুন যখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টে পৌঁছল, তখন প্লেনের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু পৌঁছে শুনল, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট দেরিতে আসছে, হাতে অনেকখানি সময়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।

আজ সকাল থেকেই টেনশন শুরু। গতকাল মোটর সাইকেলটা বিগড়েছিল। গ্যারাজ থেকে বলল, আজ বিকেলের আগে দেবে না। অর্জুন ঠিক করেছিল, সারাদিন বাড়িতেই কাটাবে। 'কাকাবাবু সমগ্র' হাতে এসেছে, ওটা পড়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু সকালবেলায় আচমকা অমল সোমের চিঠি এল। এই চিঠিটি বেশ কিছুদিন পরে এল। অমলদা এখন আর জলপাইগুড়িতে থাকেন না। কোথায় থাকেন তা কাউকে জানান না। জলপাইগুড়ির বাড়ি দেখাশোনা করে তাঁর প্রতিবন্ধী ভৃত্য। মাঝে-মাঝে অর্জুন খোঁজখবর নিয়ে আসে।

অমল সোমই অর্জুনের সত্যসন্ধানে দীক্ষাগুরু। বিয়ে-থা করেননি। ইদানীং তিনি সত্যসন্ধানের চেয়ে অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়েছেন। কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়েছেন। মাঝে-মাঝে তাঁর চিঠি পায় অর্জুন। তিনি কোথায় আছেন, এক জায়গায় আছেন কিনা তা অর্জুনের জানা নেই। চিঠির উত্তর দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই।

আজকের চিঠিটা বিদেশ থেকে। অর্জুন অমল সোমের পরিচিত হাতের লেখা দেখতে পেয়েছিল, "স্নেহভাজনেষু, আশা করি ভাল আছ। বিশেষ প্রয়োজনে এই চিঠি লিখছি। কয়েকটি জরুরি কাজে লন্ডনে আছি। এখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটির নাম ডরোথি ম্যাকডোনাল্ড। তার পূর্বপুরুষ এক সময় ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সেই জন্য তাঁকে ভারতবর্ষে থাকতে হয়েছিল। ভদ্রলোক জলপাইগুড়ি শহরে ছিলেন বেশ কিছুকাল। মেয়েটি তার পূর্বপুরুষের কর্মক্ষেত্র দেখতে আগ্রহী। আগামী চোদ্দই অগাস্ট সে কলকাতা হয়ে বাগডোগরায় পৌঁছবে। তুমি তাকে

এয়ারপোর্টে রিসিভ করে দেখাবার ব্যবস্থা কোরো।

তোমার কাজকর্ম নিশ্চয়ই ভাল চলছে। আবেগে তাড়িত হয়ো না, ক্ষুদ্র ঘটনাও যুক্তি দিয়ে বিচার কোরো। শুভেচ্ছা জেনো। — অমল সোম।"

চিঠিটা পড়ার পর হাতে সময় ছিল না। অমল সোমের অনুরোধ আদেশের চেয়ে অনেক বেশি অর্জুনের কাছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, ডরোথি ম্যাকডোনাল্ড জলপাইগুড়িতে এসে কোথায় থাকবে? এখানে ভাল হোটেল তেমন নেই। কদমতলায় একটি সাধারণ হোটেল আছে, এ ছাড়া সরকারি তিস্তা ভবন। বরং শিলিগুড়িতে অনেক ভাল ব্যবস্থা এবং সেখানে থাকাই ওঁর পক্ষে সুবিধেজনক।

বাইক নেই, দেড় ঘন্টার রাস্তা কোনও মতে ডিঙিয়ে যখন সে এয়ারপোর্টে পৌঁছাল তখন বাইরে চড়া রোদ, প্লেন আসেনি। বাগডোগরা এয়ারপোর্টটা বেশ ছোট। যাত্রীদের অপেক্ষা করার জায়গাটা এখন গমগম করছে। যে প্লেনটি আসছে, তাতেই এঁরা কলকাতায় যাবেন। অর্জুন লক্ষ করেছে, ট্রেনে ওঠার আগে যাত্রীদের মুখের হাবভাব দেখে তেমন কিছু মনে হয় না, কিন্তু প্লেনে ওঠার আগে একটা আলাদা চেহারা ধরা পড়ে। একটু যেন কৃত্রিম আর সেটা নিজেকে মূল্যবান মনে করার চেষ্টায় কি না জানা নেই।

প্লেন নামল। ছোট প্লেন, যাত্রীর সংখ্যা তাই অল্প। সিঁড়ি দিয়ে যারা নেমে এল, তাদের মধ্যে একমাত্র বিদেশিনীকে চিনতে অসুবিধে হল না। মেমসাহেবদের বয়স বোঝা বেশ মুশকিল। অর্জুন আন্দাজ করল ইনি তিরিশের নীচেই হবেন।

ফেন্সিং পেরিয়ে ভদ্রমহিলা বেশ নার্ভাস ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাতে অর্জুনের মনে হল, ওর বয়স বাইশের বেশি হতেই পারে না। চোখের মণি নীল, সোনালি চুল, পরনে নীল স্কার্ট আর সাদা জামা। অনেকটা স্কুল-ইউনিফর্মের মতো। হাতে একটা সুন্দর ব্যাগ। ওকে সবাই লক্ষ করছে এটা দেখতে পেয়ে অর্জুন এগিয়ে গেল, "এক্সকিউজ মি।"

মহিলা মুখ ফেরাতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ডরোথি ম্যাকডোনাল্ড?"

সঙ্গে-সঙ্গে হাসি ফুটল। খুব মিষ্টি হাসি। আর সেই হাসি দেখে অর্জুনের মনে পড়ল 'সাউন্ড অব মিউজিকের' জুলি ক্রিস্টির কথা। এর সঙ্গে প্রচণ্ড মিল সেই অভিনেত্রীর।

ডরোথি মাথা নেড়ে ইংরেজিতে বলল, "হ্যাঁ। আমি ডরোথি। তুমি অর্জুন?"

নিজেকে অর্জুন ভাবতে ভাল না লাগলেও সে মাথা নাড়ল।

"তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। আমি একটু নার্ভাস টাইপের। ভাবছিলাম তুমি না এলে আমি কী করব। অবশ্য মিস্টার সোম তোমার ব্যাপারে

আমাকে অনেক ভরসা দিয়েছেন।"

অর্জুন হাসল, "উনি আমাকে বেশি স্নেহ করেন।"

ডরোথি মাথা নাড়ল, "না। ওঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে ওসব ব্যাপার ওঁর তেমন নেই। উনি খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ।"

অমলদা ডরোথিকে কী বলেছেন জানা নেই, অতএব এ-বিষয়ে কথা বাড়াল না অর্জুন। সে হাত বাড়িয়ে হাতব্যাগটা চাইতেই ডরোথি মাথা নাড়ল, "না, না। এটা আমি নিজেই বইতে পারব। মুশকিল হচ্ছে আমার সুটকেস নিয়ে। ওটা খুব ভারী।"

অর্জুন দেখল প্লেনের পেট থেকে মালপত্র নামিয়ে আনছে কর্মীরা। সেটাকে হস্তগত করতে এগিয়ে গেল সে। ডরোথি যে ইতিমধ্যে পাবলিকের দ্রষ্টব্য বিষয় হয়ে গেছে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সবাই হাঁ করে দেখছে মেয়েটাকে। অর্জুন খানিকটা দূর থেকে ডরোথিকে দেখল সাগ্রহে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে এখন। মানুষজনের চাহনিকে কোনও গ্রাহ্য করছে না। আমেরিকানদের মতো ডরোথি লম্বা নয়। গায়ের রঙে ক্যাটকেটে ভাব নেই। বরং মোলায়েম গমের মতো চামড়ার রঙ। চোখাচোখি হতে ডরোথি হাসল। হাসলে যে ওকে খুব সুন্দর দেখায় তা নিশ্চয়ই ওর জানা।

সুটকেসটা সত্যি খুব ভারী। বাইরে বের করে ট্যাক্সিতে ওঠাতে গিয়ে মনে হল কাঁধ থেকে হাতটা ছিঁড়ে যাবে। শিলিগুড়ির ট্যাক্সির মিটার থাকে না, রঙ আলাদা করে তাদের চেনানোর ব্যবস্থা নেই। পেছনের আসনে বসে ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি নিজে গাড়ি চালাও না?"

প্রথমে বুঝতে পারেনি অর্জুন। তার নিজস্ব গাড়ি নেই। মোটরবাইকেই চমৎকার চলে যায়। সম্প্রতি এক বন্ধুর গাড়ি নিয়ে ট্রায়াল দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করেছে সে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ডরোথি বলল, "ইণ্ডিয়ায় দেখছি ড্রাইভাররাই গাড়ি চালায়, মালিক নিজে স্টিয়ারিং-এ বসে না।"

অর্জুন হাসল, "তুমি ভুল করছ। এটা একটা ট্যাক্সি। আমার গাড়ি নেই।"

"ট্যাক্সি? অদ্ভুত! লোকে কী করে বুঝবে কোনটা ট্যাক্সি, কোনটা নয়।"

অর্জুন মনে-মনে বলল, অবাক হওয়ার অনেক কিছু চারদিকে ছড়িয়ে আছে মেয়ে। আমাদের অনেক কিছুই অদ্ভুত! আগে প্রাইভেট গাড়ির নাম্বার প্লেটের শেষে 'ওয়াই' থাকলে আমরা বুঝতাম ওটা ভাড়া খাটে, আজকাল আর সে-নিয়ম মানা হয় না। একজন বিদেশি এদেশে এলে এত অসঙ্গতি বের করতে পারে, যাতে অভ্যস্ত হয়ে আছি বলে আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এয়ারফোর্সের এলাকা দিয়ে ট্যাক্সিটা যাচ্ছিল। ইউনিফর্ম-পরা সৈনিকরা সাইকেলে চেপে যাওয়া-আসা করছে। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "এটা কি সামরিক জায়গা?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"ওরা তোমাদের এই রাস্তা ব্যবহার করতে দিচ্ছে কেন ?"

"এয়ারপোর্টে যাওয়া-আসার আর কোনও রাস্তা নেই বলে।"

"অদ্ভুত !"

অর্জুন হাসল। ইংরেজি বলতে তার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। আর ডরোথির উচ্চারণ খুব স্পষ্ট বলে কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। ওর মনে পড়ল লন্ডন বা নিউ ইয়র্কে গিয়ে ইংরেজি ভাষা বুঝতে সে এক সময় কী রকম হিমশিম খেয়েছিল !

"অমলদার চিঠি আমি আজ সকালে পেয়েছি।"

"অমলদা কে ?"

"যিনি তোমাকে আমার কথা বলেছেন। ওঁর পুরো নাম অমল সোম।"

"আচ্ছা ! কিন্তু তুমি বললে অমলদা ?"

"বয়স্কদের আমরা নামের সঙ্গে দাদা বলি। সেটা সংক্ষেপে অমলদা হয়েছে।"

ডরোথি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল।

অর্জুন বলল, "উনি লিখেছেন তোমার পূর্বপুরুষ এদিকে চাকরি করতেন।"

"হ্যাঁ। আমার ঠাকুরদা। উনি ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। অনেক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত বাংলার উত্তর প্রান্তে দীর্ঘকাল চাকরি করেন। ওঁর লেখা একটা ডায়েরি আমি হঠাৎ পাই। তা থেকে ব্যাপারটা জানতে পারি।"

"উনি কি এখনও বেঁচে আছেন ?"

"না। বেঁচে থাকলে ওঁর বয়স ছিয়াশি হত।" কথা বলতে-বলতে হাতব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট ডায়েরি বের করে ডরোথি পাতা ওলটাল। ট্যাক্সি এখন বাগডোগরা বাজার পেরিয়ে শিলিগুড়ির দিকে ছুটছে।

"এখানে আমি কিছু নোট করে নিয়েছি। জলপাইগুড়ি কত দূরে ?

"এই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গেলে এক ঘন্টার মতো পড়বে।"

"মিস্টার সেন বলেছিলেন তুমি সেখানেই থাকো।"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন।"

"আমরা তো জলপাইগারিতে যাচ্ছি ?"

"নামটা জলপাইগারি নয়, উচ্চারণ হবে জলপাইগুড়ি। হ্যাঁ, আমরা যেতে পারি, কিন্তু মুশকিল তোমার থাকার জন্য ভাল হোটেল ওখানে নেই। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে শিলিগুড়ির হোটেলে থাকতে বলব।"

"শিলিগুড়ি। হ্যাঁ, এই নামটা আছে, তবে খুব ইম্পর্ট্যান্ট নয়।"

"তোমার ঠাকুরদার সময় শিলিগুড়ির কোনও ভূমিকা ছিল না, কিন্তু এখন কলকাতার পরেই শিলিগুড়ি মূল্যবান শহর।"

"কোনও গেস্ট হাউস নেই জলপাইগুড়িতে ?"

"চলো দেখি।"

"ঠাকুরদা ওখানকার সার্কিট হাউসের খুব প্রশংসা করেছিলেন।"

অর্জুন কিছু বলল না। অর্ধ শতাব্দী আগে জলপাইগুড়ি যা ছিল এখন তা নেই। কোণঠাসা হয়ে-হয়ে শহরটা কোনও মতে ধুঁকছে। তিস্তা ভবনে নিয়ে যেতে হবে ডরোথিকে। জায়গা পাওয়া গেলে ভাল। সে ডরোথির দিকে তাকাল। ডরোথি জানলা দিয়ে চায়ের বাগান দেখছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত! ওর ঠাকুরদার কর্মস্থল ছিল এদিকে। ভদ্রলোক নেই। তাঁর ডায়েরি পড়ে ওর মনে হল জায়গাটা দেখে আসা দরকার আর অমনই চলে এল? এই আসার জন্য প্রচুর টাকা এবং সময় খরচ হয়েছে এবং তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই! ওরা মাঝে-মাঝে এমন কাণ্ড করে! যে-লোকটা প্রথম পাহাড়ে ওঠার কথা ভেবেছিল তাকেও তো লোকে অবাক চোখে দেখেছিল। আমরা বলি ইউরোপ এবং আমেরিকার মানুষ খুব প্র্যাকটিক্যাল। তারা অপ্রয়োজনীয় কোনও কাজ করে না। কিন্তু যে মানুষ ইংলিশ চ্যানেল পার হয়, নায়েগ্রার ওপর থেকে লাফিয়ে রেকর্ড করতে চায় জীবনের বিনিময়ে, তারা কতখানি প্র্যাকটিক্যাল? সেদিক দিয়ে আমরা তো এতকাল ঝুঁকি এড়িয়ে ঘরে বসে থাকতে পছন্দ করে এসেছি।

ট্যাক্সি শিলিগুড়ি শহরে ঢুকল অর্জুন অনুরোধ করায়। ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রথমে রাজি হচ্ছিল না। তাকে নাকি জলপাইগুড়ি থেকে খালি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসতে হবে, সেটা পোষাবে না। অর্জুন অন্য সময় হলে তর্ক করত। কদমতলার বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালেই লোকটা শিলিগুড়ির যাত্রী প্রচুর পাবে এটা জানা কথা। ডরোথির জন্যই সে কিছুটা বাড়তি টাকা দিতে রাজি হল।

"তোমাদের এখানকার শহরগুলো তৈরির সময় কোনও পরিকল্পনা ছিল না?"

"বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই না।"

"কেন?"

"ব্রিটিশরা আমাদের এইভাবেই অভ্যস্ত করেছিল।"

অর্জুনের উত্তর শোনামাত্র ডরোথি অবাক হয়ে তাকাল, "তোমাদের দেশে এখনও আমার পূর্বপুরুষদের প্রভাব আছে?"

"ব্রিটিশদের তৈরি অনেক ভাল জিনিস নিয়ে আমরা যেমন এখনও গর্ব করি, তেমনই ওদের কীর্তির জন্যে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আমাদের দাম দিতে হয়।"

"তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারলাম না।"

"তোমার পূর্বপুরুষরা এ-দেশটাকে কলোনি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এখান থেকে যা কিছু ভাল তা দেশে নিয়ে যেত তারা। আর নিজেরা থাকত বলে কোনও মতে বসবাসের যোগ্য করে রেখেছিল। আমাদের কথা তারা কখনওই ভাবেনি। তবে কোনও-কোনও ব্রিটিশ মানুষ হিসেবে অসাধারণ

ছিলেন। তাঁদের কথা আমি বলছি না।"

ডরোথি সোজা হয়ে বলল। গাড়ি তখন শিলিগুড়ি ছাড়িয়েছে। ডরোথি বলল, "আমার পূর্বপুরুষ তোমাদের এখানে সরকারি চাকরি করতে এসেছিলেন আর আমি এত কাল পরে তাঁর কর্মক্ষেত্র দেখার জন্যে ছুটে এসেছি এ-কথা নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করনি ?"

"আমি অবাক হয়েছি !"

"তা হলে সত্যি কথা বলছি। কারণ তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন।"

অর্জুন তাকাল।

ডরোথি বলল, "আমি এসেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে।"

"কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?"

"আমার পিতামহ যে অন্যায় করেছেন, যার জন্যে তিনি শেষজীবনে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছেন সেই কারণেই আমি এখানে এসেছি। উনি সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। তাঁকে লন্ডন, দিল্লি, কলকাতার আদেশ মান্য করতে হত। তখন তোমাদের দেশের কিছু মানুষ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে আন্দোলন করছিল। সেই আন্দোলনকে দমন করার দায়িত্ব ছিল ঠাকুরদার ওপর। জলপাইগুড়িতে থাকার সময় ঠাকুরদা প্রতিদিনের ঘটনা তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। কীভাবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরতেন, তাঁদের মুখ থেকে কথা বের করার জন্যে অত্যাচার করতেন, তার বিস্তৃত বিবরণ আমি পড়েছি। আর এসব কাজের পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল যে, তিনি তাঁর দেশ ব্রিটেনের জন্যেই করেছেন। তাঁর ওপরওয়ালার নির্দেশ তিনি পালন করেছেন।" ডরোথি বেশ উত্তেজিত গলায় কথা বলছিল। আর সেই কারণে তার ইংরেজি শব্দগুলো একটু অন্যরকম ভাবে অর্জুনের কানে বাজছিল। ডরোথি একটু থামতেই অর্জুন বলল, "এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। চাকরি করতে গেলে ওপরওয়ালার নির্দেশ মানতেই হয়। তবে ইতিহাস বলে কোনও-কোনও ইংরেজ অফিসার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন।"

ডরোথি মাথা নাড়ল, "ঠিক। সেই কথাই ঠাকুরদা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন। কেউ বোমা নিয়ে তাঁকে মারতে আসছে জানার পর তিনি কী করতে পারতেন ? ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবেন না আক্রমণকারীর মুখোমুখি হবেন ? সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্যে তাঁকেও অস্ত্র চালাতে হত। সেই লোকটা মরে গেলে শহিদ হয়ে যেত আর ঠাকুরদা খুনি। অথচ দু'জনেই তার কর্তব্য করছে।"

"তুমি বললে এদেশে এসেছ পূর্বপুরুষের করা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে। অথচ তুমি পূর্বপুরুষের কাজকেই এখন সমর্থন করছ।" অর্জুন বলল।

"আমি ততটাই সমর্থন করছি, যতটা তাঁদের করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আরও অনেকের মতো আমার ঠাকুরদা সীমা হারিয়েছিলেন। তাঁর

ডায়েরিতে আমি তিনজন মানুষের নাম পেয়েছি যাদের ওপর বীভৎস অত্যাচার করেছেন তিনি এবং তাঁর পুলিশ। এগুলো স্রেফ জেদের বশে করেছিলেন। শেষ বয়সে দেশে বসে তিনি এই তিনটি কাজের জন্যে অনুশোচনা করতেন।" ডরোথি তাকাল স্পষ্ট চোখে, "আমি ওই তিনটি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কতদিন আগের ঘটনা?"

"প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগের কথা।"

চোখ বন্ধ করল অর্জুন। ওরে ব্বাস! এ তো অনেক সময়। অতদিন আগে যাঁদের ওপর ডরোথির ঠাকুরদা অত্যাচার করেছিলেন তাঁরা কি এখনও বেঁচে আছেন? ডরোথির ঠাকুরদাই তো এখন পৃথিবীতে নেই। সে জিজ্ঞেস করল, "যদি তাঁরা না বেঁচে থাকেন?"

"তা হলে তাদের পরিবারের কাছে যাব।"

"এই তিনজন মানুষ কারা?"

"দুঃখিত। ইণ্ডিয়ান নাম আমার ঠিকঠাক মনে থাকে না। ঠাকুরদার ডায়েরিতে তাদের নাম আছে। দেখে বলতে হবে।" ডরোথিকে এখন একটু স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

"তোমার ঠাকুরদার নাম কী?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ একজন ইংরেজের কথা অনেকদিন জানত। তাঁর নামে তিস্তার পারে একটা ফেরিঘাটকে লোকে কিং সাহেবের ঘাট বলে চিনত। তিস্তার ওপর ব্রিজ এবং দু'পাশে বাঁধ হওয়ার পর সেই ঘাটের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে এবং নামটাও হারিয়ে গিয়েছে। তবে এখনও কিছু-কিছু সরকারি বাড়ি ব্রিটিশদের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের আর পাঁচটা শহরের মতো জলপাইগুড়ি ইংরেজদের কথা ভুলতে পেরেছে। রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড নামের একজন ইংরেজ প্রশাসক যে এই শহরে ছিলেন তা এখন কারও জানার কথা নয়, যদি না তিনি সেই আমলের মানুষ হন। অর্জুন এই নামটি প্রথম শুনল।

তিস্তা ভবনে জায়গা পাওয়া গেল। রেসকোর্স ছাড়িয়ে এই সরকারি অতিথিশালার পরিবেশ চমৎকার। ডরোথিকে সেখানে তোলার পর সমস্যা দেখা দিল খাবার নিয়ে। শুধু চা-টোস্ট ছাড়া সেখানে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। যিনি রান্না করেন তিনি ছুটিতে গিয়েছেন। হোটেল থেকে ভাত-তরকারি আনলে ডরোথির পক্ষে মারাত্মক হবে, কারণ সে ঝাল একদম সহ্য করতে পারে না। ইতিমধ্যে কলকাতায় নামী হোটেলে শখে পড়ে ইণ্ডিয়ান কারি খেয়ে সে বিপদে পড়েছিল। জলপাইগুড়ি শহরে বিদেশিদের উপযুক্ত কোনও খাবারের

দোকান নেই।

ডরোথিকে বিশ্রাম নিতে বলে অর্জুন পোস্ট অফিসের মোড়ে চলে এল। তার মনে হচ্ছিল এপিদা এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারেন। এ পি রায় এই শহরের বিখ্যাত শিল্পপতি, অনেক চা-বাগানের মালিক। জলপাইগুড়ি এবং কলকাতার খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িত। অর্জুনকে বেশ পছন্দ করেন। মিনিট পাঁচেক হেঁটে এপিদার বাড়িতে পৌঁছে সে হতাশ হল। এপিদা কলকাতায় গিয়েছেন। টাউন ক্লাবের সন্তু চ্যাটার্জি সেখানে ছিল। অর্জুনের সমস্যার কথা শুনে বললেন, "আজকাল সাহেবরা তো ঝোল-ভাত খায়। মাসিমাকে বল কম ঝাল দিয়ে রেঁধে দিতে, দেখবি দিব্যি খেয়ে নেবে।"

অর্জুনের খেয়াল হল মায়ের কথা। পেটের অসুখের জন্য মা নিজের জন্য ঝালবিহীন রান্না রাঁধেন। সেটা কম উপাদেয় নয়। মাকে বললে হয়।

সন্তুদা জিজ্ঞেস করলেন, "মেমসাহেবটি কি বেড়াতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। ওঁর ঠাকুরদা এক সময় এই শহরে চাকরি করতেন।"

বারান্দার কোণে চেয়ারে গুটিসুটি মেরে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। এ পি রায়ের বাবা এস পি রায়ের আমলের মানুষ। সম্ভবত ওদের কথা শুনছিলেন তিনি। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "নাম কী লোকটার?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "কত সাহেব এল গেল, কত তাদের নামের বাহার। একজনের নাম ছিল শেকস্‌পিয়র। বুঝলে সন্তু, লোকটা নিজের নাম সই করতে পারত না। অশিক্ষিত। লন্ডনে গুণ্ডামি করত। তাকে এখানে পুলিশ করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তা তাকে রায়কত পাড়ার জীবন মিত্তিরের বড় ছেলে পঞ্চানন এমন টাইট দিয়েছিল—!"

"এ গল্প আমি অনেকবার শুনেছি মামা।" সন্তুদা বললেন।

"শুনবেই তো। একটা মানুষের জীবনে তো লক্ষ লক্ষ গল্প থাকতে পারে না। যা দেখেছি তাই বলছি। তখন ছিল দেশপ্রেম, ডেডিকেশন। আহা।"

"আপনি রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ডের কথা মনে করতে পারছেন না?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল। বৃদ্ধকে তার ভাল লাগছিল।

"ম্যাক—। ম্যাক সাহেব?"

"তা তো জানি না।"

"একজন ছিল। সবাই তাকে ম্যাকসাহেব বলত। খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল ম্যাকের দাপটে।" বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "সেই ম্যাক ছিল টেরার।"

সন্তুদা অর্জুনকে নিয়ে খানিকটা দূরে সরে এলেন, "ওঁর মাথা ঠিক নেই। তুমি একজনের কাছে যেতে পার। জলপাইগুড়ির ইতিহাস ভদ্রলোকের জানা।"

"কার কথা বলছেন?"

"সুধীর মৈত্র। এক কালে অধ্যাপনা করতেন। পাহাড়ি পাড়ায় থাকেন। অনুপকে তো চেনো। ওদের দুটো বাড়ি পরে ওঁর বাড়ি।"

সুধীর মৈত্রের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। জলপাইগুড়ি শহরে বসে বইপত্রে শুধু নিজের জন্যে যদি কেউ ডুবে থাকেন তা হলে তাঁর নাম সুধীর মৈত্র। নিজের পরিচয় দিতে ভদ্রলোক অর্জুনকে বসতে বললেন। চারপাশে বইয়ের স্তূপ। মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা। কোনও আসবাব নেই। ভদ্রলোক বসে আছেন বাবু হয়ে। সত্তরের ওপর বয়স হলেও শক্ত আছেন। পরনে ফতুয়া পাজামা। চোখে চশমা, চুলগুলো ধবধবে। বললেন, "তোমার কথা শুনেছি। লাইটারটা তো?"

অর্জুন লজ্জা পেল "হ্যাঁ।"

"বল, কী জন্য এসেছ?"

অর্জুন জানাল। সুধীরবাবু বললেন, "মেয়েটি নিশ্চয়ই তার দাদু সম্পর্কে সব জানে, তাকে জিজ্ঞেস না করে তুমি আলাদা করে জানতে চাইছ কেন?"

"এখন পর্যন্ত বলতে পারেন শুধুই কৌতূহল। জানা থাকলে ওর সঙ্গে কথা বলতে সুবিধে হবে। তা ছাড়া ও জেনেছে দাদুর ডায়েরি পড়ে। সেটা কতখানি সত্যি তাতেও তো সন্দেহ থাকবে।" অর্জুন বলল।

"মনে হয় সত্যি। কারণ ইংরেজরা যখন নিজের জন্যে ডায়েরি লেখে তখন বানিয়ে লেখে না। কোন সময়টার কথা বললে?"

"ধরুন থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি টু।"

"ও ব্বাবা। একেবারে অগ্নিগর্ভ কাল। ওঁর নাম রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড। তাই তো?" সুধীরবাবু উঠলেন। প্রায় দেওয়াল ঢাকা বইয়ের রাশির মধ্যে খুঁজতে শুরু করলেন উবু হয়ে। শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলেন বইটা। পাতলা বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর মুখে স্বস্তির হাসি ফুটল। "একটা ছোট শহরকে নিয়ে খুব বেশি লোক ভাবে না। কলকাতার তিনশো বছর নিয়ে প্রচুর বই আছে তবু প্রথম পঞ্চাশ বছরের সব কিছু আমরা জানতে পারি না। আর জলপাইগুড়ি নিয়ে কে মাথা ঘামায়? তবু কিছু-কিছু অন্য ধরনের মানুষ কাজ করেছেন বলে এখনও আমরা ফিরে তাকাতে পারি।" কথা বলছিলেন পাতা ওলটাতে ওলটাতে। হঠাৎ স্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি 'মধুপর্ণী' পত্রিকায় জলপাইগুড়িকে নিয়ে লেখা সংখ্যাটা পড়েছো?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আমার কাছে আছে।"

"খুব ভাল কাজ। সবক'টা দিক কভার করা হয়েছে।" পত্রিকাটা কখনও হাতছাড়া কোরো না। হ্যাঁ, কী নাম যেন?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

"ইয়েস। পেয়েছি। থার্টি ফাইভ নয়, থার্টি ফোরে ভদ্রলোক জলপাইগুড়িতে আসেন। বাঃ, ইনি তো দেখছি টেগার্টের সহোদর।"

"টেগার্ট ?"

"সেই কুখ্যাত ব্রিটিশ, যিনি কলকাতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের টুঁটি টিপে ধরে ব্রিটিশ সিংহকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। রিচার্ড সাহেবও সেই জাতের কর্মচারী। তাঁর প্রতাপে জলপাইগুড়ির স্বাধীনতা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়েছিল। এই বইটিতে লেখা আছে তিনি যোগ্য হাতে বিদ্রোহীদের দমন করেছিলেন। বুঝতেই পারছ এই বই সাহেবদের লেখা। হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে।" বইটি রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সুধীরবাবু। তারপর মাথা নাড়লেন, "না, শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর করে তোমাকে বলা ঠিক হবে না। তুমি বিকেলবেলায় আসতে পারবে ? আমি এর মধ্যে আশা করছি ওঁর সম্পর্কে তথ্য জানতে পারব।"

অর্জুন বলল, "ঠিক আছে। তবে এ নিয়ে আপনাকে খুব ব্যস্ত হতে হবে না। ওই মেয়েটি নাম বলায় আমার কৌতূহল হয়েছিল, এইমাত্র।"

"কৌতূহল হওয়াই তো স্বাভাবিক। একটি ব্রিটিশ মেয়ে অতদূর থেকে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে ছুটে এল তার দাদুর কর্মস্থল দেখতে, ব্যাপারটা অভিনব। আচ্ছা, মেয়েটি কি বর্ধমানে যাওয়ার কথা বলেছে ? সেখানেও রিচার্ড সাহেব কিছুদিন ছিলেন !"

"না। আমাকে কিছু বলেনি।"

"তা হলে জলপাইগুড়ির বিশেষ গুরুত্ব ওর কাছে আছে। যে মানুষটির জন্যে আছে, তার সম্পর্কে আমাদের আরও তথ্য জানা দরকার। তুমি বিকেলে এসো।"

॥ দুই ॥

সব শুনে মা বললেন, "আহা, বিদেশ বিঁভুই থেকে এসেছে মেয়েটা, তাকে তুই না খাইয়ে রাখবি এ কেমন কথা ? ওকে বরং আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয়।"

অর্জুন অবাক হল, "আমাদের বাড়িতে ? এখানে ও থাকতে পারবে ?"

"কেন পারবে না ? আমরা তো আছি।"

"ওহো, তুমি বুঝতে পারছ না, ওরা এরকম বাঙালি পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত নয়।"

"তুই সব জেনে বসে আছিস ! সিস্টার নিবেদিতা থাকতেন না ? অ্যানি বেসান্ত ছিলেন না ? নেলি সেনগুপ্তের নাম শুনিসনি ? তুই যা, মেয়েটাকে নিয়ে আয়। ও যেমন খেতে চায় তেমনই নাহয় আমি বানিয়ে দেব।" মা আশ্বাস দিলেন।

অর্জুন নিজের বাড়ির দিকে তাকাল। মধ্যবিত্ত চেহারার এই বাড়িটি তার

কাছে প্রিয় হলেও একজন বিদেশিনীর কাছে অনেক অসুবিধের কারণ হবেই। মা সেটা বুঝবেন না। তার চেয়ে মায়ের রান্না খাবার যদি ডরোথির কাছে সে পৌঁছে দেয়, তা হলে দু'কূলই রক্ষে হবে। মাকে সে কোনও মতে এই ব্যবস্থায় রাজি করালো।

মোটর বাইকটা বিকেলের আগে তৈরি হবে না। ওটা থাকলে ঘোরাফেরা করা সহজ হত। স্নান সেরে মায়ের রান্না খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে নিয়ে রিকশায় চেপে তিস্তা ভবনের দিকে চলল সে। এখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। রাস্তায় মানুষ কম। হঠাৎ তার খেয়াল হল ডরোথি আসছে ইংল্যান্ড থেকে। লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে বাগডোগরায় নামাই তো স্বাভাবিক ছিল। তা না করে ও কলকাতা ঘুরে এল কেন? কলকাতায় কি ওর কোনও কাজ ছিল? ওর মতো একা মেয়ের কলকাতা শহরে কী কাজ থাকতে পারে, যখন জলপাইগুড়িতে আসার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছে?

টিফিন ক্যারিয়ার দেখে খুব খুশি ডরোথি। যখন শুনল অর্জুনের মা নিজের হাতে রান্না করেছেন তখন আরও উচ্ছ্বসিত। বলল, "লন্ডনে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আমি একবার খেয়েছি। ফুড ওয়াজ গুড। কিন্তু ঠাকুরদার ডায়েরিতে বেঙ্গলি কারির কথা পড়েছি, সেটা কখনও খাইনি। আচ্ছা, খুব মশলা দেওয়া নয় তো?"

অর্জুন বলল, "খেয়ে দ্যাখো।"

তিস্তা ভবনের বেয়ারা এসে টিফিন ক্যারিয়ারের খাবার সার্ভ করল প্লেটে। কাঁটা চামচের বদলে অর্জুনকে হাত দিয়ে খেতে দেখে ডরোথি উৎসাহিত হল। মায়ের হাতের রান্না অর্জুনের খুব প্রিয়। আজ অবশ্য ইচ্ছে করেই মশলা কম দিয়েছেন, ঝাল তো নয়ই। অর্জুন ঠিক সেই স্বাদ না পেলেও ডরোথি খুব খুশি। বলল, "তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করব। এইসব রান্নার রেসিপি চাই।"

"তুমি কতদিন আছ এখানে?"

"এটা নির্ভর করছে আমার কাজ কবে শেষ হচ্ছে তার ওপর।"

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে ডরোথি বলল, "এভাবে হাত দিয়ে আমি কখনও খাইনি।"

"তুমি তো কখনওই ইন্ডিয়ায় আসোনি।"

"দ্যাট্‌স রাইট।"

"আচ্ছা, তুমি দিল্লি থেকে সরাসরি না এসে কলকাতা হয়ে এলে কেন?"

ডরোথি মাথা নাড়ল, "আমি জানতাম না দিল্লি হয়ে এখানে আসা যায়। আমার টিকিট কলকাতা পর্যন্ত করা ছিল।"

ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হল না অর্জুনের। জলপাইগুড়িতে

পৌঁছবার জন্য বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নামতে হবে, তা লন্ডনের ট্র্যাভেল এজেন্টরা জানতে পারে। ব্যাগ থেকে একটা লম্বা ডায়েরি বের করে ডরোথি সোফায় বসল, "যে তিনজনের নাম-ঠিকানা ঠাকুরদার ডায়েরিতে ছিল, তাদের তুমি আজই খুঁজে বের করতে পারবে ?"

অর্জুন হাসল, "তাঁরা যদি জীবিত থাকেন এবং এই শহরে বাস করেন, তা হলে চেষ্টা করতে পারি। আচ্ছা, ঠিকানা যখন আছে বলছ তখন লন্ডন থেকে ওঁদের চিঠি লিখলে না কেন ? সেটা অনেক সহজ হত।"

"আমি নিজে ওঁদের সামনে যেতে চাই।"

"ওঃ। নামগুলো বলো।"

"কামালাকান্ত রয় বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি। ঠিক আছে ?"

"কমলাকান্ত রায়। দ্বিতীয় নাম ?"

"দেবাদাস মিটার।" ডরোথি মন দিয়ে পড়ছিল, "হি ইজ ফ্রম রাইকটপাড়া।" ডরোথি হাসল। নিজের নাম উচ্চারণ যে সঠিক হয়নি, তা বুঝতে পারছিল।

"তিন নম্বর মানুষটির নাম তারিণী সেন। এর কোনও ঠিকানা নেই।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কমলাকান্ত রায়ের নাম আমি শুনেছি। বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। কিন্তু তিনি মারা গিয়েছেন অনেক বছর আগে।"

"ওঃ। ওঁর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে ?"

"তাঁরা থাকতে পারেন।"

"তা হলে তাঁদের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।"

অর্জুন ঘড়ি দেখল। "এখন দুপুরবেলা। এই সময় এখানে সবাই খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নেয়। আমরা বরং বিকেলে যেতে পারি।"

ডরোথির সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে অর্জুন যখন উঠে দাঁড়াল, তখন দুটো বেজে গেছে। ডরোথি বলল, "তুমি চলে যাচ্ছ, আমার কিন্তু এখানে বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।"

অর্জুন সেটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু এই ভরদুপুরে মেয়েটাকে নিয়ে সে কোথায় ঘুরবে ?

ডরোথি বলল, "একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে পারি না ?"

"তা পারি। কিন্তু সেটা বেশ এক্সপেন্সিভ হবে।"

ডরোথি হাসল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ আমাদের এক পাউন্ড মানে তোমাদের আটচল্লিশ টাকার সমান। ইন্ডিয়াতে এসে মনেই হয় না পয়সা খরচ হচ্ছে।"

শুনতে মোটেই ভাল লাগল না, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি ; ইংল্যান্ড তার প্রায় সমস্ত কলোনি হারিয়েও যে অর্থনৈতিক কাঠামো ধরে রেখেছে, তার সঙ্গে কবে যে ভারতবর্ষ পাল্লা দিতে পারবে। বাংলো থেকে বেরিয়ে ডরোথিকে নিয়ে

একটা রিকশাতে উঠল অর্জুন। খানিকটা যেতেই সে দেখল একটা কালো অ্যাম্বাসাডার তাদের পাশ কাটিয়ে বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গেস্ট হাউসে তো অতিথিরা আসবেই।

রিকশায় বসে অর্জুনের মনে হল, জলপাইগুড়ি শহরে কাউকে দেখানোর মতো দ্রষ্টব্য জিনিস কিছু নেই। ওই জুবিলি পার্ক অথবা রাজবাড়ির দিঘি এখন এত হতশ্রী যে, বিদেশিনী দূরের কথা, কলকাতার মানুষও মুখ তুলে চাইবে না। অথচ তার নিজের কাছে পোস্ট অফিসের মোড়, করলা নদীর পাশ দিয়ে থানায় যাওয়ার রাস্তাকে কত মোলায়েম মনে হয়। জীবনদার বই-এর দোকানে সে পুরোটা দিন কাটিয়ে দিতে পারে। এ সবই নিজের জন্য। সে ডরোথিকে বলল, "এই শহরটা খুবই সাধারণ।"

আসলে সে আটপৌরে শব্দটা ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু ইংরেজিতে প্রতিশব্দ না জানা থাকায় সিম্পল বলতে বাধ্য হয়েছিল। ডরোথি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। বেঁচে থাকাটা কেমন অদ্ভুত ধরনের!"

তোমার কাছে যতই অদ্ভুত লাগুক, আমরা ভাল আছি, মনে মনে বলল অর্জুন। সে লক্ষ করছিল, পথচারীরা বারংবার রিকশার দিকে তাকাচ্ছে। একজন বিদেশিনীকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে বেশ অবাক হচ্ছে সবাই। এই মফস্বল শহরে বিদেশিনীকে কেউ রিকশায় চেপে ঘুরতে দেখে না। তারা এই শহরে বড় একটা আসে না। কিন্তু এখন এইভাবে দেখতে চাওয়াটা প্রায় হ্যাংলামোর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে তা এখানকার মানুষের খেয়ালে থাকে না।

গ্যারাজের সামনে পৌঁছে সুখবর পেল অর্জুন। তার বাইক ঠিক করে ফেলেছে মেকানিক। তৎক্ষণাৎ রিকশা ছেড়ে দিল সে। লাল বাইকটা বের করে ডরোথিকে বলল, "উঠে বোসো।"

"এটা তোমার?"

"হ্যাঁ।"

বাইকে বসতে ডরোথি অভ্যস্ত। তাকে নিয়ে গোটা শহরটাকে পাক দিয়ে তিস্তা বাঁধের ওপর পৌঁছল অর্জুন। ডরোথি বলল, "এ কী রকম নদী, যাতে জল নেই?"

"বর্ষাকালে দেখলে ভয় পাবে। পাহাড়ি নদীর চেহারা ঋতু অনুযায়ী পালটায়।"

"নদীর ওপারে কী?"

"ডুয়ার্স।"

"হ্যাঁ, এই নামটা ঠাকুরদার ডায়েরিতে পড়েছি।"

"চারটে বেজে গিয়েছিল। ডরোথিকে নিয়ে বাবুপাড়ায় চলে এল অর্জুন। এই শহরের অনেকেই বিপ্লবী কমলাকান্ত রায়ের বাড়ি চেনে। পুরনো ধাঁচের বাড়ি, এ-মহল সে-মহল। কমলাকান্ত রায় বিত্তবান মানুষ ছিলেন। এখন

সিমেন্টের গেট আছে, কিন্তু তাতে আগল নেই। ভেতরে ঢুকে বাইক বন্ধ করতেই একটি অল্পবয়সী ছেলে বেরিয়ে এল। সে যে অর্জুনকে চিনতে পেরেছে তা বোঝা যাচ্ছিল তার মুখের হাসি দেখে। কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ?"

"তুমি এখানে থাকো ?"

"হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি।"

"কমলাকান্ত রায় তোমার কে হন ?"

"বুড়ো দাদু, মানে আমার বাবার ঠাকুরদা। আসুন না ভেতরে।" ছেলেটি ওদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। কয়েকটা আসবাব, বেশ পুরনো ধাঁচের, জলপাইগুলির সাবেকি বাড়িগুলোয় যেমন দেখা যায়, এই বসার ঘরও তেমনই।

চেয়ারে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমার বুড়ো দাদু কবে মারা গিয়েছেন ?"

"অনেক আগে। আপনি ওঁর সম্পর্কে জানতে চান ?"

অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই ছেলেটা ভেতরে চলে গেল। এতক্ষণ কথা হচ্ছিল বাংলায়। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "কী বলল ?"

"এই ছেলেটি কমলা রায়ের গ্রেট গ্র্যান্ডসন। কমলাকান্ত মারা গিয়েছেন অনেকদিন আগে।" অর্জুন হাসল, "তুমি বড় দেরিতে এখানে এলে।"

"বেটার লেট দ্যান নেভার।" ডরোথি কাঁধ নাচাল।

এই সময় ছেলেটি এক বৃদ্ধকে নিয়ে ফিরে এল। অর্জুন উঠে দাঁড়াল, দেখাদেখি ডরোথিও। নমস্কার জানিয়ে অর্জুন নিজের পরিচয় দিল। ছেলেটি বলল, "আমার দাদু।"

ভদ্রলোক ওদের বসতে বললেন। ফরসা, রোগা, কিন্তু অভিজাত চেহারা। বললেন, "আমি আপনার নাম শুনেছি। কী দরকার বলুন ?"

অর্জুন ডরোথির পরিচয় দিল, "ইনি ডরোথি। লন্ডন থেকে এসেছেন। ডরোথি, ইনি মিস্টার রায়, ওঁর বাবার নাম কমলাকান্ত রায়।"

ডরোথি মাথা নাড়ল। বোঝা যাচ্ছিল সে একটু অস্বস্তিতে রয়েছে।

অর্জুন বলল, "আমার সঙ্গে ওর পরিচয় আজকেই। ওর ঠাকুরদা এক সময় এই শহরে ছিলেন। বাকিটা আপনি ওর কাছেই শুনুন।" ইচ্ছে করেই এই কথাগুলো সে ইংরেজিতে বলল, যাতে ডরোথি বুঝতে পারে।

ডরোথি বলল, "মিস্টার রায়, ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর কিন্তু আমি আমার ঠাকুরদার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে এসেছি। আপনার বাবা এখন জীবিত নেই, তাই আপনার কাছে আমি তাঁর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

বৃদ্ধ বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কেন ক্ষমা চাইতে এসেছেন ? আপনার ঠাকুরদার নাম কী ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

"আচ্ছা! অদ্ভুত ব্যাপার!" বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন।

ডরোথি বলল, "ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসেবে ঠাকুরদাকে অনেক কাজ করতে হত। আমি তাঁর ডায়েরিতে পড়েছি, আপনার বাবা ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁকে বিরত করতে উনি প্রচণ্ড অত্যাচার করেছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল অল্প। পরে এ-নিয়ে তিনি খুব অনুশোচনা করতেন।"

"ম্যাকসাহেব অনুশোচনা করতেন? এটাও অদ্ভুত ব্যাপার।" বৃদ্ধ বললেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"জানি। তখন আমি প্রায় যুবক। বিপ্লবীরা ওকে হায়েনার মতো ঘৃণা করত। বাগে পেলে উনি চোরকে ছেড়ে দিতেন, কিন্তু বিপ্লবীকে নয়। আমার বাবার ডান হাত আর ডান পা উনি চিরকালের মতো অকেজো করে দিয়েছিলেন।

ডরোথি মাথা নামাল। কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে। ওর কথা মনে রেখে।

বৃদ্ধ বললেন, "উনিশশো চৌত্রিশে রায়কতপাড়ার নির্মল চক্রবর্তী পিস্তল সমেত গ্রেফতার হন। ওঁর সঙ্গে শচীন বোস আর শঙ্কর সান্যাল। এঁদের ওপর কী পরিমাণ অত্যাচার হয়েছে, তা বলার নয়! ম্যাকসাহেবের অত্যাচার চলেছিল উনচল্লিশ পর্যন্ত। ওই বছরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস বসল জলপাইগুড়িতে। চারু সান্যাল, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে পাণ্ডাপাড়ার সেই বিশাল অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি স্লোগান তুলেছিলেন, ইংরেজ ভারত ছাড়ো। ওই অধিবেশনের পরই ম্যাকসাহেব বদলি হলেন এখান থেকে। যা হোক, এ সব অনেক দিনের কথা। তোমার ঠাকুরদাকে আমরা ঘৃণা করতাম। কিন্তু সময় তো সব স্মৃতির ওপর পলিমাটি ফেলে। এখন শুধু খারাপ লাগাটা আছে, কিন্তু সেই জ্বালাটা নেই। ম্যাকসাহেবের তো বেঁচে থাকার কথা নয়!"

ডরোথি বলল, "না, উনি বেঁচে নেই।"

"তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছ?"

"হ্যাঁ। শেষ বয়সে ওঁর অনুশোচনা হয়েছিল।"

"আমি আব কী করতে পারি! এখন ক্ষমা করা আর না-করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অতদূর থেকে এসে তুমি আমাকে কথাগুলো বললে, শুধু এর জন্যে ধন্যবাদ।" বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। এ-ব্যাপারে আর কথা বলতে চাইছেন না, তা বুঝতে পারা গেল।

ডরোথি বলল, "আমি আপনার সেন্টিমেন্ট বুঝতে পারছি। আমার কোনও ব্যক্তিগত দায় ছিল না এখানে আসার, কিন্তু ঠাকুরদার ডায়েরি পড়ে আমি সেন্টিমেন্টাল কারণেই এত দূরে এসেছি। আচ্ছা, আমি কি মিস্টার রায় সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না আপনার কাছে?"

বৃদ্ধ তাকালেন। তাঁর মুখের চেহারা নরম হয়ে এল। নাতির দিকে তাকিয়ে বাংলায় বললেন, "ভেতরে গিয়ে এঁদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলো।"

অর্জুন বাধা দিল। "আমরা খানিক আগে ভাত খেয়েছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

বৃদ্ধ ডরোথির দিকে তাকালেন, "তুমি আমাদের পারিবারিক শত্রুর নাতনি হতে পারো, কিন্তু বাড়িতে যখন এসেছ তখন কিছু খেয়ে যেতে হবে। চা, কফি, না সরবত?"

ডরোথি হাসল, "টি উইদাউট মিল্ক অ্যান্ড সুগার।"

ছেলেটি চলে গেল ভেতরে। বৃদ্ধ বললেন, "আমার বাবা কমলাকান্ত রায় কংগ্রেস করতেন। শশিকুমার নিয়োগী, তারিণীপ্রসাদ রায়রা উনিশশো সাত সালে ব্রিটিশ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে আর্য নাট্য সমাজে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। সত্যেন বিশ্বাস, মহেন্দ্র ঘটক, হরেন ভৌমিকরা ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র। এঁরা পরে জলপাইগুড়িতে বিখ্যাত হন। বাবা কিছুদিন ওই বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর যজ্ঞেশ্বর সান্যাল যখন জাপান থেকে কাপড় বোনা শিখে এসে শিল্পসমিতি পাড়ায় বিলিতি বস্ত্রের পালটা দিশি বস্ত্র তৈরিতে নামলেন, তখন বাবা ওঁর সঙ্গে যোগ দেন। উনিশশো কুড়ি সাল থেকে বাবা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বাবাকে প্রথম গ্রেফতার করা হল উনিশশো তিরিশে। তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে, বিজয়া দশমীর দিন করলার দু'পাশে মানুষের ভিড়। সবাই ভাসান দেখছে। প্রতিমা নিয়ে নৌকো চলছে। সঙ্গে আর-একটি নৌকো। সেই নৌকো থেকে স্লোগান উঠছিল, "বিলিতি জিনিস বয়কট করো, মাদকদ্রব্য বর্জন করো।" পুলিশ সেই ভাসানের নৌকোর ওপর আক্রমণ করল। বীরেন্দ্র দত্ত, চারু সান্যাল মশাইদের সঙ্গে বাবাও গ্রেফতার হলেন। বাবা ছাড়া পান গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর। এরপর ওই ম্যাকসাহেব এলেন জলপাইগুড়িতে। ওঁর কানে 'বন্দেমাতরম্' শব্দটা ঢুকলেই যেন পাগল হয়ে যেতেন। কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়াই তিনি মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করতে বলতেন পুলিশকে। তেমন তেমন বন্দি হলে এমন অত্যাচার করতেন, যাতে সে আদালতে যেতে না পারে। আর আদালত তো ব্রিটিশদেরই ছিল। তবু মাঝে-মাঝে বিচারকের চক্ষুলজ্জা হত। সেই কারণে ম্যাকসাহেব তাঁদের বিব্রত করতে চাইতেন না। পাটগ্রামের কেশব দত্তের নাম এক কালে সবাই জানত।

সাধারণ মানুষের বন্ধু ছিলেন তিনি। পাটগ্রামের বাঁশকাটায় প্রতি বছর মেলা বসত। সেই মেলায় যে জুয়া খেলা হত তাতে নিঃস্ব হয়ে যেত মানুষ। কেশব দত্ত তা বন্ধ করতে চান। ফলে পুলিশ গুলি চালায় আন্দোলনকারীদের ওপর। একজন নিহত হন। বাবা এর প্রতিবাদে অনশন শুরু করলে ম্যাকসাহেব তাঁকে নিষেধ করেন। বাবা সেই নিষেধে কর্ণপাত না করায় এক মাঝরাত্রে পুলিশ বাবাকে তুলে নিয়ে যায়। তিনদিন বাবার কোনও খোঁজ পাই না। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন কৃষক বাবাকে অর্ধমৃত অবস্থায় বার্নিশে নিয়ে আসে। সুস্থ হয়ে কথা বলতে ওঁর দু' সপ্তাহ সময় লাগে। ওই তিনদিন তিস্তার ওপারে একটা পোড়ো বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল। রোজ রাত্রে ম্যাকসাহেব যেতেন তাঁর কাছে। যতরকমের অত্যাচার করা সম্ভব, তিনি তা করেছেন বাবার ওপরে। বাবা আর ভালভাবে হাঁটাচলা বাকি জীবনে করতে পারেননি।" বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন।

ডরোথি চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, "ওই জায়গায় কি নৌকো করে যেতে হয়?"

"নৌকো? হ্যাঁ। তখন নৌকো ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। তিস্তার ওপর তখন ব্রিজ বানাবার কথা কেউ ভাবত না।"

"ওই পোড়ো বাড়িটা যেখানে ছিল, সেই জায়গাটার নাম কী?"

"দোহমনি। বার্নিশের কাছেই। কিন্তু এখন বাড়িটার কিছু অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। যা হোক, ম্যাকসাহেবের নাতনি হওয়া সত্ত্বেও তোমার মধ্যে যে মানবতাবোধ দেখতে পাচ্ছি তাতে আমি খুশি। আমার পরিবারের সবাইকে আমি তোমার কথা বলব।"

অর্জুন উঠে পড়ল। দেখাদেখি ডরোথিও।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আপনি দেবদাস মিত্র নামে রায়কতপাড়ার কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীকে চেনেন?"

"নিশ্চয়ই। উনি বাবারই সহকর্মী।"

"উনি এখন— ?"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, "না। দেবদাসকাকু অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর ভাইরা বিষয়সম্পত্তি ফ্লাডের পর বিক্রি করে দিয়ে কলকাতার দিকে চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন তা জানা নেই।"

অর্জুন খুশি হল। তালিকা থেকে একটি নাম কাটা গেল।

বাইরে বেরিয়ে ডরোথি কথা বলেনি। ওর মুখ বেশ বিমর্ষ। অর্জুনের মনে হয়েছিল এটা খুবই স্বাভাবিক, নিজের পূর্বপুরুষের ওইরকম কীর্তির কথা শুনলে কারও মন ভাল থাকতে পারে না। বাইকে ওঠার পর খেয়াল হয়েছিল তৃতীয় নাম, তারিণী সেনের কথা জিজ্ঞেস করা হল না বৃদ্ধকে। তারিণী সেনের হদিস পেলে ডরোথির আর এখানে থাকার দরকার হত না।

এখন ছায়া ঘন হচ্ছে জলপাইগুড়ির রাস্তায়। রিকশার ভিড় বাড়ছে। তবু

এখনও এই শহরে বুক ভরে নির্মল বাতাস নেওয়া যায়। পোস্ট অফিসের মোড় পেরিয়ে তিস্তা ভবনের দিকে যেতে-যেতে অর্জুনের মনে এল কথাটা। ডরোথিকে একা রাত্রে থাকতে হবে তিস্তা ভবনে। যদিও এখন পর্যন্ত কোনও দুর্নাম নেই, তবু কোনও মেয়ের পক্ষে একা থাকা কি ঠিক! এক্ষেত্রে সে কী করতে পারে? তিস্তা ভবনে গিয়ে সে থাকতে পারে না। বরং ডরোথি যদি তাদের বাড়িতে গিয়ে থাকে—।

তিস্তা ভবনে পৌঁছে অর্জুন ডরোথিকে তার ভাবনার কথা জানাল।

ডরোথি হাসল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি লন্ডন থেকে একা তোমাদের দেশে এসেছি। আমি জানি কীভাবে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হয়।"

অর্জুন তাকাল। হ্যাঁ, ডরোথির স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু এতটা অহঙ্কার করা উচিত কি? খালি হাতে ক'জনের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব? কিন্তু বলতে হবে, মেয়েটার সাহস আছে। সে জানল ডরোথি আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার খায় এবং ওই সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে কথা দিয়ে বেরিয়ে এল।

জলপাইগুড়িতে সন্ধের মুখে এখনও অনেক বাড়িতে শাঁখ বাজে। তার শব্দ শুনতে বেশ ভালই লাগে। এখন শঙ্খধ্বনি শুনতে-শুনতে সে বাইকে চেপে পাহাড়ি পাড়ায় সুধীর মৈত্রের বাড়িতে চলে এল। সুধীরবাবু অর্জুনকে দেখে খুশি হলেন। ভদ্রলোকের সামনে অনেক বই ছড়ানো। বললেন, "এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। এই রিচার্ডসাহেব তো বেশ কৃতী পুরুষ দেখছি।"

অর্জুন বসল। চশমা খুললেন সুধীরবাবু। "সমস্ত দেশের তুলনায় জলপাইগুড়িতে স্বাধীনতা আন্দোলন কিন্তু অনেক পরে শুরু হয়। এখানকার জেলা কংগ্রেসের জন্ম উনিশশো কুড়ি সালে। ওই সময়টা ধরলে মাত্র সাতাশ বছর পরে দেশ স্বাধীন হয়। তাই ইংরেজ সরকার প্রথম দিকে জলপাইগুড়ি নিয়ে আদৌ দুশ্চিন্তায় ছিলেন না। এখানে তাই দুঁদে ব্রিটিশ অফিসারকে পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করেননি তাঁরা। উনিশশো বত্রিশ সাল থেকে এ-জেলায় আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। তখন যেসব ব্রিটিশ অফিসারকে আমি জেলা গেজেটিয়ারে পাই তাঁদের মধ্যে রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড আছেন। তাঁর কাজ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা এবং তিনি সেটা করতে চেষ্টা করেছেন। তখন জেলার বেশির ভাগ চা-বাগানগুলোর ম্যানেজার সাদা চামড়ার মানুষ। রিচার্ডসাহেব এঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তিস্তা পেরিয়ে হানা দিতেন স্বদেশীদের আড্ডায়। একটা সময় লোকে তাঁকে ম্যাকসাহেব বলে ডাকতে লাগল। ম্যাকসাহেবের মুখে পড়া মানে হায়েনার গলায় হাত দেওয়া। লোকটার কিন্তু একটা গুণ ছিল। কাউকে প্রাণে মেরে ফেলত না, শুধু অকেজো করে দিত সারাজীবনের মতো।" সুধীরবাবু আবার চশমা পরলেন,

"একটা তথ্য পেয়েছি এবং সেটা সামান্য অদ্ভুত। দিশি ঠাকুর-দেবতাদের সম্পর্কে অনেক বিদেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ম্যাকসাহেবের চরিত্র যা ছিল, তাতে তিনি কেন জল্পেশের মন্দির সম্পর্কে আগ্রহী হবেন বুঝতে পারছি না।"

"কীরকম আগ্রহী হয়েছিলেন ?"

"এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে ভদ্রলোক প্রায়ই বার্নিশ, দোমহনি এবং জল্পেশ অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। তখন তিস্তার ওপর ব্রিজ ছিল না। নৌকোয় গাড়ি নিয়ে নদী পার হওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। অথচ এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল থাকাকালীন তাঁর জল্পেশ সম্পর্কে কোনও উৎসাহ ছিল না, হল যাওয়ার আগে। কমলাকান্ত রায়ের ওপর তিনি অত্যাচার করেছিলেন ওই অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে। দেবদাস মিত্রকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পাওয়া যায় বার্নিশে। অথচ এ সবের কোনও কারণ ছিল না। ম্যাকসাহেব স্বচ্ছন্দে নিজের বাংলোতেই কর্মটি সারতে পারতেন।"

"দেবদাস মিত্র তো স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন !"

"হ্যাঁ। ডেডিকেটেড মানুষ। প্রথমে মহাত্মা গান্ধী, পরে সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হন। জেলার আধিয়ার আন্দোলনের শরিক ছিলেন একসময়। আর তখনই ম্যাকসাহেবের কুনজরে পড়েন। আধিয়ার কাদের বলে জানো ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কৃষকদের।"

সুধীরবাবু বললেন, "উত্তরবঙ্গের গ্রামের মানুষদের অধিকাংশই জমির মালিক ছিল না। জোতদারের জমিতে চাষ করে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক পেত তারা। এই কারণে তাদের আধিয়ার বলা হত। ওই অর্ধেক ফসলে তাদের সারা বছর চলত না। ফলে ধার করতে হত। তার ওপর নানা রকম কর দিতে হত গরিব মানুষগুলোকে। উনিশশো আটাত্রিশ সালে জেলা কংগ্রেসের বামপন্থী মানসিকতার মানুষরা কৃষক সংগঠনী সমিতি গঠন করেন। দেবদাসবাবু ওই সংগঠনের পক্ষে কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। হাটে-হাটে লিফলেট বিলি করা হয় কৃষকদের একত্রিত করতে। এদের নেতৃত্বে আসেন কংগ্রেস কর্মী মাধব দত্ত। কৃষকদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ইংরেজরা মনে করল সমিতি কৃষকদের সংগঠিত করছে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য। কিন্তু ওই আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ ছিল। তবু ম্যাকসাহেব দেবদাসবাবুকে তুলে নিয়ে গেলেন এক রাত্রে। ওঁর ওপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়ে কৃষক সমিতিকে চরম শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।"

"দেবদাসবাবু তো জীবিত নেই !"

"না। অনেকদিন হল চলে গেছেন। স্বাধীনতার পরেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন।"

"আচ্ছা, আপনি তারিণী সেন নামে কাউকে জানেন ?"

সুধীর মৈত্র সোজাসুজি তাকালেন, "কোন তারিণী সেন ?"

"স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক।"

"এই জেলায় ওই নামে কেউ ছিলেন বলে শুনিনি। অন্তত স্বাধীনতা আন্দোলনে এমন নামের মানুষ কোনও উল্লেখযোগ্য কিছু করেননি।" মাথা নাড়লেন সুধীরবাবু।

অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। সে ভেবেছিল সুধীরবাবুব কাছে তারিণী সেনের খবর পাবে। সেই মানুষটি যদি বেঁচে না থাকেন তা হলে ডরোথির কাজ শেষ হয়ে যাবে, আর থাকলে কালই যাওয়া যেত।

সুধীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারিণী সেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামী, তা তোমাকে কে বলল ?"

"কেউ বলেনি, আমি অনুমান করেছিলাম।"

"হঠাৎ এরকম অনুমান করার অর্থ ?"

অর্জুন বলল, "ডরোথি, মানে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের নাতনি, ওর দাদুর ডায়েরিতে যে তিনজনের নাম পড়ে এখানে এসেছে, তাদের শেষজন হলেন এই তারিণী সেন। তাই আমি ভেবেছিলাম কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্রের মতো তারিণী সেনও স্বাধীনতা সংগ্রামী।"

সুধীরবাবু বললেন, "যদি কোনও সাধারণ কর্মী থেকে থাকেন, তা হলে থাকতে পারেন। মুশকিল হল, এত বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে, তবু কংগ্রেসের তরফ থেকে আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি, কেউ ভাবছে বলে জানি না। আন্দোলনকারীদের জেলাভিত্তিক একটা তালিকাও তৈরি হয়নি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে তারিণী সেন নামে একজন ছিল, যার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনও সম্পর্ক ছিল না।"

"কোন সময়ে ?" অর্জুন কৌতূহলী হল।

সুধীরবাবু উঠলেন। বইয়ের স্তূপে হাত বোলাতে লাগলেন নিচু হয়ে। সখেদে বললেন, "ঠিক প্রয়োজনের সময় বইগুলো আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আর..." একটু পরে হতাশ হয়ে উঠে এলেন সামনে, "খুঁজব। কোনও একটা বইয়ে ওর নাম পেয়েছিলাম। কোন সময় মনে নেই, তবে লোকটা একজন কুখ্যাত অপরাধী।"

"সে কী !"

"অবাক হচ্ছ কেন ?"

"কুখ্যাত অপরাধীর নাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে থাকবে কেন ?"

"আরে সেই লোক এই লোক কি না তা আগে দ্যাখো। তুমি বিমল হোড় মশাইয়ের কাছে যাও। উনি প্রবীণ আইনজ্ঞ। ওঁর স্মরণে থাকতে পারে। এইসব অপরাধী কখনও না কখনও শাস্তি পায়। সরকারি রেকর্ডেও নাম থাকা উচিত।" সুধীরবাবু বইয়ের স্তূপের দিকে তাকালেন, "কাল বিকেল নাগাদ

এসো। আমিও খোঁজ নিচ্ছি।”

ঠিক আটটা পনেরোতে খাবার নিয়ে তিস্তা ভবনে পৌঁছে গেল অর্জুন। ডরোথি উপন্যাস পড়ছিল। অ্যালেস্টার ম্যাকলিনের থ্রিলার। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “একা সময় কাটছে না ?”

ডরোথি মাথা নাড়ল, “মোটেই না, এই বইটায় জমে আছি।”

“তুমি বেড টি খাও ?”

“না। একেবারে ব্রেকফাস্ট। তবে সেটা আমি এখানেই ম্যানেজ করে নিয়েছি। চৌকিদার বলেছে সে আমাকে টোস্ট আর ওমলেট বানিয়ে দেবে।”

“বাঃ, খুব ভাল।” টিফিন ক্যারিয়ারটা টেবিলের ওপর রেখে দুপুরেরটা নিয়ে নিল সঙ্গে। ডরোথি বলল, “কাল আমরা তারিণী সেনের খোঁজ করব তো ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “আমি ইতিমধ্যেই সেটা শুরু করেছি। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে। ওই নামে কোনও বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না।”

“সে কী ! ওই নামে কোনও মানুষ ছিল না ?”

“ছিল। কিন্তু লোকটা একজন কুখ্যাত অপরাধী।”

চমকে তাকাল ডরোথি। তারপর মাথা নাড়ল, “আমি বিশ্বাস করি না।”

“হয়তো ওই লোকটার কথা তোমার দাদু লেখেননি। আসলে ওর সম্পর্কে তিনি ঠিক কী-কী লিখেছেন জানলে খোঁজ পেতে সুবিধে হত।”

ডরোথি একটা নোটবই বের করল। বোঝা যাচ্ছে যে তার দাদুর ডায়েরি থেকে ওখানে নোট করেছে তথ্যগুলো। সে পড়ল, “তারিণী সেন। যে লোকটা আমাকে প্রচন্ড সাহায্য করেছিল তাকে আমি শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারিনি। স্বাধীনতা এমন একটা স্বপ্নের নেশা যে-কোনও মানুষ তার লোভে পালটে যেতে পারে। আমি ওর ওপর যে অত্যাচার করেছি তার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তা না করে আমার উপায় ছিল না। এখন অনুশোচনা হচ্ছে। লোকটা হয়তো চিরকালই বিশ্বস্ত থাকত।” ডরোথি তাকাল, “ব্যস, এইটুকু।”

অর্জুন চোখ বন্ধ করে শুনছিল। এবার গম্ভীর মুখে বলল, “লোকটা আর যেই হোক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল না। ওই সময়ে কোনও ভারতীয় ইংরেজ শাসককে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলে তাকে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা হত না।”

“হয়তো। তবে এই লোকটা তো সরকারের প্রতি অনুগত হতে পারেন, দাদু তাকে ভুল বুঝেছেন বলে পরে অনুশোচনা করেছেন।”

“অনুগত ছিলেন তাতে ভুল নেই। এ দেশে তো বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই।”

“আমি এ-ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না।”

"তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। সুধীরবাবু বলেছেন ওই নামে একজন কুখ্যাত অপরাধী ছিল। আমরা কালকে জানতে পারব লোকটা তোমার দাদুর সময়ে ছিল কি না আর কোন অঞ্চলের মানুষ !"

"সুধীর মৈত্র কে ?"

"একজন পণ্ডিত মানুষ। জলপাইগুড়ির ইতিহাস ওঁর জানা। পাহাড়ি পাড়ায় থাকেন। উনি আগামিকাল আমাকে যেতে বলেছেন।"

ডরোথি কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অর্জুনের মনে হল, এটা স্বাভাবিক। একজন কুখ্যাত অপরাধীর সঙ্গে তার দাদুর সম্পর্ক ছিল, এটা ভাবতে নিশ্চয়ই ভাল লাগছে না তার। কিছুক্ষণ কথা বলে আগামীকাল আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নীচে নেমে এল। চৌকিদারকে ডরোথির নিরাপত্তার কথা আর-একবার মনে করিয়ে দিয়ে সে বাইকে চড়ে বসল। এদেশের বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য পেয়েছিল বলেই ইংরেজরা দুশো বছর ধরে রাজত্ব চালিয়ে যেতে পেরেছে। বোঝা যাচ্ছে ওই রকম একজন বিশ্বাসঘাতকের নাম তারিণী সেন। ওই লোকটা কুখ্যাত অপরাধী নাও হতে পারে। একজন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কারও অনুশোচনা হতে পারে না। অন্যমনস্ক হয়ে বাইক চালাচ্ছিল অর্জুন। হঠাৎ একটা গাড়ির জোরালো আলো মুখে পড়ায় সে হকচকিয়ে রাস্তার একপাশে সরে এল। গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর তার মনে হল অকারণে জোরে চালাচ্ছে ড্রাইভার।

এখন শহরের রাস্তায় রাত ন'টাতেও মানুষজন রিকশায় দেখা যায়। বছর পাঁচেক আগেও সাতটার পর রিকশা উধাও হয়ে যেত। ন'টার সময় রাস্তার অবস্থা শ্মশানের মতো। অর্জুনের মনে পড়ল বিমল হোড় মশাইয়ের কথা। সুধীরবাবু ওঁর কথা বলেছিলেন। বিমল হোড় এই শহরের প্রবীণ আইনজ্ঞ। নিশ্চয়ই বয়স হয়েছে। অর্জুন তাঁকে কয়েকবার দূর থেকে দেখেছে। ভদ্রলোক হয়তো এতক্ষণে শুয়ে পড়েছেন। এই সময় গেলে বিরক্ত করা হবে। তবু অর্জুন সমাজপাড়ার দিকে বাইক নিয়ে চলল। বিভীষণ অথবা মিরজাফরদের কাহিনী জানতে মানুষের চিরকাল কৌতূহল হয়। অর্জুনেরও হচ্ছিল।

বিমল হোড় মশাইয়ের বাড়িতে আলো জ্বলছিল। নীচের তলার ঘরটির সামনে দু'জন লোক কথা বলছে। একটু ইতস্তত করে অর্জুন বাইক থামিয়ে গেট খুলল। লোক দুটো ফিরে তাকাতে সে এগিয়ে গেল, "কিছু মনে করবেন না, বিমলবাবু কি এখন দেখা করতে পারেন ?"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কী দরকার ?" বলেই তার খেয়াল হল, "আরে ! আপনি অর্জুন না ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন। বাবা অবশ্য অনেক আগে ওপরে চলে যান। আজ ল' কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হল বলে এখনও নীচে আছেন। আসুন।"

ভদ্রলোক তাকে নিয়ে গেলেন যে ঘরে, সেটা আইনজ্ঞের ঘর তাতে কোনও

সন্দেহ নেই। অর্জুন দেখল বিমলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ভদ্রলোক বললেন,"বাবা, ইনি অর্জুন।"

"কোন অর্জুন ?"

"ডিটেকটিভ।"

শব্দটা নিয়ে অর্জুন আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বিমলবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে, এসো, এসো। বোসো। তোমার নাম শুনেছি এতকাল, চোখে দেখলাম এই প্রথম। 'তুমি' বললাম বলে রাগ কোরো না।"

"না, না। অবশ্যই বলবেন।"

"বয়সের অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছি।" বিমলবাবু বললেন, "বোসো। বলো, কী দরকার। আমার কাছে কোর্ট-কাছাবির ব্যাপার না থাকলে তো কেউ সহজে আসে না !"

"পাহাড়ি পাড়ার সুধীর মৈত্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।"

"সুধীর ? সে তো পন্ডিত মানুষ। ব্যাপারটা কী ?"

"আপনি তারিণী সেন নামে কাউকে চেনেন ?"

"জলপাইগুড়িতে সেনবংশ ব্যাপক। কোন তারিণী সেনের কথা বলছ ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড নামে এক সাহেবের ডায়েরিতে নামটা পাওয়া গেছে।"

"কী সাহেব ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

"নামটা শোনা-শোনা। ওহো ম্যাকসাহেব ! ভয়ঙ্কর লোক। আজকাল বয়সের দোষে সব সময় স্মরণশক্তি কাজ করতে চায় না। তা, ওঁর ডায়েরিতে নামটা পাওয়া গিয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তারিণী সেন।" চোখ বন্ধ করলেন বিমলবাবু। সম্ভবত স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য অর্জুন বলল, "মনে হচ্ছে লোকটা বিশ্বাসঘাতক ছিল।"

চোখ খুললেন বিমলবাবু, "ইয়েস, মনে পড়েছে। লোকটা ছিল কুখ্যাত ডাকাত। ওই ময়নাগুড়ি অঞ্চলে ওর ভয়ে মানুষ শিউরে থাকত। লোকটাকে অ্যারেস্ট করা হয়, সেটা নাইনটিন থার্টি এইট, হ্যাঁ, ওই বছরই। তার পরের বছর খগেনদা, ধীরাজদা, শশাদারা জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন করেন। সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু আর প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র। 'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো' ধ্বনিটি ওখানেই ঘোষিত হয়। এর ঠিক আগের বছর তারিণীকে গ্রেফতার করে আনে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে চার্জ ছিল, খুন-ডাকাতি-রাহাজানির। অন্তত গোটা দশেক খুন করেছিল লোকটা।"

"বিচারে কী শাস্তি হয়েছিল ?"

"বিচার হয়নি।"

"তার মানে ?"

"পুলিশ সাক্ষী দেওয়ার জন্যে একটা মানুষকেও জোগাড় করতে পারেনি। ওর ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায়নি। বংশী বর্মণ নামে দোমহনির একজন শিক্ষক পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তিনি সাক্ষী দিতে চান। কিন্তু তার পরদিনই বংশীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। আর তারপর থেকে সমস্ত সাক্ষী উধাও। প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়ে যায় তারিণী। শুনেছি, এ-ব্যাপারে নাকি ম্যাকসাহেবের একটা বড় ভূমিকা ছিল।"

"তারিণী সেন তারপরেও ডাকাতি করত ?"

"না। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খবর সে ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিত। ময়নাগুড়ি থেকে দোমহনি পর্যন্ত যে এলাকা, সেটা যেন ওর সম্পত্তি ছিল। টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত সে। কিন্তু মানুষ তার অন্যায়ের শাস্তি পাবেই। তারিণীও পেয়েছিল। তাকে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে আনা হয়েছিল প্রচন্ড আহত অবস্থায়। দুটো হাত কেউ কেটে নিয়ে গিয়েছে। প্রচন্ড প্রাণশক্তি থাকায় রক্তপাত হলেও বেঁচে গিয়েছিল সে। কিন্তু পুলিশের কাছে শুনেছি কোনও জবানবন্দী দেয়নি।"

"কেন ?"

"জানি না। তারপর লোকটার কোনও খবর জানি না।"

"তারিণী সেন নিশ্চয়ই বেঁচে নেই ?"

"বেঁচে থাকলে আশির ওপর বয়স হবে।"

"আপনি বললেন ওর দুটো হাত কেটে ফেলা হয়েছিল !"

"হ্যাঁ। সুস্থ হলেও ওই অবস্থায় কতদিন বেঁচে থাকা যায়, জানি না। কিন্তু তুমি ওর সম্পর্কে এত ইন্টারেস্টেড কেন ?"

"আমি নই। একজন বিদেশিনী লোকটার সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু মনে হচ্ছে ওর এতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা একটু অস্বাভাবিক !"

বিমল হোড় বললেন, "তুমি একটা কাজ করতে পারো। ময়নাগুড়িতে আমার এক পুরনো মক্কেল থাকেন। অবস্থাপন্ন পরিবার। ভদ্রলোকের নাম হরিদাস বর্মন। ময়নাগুড়ির মোড় থেকে নাটাগুড়ির দিকে যাওয়ার পথেই ওঁর বাড়ি। সবাই চেনে। ওঁর কাছে যেতে পারো। আমার নাম করলে হরিদাসবাবু তোমাকে সাহায্য করবেন। উনিই বলতে পারবেন, তারিণী সেন বেঁচে আছে কি না !"

॥ তিন ॥

আজ ঘুম ভেঙে গেল সাতসকালে। একটু আলস্য লাগছিল বলে অর্জুন মর্নিং ওয়াকে বের হল না। বিছানায় শুয়ে ডরোথির কথা ভাবল সে। কাল রাত্রে মেয়েটা ঠিকঠাক ছিল কিনা খোঁজ নিতে হবে। অমল সোম যখন তার কাছে পাঠিয়েছেন তখন একটা দায়িত্ব তো থাকছেই। তারপর তারিণী সেনের কথা মনে এল। কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্রের চেয়ে তারিণী সেন অনেক বেশি আকর্ষক চরিত্র।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই তারিণী সেন অপরাধী ছিল। কুখ্যাত ডাকাত। তার কাছে ক্ষমা চাইবেন কেন রিচার্ডসাহেব ? এই লোকটি তাই রিচার্ডসাহেবের ডায়েরিতে লেখা লোক নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অমন কুখ্যাত মানুষের বিরুদ্ধে যখন সাক্ষ্য দেওয়ার মানুষ পাওয়া যায়নি, তখন তার দুটো হাত কেটে ফেলার সাহস কে দেখাবে ? বিপ্লবীরা বদলা নেয়নি তো ? দোমহনি থেকে ময়নাগুড়ি অঞ্চলটায় সে ঘুরে বেড়াত ! ডাকাতি ছেড়ে দেওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খবর সাহেবদের দিত। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু এ সবের সঙ্গে রিচার্ড সাহেবের সম্পর্ক কোথায় ? তবু, এত বছর পরেও চরিত্রটা তাকে টানছে। অর্জুন ঠিক করল সে ময়নাগুড়িতে গিয়ে হরিদাস বর্মণের সঙ্গে দেখা করবে।

মা ঘরে ঢুকলেন, "কী রে, শরীর খারাপ নাকি ?"

অর্জুন হাসল, "না। আরাম করছি।"

"তোকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন। ওঠ।"

"কে ?"

"নাম জিজ্ঞেস করিনি। বয়স্ক মানুষ। সেই মেয়েটার জন্যে জলখাবার করে দিচ্ছি। হ্যাঁ রে, আমার রান্না ওর পছন্দ হয়েছে তো ?"

অর্জুন বিছানা থেকে নামল, "খুব। তবে জলখাবার লাগবে না। ওখানেই ব্যবস্থা হয়েছে।" সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেল।

বাইরের ঘরে এসে অর্জুন অবাক ! সুধীর মৈত্র বসে আছেন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক খুব বিচলিত। সে জিজ্ঞেস করল, "এ কী, আপনি ?"

"আসতে হল। খোঁজ খবর নিয়ে চলে এলাম। খুব সমস্যা—।"

"বলুন !"

"কাল মাঝরাতে দু'জন লোক এসেছিল বাড়িতে।"

"মাঝরাত্রে ?"

"হ্যাঁ। তখন প্রায় বারোটা। আমি অবশ্য জেগে ছিলাম। হারু সান্যাল মশাইয়ের 'দি রাজবংশীস অফ নর্থবেঙ্গল' বইটা আবার পড়ছিলাম। আটষট্টি সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিল বইটা। এই সময় ওরা দরজায় নক করল।"

"তারপর ?"

"আমি বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম। ওরা ক্ষমা চেয়েছিল। অনেক কষ্ট করে আমার সন্ধান পেয়ে শিলিগুড়ি থেকে এসেছে ওরা। তারিণী সেন নামে কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা আমি জানি কি না তা ওরা জানতে চেয়েছিল।"

"সে কী ?" অর্জুন চমকে উঠল।

"হ্যাঁ। আমিও অবাক হয়ে যাই। এত বছরে কেউ আমাকে ওই প্রশ্ন করেনি। আর একই দিনে দু'জন, তুমি এবং ওরা, তারিণী সেনের খবর জানতে চাইল। বুঝলাম এর পেছনে রহস্য আছে। তুমি জলপাইগুড়ির ছেলে। আমার কাছে আশা করব মিথ্যে কথা বলবে না। তারিণী সেন সম্পর্কে যারা আগ্রহী, তাদের মতলব ভাল হতে পারে না।"

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, "আমি আপনার কাছে সত্যি কথা বলেছি। ওই বিদেশিনী আমাকে বলেছেন যে, তাঁর দাদু তিনজন মানুষের নাম ডায়েরিতে লিখে গেছেন যাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে তিনি এদেশে এসেছেন।"

"তুমি এটা বিশ্বাস করছ ?"

"এখনও অবিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ ঘটেনি। অবশ্য শুনলে একটু অবাক হতেই হয়। তবে মানুষ তো অনেক অদ্ভুত কান্ড করে।"

"কাল রাত্রে লোক দুটোকে আমি কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা বলল তারিণী সেনের কাহিনী ভাসা-ভাসা শুনে মনে হয়েছে ভাল সিনেমা করা যায়। কিন্তু আরও বিস্তৃত জানার জন্যে লোকটার কাছে যাওয়া দরকার বলেই এসেছে।"

"আপনি বললেন ওরা শিলিগুড়ি থেকে এসেছিল।"

"তাই বলেছে।"

"বাঙালি ?"

"একজন বাঙালি, অন্যজন নয়। তার কথা জিজ্ঞেস করিনি।"

"তারপর ?"

"আমি যখন জানালাম ওই নামের কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীকে চিনি না, তখন ওরা কিছুক্ষণ শক্ত মুখে বসে রইল। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়জন ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, "স্বাধীনতার আগে যে তারিণী সেনের নাম আপনি জানেন, তার কথা বলুন।"

আমি খুব রেগে গেলাম। এত রাত্রে যেচে বাড়িতে ঢুকে ওরা যেন আমাকে আদেশ করছে। আমি কিছু বলতে অস্বীকার করলাম। বাঙালিটি বলল, "আপনি এত রাগ করছেন কেন ? আপনি বলুন এবং তার জন্যে পারিশ্রমিক পাবেন।"

কথাটা শুনে আমি এত রেগে গিয়েছিলাম যে, ওরা আর অপেক্ষা করেনি।

আমি রাত্রে ভাল করে ঘুমাতে পারিনি। এই লোকগুলোর অ্যাটিচুড মোটেই ভাল নয়। তুমি না-হয় ম্যাক সাহেবের নাতনির অনুরোধে তারিণী সম্পর্কে জানতে আমার কাছে এসেছিলে, কিন্তু ওরা এল কেন ? আমার কাছে কে পাঠাল ?"

"আমাকে সন্তুদা বলেছিলেন আপনার কথা।" অর্জুন বিনীত গলায় বলল।

"ওদের কে বলেছে আমার কথা ? শিলিগুড়ি থেকে মাঝরাত্রে সোজা আমার বাড়ির দরজায় ? আমি যেন ইনফরমেশন সেন্টার। সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বসে আছি।" বিড়বিড় করলেন সুধীর মৈত্র।

"আপনি থানায় একটু বলে রাখুন।"

"সকালে ফোন করেছিলাম। পঞ্চাশ বছর আগের একটা মানুষ সম্পর্কে জানতে এসেছিল শুনে ওরা পাত্তাই দিল না।"

মা ভেতর থেকে ডাকতে অর্জুন ক্ষমা চেয়ে নিয়ে উঠল। চা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ট্রেতে দুধ, চিনি, চা আলাদা পটে নিয়ে ফিরল অর্জুন। সুধীর মৈত্র সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি কালো চা খাই।"

চুপচাপ চা খেলেন সুধীরবাবু। অর্জুনও কথা বলেনি। চা শেষ করে সুধীরবাবু বললেন, "লোকটাকে নিয়ে সিনেমা বানাবে! ক্রিমিন্যালদের ছবি লোকে দ্যাখে ?"

"দ্যাখে। খুব অ্যাকশন থাকে তো !"

"তারিণী সেনকে পুলিশ ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নাইনটিন থার্টি এইটে। কিন্তু কোনও শাস্তি হয়নি তার। আমি কাল এটুকুই জানতে পেরেছি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। সে যে শিমল হোড়ের কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য পেয়েছে, সেটা বলল না। সুধীরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আমি নিজের মনে পড়াশোনা করতে ভালবাসি, বাইরের লোক এসে ডিস্টার্ব করলে খুব অসুবিধে হয়। তা বলে ভেবো না তোমাকে আমি বাইরের লোক বলছি। চলি।"

অর্জুন ভদ্রলোককে এগিয়ে দিল খানিকটা। ফিরে আসার সময় সে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সুধীরবাবুর বাড়িতে অত রাত্রে কারা গিয়েছিল ? সন্তুদা যেভাবে তাকে সুধীরবাবুর খবর দিয়েছিল সেইভাবেই কি লোক দুটো খবর পেয়েছিল ? সিনেমার ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। তার জন্য ওরা সকালবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত। বোঝাই যাচ্ছে, ওদের ধৈর্য ধরার মতো সময় ছিল না। কেন ?

ডরোথি যেমন তারিণী সেনকে খুঁজছে ওর দাদুর শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে, তেমনই এদের কী কারণে একই সঙ্গে লোকটাকে দরকার হয়েছে ? ব্যাপারটা যেহেতু রহস্যময়, তাই ডরোথিকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, গত রাতে যারা সুধীব মৈত্রের কাছে গিয়েছিল, তারা ডরোথির

জলপাইগুড়ির আসার খবর পেয়েছে এবং কোনও অজানা ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছে।

তৈরি হয়ে বাইক নিয়ে বের হল অর্জুন। তিস্তা ভবনের গেটে পৌঁছে সে ডরোথিকে দেখতে পেল। এই সকালবেলায় নরম রোদে লনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। পরনে হলদে ছোপ দেওয়া চমৎকার স্কার্ট। মাথায় রিবন। বয়স অনেক কম লাগছে।

"গুড মর্নিং।" অর্জুন হাসল।

"গুড মর্নিং। সত্যি, সকালটা খুব সুন্দর! ওটা কী পাখি?"

অর্জুন দেখল কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচু ডালে পাখিটা বসে আছে, "আমি ইংরেজি নাম জানি না। বাংলায় বলে নীলকণ্ঠ।"

ডরোথি মনে-মনে নামটা উচ্চারণের চেষ্টা করল, কিন্তু পাখিটা উড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে তাকে বেশ হতাশ দেখাচ্ছিল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। ডিম সেদ্ধ, টোস্ট আর চা।"

"তোমার জন্যে একটা খবর আছে।"

ডরোথির মুখে হাসি ফুটল, "তিন নম্বরের খবর পেয়েছ?"

"কিছুটা। কিন্তু খবর হচ্ছে ওই তারিণী সেন সম্পর্কে তুমি ছাড়া আরও দু' জন মানুষ ইন্টারেস্টেড। তাঁরা ওর ওপর সিনেমা তৈরি করবেন।"

ডরোথির মুখ শক্ত হয়ে গেল, "কে বলল এ-কথা?"

"ওরাই। অবশ্য আমাকে নয়। গতকাল আমি যে ভদ্রলোকের কাছে তারিণী সেনের খবর আনতে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছেই ওরা রাত বারোটার সময় গিয়েছিল। আমার কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হচ্ছে না, ওরা সুধীরবাবুর কাছেই গেল কেন? জলপাইগুড়ি শহরে অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন যাঁরা পুরনো দিন নিয়ে কথা বলতে ভাল পারেন। তাঁদের কারও কাছে না গিয়ে ওরা—! এটা কাকতালীয় ঘটনা বলে মনে করি না।"

ডরোথি বলল, "তোমাকে যিনি ওঁর কথা বলেছিলেন তেমনই আর-একজন ওদের একই নাম বলতে পারেন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো আলাদা।"

"হ্যাঁ। তবে সেটা একই সময়ে বলে অস্বস্তি হচ্ছে। বিশেষ করে লোকটার অতীত ভাল নয়। তারিণী সেন কুখ্যাত ডাকাত ছিল।" অর্জুন তাকাল ডরোথির দিকে। মেয়েটা পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা একটু সহজ করার জন্য সে বলল, "আসলে সত্যসন্ধান করতে-করতে এমন অভ্যেস তৈরি হয়েছে যে, কোনও কিছুকেই সহজ মনে গ্রহণ করতে পারি না।"

"তারিণী সেন কি এখনও বেঁচে আছে?" ডরোথি জিজ্ঞেস করল।

"জানি না। না থাকারই সম্ভাবনা। সময় তো কম বয়ে যায়নি।"

"উনি কোথায় থাকতেন?"

"ময়নাগুড়ি থেকে দোমহনির মধ্যে।"

"আমরা নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে পারি। কত দূরে?"

"বেশি দূর নয়। তিস্তা ব্রিজ পার হলেই দোমহনি। মিনিট কুড়ির পথ।"

"তা হলে চলো।"

"আমি বলি কি, তুমি গেস্ট হাউসেই থাকো ; আমি ঘুরে আসি।"

"না। একা থাকতে একঘেয়ে লাগছে। আমি যাব।"

অতএব ডরোথিকে পেছনের সিটে বসাতে হল। জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তায় সাইকেল রিকশার ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। টাউন ক্লাবের পাশ দিয়ে অর্জুন তিস্তা ব্রিজের পথ ধরল। রাস্তায় অধিকাংশ মানুষ ঘুরে-ঘুরে তাদের দেখছে। এটা যে ডরোথির কারণে, তা বলা বাহুল্য। ডরোথি এখন রোদচশমা পরে নিয়েছে। ফলে তার মনের ভাব বোঝা সম্ভব নয়। কী রকম নির্বিকার দেখাচ্ছে।

এখন দু'পাশে ফাঁকা মাঠ, নীল আকাশ মাথার ওপর, আর চমৎকার বাতাস শরীরে আলতো আঘাত করছে। পেছনে বসে ডরোথি বলল, "কী আরাম!"

অর্জুন কিছু বলল না। তার মনে হচ্ছিল মেয়েটার বয়স নিশ্চয়ই বেশি নয়, শরীরটাই বড় হয়েছে শুধু। নইলে ওই দুটো লোককে নিয়ে সে এবং সুধীরবাবু যতটা বিচলিত হয়েছে, তার বিন্দুমাত্র ও হচ্ছে না কেন? সহজ-সরল মানুষদের সুবিধে হল দুশ্চিন্তা চট করে তাদের আঁকড়ে ধরে না, ফলে ভাল থাকে।

তিস্তা ব্রিজে টোল ট্যাক্স দিতে থামতেই হল। টিকিট নিয়ে অর্জুন বলল, "এটা হল তিস্তা নদী। এখন বেশি জল নেই বলে ভেবো না সারা বছর এইরকম চেহারা থাকে। ভরা বর্ষায় এপার-ওপার দেখা যায় না।"

ডরোথি নেমে পড়েছিল। কয়েক পা হেঁটে ব্রিজের ওপর রেলিং ধরে দাঁড়াল সে। হাওয়ায় তার পোশাক উড়ছে। বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে অর্জুন পাশে চলে গেল, "যখন এই ব্রিজ তৈরি হয়নি তখন বর্ষাকালে নৌকোয় মানুষ এপার থেকে ওপারে যেত। প্রচুর সময় লাগত তখন। শীতকালে শুনেছি একপাশে নৌকো আর বাকিটা চরের ওপর ট্যাক্সি চলত। ওদিকটা হল বার্নিশ। কমলাকান্ত রায়কে ওখানে পাওয়া গিয়েছিল।"

ডরোথি অনেক দূরের গাছপালার দিকে তাকাল। এখান থেকে সেটা প্রায় অস্পষ্ট।

ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "আমার ঠাকুর্দাও তা হলে নৌকো করে পার হতেন?"

"নিশ্চয়ই। তখন মোটরবোট চালু হয়নি।"

আবার বাইক চালু করে অর্জুন ব্যাপারটা ভাবতে আরম্ভ করল। মায়ের কাছে সে শুনেছে তখন নদী পার হতে ঘণ্টা দেড়েক লেগে যেত। রিচার্ড অথবা ম্যাকসাহেব প্রায়ই তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করে কোন কারণে বার্নিশের দিকে

যেতেন, সেটা বোধ হয় কখনও জানা যাবে না। মানুষ অকারণে এত কষ্ট করে না।

দোমহনির মোড় জমজমাট। আগে এখানে রেল লাইন ছিল, আটষট্টির বন্যার পর ট্রেন চলে না। ডান দিকে বাইপাসের পথ ছেড়ে অর্জুন সোজা চলে এল ময়নাগুড়িতে। তেমাথার মোড়ে বাইক থামিয়ে সে জায়গাটার নাম বলল ডরোথিকে। বেশ হতশ্রী চেহারা। দোকানপাটগুলো যে সচ্ছল নয় বোঝা যায় সাজগোজ দেখে। বাইপাস হওয়ার পর থেকে ময়নাগুড়ির গুরুত্ব কমে গেছে।

ওদের দাঁড়াতে দেখে ভিড় জমে গেল। মফস্বলের বেকার মানুষেরা গোল হয়ে ঘিরে ওদের দেখতে লাগল। কালো চামড়ার মানুষের পেছনে সাদা চামড়ার এক মেমসাহেব দেখে ওরা কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল। অর্জুন এক জনকে জিজ্ঞেস করল, 'হরিদাস বর্মণকে চেনেন ?'

সঙ্গে-সঙ্গে গুঞ্জন উঠল। এরা হরিদাস বর্মণের বাড়িতে এসেছে অতএব আর কোনও কৌতূহল থাকতে পারে না, এমন ভাব। একজন জবাব দিলেন, "ওই যে রাস্তাটা, চারটে বাড়ি বাদ দিলেই ডানহাতি দোতলা বাড়ি। কোনও কাজ আছে বুঝি ?"

মফস্বলের লোকেরা প্রশ্ন করার সময় ভাবে না করাটা ঠিক কিনা। মুখ আর মনের ফারাক নেই। অর্জুন বাইক ঘোরাতেই রাস্তা করে দিল লোকগুলো। ঠিক চতুর্থ বাড়িটির সামনে পৌঁছে অর্জুন বাইক থেকে নামল।

ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "এটা কার বাড়ি ?"

"হরিদাস বর্মণ। অনেক পুরনো মানুষ। কপাল ভাল থাকলে এর কাছে খবর পাব।" অর্জুন এগোল। বাড়িটার সামনে কোনও ফেন্সিং অথবা গেট নেই। রাস্তা ছেড়ে কিছুটা এগোলেই বারান্দা। ওদের এগোতে দেখে এক ভদ্রমহিলা মাথায় ঘোমটা তুলে দ্রুত ঢুকে গেলেন ঘরে। ওরা বারান্দায় উঠতেই একটি বয়স্ক গলা ভেসে এল, "কাকে চাই ?"

অর্জুন চার পাশে কাউকে দেখতে পেল না। গলার স্বর ভেসে এসেছিল যেদিক থেকে, সেদিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা হরিদাসবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?"

"জলপাইগুড়ির বিমল হোড়মশাই পাঠিয়েছেন।"

"ও, কথা বলছি।"

"আচ্ছা ! আপনিই হরিদাসবাবু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আমি পুজো করছি, পরনে গামছা। এই অবস্থায় পুরুষমানুষের সামনে যাওয়া গেলেও কোনও মহিলার সামনে নয়।

"ঠিক আছে। আপনি পুজো শেষ করুন, আমরা অপেক্ষা করছি।"

ইতিমধ্যে একজন মেমসাহেব আগমনের সংবাদ ছড়িয়েছে মহল্লায়। হরিদাস বর্মণের কণ্ঠ চুপ করে গেলেও ইজের-পরা খালি গায়ের শিশু থেকে বয়স্ক মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে সামনে। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এরা আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছে ?"

"সম্ভবত তোমার চামড়া !"

"মাই গড ! চামড়া দেখার কী আছে ?" আঁতকে উঠল ডরোথি।

"ওটা তুমি বুঝবে না। দু'শো বছর ধরে তোমার পূর্বপুরুষ আমাদের মনে যে কমপ্লেক্স ঢুকিয়ে দিয়েছে, এটা তারই ফল। উপেক্ষা করো, ঠিক হয়ে যাবে।"

এই সময় ভেতর থেকে একটি মিহি নারীকণ্ঠ ভেসে এল, "আপনারা ঘরে এসে বসুন। বাইরে থাকলে ভিড় বাড়বে।"

সামনের দরজাটা খুলে গিয়েছিল। ওরা ঘরে ঢুকল। ঘরে কেউ নেই।

চেয়ারে বসে ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "এরা কেউ সামনে আসছে না কেন ?"

"মনে হয় বাড়িতে হরিদাসবাবু ছাড়া কোনও পুরুষ নেই।"

"আমি তো মেয়ে, মেয়েরা আসতে পারত !"

অর্জুন উত্তর দিল না। উত্তরবাংলার অনেক পরিবারে এখনও রক্ষণশীলতা ভালভাবে রয়েছে। একজন ইংরেজ মেয়েকে এই ব্যাপারটা বোঝানো যাবে না।

খড়মের আওয়াজ হল। ভেতরের দরজায় এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দেখা দিলেন। সাদা ফতুয়ার নিচে লুঙ্গি। মাথার চুল ধবধবে সাদা। অর্জুন উঠে দাঁড়াতেই হরিদাস বর্মণ হাতের ইশারায় বসতে বললেন। তাঁর নজর ডরোথির দিকে গেল, "ইনি কোন দেশের মেয়ে ?"

"ইংল্যান্ড। ওর নাম ডরোথি। আমি অর্জুন।"

ভদ্রলোক বসলেন। ডরোথির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখানে এখন মেমসাহেব দেখা যায় না বলে বাইরে অত ভিড় হয়েছে। আমি তো ইংরেজি জানি না, কৃষক মানুষ। খেতি খামারির ভাষা বুঝি। বিমলবাবু আপনাদের পাঠিয়েছেন ?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। আপনি তো ময়নাগুড়িতে অনেকদিন আছেন ?"

"হ্যাঁ। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আমার জন্ম।"

অর্জুন ডরোথিকে বলল, "ইনি ইংরেজি জানেন না। আমি পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব।" ডরোথি মাথা নেড়ে সায় দিল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা একজন মানুষের কথা জানতে চাই। ওঁর নাম তারিণী সেন। শুনেছি এককালে উনি খুব কুখ্যাত ছিলেন।"

তারিণী সেনের নাম শুনে সোজা হয়ে বসলেন বৃদ্ধ, "ওর কথা কে বলল ?"

"আমরা খোঁজখবর নিয়েছি।"

"অদ্ভুত কাণ্ড ! এখন কেউ তারিণীর খবর নেবে ভাবতেই পারি না। হ্যাঁ,

কী জানতে চান ওর সম্পর্কে ?"

"উনি এক সময় ডাকাতি করতেন ?"

"হ্যাঁ। সে একটা সময় ছিল যখন তারিণীর ভয়ে মানুষ কাঁপত। ওর একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনলে লোকে ঘরের দরজা বন্ধ করত। তখন এদিকে শুধুই জঙ্গল। এই আমার বাড়ির সামনে বাঘ আসত। অবশ্য বাড়িটা মাটির ছিল। মাটির একতলা। তারিণী সম্পর্কে জানতে চান কেন ? বইটই লিখবেন নাকি ?"

"না। ইনি একটা ডায়েরিতে তারিণী সেনের নাম পড়েছেন। সেই সুবাদেই এখানে এসেছেন আরও খোঁজখবর নিতে। ওর আত্মীয়স্বজন কেউ আছে ?"

"না। নেই। দু-দুটো বিয়ে করেছিল, বাচ্চা হয়নি। এখন বউরাই ওকে খাওয়ায়।"

"এখন খাওয়ায় মানে ? উনি কি জীবিত আছেন ?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "মাস তিনেক আগেও ওকে দেখেছি।"

অর্জুনের উত্তেজনা লক্ষ করে ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন উনি ?"

অর্জুন ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তারিণী সেন বেঁচে আছে।"

"রিয়েলি ?" চিৎকার করে উঠল ডরোথি।

অর্জুন হকচকিয়ে গেল। ডরোথি যে এত উত্তেজিত হতে পারে, সে ভাবেনি। ডরোথি বলল, "ওঁকে জিজ্ঞেস করো, কোথায় গেলে দেখা পাওয়া যেতে পারে ?"

অর্জুন হরিদাসবাবুর দিকে তাকাল, "উনি কোথায় থাকেন ?"

"তারিণীর বাড়ি হুচলুডাঙার কাছে। হুচলুডাঙা চেনেন ?"

"না।"

"এখান থেকে সাত মাইল পূর্বে জলঢাকা নদীর আগে হুচলুডাঙা। সেখান থেকে তিন মাইল কাঁচা পথ ধরে এগোলে পূর্বদহর মন্দির। সেখানে গিয়ে হাতকাটা তারিণীর খোঁজ নিলে যে-কেউ বলে দেবে।"

হুচলুডাঙা নামটা অনেকদিন মনে থাকবে। এ-অঞ্চলে অভিনব নামের গ্রাম ছড়িয়ে রয়েছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তারিণী সেনের যখন বয়স হয়েছে তখন তাঁর স্ত্রীদের তো একই অবস্থা হওয়ার কথা। তাঁরা কী করে রোজগার করেন ?"

"কিছু জমি আছে। সেখানে চাষ হয়। আর বাকিটা ফাইফরমাশ খেটে। কোনও মতে বেঁচে আছে বলতে পারেন। আপনি বললেন, ডায়েরিতে নাম পেয়ে উনি এদেশে এসেছেন। তারিণী কি এই বয়সে কারও সম্পত্তি পাচ্ছে ? এ রকম তো হয় শুনেছি।"

অর্জুন ইচ্ছে করেই রিচার্ডসাহেবের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। বলল, "না, না। আমাদের দেশের একজন কুখ্যাত ডাকাতকে দেখার লোভেই উনি এসেছেন।"

"তা হলে নিয়ে যাবেন না। খুব হতাশ হবেন। ভাল খেতে না পেয়ে তার চেহারা প্রায় হাড় জিরজিরে। ডাকাত বলে মনেই হবে না।" বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন, "আগে প্রায়ই আমার কাছে আসত টাকা চাইতে। বলতাম এমনি-এমনি দেব না। কাজ করো, টাকা নাও। আমার জোতে সুপুরি, নারকেল গাছ আছে অনেক। দু' হাতে পাঞ্জা কাটা। তবুও সড়সড় করে উঠে যেত নারকেল গাছে। কনুইয়ের ভাঁজে কাটারি গুঁজে ফল কাটত। এ সব অবশ্য অনেক দিন আগের কথা।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওর হাত দুটো কাটা গেল কী করে?"

"এটা কেউ জানে না। তারিণীও কাউকে বলেনি। নিশ্চয়ই কেউ প্রতিশোধ নিয়েছিল। ও যা করত তাতে তো শত্রুর কোনও অভাব ছিল না।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। খানিকটা বিরক্ত করে গেলাম। আচ্ছা, নমস্কার।"

বাইরে বেরিয়ে এল এরা। তখনও দর্শকরা অপেক্ষা করছে ডরোথিকে দেখবে বলে। ডরোথি কিছু বলতে যেতেই অর্জুন বাধা দিল, "এখান থেকে বেরিয়ে কোনও ফাঁকা জায়গায় গিয়ে কথা বলব আমরা।"

ময়নাগুড়ি শহর থেকে খানিকটা পূর্ব দিকে যেতেই দু' পাশে ফাঁকা মাঠ। পিচের রাস্তা ছেড়ে বাইক দাঁড় করিয়ে একটু আগে শোনা তথ্যগুলো ডরোথিকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল অর্জুন। সব শুনে ডরোথি নোটবুক বের করে কিছু নোট করে নিয়ে বলল, "আমরা কি এখন ওই হুচ্‌লুডাঙায় যাব?"

"আমার কোনও আপত্তি নেই। বেশি দূর তো নয়।"

ডরোথি ঘড়ি দেখল, "তোমার খিদে পাচ্ছে না?"

খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল অর্জুন। এখন মনে হল লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ডরোথির জন্য রান্না করে মা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এখন যদি ওরা জলপাইগুড়িতে লাঞ্চের জন্য ফিরে যায়, তা হলে সব চুকিয়ে আবার এদিকে ফিরে আসতে-আসতে বিকেল হয়ে যাবে। সে বলল, "কাছাকাছি একটা রোডসাইড ফাস্ট ফুডের দোকান আছে। তোমার একটু অসুবিধে হতে পারে, তবুও সেখানেই ট্রাই করবে নাকি?"

ডরোথি হেসে জবাব দিল, "আই ডোন্ট মাইন্ড।"

ওরা ময়নাগুড়ি বাইপাসে নির্জন মাঠের গায়ে তৈরি নতুন ধাবায় চলে এল। খোলা আকাশের নীচে পাতা খাটিয়ায় বসে শুকনো মুরগির মাংস আর রুটি দিতে বলল অর্জুন। মাংসে যাতে ঝাল না দেওয়া হয় সেটা বারবার মনে করিয়ে দিল।

এরকম দোকানে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা ডরোথির নেই। তার যে মজা লাগছে বোঝা যাচ্ছিল মুখ দেখে। অর্জুন বলল, "তোমার দাদু কেন যে তারিণী

সেনের নাম ডায়েরিতে লিখলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। যা জানা যাচ্ছে তাতে লোকটা এত গুরুত্ব পেতে পারে না।"

ডরোথি গম্ভীর গলায় বলল, "আমি শুধু কর্তব্য করছি। তবে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে আমার খারাপ লাগছে।"

"আমারও তো লাভ হচ্ছে। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম।"

খাওয়া সুবিধে হল না ডরোথির। অর্জুনের ভাল লাগলেও সে মাংস প্রায় ধুয়ে নিয়ে খানিকটা খেল। ধাবাওয়ালার কাছ থেকে আর-একবার হুচ্‌লুডাঙায় পৌঁছবার পথ জেনে নিয়ে ওরা বাইকে উঠল।

প্রায় সাত মাইল পথ পেরিয়ে আসার পর ওরা হুচ্‌লুডাঙায় পৌঁছল। একটা ছোটখাটো গ্রাম। কোনও বৈচিত্র্য নেই। পূর্বদহর মন্দিরের কথা জিজ্ঞেস করতেই পথ দেখিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব হল না। শোনা গেল তিন মাইল কাঁচা পথ ধরে যেতে হবে।

রাস্তা ভাল নয়। বাইক লাফাচ্ছিল বেশ। ডরোথি সিট আঁকড়ে বসে ছিল। এই পথে জিপ ছাড়া যাওয়া বেশ কষ্টকর। গ্রামের লোক এখনও গোরুর গাড়ি ব্যবহার করে। মনে হচ্ছিল অনন্তকাল ধরে যেতে হবে এবং পৌঁছবার আগে হাড়গোড় ভেঙে যাবে।

শেষ পর্যন্ত পূর্বদহে পৌঁছন গেল। মন্দির দেখতে পেল ওরা। বিশাল ঢিবির ওপরে কাটা পাথরে তৈরি মন্দির। পাশেই একটা দিঘি, যা কাদা এবং পানায় ঢাকা। মন্দির চত্বরে একজন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের নামতে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "আসুন। ওপাশে যে নদীটা রয়েছে, জল নেই অবশ্য, তার নাম চুকচুকা নদী। আর এই দিঘির নাম পদ্মদিঘি। আমি এই মন্দিরে আছি অনেক বছর। আপনাদের সব ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।"

অর্জুন বুঝল লোকটি গাইড অথবা পাণ্ডা হতে চাইছে। যদিও এই পাণ্ডববর্জিত মন্দিরে কোনও টুরিস্ট সচরাচর আসে না, তবু লোকটাকে নিশ্চয়ই কিছু কথা মুখস্থ করে রাখতে হয়েছে। সে হেসে বলল, "সঙ্গে মেমসাহেব আছে দেখছেন, ইংরেজি বলতে পারবেন ?"

"ইয়েস সার, তবে সেইসঙ্গে নো সার। লিট্‌ল-লিট্‌ল বলতে পারি।"

"তা হলে বাংলায় বলুন। এটি কার মন্দির ?"

"আজ্ঞে, ইনি জটিলেশ্বর। এই যে গ্রাম পূর্বডহর, এর মানে হল প্রথম পুজো করা। ডহর মানে পুজো করা। এই মন্দিরের পাশে দেখুন একটা লাল রঙের ছোট্ট মন্দির আছে। কোনও এক রাজা এই মন্দির দুটো তৈরি করেছেন। তবে এখন তো আর সে দিন নেই। সরকার এখান থেকে কুবেরের মূর্তি আর একটা বিষ্ণুপট্ট নিয়ে গেছে। লোকজন যায় জল্পেশের মন্দিরে। এখানে আসে খুব কম। এদিকে আসুন।"

লোকটি এগিয়ে গেল মন্দিরের কাছাকাছি। "এই দেখুন, মন্দিরের গায়ে নানান ভঙ্গিমায় নারীমূর্তি রয়েছে। ইনি নৃত্যরত গণেশ, উনি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ। খুব প্রাচীন মন্দির এটি। ওই যে দিঘি দেখেছেন, ওখান থেকে মাটি কাটার সময় এগারোটি প্রাচীন দেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। যেমন, শিব, গণেশ, বুদ্ধ, বিষ্ণুচণ্ডী।" লোকটা চোখ বন্ধ করে নমস্কার করল কপালে দুটো হাত ঠেকিয়ে, "তাও সরকার নিয়ে গিয়েছেন।"

অর্জুন একটু অবাক হচ্ছিল। হিন্দু মন্দিরের গায়ে বুদ্ধের মূর্তি কেন? কোথায় যেন সে পড়েছিল এক কালে এদিকের বৌদ্ধরা কিছু হিন্দু দেবদেবীকে নিজেদের ধর্মে গ্রহণ করেছিল। এই গ্রহণ করা একেবারে স্থানীয়ভাবে। শিব এবং চামুণ্ডাকে বৌদ্ধরা উপাসনা করত বলে নাকি শোনা যায়। কিন্তু এখন মন্দির দেখার বদলে যে-কাজের জন্য তারা এসেছে তাই করা যাক। ডরোথি যেভাবে মন্দির থেকে মুখ ঘুরিয়ে মজা দিঘির দিকে তাকিয়ে আছে তাতে স্পষ্ট যে, তার এসব ভাল লাগছে না।

অর্জুন মন্দির ছাড়িয়ে একটু হাঁটল। লোকটি পেছনে ছুটে এল, "এ কী, পুজো দেবেন না?" মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দুই বিশালাকার দ্বারপালের একটি এখনও ভগ্নদশায় দাঁড়িয়ে আছে, অন্যটির দুটো পা নেই। সেদিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "উনি খ্রিস্টান আর আমি খুব নাস্তিক। আপনি তো এখানে থাকেন, তারিণী সেনকে চেনেন?"

লোকটি হকচকিয়ে গেল, "কোন তারিণী?"

"যার দুটো হাত নেই।"

"ও, হাতকাটা তারিণী! ওকে কে না চেনে!"

"কোথায় থাকেন উনি?"

"ওই যে বাড়িগুলো দেখছেন, ওখানে। কিন্তু আমি যে আপনাদের এত কথা বললাম— ?"

অর্জুন পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে লোকটার হাতে দিল, লোকটা যেন তাতেও খুশি হল না। অর্জুন ডরোথিকে ডাকল। ডরোথি তখন লাল মন্দিরটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ডাক শুনে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "ও এতক্ষণ তোমাকে কী বলছিল?"

"মন্দিরটার বর্ণনা দিচ্ছিল। তুমি ইন্টারেস্টেড?"

"না। ওকে তারিণী সেনের কথা জিজ্ঞেস করেছ?"

"হ্যাঁ। ওইদিকে। বাইক নিয়ে যাওয়া যাবে না। চলো হাঁটি।"

ওরা হাঁটা শুরু করতে দেখল লোকটা পেছন-পেছন আসছে। ইতিমধ্যে গ্রামের কিছু ছেলে-বুড়ো জড়ো হয়ে গেছে মেমসাহেব দেখতে।

অর্জুন হেসে বলল, "তোমাকে দেখার জন্যে সবারই দেখছি বেশ কৌতূহল।"

ডরোথি বলল, "হ্যাঁ, এখানে এসে নিজেকে বেশ দামি বলে মনে হচ্ছে।"

তারিণী সেনের বাড়িটিকে দেখিয়ে দিল সঙ্গে আসা লোকটি। এক বৃদ্ধা মহিলা দাওয়ায় বসে সুপুরি ছাড়াচ্ছিলেন ; ওদের দেখে ময়লা শাড়ির আঁচল মাথায় তুললেন।

লোকটা বলল, "ও জেঠি, এঁরা শহর থেকে এসেছেন। জ্যাঠার খোঁজ করছেন।"

"তার শরীর খারাপ। জ্বর।"

এই সময় ভেতর থেকে আর-একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কারা তোমরা ?"

দ্বিতীয়জনের চেহারা প্রথমজনের চেয়ে ভাল, বয়স সামান্য কম হতে পারে।

অর্জুন একই কথা বলল। এদিকে পেছনে ভিড় জমছে। মন্দিরে দেখা হওয়া লোকটা এগিয়ে গেল বৃদ্ধার সামনে, "তাড়াতাড়ি ডাকো জ্যাঠাকে। চেয়ে দেখছ না, খোদ মেমসাহেব এসেছেন।"

বৃদ্ধা ভেতরে চলে গেলেন। এবার লোকটি ঘুরে দাঁড়াল, "এই, হট্ হট্। এখানে কী চাই ? যেন মেলা বসেছে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবাই। যা, সরে যা।"

দু-একজন সরল, বাকিরা কয়েক পা পিছিয়ে গেল মাত্র। লোকটি অর্জুনের দিকে তাকাল, "গাঁয়ের মানুষ তো ! সব ব্যাপারে নাক গলানো অভ্যেস।"

অর্জুন জবাব দিল না। সে দেখল দ্বিতীয় বৃদ্ধা দু' হাতে কোনও রকমে ধরে বাইরে নিয়ে আসছেন একজন অসুস্থ মানুষকে। মানুষটির হাত কনুইয়ের ওপরেই শেষ হয়ে গেছে। মুখে সাদা দাড়ি, মাথার চুল অনেকখানি উঠে গেছে। দাওয়ায় বসিয়ে দেওয়ার পর মানুষটি সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা এখন স্পষ্ট।

অর্জুন ডরোথিকে ইংরেজিতে বলল, "ইনিই তারিণী সেন।"

ডরোথি দেখছিল। বলল, "তুমি কি নিশ্চিত ? ওর নাম জিজ্ঞেস করেছ ?"

অর্জুন কয়েক পা এগিয়ে দাওয়ার ধারে গেল, "আপনার নাম কী ?"

বৃদ্ধ মুখ তুললেন, ঘোলাটে চোখ, ঠোঁট চাটলেন, "তিনদিন জ্বর।"

মানুষটি হয়তো কানে কম শোনেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কী ?"

"নাম ? অ। তারিণী, লোকে বলে হাতকাটা তারিণী।"

অর্জুন এবার দ্বিতীয় বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেসা করল, "ওঁকে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন ?"

"ঘরে গুলি-ওষুধ ছিল, তাই খেয়েছে।"

"গুলি-ওষুধ মানে ?"

বৃদ্ধা ভেতরে গিয়ে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি নিয়ে এলেন।

অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, "আপনাদের গ্রামে ডাক্তার নেই ?"

মন্দির থেকে আসা লোকটি বলল, "থাকবে না কেন, আছে। বাড়িতে এসে দেখলে কুড়ি টাকা নেয়। ওষুধ কিনতে হয় ধুপগুড়ি, নয় ময়নাগুড়ি যেতে হয়। গরিব মানুষের পক্ষে এসব কি সম্ভব বাবু ? আমরা যখন দেখি খুব অবস্থা খারাপ, তখন কোনও মতে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এইভাবেই তো সবাই বেঁচে আছি।"

অর্জুন বলল, "আপনি এক্ষুনি গ্রামের ডাক্তারকে ডেকে আনুন তো !"

"আমি ?" লোকটা হকচকিয়ে গেল।

"টাকার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি, আপনি শুধু ডেকে আনুন।"

"অ। তাই বলুন।" লোকটি কয়েক পা হেঁটে একটি তরুণকে নির্দেশ দিতে সে দৌড়ল । অর্জুন এবার বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কথা বলতে পারবেন ?"

"কথা ? কী কথা ?" বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ।

"পুরনো দিনের, যা আপনার মনে আছে।"

বসে থাকতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছিল, তারিণী সেন ধীরে-ধীরে দাওয়ায় শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলেন। ডরোথি ছুটে এল অর্জুনের পাশে। ভীত স্বরে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, "উনি কি মারা যাচ্ছেন ?"

"না, না, মারা যাবেন কেন ? অসুস্থ বলে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।"

"থ্যাঙ্ক গড, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম !"

শুয়ে-শুয়েই চোখ খুললেন তারিণী সেন। অর্জুন দেখল ওঁর চোখের মণি ডরোথির দিকে স্থির হয়েছে। সেই অবস্থাতেই গোঙানির গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে ?"

"এর নাম ডরোথি। ইংল্যান্ড থেকে এসেছে আপনাকে দেখতে।"

"কালাপানি !"

"না, না, এখন আর কালাপানি পার হতে হয় না। আকাশ পথে বারো ঘণ্টাও লাগে না। এর ঠাকুরদাকে কি আপনি চিনতেন ?"

চোখের পাতা বন্ধ হল। বোঝা গেল আরও কাহিল হয়ে পড়েছেন। এবং তখনই ডাক্তারবাবু এলেন। বছর তিরিশের যুবক। শার্ট প্যান্ট পরা, হাতে ব্যাগ। এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ?"

অর্জুন বলল, "তারিণীবাবু অসুস্থ, আপনাকে তাই ডেকেছি।"

ডাক্তারবাবু একবার অর্জুন আর একবার ডরোথির দিকে তাকালেন। তাঁর ইতস্তত ভাবটা কেটে গেল। দাওয়ায় উঠে ভদ্রলোক মাটিতেই বসে পড়লেন। পাল্‌স এবং চোখের পাতা টেনে দেখার পর স্টেথো ব্যবহার করলেন।

তারপর মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "ঠান্ডা লাগল কী করে ?"

দ্বিতীয় বৃদ্ধা বললেন, "ঠান্ডার দোষ কী ! রোজ চার বেলা স্নান করে।

বললেও শুনতে চায় না। বলে, পাপ ধুয়ে ফেলি।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বুকে সর্দি বসেছে আর তা থেকে জ্বর। বয়স তো অনেক, শরীরে রেজিস্টেন্স পাওয়ার বলে কিছু নেই। তবে ওষুধ পড়লে ভয়ের কিছু নেই।"

"লিখে দিন।" অর্জুন বলল।

ডাক্তার ব্যাগ খুলে কাগজ বের করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের চিনতে পারলাম না।"

অর্জুন বলল, "আমরা একটু আগে এখানে এসেছি। ইনি ডরোথি, ইংল্যান্ডে থাকেন। আমি অর্জুন, জলপাইগুড়িতে বাড়ি।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি সেই অর্জুন?" ডাক্তারের চোখমুখে বিস্ময়।

"সেই অর্জুন মানে?"

"আপনি তো সত্যসন্ধানী?"

"ঠিক শব্দটা উচ্চারণ করেছেন।"

"আরে ব্বাস। আপনার দেখা পেলাম এখানে! কী সৌভাগ্য। আপনার কথা আমি কাগজে পড়েছি। আপনি এখানে কোনও সত্যসন্ধানে নাকি?"

"তেমন কিছু নয়।"

ডাক্তার প্রেসক্রিবশন না লিখে ব্যাগের ভেতরে হাত দিলেন। দু'রকম ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল বের করে বৃদ্ধাকে বললেন, "এখনই এর একটা ওর একটা খাওয়াবেন। বিকেলে আবার একইভাবে খাওয়াতে হবে। বাকি দুটো কাল সকালে। মনে হয় তার মধ্যে জ্বর কমে যাবে। কাল সকালে আর এক বার দেখার পর ওষুধের কথা বলব। আমার কাছে না থাকলে ময়নাগুড়ি থেকে আনাতে হবে। এখন একটা কিছু খাইয়ে তবে ওষুধ খাওয়ান।"

"কিছুই খেতে চায় না।"

"চায় না বললে তো হবে না। জোর করে খাওয়ান।" ডাক্তার বৃদ্ধার হাতে ওষুধ দিয়ে দাওয়া থেকে নামতেই অর্জুন পার্স বের করল।

ডাক্তার হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "না, না। আমাকে টাকা দিতে হবে না।"

"সে কী, আপনি এলেন, ওষুধ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।"

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "হ্যাঁ, আমি বাড়িতে এসে রুগী দেখতে কুড়ি টাকা নিই। কারণ আমাকেও সংসার চালাতে হয়। এদিকের অধিকাংশ বাড়িতে গিয়ে রুগী দেখার পর শুনতে হয় পরে টাকা দেব। যা কখনও পাওয়া যায় না। সঙ্গে ওষুধ না থাকলে তো ওঁকে দিতে পারতাম না। কিন্তু আপনার কাছে আমি টাকা নিতে পারব না। আপনার সঙ্গে আলাপ হল এটাই আমার বড় পাওয়া।"

"কিন্তু আপনার তো ক্ষতি হয়ে গেল!"

"পকেট থেকে তো কিছু গেল না। ওষুধগুলো সেলস্‌ম্যানদের দেওয়া।

ছাড়ুন তো এসব কথা। কোন রহস্য সন্ধানে এসেছেন শুনতে পারি কি ?"

"কোনও রহস্য নেই। ওঁর কথা উনি ইংল্যান্ডে বসে শুনেছিলেন, তাই দেখতে এসেছেন।"

মন্দিরের লোকটি বলল, "তারিণী জ্যেঠার নাম সাহেবদের দেশে শোনা যায় ?"

অর্জুন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

"কপাল বটে। এলেন বলে পেটে ওষুধ যাচ্ছে। জেঠি, ওষুধ খাওয়াও।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওঁর সঙ্গে কালকের আগে ভাল করে কথা বলা যাবে না, না ?"

"না। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা তো লাগবেই।" ডাক্তার বললেন।

অর্জুন ডরোথিকে ব্যাপারটা জানাল। ওদিকে তখন বৃদ্ধা মুড়ি খাওয়াবার চেষ্টা করছেন তারিণী সেনকে। ডরোথি বলল, "তুমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো, ওঁর মরে যাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই তো ?"

ডাক্তারবাবু সেটা শুনতে পেয়ে ইংরেজিতে বললেন, "যা বয়স হয়েছে তাতে কেউ কোনও প্রেডিক্ট করতে পারে না। তবে এই জ্বরের জন্যে যে মারা যাবেন না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। চলুন, আমার ওখানে গিয়ে একটু চা খাবেন।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আজ নয়। আমাদের তো আবার আসতেই হবে। তখন নিশ্চয়ই আপনার কাছে যাব। ধরুন, কাল বিকেলে—। আপনি কিন্তু কাল সকালে এসে একবার ওঁকে দেখে যাবেন।"

বিকেল হয়ে এসেছিল। বাইকে চেপে তিস্তা ব্রিজ পার হওয়ার সময় ডরোথি বলল, "আমরা খুব লাকি। মাসখানেক পরে এলে হয়তো লোকটা মরে গেছে বলে শুনতাম। এত গরিব মানুষ আমি ভাবতে পারিনি! এত গরিব তবু দু-দুটো বিয়ে করেছে। অদ্ভুত!" অর্জুন হাসল। ডরোথিকে বোঝানো যাবে না এক সময় গ্রাম বাংলায় কী রকম কুসংস্কার চেপে বসেছিল। তার কানে এল ডরোথি নিজের মনে বলছে, "কিন্তু লোকটার অবস্থা এ রকম হওয়ার কথা নয়।"

অর্জুনও তাই মনে করল। যে সারা জীবন ডাকাতি করে রোজগার করেছে প্রচুর, তার অবস্থা এমন হবে কেন ? হঠাৎ খেয়াল হল। কথাটা ডরোথি জানল কী করে ? রিচার্ড সাহেব কি তাঁর ডায়েরিতে তারিণী সেনের ডাকাতি করার কথা লিখেছেন ? লিখলে সেই কথা ডরোথি তাকে বলেনি কেন ? উলটে কমলাকান্ত রায়দের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে একইভাবে তারিণী সেনের নাম উচ্চারণ করেছে। এটা কী রকম হল ?

॥ চার ॥

রাত্রে ডরোথিকে খাবার পৌঁছে দিয়ে অর্জুন পোস্ট অফিসের মোড়ে এসে দাঁড়াল। জলপাইগুড়ি শহরে রাত আটটার পর রাস্তায় মানুষ কমে যায়। কিন্তু এই মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করার অভ্যেস অনেকের আছে। অর্জুন পরিচিত মুখ খুঁজল, পেল না। ঠিক তখনই সে গাড়িটাকে দেখতে পেল। সাধারণ গতিতেই রেসকোর্সের দিকে যাচ্ছে। সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে একটা লোক বসে আছে। এই গাড়িটাকে সে গতকাল দেখেছে বেশ বেপরোয়া গতিতে চালাতে। গত রাতের অপরাধের জন্যে এখন গিয়ে কিছু বলা যায় না।

মোড়ের দোকান থেকে সে এক গ্লাস চা নিল। ডরোথি আসার পর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য জানা ছাড়া কোনও উত্তেজক ঘটনা ঘটেনি। বরং বলা যেতে পারে বেশ একঘেঁয়ে লাগছে। ডরোথি যাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে তাদের আত্মীয়রা ওকে গালাগাল দিতে পারত, এই নিয়ে শহরে টেনশন বাড়তে পারত, কিন্তু কিছুই হয়নি। অনেকখানি সময় চলে গেলে মানুষ আর উত্তেজিত হয় না। মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক ছিলেন কি না তা নিয়ে এখন মানুষ মাথা ঘামায় না। যারা ঘামাতে চায়, তাদের সংখ্যা খুব কম।

কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্রের পর্ব চুকে গেছে। শেষতম ব্যক্তি তারিণী সেনকে আজ পাওয়া গেল। আগামিকাল বিকেলে ওর সঙ্গে কথা বলে ডরোথি ফিরে যাবে। ফেরার টিকিট তাহলে কাল সকালে করে ফেলা উচিত। সে তারিণী সেনের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবল। তারিণী ছিল কুখ্যাত ডাকাত। টাট্টুতে চেপে ডাকাতি করত। ওর ভয়ে সবাই কাঁপত। শেষ পর্যন্ত তারিণী এক সময় ধরা পড়ল। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে বিচার হল না, ছাড়া পেয়ে গেল। শহর থেকে ফিরে গিয়ে তারিণী ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছিল। এই সময় সে বিপ্লবীদের কথা ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিত। কোন ইংরেজের কাছে? ডায়েরি যদি সত্যি হয় তা হলে রিচার্ড অথবা ম্যাক সাহেবের সঙ্গেই তারিণীর যোগাযোগ ছিল। সেই জন্য লোকটার হাত বিপ্লবীরা কেটে নিতে পারে। প্রশ্ন হল, যারা হাত কেটেছিল তাদের নাম কি তারিনী ম্যাকসাহেবকে বলেছিল? বললে তিনি যদি কোনও অ্যাকশন নিতেন তা হলে সেটা বিমল হোড় মশাই অথবা সুধীরবাবু নিশ্চয়ই বলতেন। ম্যাক সাহেব নিশ্চয়ই কোন অ্যাকশন নেননি। দেশে ফিরে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এই কারণে অনুশোচনা হতেই পারে, যা ডায়েরিতে লিখে গেছেন তিনি। কিন্তু খটকা লাগছে অন্য জায়গায়। তারিণী সেন জলপাইগুড়িতে এসে ম্যাক সাহেবের সঙ্গে দেখা করত কি না তা জানা যায়নি। কিন্তু ম্যাকসাহেব প্রায়ই নদী পেরিয়ে ওদিকে যেতেন।

কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্রকে আহত অবস্থায় নদীর ওপারেই পাওয়া গিয়েছে। নিশ্চয়ই তখন তাঁর সঙ্গে তারিণীর দেখা হত। কী কথা হত? তারিণী যে ডাকাতি করত, তা রবিনহুডের মতো খরচ করে উড়িয়ে দেয়নি। সেই সব সম্পদ কোথায় গেল? অর্জুনের মনে হল তারিণী সেনের সঙ্গে কথা বললে অনেক গোপন তথ্য জানা যাবে। যেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। অবশ্য মনে হওয়ার পেছনে ছুটে কোনও লাভ নেই।

চায়ের দাম মিটিয়ে বাইকে উঠতেই অর্জুন গাড়িটাকে দেখতে পেল। কালো রঙের অ্যাম্বাসাডারটা। গাড়িটা মোড় ঘুরে হাকিমপাড়ার দিকে চলল। গাড়িটা ফাঁকা রাস্তায় বেশ জোরেই যাচ্ছিল। অর্জুনের মনে হল ড্রাইভার ছাড়া আরও দু'জন আরোহী রয়েছে গাড়িতে। অথচ একটু আগে একজন কম ছিল। তৃতীয়জন বসে আছে পেছনের আসনে। এই গাড়ির যাত্রীদের কেউ তিস্তা ভবনে থাকে। এত রাত্রে ওরা কোথায় যাচ্ছে? ওদের সম্পর্কে একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। ডরোথি তিস্তা ভবনে একা রয়েছে। ওর কোনও বিপদ হলে সে দায়ী হবে। অমলদা তাকে চিঠি লিখেছেন ডরোথির দায়িত্ব দিয়ে। সে মিনিট দেড়েকের মধ্যে তিস্তা ভবনে পৌঁছে গেল। গেট খোলা। ভেতরে ঢুকে বাইক বন্ধ করে নেমে দাঁড়াল সে। চৌকিদারটা কোথায়? সে ওপরে উঠল। দোতলায় আলো জ্বলছে। ডরোথির ঘরের সামনে পৌঁছে সে হকচকিয়ে গেল। দরজায় তালা দেওয়া।

সে এপাশ-ওপাশে তাকাল। দরজায় তালা দিয়ে কাছাকাছি গেলে ওঠার সময় দেখা যেত। এত রাত্রে কোথায় গেল মেয়েটা! হঠাৎ কালো গাড়ির তৃতীয় আরোহীর ঝাপসা মূর্তি স্মরণে এল। ডরোথি কি? ওই কালো গাড়িতে সে কেন যাবে? এমন হতে পারে, যারা এখানে আছে তাদের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে এবং অনুরোধ ফেরাতে না পেরে এখন বেড়াতে বেরিয়েছে। অজানা জায়গায় ডরোথি নিজের ওপর যতই আস্থা রাখুক এভাবে যাওয়া যে ঠিক নয়, এটা তার বোঝা উচিত।

অর্জুন নীচে নেমে চৌকিদারকে দেখতে পেল। লোকটা বালিশ বগলে নিয়ে আসছে। এই তিস্তা ভবনের একজন কেয়ারটেকার আছেন। কাল ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। যে-কোনও মানুষ যদি একটুও বাধা না পেয়ে ওপরে উঠে যায়, তা হলে তো মুশকিল!

অর্জুন চৌকিদারকে বলল, "মেমসাহেবকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ। একটু আগে গাড়িতে করে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গের বাঙালিবাবু বললেন যে ফিরতে একটু রাত হবে।"

"সঙ্গে যারা গেল তারা কি এখানেই উঠেছে?"

"না, বাবু। কাল বিকেলে ওঁরা এসেছিলেন। রাত্রেও একবার। আবার আজ আপনি খাবার দিয়ে চলে যাওয়ার পর গাড়ি নিয়ে আসেন।"

"কোথায় গেল ওরা, কিছু শুনলে ?"

"ইংরেজিতে কথা বলছিল, তাই বুঝতে পারিনি।"

অর্জুনের চোয়াল শক্ত হল। এই লোক দুটো কে ? সুধীর মৈত্রের বাড়িতে রাতদুপুরে যারা হামলা করেছিল তারাই মনে হচ্ছে। ডরোথির সঙ্গে এদের কী করে যোগাযোগ হল ? ডরোথিকে সে সরাসরি এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছে। সেখানে কারও সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখেনি সে। তা হলে গতকাল থেকে লোক দুটো এখানে এসে যোগাযোগ করছে কী করে ?

অর্জুন বাইকে উঠল। ডরোথিকে সুধীর মৈত্রের নাম-ঠিকানা বলে আসার পরই গত রাত্রে লোক দুটো পাহাড়ি পাড়ায় পৌঁছেছিল। অর্থাৎ ডরোথিই ওদের সন্ধান দিয়েছে। নিজেকে কী রকম প্রতারিত বলে মনে হচ্ছে এখানে। মনে হচ্ছে কলকাতা থেকেই ডরোথির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ। ডরোথি যে তিনজনের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে— ! সত্যি কি ক্ষমা চাইতে এসেছে ? তা হলে পেছনে দু'জন গোপন সঙ্গী নিয়ে আসবে কেন ? তাকে দিয়ে মানুষজনের সন্ধান করিয়ে ও কোন কাজ হাসিল করতে চায় ? মেয়েটার মুখ মনে পড়ল। একবারের জন্য মনে হয়নি ওর গোপন কোনও মতলব আছে। তা ছাড়া ওকে পাঠিয়েছেন অমলদা। ওর সম্পর্কে কিছু না জেনে অমলদা কি অর্জুনের কাছে পাঠাবেন ? তার এখন কী করা উচিত ?

বাইকে চেপে শহরে চলে এল সে। দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে। ঘরে ঢুকে যদি ডরোথির জিনিসপত্র, বিশেষ করে ওই নোটবুক দেখা যেত, তা হলে কিছুটা সুবিধে হত। হঠাৎ ওর মনে হল ওরা তারিণী সেনের কাছে যাচ্ছে না তো ? এত রাত্রে গ্রামে গাড়ি ঢুকলে মানুষ অন্য রকম আচরণ করতে পারে। ডাক্তার বলেছেন আজ তারিণী সেনের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। ডরোথি কি কথাটাকে বিশ্বাস করেনি ? ওরা কী এমন কথা আলাদা করে বলতে চায়, যা কাল অর্জুনের সঙ্গে গিয়ে ডরোথি বলতে পারত না ? অর্জুনের মনে হল তারিণী সেনের বিপদও হতে পারে। শুধু ক্ষমা চাইতে এত রাত্রে এভাবে গোপনে কেউ অত দূরে যেতে পারে না। তারিণীকে বাঁচানো দরকার।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। ওরা এতক্ষণে দোমহনি ছাড়িয়ে গেছে। বাইক চালিয়ে ওদের ধরা যাবে না। সে দ্রুত জলপাইগুড়ি থানায় চলে এল। থানার ও সি অবনীবাবু নিজের টেবিলে বসে কাজ করছিলেন এত রাত্রেও। অর্জুনকে দেখে বললেন, "আবার কিসে জড়ালেন ?"

অর্জুন বলল, "একটা উপকার করতে হবে। ময়নাগুড়ি থানায় ফোন করে বলুন একটা কালো অ্যাম্বাসাডার হুচলুডাঙা হয়ে পূর্বদহে যাচ্ছে। যে করেই হোক ওদের আটকাতে হবে। প্লিজ।"

অবনীবাবু অবাক হলেন, "ওদের অপরাধ ?"

"আপনাকে সব বলব। শুনতে গেলে যে-সময় লাগবে, তা আমাদের হাতে নেই।"

"কিন্তু আটকাতে গেলে তো কারণ দেখাতে হবে।"

অর্জুন অসহায় চোখে তাকাল। তারপর বলল, "ধরুন, পূর্বদহের কোনও মন্দির থেকে প্রাচীন মূর্তি চুরি গেছে। তাই রাত্রে কাউকে ওদিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।"

"সত্যি চুরি গেছে নাকি?"

"না। তবে তার চেয়ে ভয়ানক কিছু হতে পারে।"

অবনীবাবু টেলিফোনের রিসিভার তুললেন, "দেখবেন মশাই, যেন বিপদে না পড়ি। তবে আপনার ওপর আমার আস্থা আছে।"

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ময়নাগুড়ির লাইন পাওয়া গেল। অবনীবাবু অর্জুনের অনুরোধ জানালেন। ওপার থেকে পুলিশ অফিসার জানতে চাইলেন গাড়িটাকে আটক করা হবে কি না! অর্জুন মাথা নাড়তে অবনী সেইরকম জানিয়ে দিলেন।

অবনীবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, "খবর কী? ক'দিন থেকে একটি বিদেশিনী মহিলাকে নিয়ে ঘুরছেন বলে শুনতে পেলাম।"

"ভুল শোনেননি। তাকে নিয়েই এই বিভ্রাট।"

অর্জুন ধীরে, ধীরে সব ঘটনা অবনীবাবুকে খুলে বলল। অবনীবাবু মন দিয়ে শুনে বললেন, "না, মশাই। একটি ব্রিটিশ মেয়ে তার পূর্বপুরুষের করা অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চাইতে এতদূরে একা চলে আসবে, এ-কথা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।"

"ঠিকই। কিন্তু কিছু বিদেশিনী মহিলা তো একসময় আমাদেরই মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। এই যেমন এখন মাদার টেরেসা। তাঁকে তো আমরা মা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি।"

অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, "উনি মহামানবী। যেমন সিস্টার নিবেদিতা। কিন্তু সাধারণ বিদেশিনীদের সম্পর্কে অতটা ভাবার কোনও দরকার নেই, যতক্ষণ না প্রমাণ পাচ্ছেন। যাকগে, আপনার কি মনে হয় উনি তারিণী সেনের জন্যেই এসেছেন?'

"এখন তাই মনে হচ্ছে। কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্র ওঁর লক্ষ্য নয়। ওঁদের নাম উনি হয়তো দাদুর ডায়েরিতে পেয়েছিলেন, ওই পর্যন্ত।"

"তা হলে তারিণী সেনের ওপর সিনেমা করতে কেউ আসেনি?"

"আমি বিশ্বাস করছি না।"

"ওই লোক দুটোর সঙ্গে ডরোথির যোগাযোগ হল কী করে?"

"তা জানি না।"

"ডরোথির পাসপোর্ট আপনি দেখেছেন?"

“না। দেখার কথাও নয়।”

“তা হলে ওই দুজনের সঙ্গে এত রাত্রে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া এবং তা আপনাকে না বলে—শুধু এ-কারণেই আপনার সন্দেহ হচ্ছে ?”

“না। ওরা গতকালও ডরোথির সঙ্গে দু'বার যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু সে এ-কথা আমাকে জানায়নি। ডরোথির কাছ থেকে খবর পেয়েই ওরা সুধীরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। অত রাত্রে যারা সুধীরবাবুর বাড়িতে যেতে পারে, তারা তারিণী সেনকে তুলে নিয়ে আসতে দ্বিধা করবে না, যদি তেমন প্রয়োজন থাকে।”

এই সময় টেলিফোন বাজল। অবনীবাবু রিসিভার তুলে কথা শুনতে-শুনতে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, “ওদের কোনও অজুহাত দেখিয়ে আধ ঘণ্টা আটকে রেখে তবে ছাড়ুন। দেখবেন যেন কোনও মতে সন্দেহ না করে।”

রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, “ময়নাগুড়ি থানা থেকে একটা পেট্রোল ভ্যানকে ওয়ারলেসে খবর দিয়েছিল। ওরা গাড়িটাকে আটকেছে। হাইওয়েতে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার পুলিশের আছে। ওরা তিনজনেই ওখানে আধ ঘণ্টার মতো থাকবে। তারপর ফিরে আসতেও মিনিট কুড়ি। তার মানে আমাদের হাতে পঞ্চাশ মিনিট। চলুন, একবার ডরোথির ঘরটা দেখে আসি। চটপট।” অবনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

“কিন্তু ওর ঘরে তালা মারা।” অর্জুন বলল, “ল্যাংড়া পাঁচুকে পেলে হত!”

অবনীবাবু বললেন, “একটা চান্স নেওয়া যেতে পারে। হাসপাতালের উলটো দিকের গলিতে ও নেশা করতে আসে। অবশ্য এখন যা রাত হয়েছে তাতে না পাওয়ারই সম্ভাবনা। চলুন, পথেই তো পড়বে।”

ল্যাংড়া পাঁচু অর্জুনের কাছে কৃতজ্ঞ। তাকে জেল থেকে বাঁচিয়েছে সে। আগে তালা খোলার নৈপুণ্যের কারণে ডাকাতদের সঙ্গী ছিল। এখন লটারির টিকিট বিক্রি করে। অবনীবাবুর জিপে হাসপাতালের সামনের গলিতে যাওয়ামাত্র কিছু লোক এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। আধো অন্ধকারেও পুলিশের জিপ ঠিক চিনে ফেলেছিল তারা। কিন্তু একটি গলা চিৎকার করে উঠল, “পালাচ্ছিস কেন ? এই হতভাগারা ? আমি চোর-ডাকাত নই যে পালাব। হুম।”

অর্জুন দেখল ল্যাংড়া পাঁচু বাবু হয়ে বসে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, “তোমার অবস্থা কীরকম ?”

চোখ বড় করে দেখার চেষ্টা করল ল্যাংড়া পাঁচু। চিনতে একটু কষ্ট হল। তারপর চিনে ফেলতেই মাথা নাড়ল, “এখনও দশটা বাজেনি।”

“এখন এগারোটা বেজে গেছে।”

“অসম্ভব! দশটার মধ্যে আমি ঘরে ফিরে যাই। আমি যখন যাইনি, তখন

এগারোটা বাজবে কী করে ?”

“উঠতে পারবে ?” অর্জুন ধমক দিল।

“আপনি আদেশ করলে আমি উড়তেও পারব।”

ল্যাংড়া পাঁচুকে ধরে-ধরে নিয়ে এল অর্জুন জিপের কাছে। অবনীবাবুকে দেখে ল্যাংড়া পাঁচু বলল, “আই বাপ, শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবেন নাকি ?”

তাকে গাড়িতে তুলে অর্জুন বলল, “তোমার মাথা কেমন আছে এখন ?”

“আপনাদের চিনতে পারছি।”

“তা হলেই হবে। একটা তালা খুলবে তুমি।”

“না। অসম্ভব ! আপনার নির্দেশে ও-কাজ ছেড়ে দিয়েছি আমি।”

“মানুষের উপকার হলে কেন করবে না ?”

“কেউ আমার উপকার করে না। আমি কেন করব ?”

অর্জুন কিছু বলার আগে গাড়ি চালাতে-চালাতে অবনীবাবু বললেন, “কেন, অর্জুনবাবু তোমার উপকার করেননি ?”

“একশোবার। সবাইকে বলি সে-কথা।” ল্যাংড়া পাঁচু মাথা নাড়ল, “কিন্তু সঙ্গে যন্ত্রপাতি নেই। সব ফেলে দিয়েছি তিস্তার জলে।”

অর্জুন বলল, “দ্যাখো পাঁচু, একটি মানুষের জীবন বিপন্ন। তাকে রক্ষা করতে চাই আমরা। এই তালা সেই কারণে খোলা দরকার।”

“অ। এটা প্রথমে বললেই পারতেন। মোটা তার চাই।”

অবনীবাবু গাড়ির ড্রয়ার খুলে তার বের করে দিলেন। ল্যাংড়া পাঁচু সেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কিছু একটা বানাতে লাগল।

পুলিশের গাড়ি দেখে চৌকিদার ছুটে এল। অবনীবাবু চাপা গলায় বললেন, “আপনি ওকে নিয়ে এগিয়ে যান, আমি এর সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাই। আপনার মেমসাহেব যদি ফিরে আসে, তা হলে হর্ন বাজাব।” অর্জুন ঘাড় নেড়ে ল্যাংড়া পাঁচুকে ইশারা করল।

অবনীবাবু কেয়ারটেকারের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলেন। অর্জুনরা যে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকছে তা দেখেও দেখল না চৌকিদার। অবশ্য অর্জুনের জন্য ওর কোনও চিন্তা ছিল না। সিঁড়ি ভেঙে ল্যাংড়া পাঁচু দ্রুত ওপরে উঠে এল অর্জুনের পেছন-পেছন। নির্জন দোতলায় আলো জ্বলছে, দরজায় তালা, যেমনটি অর্জুন দেখে গিয়েছিল।

ল্যাংড়া পাঁচু তালার গায়ে হাত বোলালো, “এ যে দেখছি বিলিতি জিনিস।”

“হতে পারে। চটপট খোল।”

“এরকম তালা অনেকদিন আগে একবার খুলেছিলাম। বার্মিংহাম না কি যেন একটা জায়গায় তৈরি হয়। বেশ খানদানি তালা।”

“আঃ। কথা বোলো না।” অর্জুন বিরক্ত হল।

“আপনি বুঝতে পারছেন না। এমন জিনিস তো চট করে দেখতে পাওয়া

যায় না। আহা। কী ফিনিশ ! চাবি ছাড়া যে কেউ এটা খুলে দেখাক। তার পায়ের ধুলো মাথায় নেব আমি। একেবারে রানি তালা।" চোখ বন্ধ করে বলে যাচ্ছিল ল্যাংড়া পাঁচু, তালার গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে। তারপরই সোজা হল, "মনে হচ্ছে পেয়েছি। তা তালা খুলে আবার লাগাতে হবে, না এটাকে নিয়ে যাব ?"

"আবার লাগাতে হবে।"

"অ।" কথাটা মনঃপূত হল না লোকটার। অর্জুন দেখছিল যেভাবে ডাক্তাররা অপারেশন করে, সেইভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে ল্যাংড়া পাঁচু, এরই মধ্যে। মিনিটদুয়েক চুপচাপ কেটে গেল। অর্জুন অস্থির হয়ে উঠছিল। ঠিক তখনই হাসির শব্দ কানে এল। তালা হাতে নিয়ে ল্যাংড়া পাঁচু হাসছে। "আবার হার মানলি। আমার নাম পাঁচুগোপাল রে !"

অর্জুন চট করে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। ঘরের এক কোণে সুটকেসটা রয়েছে। টেবিলের ওপর হাতব্যাগ। চটপট সেটা খুলল। পাসপোর্ট রয়েছে ওপরে। সেটার পাতায় নজর বোলাতে লাগল। ডরোথি ভারতে এসেছে সাতদিন আগে। প্রথমে দিল্লিতেই নেমেছে সে। দিল্লি থেকে কলকাতায় নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে পৌঁছেছে, তাই পাসপোর্টে তার কোনও এন্ট্রি নেই। বাগডোগরায় পৌঁছবার আগে ও দিল্লি এবং কলকাতায় পাঁচদিন কী করছিল তা জানা যাচ্ছে না। পাসপোর্ট বলছে ডরোথি মাস ছয়েক আগে আর-একবার দিল্লিতে এসেছিল। দু'দিন ছিল মাত্র। এ-কথা ডরোথি একবারও বলেনি।

ব্যাগে শ' তিনেক পাউন্ড ছাড়া প্লেনের টিকিট দেখতে পেল। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের। এ ছাড়া একটা চাবি এবং প্রসাধনী সামগ্রী। নোট বইটাকে দেখতে পেল না সে। এবার সুটকেসটা। ব্যাগটাকে ভাল করে যথাস্থানে রেখে সে সুটকেসের সামনে গেল। তালাবন্ধ। নম্বর ঘুরিয়ে লক করে দেওয়া হয়েছে। হয়তো চেষ্টা করলে ল্যাংড়া পাঁচু এটাকে খুলতে পারবে, কিন্তু তার জন্য আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। অর্জুন ওয়াড্রোব খুলে দেখল সেখানে কিছু ব্যবহৃত পোশাক ঝুলছে। পোশাকগুলো হাতড়ে দেখল পকেটে কিছু নেই। বিছানার দিকে তাকাল। একেবারে নিপাট বিছানা নয়। বালিশের পাশে একটা বই। থ্রিলার। অর্জুন থ্রিলারটা তুলে নিল। ওপরে রিভলভারের ছবি। পাতা উলটে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। সেটাকে রেখে বালিশটা তুলতেই নোটবুকটা চোখে পড়ল। চটপট পাতা ওলটাল। প্রথম দিকে কিছু কোটেশন লিখে রাখা হয়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্যিকদের রচনা থেকে নির্বাচিত লাইন। তারপরের পাতায় কিছু ইংরেজি নাম, নামের পাশে ওয়ান, টু লেখা। হঠাৎ এক পাতায় লেখা বিল মেট রে ইন ডেল্‌হি। পাতাগুলোর খানিকটা সাদা। হঠাৎ লেখা কমলাকান্ত রে, দেবদাস মিটার অ্যান্ড

তারিণী সেন। তারিণী সেনের নামটার চারপাশে লাইন টেনে ঘর করা হয়েছে। কমলাকান্তর নামের পাশ থেকে একটা লাইন বেঁকিয়ে নিচে নামিয়ে সেই বক্সের গায়ে শেষ করেছে ডরোথি। নোটবুকে আর কোনও লেখা নেই। ওটাকে বালিশের নিচে নামিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন।

ল্যাংড়া পাঁচু তখনও তালাটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে যাচ্ছে। অর্জুন তাকে বলল, "এবার ওটা লাগিয়ে দাও!"

হাসল ল্যাংড়া পাঁচু, "আমি বোধ হয় অভিমন্যু হয়ে গেলাম।" ওর চুপসে যাওয়া মুখের হাসিটাকে ঠিক শকুনির হাসি মনে হল। "কী আজেবাজে বকছ?"

"সত্যি বাবু! এ খানদানি জিনিস। গুরুবলে খুলে ফেলেছি। কিন্তু বন্ধ করতে গিয়ে বুঝতে পারছি এ কী জিনিস!"

"দ্যাখো, আমার হাতে সময় নেই। যেমন করে পারো বন্ধ করো।" অর্জুনের গলায় এবার বেশ উত্তেজনা। ডরোথি যেন না বুঝতে পারে ঘরে কেউ ঢুকেছিল।

দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ল্যাংড়া পাঁচু। তালাটাকে কড়ায় ঝুলিয়ে জিভে শব্দ করল, যেন কোনও পোষা প্রাণীকে আদর করছে। অর্জুন গাড়ির হর্ন শোনার জন্য কান খাড়া করল। যে-কোনও মুহূর্তে ডরোথিরা ফিরে আসতে পারে। ওদের মুখোমুখি এখনই হতে চায় না সে।

ল্যাংড়া পাঁচু যতবারই তালা বন্ধ করে টেনে দেখছে, ততবারই ওটা খুলে যাচ্ছে। তার মুখ থেকে ছোটখাটো গালাগালি বেরিয়ে আসছিল। অন্য সময় হলে অর্জুন আপত্তি করত, কিন্তু এখন করল না। সে বলল, "তোমার এত নাম, আর তুমি হার মানবে?"

"হার মানলে আপনার জন্যে মানব।"

"তার মানে?"

"আপনি সেই যে আমাকে থানা থেকে বের করে এনে বললেন লাইন ছেড়ে দিতে, তারপর তো আর চর্চা নেই। খুলবে কেন?" ল্যাংড়া পাঁচু তখনও তালা ঘোরাচ্ছে।

অর্জুন ঢোঁক গিলল। হঠাৎ ল্যাংড়া পাঁচু তারটাকে পকেটে পুরে ওপর থেকে তালার মাথায় আঘাত করতে ওটা ভেতরে ঢুকে আটকে গেল। ওর মুখ থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ছিটকে উঠল, "যাঃ বাবা। চাপ দিলেই তো বন্ধ হত। আমি এতক্ষণ ওর পেটের ভেতরে তার ঘোরাচ্ছিলাম। সহজ জিনিসটা কখনওই মাথায় আসে না।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে তালাটাকে টেনে দেখল ওটা আটকে গেছে। সে চাপা গলায় ল্যাংড়া পাঁচুকে বলল, "চটপট নেমে এসো।"

নেমে আসার পথে ল্যাংড়া পাঁচু বকর-বকর করছিল, এর আগে সে কত

রকমের জটিল তালা খুলেছে, অথচ কোনওটাই বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আজ বুঝতে পারছে যে, কোনও জিনিস খোলা অথবা ভাঙা সহজ, কিন্তু বন্ধ করা অথবা গড়া খুব কঠিন।

নিচে নেমে অর্জুন বলল, "এবার সোজা বাড়ি ফিরে যাও।"

"অ্যাত্ত দূর থেকে হেঁটে বাড়ি যাব ?"

"রিকশায় যাও।" পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে সে লোকটাকে দিল।

মাথা নাড়ল লোকটা, "এত রাতে রিকশা পাব না।"

অগত্যা ওকে জিপের পেছনে বসাতে হল। অবনীবাবু তখনও চৌকিদারটার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিলেন। এবার জিপ ঘুরিয়ে তিস্তা ভবনে পৌঁছবার বিপরীত দিকে খানিকটা গিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায় ওটাকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন, "কিছু পেলেন ?"

"তেমন কিছু নয়। তবে দুটো তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ডরোথি যে মিথ্যেবাদী, তা স্পষ্ট।"

"যেমন ?"

"ওর পাসপোর্ট বলছে, এর আগে মাস ছয়েক আগেই ডরোথি দিল্লিতে এসেছিল। আর এবার এসেছে দিন সাতেক আগে। এসে ও পাঁচ দিন কোথাও ছিল। এসব কথা আমাকে বলেনি ডরোথি।" অর্জুন জানাল।

"দিন সাতেক আগে ও যদি দিল্লিতে আসে তা হলে অমলবাবুর চিঠি এত দেরিতে পৌঁছল কেন আপনার কাছে ? ও যদি সরাসরি দিল্লি থেকে বাগডোগরাতে চলে আসত, তা হলে আপনি জানতেও পারতেন না, কারণ তখনও চিঠি আপনার কাছে পৌঁছতো না। অমলবাবু এমন ভুল নিশ্চয়ই করবেন না।" অবনীবাবুর কথায় যুক্তি ছিল।

"ঠিক। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না।"

"আপনি চিঠিটা গতকাল পেয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় পোস্ট করা হয়েছে তা দেখিনি। ওটা দেখতে হবে।"

"আপনার কাছে যে-মেয়েটা এত মিথ্যে কথা বলছে, তাকে অমলবাবু কেন যে রেকমেন্ড করলেন, বুঝতে পারছি না।"

"জানি না, অমলদার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় !"

অর্জুনের কথা শেষ না হওয়ার আগে হেডলাইটের আলো এগিয়ে এল। গাড়িটা বিপরীত প্রান্ত থেকে এলেও তিস্তা ভবনের গেটের সামনে থেমে যাওয়ায় ওদের জিপ পর্যন্ত হেডলাইটের আলো পৌঁছল না। পেছনের দরজা খুলে দু'জন নেমে পড়ল। অথচ যাওয়ার সময় পেছনের আসনে একজনই ছিল এবং সে ডরোথি। ওরা গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেলে কালো

অ্যাম্বাসাডার মুখ ঘুরিয়ে আবার গেটের সামনে পৌঁছল। অর্থাৎ ডরোথিকে কেউ একজন পৌঁছে দিতে গেল।

অর্জুন বলল, "চৌকিদার আবার বলে না দেয়!"

অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, "লোকটা মরে গেলেও মুখ খুলবে না। ব্যবস্থা করেছি।"

মিনিট দুয়েকের মধ্যে লোকটা ফিরে গেট বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। অবনীবাবু ইঞ্জিন চালু করলেন, "ওদের অনুসরণ করা যাক।"

"আমার মনে হচ্ছে ওরা শিলিগুড়িতে ফিরে যাবে।"

"এক শহরে থাকছে না বলছেন?"

"হ্যাঁ। বোধ হয় সেটা সন্দেহ এড়াতে।"

"তা হলে তো বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে। যেতে-আসতে দেড় ঘণ্টা।"

কালো অ্যাম্বাসাডারটা এখন বেশ জোরে ছুটছে। অবনীবাবু অনেকটা দূরত্ব রেখে ওটাকে অনুসরণ করছিলেন। ক্রমশ কদমতলার মোড় ঘুরে শান্তিপাড়ার মোড় হয়ে গাড়িটা শিলিগুড়ির পথ ধরতে অবনীবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন, "আর যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এখন ওদের আটকে কোনও লাভ নেই।"

রায়কতপাড়ার মোড়ে ল্যাংড়া পাঁচুকে বাইক থেকে নামিয়ে অর্জুন যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন মধ্যরাত। মা জেগেই ছিলেন। খানিকটা বকুনি খেল সে। দেরির কারণ যে ডরোথি, এটা বলতে কোথায় বাধল। মা যদি বোঝেন কেউ অসৎ, তা হলে তার জন্য কোনও কাজ করবেন না। ডরোথির সঙ্গে আগামী কালও তাকে ভাল ব্যবহার করতে হবে, দুপুরে খাবার পৌঁছে দিতেও হবে। জানলে মা খাবারটা তৈরি করে দেবেন না। অতএব বকুনি হজম করতে হল অর্জুনকে।

টেবিলে অমলদার চিঠিটা পড়ে ছিল। সেটাকে তুলে খামের গায়ে স্ট্যাম্প দেখতে গিয়ে মাথা নাড়ল অর্জুন। চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল থেকে। টিকিটগুলো ভারতবর্ষের। অর্থাৎ ডরোথি অমলদার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে এসে কলকাতা থেকে পোস্ট করেছে। চিঠিটা যখন সে পড়েছিল তখন আর খামটা খেয়াল করেনি। চিঠির ওপর 'লন্ডন' এবং তারিখ আছে। তারিখটা ডরোথি রওনা হওয়ার দু'দিন আগের। খামের ওপর অর্জুনের ঠিকানা টাইপ করে বসানো। আর খামটাও বিদেশি, এ-দেশের স্ট্যাম্প বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ওপরে। এটা নিশ্চয়ই আগে থেকে পরিকল্পনা করেই করা হয়েছে। কথা হল, অমলদা কেন নিজে পোস্ট না করে ডরোথির হাতে তুলে দিলেন?

রাত্রে ভাল ঘুম এল না। বারংবার মনে হচ্ছিল ডরোথি তাকে যেমন

প্রতারণা করেছে, অমলদাকেও তেমনই। কিন্তু কেন সেটা করতে গেল ? বোঝা যাচ্ছে, তারিণী সেন এখন ওর লক্ষ্য। এখন, না আগে থেকেই ? নোটবুকে ওই নামটার চার পাশে বাক্স আঁকা আছে। অর্থাৎ ডরোথি আগেই জানত যে, বাক্সটা মূল্যবান। আর ওই বাক্সের গায়ে কমলাকান্ত রায়ের নামের পাশ থেকে একটা লাইন নামানো হচ্ছে। তার মানে কি কমলাকান্ত রায়ের সঙ্গে তারিণী সেনের কোনও যোগাযোগ ছিল ? মুশকিল হচ্ছে তারিণী সেনের আর্থিক এবং শারীরিক অবস্থা যা, তার জন্য লন্ডনের কোনও ইংরেজ মহিলার কোনও উদ্বেগ থাকা তো অস্বাভাবিক, ক্ষমাটমা চাওয়ার ব্যাপারটা এখন নেহাতই একটা আড়াল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে অর্জুন সোজা রওনা হল তিস্তা ভবনের দিকে। খুব হালকা রোদ উঠেছে আজ। বাতাস বইছে চমৎকার। তিস্তা ভবনের বাগানে ডরোথিকে দেখতে পাওয়া গেল। একটা গাছের পাতা খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে। বাইকের আওয়াজে বোধ হয় তার চমক ভাঙল। অর্জুন 'গুড মর্নিং' বলতে সে হেসে সাড়া দিল।

"ঘুম হয়েছিল ?"

"নাঃ। নিজের বিছানার অভ্যেস বড় খারাপ। যাকগে, আমরা কখন যাব ?"

"বিকেলে। গতকাল ডাক্তার তো সে রকমই বলল।"

"ওকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনই কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।"

"ঠিক আছে, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করব। উনি যদি বলেন, তা হলে করা যাবে।"

"দেখে আমার এত ভয় করছিল ! যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে না থাকেন তা হলে আমার এখানে আসাই বৃথা হবে।" ডরোথি হাঁটতে লাগল।

"তা তো হবেই। অন্য দুজন মারা গিয়েছেন আগে, তারিণীবাবু এখনও বেঁচে আছেন, ওঁর সঙ্গে তোমার কথা হওয়া দরকার।"

"কথা মানে দাদুর হয়ে ব্যাপারটা জানানো। ব্যস।"

"ব্রেকফাস্ট করেছ ?"

"নাঃ। একটু পরে করব। তুমি ?"

"আমি খেয়ে বেরিয়েছি।"

"তোমাকে আমার জন্যে কষ্ট করতে হচ্ছে !"

"আরে না। অমলদার আদেশ আমার শিরোধার্য। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমার ভালই লাগছে।"

"ধন্যবাদ। তুমি কখনও বিদেশে গিয়েছ ?"

"তা গিয়েছি। হিথরো এবং কেনেডি এয়ারপোর্ট দেখা হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি ?" অবাক হয়ে তাকাল ডরোথি। যেন এতটা আশা করেনি

সে। জিজ্ঞেস করল, "বেড়াতে গিয়েছিলে?"

"ওই আর কি!" অর্জুন হাসল, "এখন কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে?"

"নাঃ। বইটা শেষ করব। খুব ইন্টারেস্টিং।"

"ক্রাইম থ্রিলার?"

"হ্যাঁ।"

"জলপাইগুড়িতে একসময় খুব ক্রাইম হত। এখানকার পুলিশের খুব নাম আছে।"

"তাই নাকি?" ডরোথি তাকাল।

"হ্যাঁ। ক'দিন আগে হাইওয়ে থেকে ওরা কুখ্যাত ক্রিমিন্যালদের ধরেছে।"

"ও।" ডরোথি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেসা করা হয়নি। মিস্টার অমল সোমের সঙ্গে তোমার কীভাবে আলাপ হল? উনি কি এখন লন্ডনেই থাকেন?"

"আমি ওঁকে ঠিক জানি না। আমার এক আত্মীয় ওঁকে চেনেন। আমি ইন্ডিয়ার এদিকটায় আসতে চাই শুনে উনি মিস্টার সোমের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওই একবারই দেখি ওঁকে। আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিলেন এই পর্যন্ত।"

আরও কিছুক্ষণ অনাবশ্যক কথাবার্তা চালিয়ে অর্জুন বিদায় নিল। ঠিক হল, বিকেল হওয়ার আগেই ওরা রওনা হবে। দুপুরে লাঞ্চ নিয়ে অর্জুনকে আসতে নিষেধ করল ডরোথি। আজ ওর খাওয়ার ইচ্ছে নেই। দরকার হলে এখান থেকেই টোস্ট আর ওমলেট খেয়ে নেবে। মেয়েটাকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল এখন।

বাড়ি ফিরে মাকে খাবার তৈরি করতে নিষেধ করে ছ'টা লুচি, বেগুনভাজা আর মিষ্টি পেটে পুরল অর্জুন। ডরোথির মুখটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। কী চমৎকার অভিনয় করে গেল মেয়েটা! গত রাতে বেরিয়ে আসার কথা বেমালুম চেপে গেল। অর্জুন এখানকার পুলিশের কৃতিত্বের বর্ণনা করায় অন্যমনস্ক হয়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ডরোথি কোনও একটা গোপন কাজে সঙ্গী নিয়ে এসেছে এটা স্পষ্ট, কিন্তু কাজটা কী, তা বুঝতে পারছে না সে।

॥ পাঁচ ॥

সাড়ে আটটা নাগাদ অর্জুন শহর ছেড়ে তিস্তা ব্রিজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ডরোথিকে নিয়ে বিকেলে যাওয়ার আগে তাকে একবার পূর্বদহ থেকে ঘুরে আসতেই হবে। তার সামনে ডরোথি এমন কোনও কাজ করবে না বা বলবে না, যাতে ওর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। তারিণী সেনের সঙ্গে তাই আগেভাগে

কথা বলে আসতে চায় সে। হয়তো কোনও লাভ হবে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন আজ দুপুরের আগে তারিণী সেন কথা বলার মতো অবস্থায় নাও থাকতে পারেন, তবু একটা চেষ্টা করতে দোষ কী ! ময়নাগুড়ি থেকে কিছু ফল কিনে নিয়ে হুচলুডাঙা হয়ে পূর্বদহর দিকে যেতে যেতে সে বাইক দাঁড় করাল। ডাক্তারবাবু আসছেন সাইকেল চালিয়ে। ওকে দেখে তিনি নেমে দাঁড়ালেন। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো ?"

"এই এলাম।" অর্জুনও হাসল।

"না, না। আপনার কথা বলছি না। হঠাৎ দেখছি তারিণী সেনকে নিয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একটু আগে বিডিও সাহেব লোক পাঠিয়েছিলেন। তারিণী সেন যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে এক্ষুনি ময়নাগুড়ি নয়, জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। আমি বলে দিলাম আজ উনি একটু সুস্থ। তবু ভাবলাম বিডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই।"

"বিডিও সাহেব জানলেন কী করে ?"

"আমি ভাবলাম আপনারাই জানিয়েছেন। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। এত বছর মানুষটা নানান অসুখে ভুগেছে, আধপেটা খেয়ে কোনওমতে বেঁচে আছে, অথচ কেউ কোনও খবর নেয়নি। হঠাৎ এখন ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পাওয়ার কারণটা কী ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। আমরা বিডিওকে কিছু জানাইনি।"

"আর একটা ব্যাপার। বিডিও সাহেব আমাকে দেখা করতে বলেছেন।"

"কেন ?"

"সেটা না গেলে জানতে পারব না।"

"বেশ। আপনি ঘুরে আসুন। আপনার না ফেরা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।"

ডাক্তারবাবু সাইকেলে চেপে চলে গেলে অর্জুন খানিকক্ষণ সেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা অবাক হওয়ার মতোই ! গ্রামের এককোণে পড়ে থাকা এক অথর্ব বৃদ্ধ যদি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে, তা হলে লোকে তো অবাক হবেই ! কিন্তু বিডিও কেন এমন উৎসাহী হলেন ? তারিণী সেনকে হাসপাতালে ভর্তি করলে কার লাভ হবে ?

মন্দিরের সামনে এসে গতকালের সেই লোকটাকে দেখতে পেল অর্জুন। দু' হাত জড়ো করে নমস্কাব করল সে। অর্জুন বাইক থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল, "কী খবর ?"

"আমাদের আর খবর ! এখন তো তারিণী জ্যাঠার কপাল খুলল। আজ সরকার থেকে লোক এসেছিল ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। গতকাল আপনারা না এলে এটা হত না।"

"উনি কেমন আছেন ?"

"কাল ওষুধ পড়ায় আজ বেশ ভাল। মেমসাহেব আসেননি কেন ?"

"বিকেলে আসবেন। চলুন।"

হঠাৎ যেন গুরুত্ব পেল লোকটি। জিজ্ঞেস করল পাশে হাঁটতে-হাঁটতে, "ওটা কী ?"

"আঙুর, মুসুম্বি।"

"বাব্বা ! আমি কখনও ওসব খেয়েছি কিনা মনে পড়ে না।"

অর্জুন জবাব দিল না। গ্রামের মানুষদের দু'বেলা ভাত জোটাতে হিমশিম খেতে হয়, সেখানে এইসব ফল তো নাগালের বাইরে থাকবেই।

হঠাৎ লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবু, হঠাৎ আপনারা জ্যাঠাকে নিয়ে এত ভাবছেন কেন বলুন তো ? আমি তো জ্ঞান হওয়া ইস্তক জ্যাঠার কাছে কাউকে আসতে দেখিনি। আগে মাঝে-মাঝে ময়নাগুড়িতে যেত। এখন তো সেই ক্ষমতাও নেই।"

"তোমার কীরকম জ্যাঠা হয় ?"

"জ্ঞাতি সম্পর্কের।"

"ওঁর সম্পর্কে কিছু জানো ?"

"শুনেছি এককালে ডাকাতি করত। সেইজন্যে ইংরেজরা ওর হাত কেটে দিয়েছিল। এসব শোনা কথা।"

ওরা তারিণী সেনের বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল। দূর থেকেই অর্জুন দেখতে পেল তারিণী সেন দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। বৃদ্ধাদের মধ্যে যাঁর বয়স বেশি, তিনি একটা বাটিতে কিছু দিলেন তারিণী সেনের সামনে। দ্বিতীয়া বৃদ্ধাকে দেখা গেল না। লোকটি কাছে গিয়ে চিৎকার করল, "অ জ্যাঠা, কাল যে বাবুটি এসেছিলেন তিনি আবার এসেছেন।"

তারিণী সেন চোখ পিটপিট করলেন। ওঁকে আজ একটু ভাল দেখাচ্ছে। অর্জুন পা ঝুলিয়ে দাওয়ায় বসে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল, "আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। অসুখের সময় খেলে ভাল লাগবে।"

তারিণী সেন প্যাকেটটার দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। অর্জুন দেখল বাটিতে মুড়ি রয়েছে খানিকটা। অর্জুন বৃদ্ধাকে বলল, "ওর মধ্যে আঙুর আছে। একটু ওঁকে দিন। মিষ্টি আঙুর। আর মুসুম্বির রস করে দেবেন।"

লোকটি হাসল, "রাজভোগ গো জেঠি। আমাকে একটু দিয়ো। জীবন সার্থক করি।"

বৃদ্ধা যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আজ কেমন আছেন ?"

"ভাল।" মিনমিনে আওয়াজ বের হল তারিণী সেনের গলা থেকে।

"আমি জলপাইগুড়িতে থাকি।" অর্জুন কথা খুঁজছিল।

লোকটি বলে উঠল, "খুব ভাল মানুষ। আপনার জন্যে ফল এনেছেন। হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেছেন।"

হঠাৎ ঘন-ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন তারিণী সেন। সরু গলায় কান্নার সুরে বলতে লাগলেন, "না, না। যাব না। আমি হাসপাতালে যাব না।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কেন যাবেন না?"

"আমি কোথাও যাব না। এখান থেকে কোথাও না।" তারিণী সেন প্রতিবাদ করছিলেন।

অর্জুন ভয় পেল, বৃদ্ধ এর ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন! সে বলল, "আপনাকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যাবে না। আপনি এখানেই থাকুন। ওষুধ খান ঠিকমতো। খাবেন তো?"

বৃদ্ধ শিশুর মতো মাথা নাড়লেন।

আজও কিছু কুচো উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তবে গতকাল ডরোথি সঙ্গে থাকায় যে ভিড় জমেছিল, তা আজ হয়নি। অর্জুন লোকটিকে বলল, "আপনি একটু মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন? ডাক্তারবাবু ফিরে আসামাত্র ওঁকে এখানে নিয়ে আসবেন।"

লোকটি ভেতরের দিকে তাকাল। সেখান থেকে বৃদ্ধা একটা ভাঙা প্লেটে অনেকটা আঙুর নিয়ে বের হয়ে এলেন। বৃদ্ধের সামনে রেখে বললেন, "খান।"

অর্জুন দেখল লোকটির চোখ চকচক করছে। ওকে সরাতে হলে একটু আঙুর দেওয়া দরকার। সে কিছু বলার আগেই বৃদ্ধা তাঁর বাঁ হাতের মুঠো আলগা করে লোকটার সামনে ধরতেই সে খপ করে সেখান থেকে গোটা চারেক আঙুর তুলে নিল। একটা মুখে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, "আহা! অমৃত।"

"এবার তা হলে যান!" অর্জুন হেসে বলল।

মাথা নেড়ে লোকটা যেতে-যেতে বাচ্চাদের ধমকে দিল, "অ্যাই! হ্যাট-হ্যাট। যা এখান থেকে। কেউ কাছে যাবি না। যাঃ।"

তারিণী সেন কিছুই খাচ্ছিলেন না। অর্জুন বৃদ্ধাকে বলল, "আপনি ওঁকে খাইয়ে দিন।" বৃদ্ধা যেন লজ্জা পেলেন। তারপর পাশে উবু হয়ে বসে প্লেট থেকে একটা আঙুর তুলে তারিণী সেনের মুখে গুঁজে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তারিণী সেনের চোয়াল নড়তে লাগল। রসের স্বাদ পেতে নিজেই হাত বাড়ালেন। অর্জুন অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখল। হাতে পাঞ্জা নেই। কব্জির কাছেই তা আচমকা শেষ। অথচ সেই দুটো হাত একত্রিত হয়ে দুটো আঙুর তুলে নিল অদ্ভুত কায়দায়। জাপানিরা কাঠি দিয়ে ভাত খায়। তারিণী সেন কব্জিবিহীন দুই হাতে আঙুর তুলছেন আর মুখে পুরছেন। হয়তো ওইভাবে ইনি ভাত অথবা মুড়িও খেতে পারেন। অভ্যেসে মানুষ কী না করতে পারে! সে চেষ্টা

করলেও কাঠি দিয়ে দুটো দানার বেশি ভাত তুলতে পারবে না একবারে।

অর্জুন তারিণী সেনের দিকে তাকাল। ইনি এমন একটা বয়সে পৌঁছে গেছেন, যেখানে গেলে কোনও বিষয় নিয়ে আর তেমন আগ্রহ থাকে না বলে অর্জুন শুনেছে। ওঁর বসার ভঙ্গি, তাকানো যেন সেই কথাই বলে। হঠাৎ তারিণী সেন বললেন, "আজ শরীর ভাল।"

কথাটা লুফে নিল অর্জুন, "আপনাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।"

"খেতে পাই না, পরতে পাই না, তবু বেঁচে আছি। এই লুঙ্গিটাও ছিঁড়ে গেছে।"

এমন কথার পেছনে কোনও কথা মুখে আসে না। অর্জুন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটা কাক দাওয়ার কাছে এসে খুব চেঁচাচ্ছিল। তারিণী সেন হাত তুললেন, "যাঃ, যাঃ।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "পুরনো দিনের কথা আপনার মনে পড়ে ?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন তারিণী সেন। তারপর ফোকলা দাঁতে হাসলেন, "আমি তখন ডাকাত ছিলাম। সবাই ভয় পেত।"

একেবারে শিশুর মতো কথা। ডাকাতি যে অপরাধকর্ম, তাও খেয়াল নেই।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ডাকাতি করতেন কেন ? কাজটা তো ভাল না।"

তারিণী সেন চোখ বন্ধ করলেন। যেন কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "এক কাহন বলতে গেলে সাত কাহন গাইতে হবে। আঙুরগুলো খুব মিষ্টি ছিল। অ্যাই দাও না, আর একটু আঙুর দাও না।" বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বায়না করলেন তিনি।

অর্জুন বলল, "বাকিটা বিকেলে খাবেন। আমি আরও এনে দেব।"

তারিণী সেন বললেন, "দেবে তো ? ঠিক ? মনে করে দিয়ো। তুমি ছেলেটা দেখছি বেশ ভাল। আমাকে অনেক বছর কেউ কিছু দেয়নি।"

"ওই ডাকাতির ব্যাপারটা !" অর্জুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

"বাপ গরিব ছিল। খুব গরিব। আমি চাষ করতাম। তাতে পেট ভরত না। কত বয়স হবে তখন ? বড়জোর এক কুড়ি। বোনের বিয়ে ঠিক হল ধূপগুড়িতে। ধারধোর করে বাপ তাদের খাঁই মেটালো। কিন্তু বিয়ের দিন বরের বাপ জানালো সাইকেল দিতে হবে, নইলে ছেলে আসবে না। সাইকেল কোথায় পাব ? মড়াকান্না শুরু হয়ে গেল। হাঁটতে-হাঁটতে ধূপগুড়ি গেলাম। বরের বাপের পায়ে পড়লাম। সে কসাই, রাজি হয় না কিছুতেই। ফিরে আসছি, এমন সময় দেখলাম একজন সাইকেল চালিয়ে আসছে নির্জন রাস্তা ধরে। রোগা লোক। মনে হল বোনের সম্মান বাঁচাতে ওটাই নিয়ে নিই। কোনও দিন অমন কম্ম করিনি। কিন্তু সেদিন করে ফেললাম। সাইকেল

পৌঁছে দিয়ে এলাম বরের বাড়িতে। লোকটাকে একটু বেশি মারতে হয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল পথের ধারে। কিন্তু বোনের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কী করে জানি লোকটা আমায় চিনে ফেলেছিল। তিন দিন বাদে পুলিশ এল আমাকে ধরতে। আমি পালালাম। জঙ্গলে যখন লুকিয়ে আছি তখন আলিবক্সের দলের সঙ্গে যোগাযোগ হল। নিজেকে বাঁচাতে তার দলে যোগ দিলাম। ওই আলিবক্স আমাকে শিখিয়ে দিল কী করে লাঠি, ছুরি চালাতে হয়, এক কোপে গলা নামাতে হয়। মনে দয়া রাখলে সেটাই যে কাল হবে, তাও শিখলাম। আলিবক্স মারা গেলে আমাকেই সর্দার বানালো সবাই। গরিবদের কিছু বলতাম না। কিন্তু যার বেশি আছে তাকে ছাড়তাম না। ওই বার্নিশ পর্যন্ত আমাকে ভয় পেত না এমন মানুষ খুঁজে পাবে না। আমার একটা সাদা টাট্টু ঘোড়া ছিল। তার আওয়াজ শুনলেই সবাই ঝাঁপ দিত ঘরে। ওই যে আমার বউ, ও হল প্রথম পক্ষের। বাপ দিয়েছিল এনে। ওর সঙ্গে ঘর করতে পারিনি কত বছর। দ্বিতীয় বউটাকে বিয়ে করতে হল চাপে পড়ে। ওকে চিনতাম না। বিয়ের ঠিক করেছিল ওর বাপ এক পাষণ্ডের সঙ্গে। পাওনাগণ্ডা পায়নি বলে বিয়ের দিন আসেনি। আমি সে সব জানতাম না। বিয়েবাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে শুনি এই অবস্থা। সঙ্গে-সঙ্গে বরকে ধরতে লোক পাঠালাম। সে-ব্যাটা আমি গিয়ে পড়েছি শুনে একেবারে হাওয়া। এবার মেয়ের কী হবে? আমি বললাম, ঠিক আছে, আমিই নাহয় উদ্ধার করছি। সে বড় ভাল দিন ছিল।"

জোরে-জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন তারিণী সেন।

অর্জুন তাঁকে একটু সময় দিয়ে বলল, "বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না?"

"না। ও-ব্যাটারা যে কী চায় তাই বুঝতাম না। কোনও কালে যোগ না থাকলে ভালই হত। একবার লাটাগুড়ির জঙ্গলে একজনকে ধরলাম। মুখে দাড়ি, খেতে পায়নি অনেকদিন। বলল সে বিপ্লবী। ইংরেজদের তাড়াতে চায়। বলল, দেশকে স্বাধীন করবে। শুনতে-শুনতে কী রকম যেন হল। ওকে সঙ্গে নিয়ে ক'দিন ঘুরলাম। শিক্ষিত মানুষ। রোজগারপাতি না করে দেশ উদ্ধার করতে পুলিশের তাড়া খেয়ে বনবাদাড়ে ঘুরছে কেন, সেটাই বুঝতে চাইলাম। আর তাই ধরা পড়ে গেলাম পুলিশের হাতে।"

"কী করে?"

"অমন লোক দলের সঙ্গে ঘুরুক তা কেউ-কেউ পছন্দ করছিল না। মাঝে-মাঝে লোকটা বার্নিশে যেত তার কাজে। আবার ফিরেও আসত। একদিন খোচড় এসে দেখে গেল ওর পিছু পিছু। তারপর পুলিশ এল ওকে ধরতে। ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমি ধরা পড়ে গেলাম। তা ধরে করবে কী? নিয়ে গেল জলপাইগুড়ি। পুরে রাখল ক'দিন। কিন্তু কেউ সাক্ষী দিতে এল না আমার বিরুদ্ধে। আমি বেকসুর খালাস।"

"আপনি এরপরে ডাকাতি করা ছেড়ে দেন কেন ?"

"সেই লোকটার জন্যে। ওই নাকি আমার জন্যে উকিল দিয়েছিল। সেই উকিলবাবু আমার ছাড়া পাওয়ার সময় বলেছিল আর ওসব করবেন না। অনেক তো হল। কথাটা মনে লেগে গেল। দলের লোকজন চাইত না আমি বসে যাই। তারা আমাকে খুব উসকাতো। কিন্তু সেই লোকটা আমার সব খবর রাখতো। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইত।"

"ওই লোকটা মানে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী, যাদের বিপ্লবী বলা হত ?"

অর্জুনকে অবাক করে তারিণী সেন ঘাড় নাড়লেন, "না, না। ওরা আলাদা লোক। একজন এদেশি আর অন্যজন সাহেব। লাল গোরা। পুলিশরা সেলাম করত।"

"এই লাল গোরার নাম কি ম্যাকসাহেব ?"

"হ্যাঁ। তুমি কী করে জানলে ? তখন তো জন্মাওনি বাপ !"

"শুনেছি। আর যিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তাঁর নাম কী ?"

"কমলবাবু। লোকটা ভাল ছিল গো।"

"তা আপনাকে ছাড়াল কে ?"

"ওই গোরাসাহেব। ওই উকিল ঠিক করে দিয়েছিল।"

"গোরাসাহেব দেশের শত্রু ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর কাজ ছিল অপরাধী ধরা। তিনি কেন আপনাকে বাঁচাতে গেলেন ?"

তারিণী সেন মাথা নাড়তে লাগলেন, সঙ্গে ফিকফিক হাসি, "সাহেবের খুব লোভ ছিল, তাই।"

"কিসের লোভ ?"

"বাটপাড়ি করার লোভ। চোরের ওপর বাটপাড়ি। সাহেব জানত, আমি অনেক ডাকাতি করেছি। অনেক সোনাদানা। একবার তিব্বতের, ওই যে কী বলে, তিব্বতের সাধুদের একটা দল যাচ্ছিল, তাদের ওপর ডাকাতি করে অনেক ধনসম্পত্তি পেয়েছিলাম। সোনাদানা ছাড়াও কালো পাথরের ভারী মূর্তি ছিল ওদের সঙ্গে। দুটো লোককে খুন না করে তার দখল পাইনি। গোরাসাহেব ওই মূর্তির জন্যে আমার কাছে আসত। ওই বার্নিশের জঙ্গলে সে দেখা করত আমার সঙ্গে। আমাকে যখন পুলিশ ধরল, তখন সে ছাড়িয়েছিল ওই এক শর্তে। ছাড়া পাওয়ার লোভে আমি তখন রাজি হই। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে মনে হল যদি মূর্তিটা দিয়ে দিই, সাহেব আমাকে ছিঁড়ে খাবে।"

"মূর্তিটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন ?"

"কে কিনবে ? অদ্ভুত মূর্তি। দেবদেবীর না। সোনাদানা সব ফক্কা হয়ে গিয়েছিল।"

"মূর্তিটা নিয়ে কী করলেন ?"

"পুঁতে রেখেছি।"

অর্জুন এবার সোজা হয়ে বসল, "আপনার হাত দুটো কাটা গেল কী করে ?"

হঠাৎ কেমন অবসন্ন দেখাল তারিণী সেনকে। সম্ভবত অনেকক্ষণ কথা বলার ধকল তিনি সামলাতে পারছিলেন না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বললেন, "ম্যাকসাহেব কেটে দিয়েছে।"

"সে কী ! আমরা শুনেছিলাম বিপ্লবীরা বদলা নিয়েছে। আপনি তাদের ধরিয়ে দিতেন।"

"মিথ্যে কথা ! কমলাকান্তকে দোমহনির সরকারি বাড়িতে প্রচণ্ড মার মেরেছিল ম্যাকসাহেব। আমি তাকে লুকিয়ে দু' হাতে নিযে ছুটে যাই তিস্তার নৌকো ধরতে। সেই অপরাধে ম্যাকসাহেব আমাকে বলল, যদি আমি মূর্তিটা ওকে না দিই তা হলে আমার হাত কেটে দেওয়া হবে। লোকটা যত আমার কাছে মূর্তিটা চাইত, তত আমার রোখ চেপে যেত। আমি রাজি হলাম না। ও আমার হাত কেটে দিল দোমহনির লালকুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে।"

যেন সহজ-সরল একটা কাজের কথা বললেন তারিণী সেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ম্যাকসাহেব মূর্তিটার কথা জানলেন কী করে ?"

"তিব্বতিরা বলেছে।"

"ঠিক আছে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

"কাল নাকি এক গোরা মেম এসেছিল ?"

"হ্যাঁ। মেয়েটি ম্যাকসাহেবের নাতনি। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে।"

অদ্ভুত মুখ করে তাকালেন তারিণী সেন। তারপর বললেন, "গোরাসাহেবের নাতনি আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে ? হায় ভগবান ! এমনও হয় ?"

অর্জুন বলল, "আমাকে তো তাই বলেছে। আচ্ছা, ও যদি আপনার কাছে মূর্তিটার হদিস চায় তা হলে ওকে তা দেবেন ?"

তারিণী সেন হাসলেন। রহস্যময় তাঁর হাসি। ছড়া কেটে বললেন, "কালোর সঙ্গে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভালো। আমি ভুলেই গেছি কোথায় রেখেছি।"

অর্জুন দেখল সেই লোকটির সঙ্গে ডাক্তারবাবু আসছেন। সে জিজ্ঞেস করল, "কথা হল ?"

"হ্যাঁ। এই যে তারিণীবাবু, কেমন আছেন ? নাড়িটা দেখি ?"

ভদ্রলোক নিজেই বৃদ্ধের হাত তুলে নিলেন, "একটু দুর্বল দেখছি। খুব কথা বলেছেন মনে হচ্ছে। যান, ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি ওষুধ এনেছি, কোনও চিন্তা নেই।"

অর্জুন বলল, "হাসপাতালে যেতে হবে না, এই তো ?"

"তাই তো বলে এলাম। বিডিও সাহেব খুব বলছিলেন। তাঁকে টেলিফোন

করেছে শিলিগুড়ির এক ইনফ্লুয়েনশিয়াল ব্যবসায়ী। উনি যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, তাই বিডিও সাহেব জানতেন না। এরকম একটা লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন তা হতে দেওয়া যায় না। মুশকিল হল, আমিও জানতাম না উনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিডিও সাহেবকে বলে এলাম যদি বুঝি দরকার, সঙ্গে-সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাব। একটু রিস্‌ক নিয়ে ফেললাম।"

অর্জুন বলল, "উনি নিজেও জানেন না যে ওঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা হচ্ছে। যাকগে, আপনি কাল চা খাওয়াবেন বলেছিলেন, আজ আমি যেচে খেতে চাইছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারবাবু চঞ্চল হলেন, "আরে, এ কী কথা! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চলুন। এ তো আমার সৌভাগ্য!" ওরা তারিণী সেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

ডাক্তারবাবুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। চেম্বারের সামনে কিছু রুগী বসে আছে। তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে অর্জুনকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন তিনি। বোঝা যাচ্ছে বসার ঘরই চেম্বার। চায়ের হুকুম দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "এবার আমাকে বলুন তো ব্যাপারটা কী? আপনার মতো মানুষ এমন অজ গাঁয়ে বিনা কারণে আসতে পারেন না!"

অর্জুন জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ফাঁকা মাঠ, মাঠের বুকে বড় মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। সে হেসে বলল, "গতকাল আমি এসেছিলাম নেহাতই কর্তব্য করতে। ওই ইংরেজ মেয়েটি তারিণী সেনকে দেখতে চেয়েছিল, তাই ওকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে।"

"কীরকম?" ডাক্তারবাবু ঝুঁকে বসলেন।

"আজ মনে হচ্ছে তারিণী সেনের ‌.বন বিপন্ন। না, অসুখের জন্যে নয়, ও-ব্যাপারে আপনি আছেন। বিপন্ন তাঁর অতীতের কিছু কাজের জন্যে।"

"বিপন্ন কী করে বুঝলেন?"

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, যে-লোকটার খোঁজ কাল সকাল পর্যন্ত কেউ করত না, সে আজ বেশ ভি আই পি হয়ে গেল কী করে? আপনাকে বিডিও ডেকে পাঠাচ্ছেন ওঁর সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে। এখানকার গ্রামে-গ্রামে এমন অনেক বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, কই, তাঁদের সম্পর্কে তো খোঁজ নেওয়া হচ্ছে না?"

"ঠিক। এটা আমাকে অবাক করেছে!"

"একজন ইংরেজ মহিলা এত দূরে কী কারণে আসবে, যদি না তার স্বার্থ থাকে?"

"ঠিকই। কিন্তু এর সঙ্গে জীবন বিপন্ন হওয়ার কারণ কী?"

"তারিণীবাবু এমন কিছু জানেন, যা জানতে এখন অনেকেই উৎসুক। বিডিও সাহেব স্রেফ অনুরোধে খোঁজখবর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে যিনি অনুরোধ করেছেন, তিনি হয়তো উৎসাহী। তারিণী সেনকে এখান থেকে তুলে

নিয়ে গেলে চাপ দিলে হয়তো খবরটা পাওয়া যাবে বলে ওদের ধারণা হতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, তারিণী সেনকে বাইরের মানুষের চোখের আড়ালে রাখা উচিত। সেটা কীভাবে সম্ভব তা আপনারাই বলতে পারবেন।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কী সেই গোপন কথা, যা উনি জানেন বলে এসব হচ্ছে?"

"সেটা উনিই জানেন।"

হঠাৎ দূরে মাঠের প্রান্তে ধুলো উড়তে দেখা গেল। একটু ঠাওর করতেই অর্জুন বুঝতে পারল একটা গাড়ি আসছে এদিকে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের গ্রামে প্রায়ই গাড়ি আসে?"

"কালেভদ্রে। কেউ-কেউ মন্দির দেখতে আসে।"

এবার কালো অ্যাম্বাসাডারটা নজরে এল। অর্জুন একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু, আমার মনে হচ্ছে এরা মন্দির দেখতে আসেনি। আপনার এখান থেকে পেছন দিক দিয়ে তারিণী সেনের বাড়িতে যাওয়ার কোনও পথ আছে?"

"হ্যাঁ আছে। কেন?"

"ওরা তারিণী সেনের খোঁজে এসেছে। আমি লোকটার জন্যে ভয় পাচ্ছি।"

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আমি দেখছি। ওরা যাতে দেখা না করতে পারে তার ব্যবস্থা করব।" ডাক্তারবাবু দ্রুত বেরিয়ে যেতে অর্জুনের খেয়াল হল তার বাইকটা মন্দিরের সামনেই পড়ে আছে। ওরা এমন একটা অজ পাঁড়াগাঁয়ে বাইক দেখতে পেলে সন্দিগ্ধ হলেও হতে পারে। কালো অ্যাম্বাসাডার মন্দিরের সামনে দাঁড়ালে সেই গ্রাম্য লোকটি এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে মন্দির দেখিয়ে কিছু বলতে লাগল। অর্জুন বুঝল ও ওর কাজ করছে। গাড়ি থেকে নামল দু'জন মানুষ। দু'জনেই স্বাস্থ্যবান। একজনকে বিদেশি বলেই মনে হচ্ছিল। সে ক্যামেরা বের করে টপাটপ মন্দিরের ছবি তুলতে লাগল। দ্বিতীয়জন লোকটির সঙ্গে কথা বলছিল। এবার ডাক্তারবাবুকে এগিয়ে যেতে দেখল সে। লোকটির সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথা হচ্ছে। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে লোকটি ডাক্তারবাবুকে দিল। ডাক্তারবাবু সেটা পড়ে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না, কারণ তিনি ঘন-ঘন এদিকে তাকাচ্ছিলেন। তারপর গ্রাম্য লোকটিকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু কিছু বলতেই সে ছুটে এদিকে আসতে লাগল। অর্জুন বুঝল ভদ্রলোক তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান, কিন্তু যে-কোনও বুদ্ধিমান মানুষ এই চালাকি ধরে ফেলবে। অথচ এখন কিছু করার নেই। লোকটি ঘরের দরজায় এসে বলল, "ওরা শিলিগুড়ি থেকে এসেছে। কেউ যেন তারিণী জ্যাঠার চিকিৎসার জন্যে এক হাজার টাকা পাঠিয়েছে। টাকাটা জ্যাঠার হাতে না দিতে পারলে ফেরত নিয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন কী করবেন ?"

অর্জুন বলল, "ডাক্তারবাবুকে বলো ওদের সঙ্গ না ছাড়তে আর কথা বলতে না দিতে।"

লোকটি আবার দৌড়ে চলে গেল। ওকে দেখে ডাক্তারবাবু এগিয়ে এসে মাথা নামিয়ে বক্তব্য শুনে ওদের ইশারা করলেন অনুসরণ করতে। একটু পরেই ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল।

তারিণী সেনের কাছে একটি মূর্তি ছিল। কালো পাথরের মূর্তি, যা লোকটা তিব্বতি লামাদের ওপর ডাকাতি করে পেয়েছিল। ওই মূর্তি তারিণী সেন বিক্রি করতে পারেনি, কারণ সে-সময় ওই অঞ্চলে কোনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া অন্য মূর্তির চাহিদা ছিল না। অথচ বোঝা যাচ্ছে ওই মূর্তি যথেষ্ট মূল্যবান। মূল্যবান বলেই রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড ওটাকে পেতে চেয়েছিলেন। তারিণীকে হাতে রেখে ওটার হদিস পাওয়ার চেষ্টাও করেছেন। দেশে ফিরে গিয়ে নিজের ডায়েরিতে ওই মূর্তির কথা লিখে রেখে গেছেন, যা ডরোথি পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওই মূর্তির লোভেই সে গতবার দিল্লিতে এসে কয়েক জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর নেহাতই কাকতালীয়ভাবে অমল সোমের কাছে পৌঁছে গিয়ে তার নামে চিঠি লিখিয়ে নেয়। ডরোথি হয়তো এখনও জানে না তার পেশা কী! স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে ক্ষমা চাইতে আসার গল্প নেহাতই একটা আড়াল মাত্র। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ও এবং ওর দলের লোকজন বেশ সক্রিয়। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি থেকে বিডিওকে ফোন করাবার মতো লোককে ওরা পেয়ে গেছে। এই যে হাজার টাকা দিতে আসা, এটাও একটা চাল। তারিণী সেনকে সচক্ষে দেখে নিতে চায় ওরা, যাতে লোকটাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধে না হয়।

এখন কী করা যায় ? মূর্তিটা কোথায় আছে, তা তারিণী সেন ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। টাকার লোভে লোকটা কি বলে দেবে ? অবশ্য টাকার লোভ থাকলে এত বছর প্রচণ্ড অভাবে থেকেও তারিণী সেন মূর্তিটার কথা কাউকে বলেনি। কেন ?

কিছুক্ষণ পরে ওদের আবার দেখতে পেল অর্জুন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রাম থেকে ধুলো উড়িয়ে।

অর্জুন বেরিয়ে এল। মন্দিরের দিকে কয়েক পা হাঁটতেই ডাক্তারবাবু এবং লোকটির মুখোমুখি হল। ডাক্তারবাবু বললেন, "ওরা চিকিৎসার জন্যে এক হাজার টাকা দিয়ে গেল।"

অর্জুন বলল, "ভালই তো! তারিণীবাবুর উপকার হবে।"

লোকটি বলল, "অত টাকা আমি জীবনে একসঙ্গে ধরিনি! তারিণী জ্যাঠার কপাল বটে! টাকা দেখে বুড়ো কিন্তু একটুও হইচই করল না। জেঠিকে দিয়ে

দিল। ওরা ফোটো তুলল। দু-চারটে কথা বলল, কিন্তু জ্যাঠা কোনও জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কী মানুষ রে বাবা!"

ডাক্তারবাবু এসব কথায় কান দিচ্ছিলেন না। সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "কী করা যায়?"

"লক্ষ রাখবেন। এই আর কি। ওরা কি শহরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল?"

"না। সেসব কিছু বলেনি।"

"আমি তো আবার বিকেলে আসছি মেমসাহেবের সঙ্গে। সে রকমই কথা হয়ে আছে।" অর্জুন সোজা বাইকে গিয়ে বসল। সে যখন নিজেই কিছু বুঝতে পারছে না তখন ডাক্তারবাবুকে কী বলবে! অনেকটা দূরে এসে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল মন্দিরটাকে দেখা যাচ্ছে। পাশের ছোট লাল মন্দিরটাও এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। রাজারাজড়াদের তৈরি করা এইসব মন্দির দেখতে এখনও কেউ-কেউ আসেন। কিছু-কিছু মূর্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় নিয়ে গিয়েছেন। মন্দির দেখাবার সময় গতকাল লোকটি বলেছিল কুবের মূর্তি এবং বিষ্ণুপট্ট এখন সরকারের হেফাজতে। এখন তারিণী সেনের লুকিয়ে রাখা মূর্তি যদি পাওয়া যায় তা হলে তার স্থান হওয়া উচিত পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালা।

আবার চলতে শুরু করল অর্জুন। একটানা অনেক কথা বলে গেলেন তারিণী সেন। অত বছর আগের কথা ঠিকঠাক একজন অসুস্থ বৃদ্ধ বলবেন, এমন আশা করা ঠিক নয়। কিন্তু ওঁর হাতের পাঞ্জা ম্যাকসাহেব কেটে ফেলেছিলেন, এটা অবশ্যই নতুন তথ্য। দৃশ্যটি অবশ্যই ভয়ঙ্কর। নাৎসিদের অত্যাচার তো অমনই ছিল। সেই একই অত্যাচার করেছেন ডরোথির দাদু। সেটা কমলাকান্ত রায়কে সাহায্য করার জন্য না মূর্তি বের করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে, তা এখন আর জানা যাবে না। হয়তো মাথাগরম করেই, হাল ছেড়ে দিয়েই কাজটা করেছিলেন ম্যাকসাহেব। কিন্তু তাঁর যে আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল, তা বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা ডায়েরিতে লিখে রাখায়। আর এতদিন পরে তাঁর নাতনি এসেছে ওই একই বস্তুর সন্ধানে।

ময়নাগুড়ির বাইপাসে এসে অর্জুন একবার ভাবল বিডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা জানিয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জলপাইগুড়িতে চলে এল। এখন ভর দুপুর। সোজা থানায় এসে দেখল অবনীবাবু দুটো লোককে প্রশ্ন করে চলেছেন। এরা চোরাশিকারি। জঙ্গলে ঢুকে অবৈধভাবে জন্তু-জানোয়ার মারে। অর্জুনকে দেখে ওদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী খবর?"

পুলিশের সবাইকে মন খুলে সব কথা বলা যায় না। কিন্তু অবনীবাবু অন্য রকমের মানুষ, অনেক বার তার প্রমাণ পেয়েছে অর্জুন। অতএব আজ সকাল থেকে যা-যা ঘটেছিল সব সে বলে গেল।

শোনা শেষ হলেই অবনীবাবুকে উত্তেজিত দেখাল, "এর পরেও বৃদ্ধ লোকটাকে ওখানে ছেড়ে এলেন ? না, না। এটা ঠিক কাজ হয়নি।"

"এখন কিছু করার নেই। আমার মনে হয় ডরোথি যাওয়ার আগে কিছু করবে না ওরা।"

"মেমসাহেবকে নিয়ে আবার তা হলে যাচ্ছেন ?"

"অবশ্যই।"

অবনীবাবু একটু চিন্তা করলেন। তারপর উঠে গেলেন একটা আলমারির কাছে। এই বই সেই খাতা খুলে দেখতে লাগলেন কিছু। অর্জুন লক্ষ করছিল ভদ্রলোককে। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে অবনীবাবু বললেন, "নাঃ। হাতের কাছে নেই। ওপরে হয়তো পাব। পুরনো ইতিহাস ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একবার যেন পড়েছিলাম তিব্বতি লামাদের আনা একটা মূর্তি ডাকাতির পর আর পাওয়া যায়নি খুঁজে। সেই সময় ব্রিটিশরা দাম দিয়েছিল হাজার পাউন্ড। এখনকার টাকায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার। পঞ্চাশ বছরে ওর দাম গিয়ে দাঁড়াবে এক কোটিতে। আপনার তারিণী সেন সেই মূর্তিটি কব্জা করে ভিখিরির মতো বাস করবেন, এমন মনে হয় না।"

"মূর্তিটা থেকে অত টাকা পাওয়া যাবে এমন আন্দাজ বৃদ্ধ মানুষটার নেই।"

"কিন্তু এটা যে মূল্যবান, তা নিশ্চয়ই জানত, নইলে পুঁতে রাখবে কেন ?"

"ম্যাকসাহেব চাইছেন, দিয়ে দিলেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, নিজেকে দামি করতে তারিণী সেন মূর্তি হাতছাড়া করতে চাননি।" হঠাৎ তারিণী সেনের বলা ছড়া মনে পড়ে গেল অর্জুনের। সে টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে ঠিকঠাক লেখার চেষ্টা করল।

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী লিখলেন ?"

অর্জুন কাগজটা এগিয়ে দিল। অবনীবাবু পড়লেন, "'কালোর সঙ্গে লাল আর লালের মধ্যে কালো, ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভালো'। এর মানে কী ?"

"আমি জানি না। মূর্তিটা কোথায় পুঁতেছেন জানতে চাইলে, বললেন ভুলে গিয়েছি। তার আগে ওই কথাগুলো সুরে বললেন।"

"বেশ হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। কোনও মানে পেয়েছেন ?"

"এখনও না।"

"দুর মশাই। এটা তো সিম্প্‌ল। কালোর সঙ্গে লাল। তারিণী সেনের গায়ের রঙ নিশ্চয়ই কালো আর ম্যাক সাহেবের অবশ্যই লাল। তাই কালোর সঙ্গে লাল। ম্যাকসাহেব তারিণীর সঙ্গে আছেন। আর লালের মধ্যে কালো। তারিণী ম্যাকের মধ্যে আটকে গেছে। এক্ষেত্রে সাহেবকে শ্রদ্ধা করলে প্রাণ বাঁচবে। এই তো।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "এর সঙ্গে মূর্তির কী সম্পর্ক ?"

অবনীবাবু গম্ভীর হলেন, "হুঁ। তা অবশ্য। তবে লাল-কালো মানে ইংরেজ এবং আমরা।"

"আমার তো মনে হয় না। তারিণী সেন একজন রাজবংশী। ওঁর গায়ের রং এই বয়সেও বেশ ফরসা। কালো কখনই বলা যাবে না।"

"আহা, ইংরেজদের তুলনায় তো কালো?"

"আমি উঠলাম।" অর্জুন উঠে পড়ল।

"আপনি কি ফিরে এসে থানায় টুঁ মারবেন?"

"বলতে পারছি না। আপনি কি ময়নাগুড়ি থানায় আমার কথা বলে রাখবেন? ইন কেস অফ এনি হেল্প। আজ রাত্রে দরকার হলেও হতে পারে!"

"নিশ্চয়ই। তা ছাড়া ওখানকার ও সি আপনাকে বিলক্ষণ চেনেন। আমার জুরিসডিকশন নয়, তবু মনে হচ্ছে যেতে পারলে ভাল লাগত।"

"আসুন না!" অর্জুন বেরিয়ে এল।

স্নান-খাওয়া সেরে অর্জুন প্রথমে সুধীর মৈত্রের বাড়িতে গেল। ভদ্রলোক তাঁর পড়ার ঘরেই ছিলেন। চশমা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কী?"

"অসময়ে এলাম!"

"আমার কাছে সবসময়ই ঠিক সময়। শুধু রাতদুপুর ছাড়া।"

"কেউ আর বিরক্ত করেনি তো?"

"না।"

"আচ্ছা, জলপাইগুড়ির পুরনো দিনের মূর্তি নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন।"

"না। আমি আলাদা করে কিছু জানি না। বইয়ের পাতায়-পাতায় যা লেখা আছে, তাই জেনে নিই। অন্য লোকে পড়ে না তেমন করে, তাই জানে না। কী বক্তব্য?"

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে একটি তিব্বতি দল তিস্তার ধারেকাছে ডাকাতদের হাতে পড়ে। ওদের সঙ্গে একটি মূল্যবান মূর্তি ছিল। মূর্তিটি আর পাওয়া যায় না। এ-ব্যাপারে কিছু জানা থাকলে বলুন।" অর্জুন সরাসরি জানতে চাইল।

"অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধমূর্তি?"

"আমি জানি না। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি নয়।"

"আশ্চর্য! এর সঙ্গে জলপাইগুড়ির পুরাকীর্তির কী সম্পর্ক? ঠিকঠাক প্রশ্ন করতে পারো না কেন? হ্যাঁ। এই সেদিন সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ সালে, ওরকম একটা ডাকাতির পর হইচই হয়েছিল খুব। মূর্তিটা নাকি খুব দামি। কত দামি, তা কেউ বলতে পারেনি। ইংরেজরা বলেছিল, কয়েক হাজার পাউন্ড। যে জিনিস চোখে দেখিনি বা কোনও বিশেষজ্ঞ দ্যাখেননি তার দাম অনায়াসে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এরকম বুনো হাঁসের পেছনে ছুটতে

আমি রাজি নই। ওরা তো মিথ্যে কথাও বলতে পারে।"

॥ ছয় ॥

সুধীর মৈত্রের কথায় যুক্তি আছে। যা তিনি দেখেননি, যা আদৌ ছিল কিনা তার কোনও প্রমাণ নেই, সেটা সাধারণ না অসাধারণ, তা নিয়ে তিনি গবেষণা করতে রাজি নন। ঠিক কথা। কিন্তু জিনিসটি যে অসাধারণ, তা রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড অনুমান করেছিলেন বলেই এত বছর বাদে তাঁর নাতনি ভারতবর্ষে এসে হাজির হয়েছে। তারিণী সেনের হাত কেটে ফেলে অত্যাচার করেও তো ভদ্রলোক মূর্তিটাকে পাননি। সরকারি ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল, তা সত্ত্বেও বিফল হয়েছিলেন তিনি। এত বছর পরে ডরোথি কী করে বুঝল যে সে সফল হবে? আর ডরোথি তো এখন একা নয়। দু'-দুবার এদেশে এসে ভালই সঙ্গী জোগাড় করতে পেরেছে। তিস্তা ভবনের দিকে যেতে-যেতে এই সব ভাবছিল অর্জুন।

ডরোথি তৈরি ছিল। বলল, "আমাদের যেতে দেরি হয়ে গেল না তো?"

অর্জুন ঘড়ি দেখল। এখন তিনটে বাজে। বলল, "না। সন্ধের মধ্যে ফিরে আসতে পারব।"

মেয়েটা সাবলীলভাবে মোটরবাইকের পেছনে উঠে বসল। ওর মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে, ওর দাদুর হয়ে ক্ষমা চাইতে নয়, স্রেফ মূর্তির লোভে এ-দেশে আছে। বেশ চমৎকার অভিনয় করতে পারে মেয়েটা। তিস্তা ব্রিজের ওপর এসে অর্জুনের ইচ্ছে করছিল ডরোথির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

পূর্বদহে যখন ওরা পৌঁছল তখনও মাটিতে হালকা রোদ। চারধার ঝরঝরে। বাইক থেকে নেমেই সে দেখল ডাক্তারবাবু মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। অর্জুন বলল, "ডরোথি আবার এল দেখা করতে। ক্ষমা চাইতে।" কথাগুলো ইচ্ছে করেই সে ইংরেজিতে বলল। ডরোথি তখন মন্দিরের পূর্ব দিকে পুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছে। সংস্কার হয়নি অনেককাল। পানায় ঢেকে গেছে এতকালের পদ্মদিঘি।

ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়েই তারিণী সেনের বাড়িতে এল। তারিণী সেন এখনও ঘুমোচ্ছেন। ওষুধে ভাল কাজ হয়েছে। হঠাৎ ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "উনি এ-বাড়িতে কতদিন আছেন?"

আজ দ্বিতীয়া বৃদ্ধাকে দেখতে পেল অর্জুন। ওঁর বয়স হয়েছে তবে প্রথমার মতো নয়। ডাক্তারবাবু তাঁকে প্রশ্ন করলেন ডরোথির হয়ে। দ্বিতীয়া বললেন, "হিসেব নেই।"

"এর আগে ওঁর বাড়ি ছিল কোথায়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আগে তো জঙ্গলে ঘুরত। এই বাড়িতে ওর বাপও থাকত।"

তথ্যটা ডরোথিকে জানিয়ে দিল অর্জুন।

ইতিমধ্যে প্রথমা তারিণী সেনকে ঘুম থেকে তুলে বাইরে নিয়ে এসেছেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন এখন ? জ্বর ছেড়েছে ?"

"ভগবান নিচ্ছে না, তাই যেতে পারছি না। এটাকে কি থাকা বলে !" গলার স্বর এখনও মিনমিনে। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি উঠি। পেশেন্ট আসবে। যাওয়ার সময় দয়া করে যদি আসেন— !"

অর্জুন নিঃশব্দে মাথা নাড়তে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ডরোথি বলল, "ওঁকে বলো যে, আমি দাদুর হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

অনেক কষ্টে হাসি চেপে অর্জুন সে-কথা তারিণী সেনকে জানিয়ে দিল।

হঠাৎ তারিণী সেন নিজের হাত দুটো ডরোথির দিকে তুলে ধরলেন, "এ দুটো ফিরে পাব ?"

ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "উনি কী বলছেন ?"

অর্জুন দোভাষীর কাজ করতে লাগল। ডরোথি বলল, "এ-কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?"

"কারণ, তোমার দাদু আমাকে সারাজীবনের জন্যে ঠুঁটো করে গেছেন।"

"অসম্ভব ! আমি বিশ্বাস করি না।"

তারিণী সেন হাসল, "কবরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, উত্তর পেয়ে যাবে।"

"আপনি কী অন্যায় করেছেন, যাতে তিনি এত বড় শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন ?"

অর্জুন 'বাধ্য হয়েছেন' শব্দ দুটো শুনে মজা পেল। ডরোথি তার দাদুকে বাঁচাতে চাইছে।

তারিণী সেন বললেন, "ওই যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম কমলাবাবুকে। নইলে মানুষটা মরেই যেত। সেই ব্যাপারটাকে অপরাধ বলে মনে করলেন গোরাসাহেব। বললেন, হাত কেটে ফেলবেন, যদি না আমি তাকে মূর্তিটা দিয়ে দিই।"

কথাটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ডরোথির দিকে তাকাল অর্জুন। মেয়েটার মুখে একটুও অন্য ছাপ ফুটল না। সে জিজ্ঞেস করল, "কিসের মূর্তি ?"

তারিণী বললেন, "তোমায় গোরাসাহেব বলেননি মূর্তির কথা ?"

"আমার সঙ্গে দাদুর কোনও কথা হয়নি। আমি তাঁর লেখা ডায়েরিতে যে তিনজনের নাম পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আপনি আছেন। তাই এখানে এসেছি।"

"অ। তা হবে। মূর্তিটা পেয়েছিলাম তিব্বতিদের কাছ থেকে। ওটার ওপর গোরাসাহেবের খুব লোভ ছিল। একটা হাত কাটার পর বলেছিল মূর্তি দিলে দ্বিতীয়টা কাটবে না। তাও যখন রাজি হলাম না, তখন এটাও কাটল।"

ডান হাত দেখালেন বৃদ্ধ, "জানে মারল না। মারলে তো মূর্তি কোনওদিনই পাওয়া যাবে না!"

ডরোথি জিজ্ঞেস করল. "মূর্তিটা কি খুব দামি?"

"নাঃ। কেউ কিনতে চায়নি। ময়নাগুড়ির মাড়োয়ারি দোকানদার আট আনা দাম দিয়েছিল।"

"আমার দাদু আপনাকে টাকা দিতে চাননি?"

"হ্যাঁ। একশো টাকা।" চোখ বড় করলেন তারিণী সেন। পঞ্চাশ বছর আগে একশো টাকার দাম ছিল কয়েক হাজার টাকার সমান।

"দিলেন না কেন?"

"দিলেই তো আমাকে খতম করে দিত গোরাসাহেব। মূর্তিটার লোভে আমাকে জেল থেকে বাঁচিয়েছে। আমাকে মেরে ফেলতে পারেনি।" তারিণী সেন ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন।

"মূর্তিটার শেষপর্যন্ত কী হল?"

"কালোর মধ্যে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভাল।"

"এর মানে কী?"

তারিণী সেন এর জবাব দিলেন না। একই ভাবে হাসতে লাগলেন।

"কত টাকা দিলে মূর্তিটা আপনি দিতে পারবেন?"

"কেন? মূর্তিটা তুমি কেন চাইছ?"

"আমার দাদুর ইচ্ছে ছিল, ওটা নিজের কাছে রাখার। সেই ইচ্ছে পূর্ণ করতে চাই।"

তারিণী সেন হাসলেন, "তা লে ক্ষমা চাইতে নয়, মূর্তির জন্যে এসেছ আমার কাছে?"

এই গোপন সত্যটা মুখের ওপর বলে দিলেন বৃদ্ধ। অনুবাদ করতে-করতে নিজেকে ঠিক রাখা বেশ মুশকিল হচ্ছিল অর্জুনের। ডরোথি হঠাৎ গলার স্বর পালটাল, "কত টাকা পেলে মূর্তিটা দিতে পারবেন? দশ হাজার টাকা?"

তারিণী সেন অঙ্কটা শুনে যেন অবাক হয়ে গেলেন! কোনও কথা বলতে পারলেন না।

ডরোথি আবার প্রশ্ন করল, "ঠিক আছে, আপনাকে কুড়ি হাজার টাকা দেব আমি।"

এবার দ্বিতীয়া বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, "কথা বলছেন না কেন? কুড়ি হাজার টাকা। ওমা, আর ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।"

তারিণী সেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর দিকে তাকালেন। টাকার অঙ্কটাকে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ভদ্রলোক। অর্জুনের ভয় হচ্ছিল, উনি রাজি হয়ে যাবেন। সে চটপট বলে উঠল, "ডরোথি, তুমি ভুল করছ। ভারত সরকারের

অনুমতি ছাড়া এ-দেশ থেকে কোনও মূর্তি তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। আর মূর্তির যদি পুরাতাত্ত্বিক মূল্য থাকে, তা হলে কখনওই সেই অনুমতি পেতে পারো না।"

ডরোথি শক্ত গলায় জবাব দিল, "কীভাবে নিয়ে যাব সেটা আমার চিন্তা। ওঁকে তুমি জিজ্ঞেস করো মূর্তিটা ওই টাকায় দেবেন কি না!"

অর্জুন এবার মিথ্যাচার করল, "আপনি যেটা ওর দাদুকে দেননি তা কি এখন মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় দিয়ে দেবেন ?"

"মাত্র ? কুড়ি হাজার মাত্র নাকি ? মাড়োয়ারি দোকানদার আট আনাও দাম দেয়নি।"

অর্জুন কথাগুলো অনুবাদ করল না। সে বলল, "ডরোথি, উনি বলছেন সে সময় ওই মূর্তির দাম ছিল তোমাদের টাকায় এক হাজার পাউন্ড।"

"এ-কথা উনি জানলেন কী করে ?"

অর্জুন তারিণী সেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তখন একশো টাকার লোভ ছেড়েছিলেন প্রাণের ভয়ে। এখন তো সেই ভয় নেই!"

তারিণী সেন এবার নীরবে মাথা নাড়লেন। সেটা দেখিয়ে অর্জুন বলল, "উনি রাজি হচ্ছেন না। সেই সময় হাজার পাউন্ড দাম উঠলে এখন তো কোটি টাকা হবে ডরোথি। তুমি মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় সেটা পাওয়ার আশা করতে পারো না।"

"এটা ওঁর কথা, না তুমি আমাকে বলছ ?"

"আমিই বলছি।"

"দ্যাখো অর্জুন, আমি আশা করছি তুমি আমাকে সহযোগিতা করবে। ওই মূর্তির জন্যে আমি অনেক খরচ করেছি। তুমি ভেবো না আমি তোমাকে বঞ্চিত করব। তুমি তোমার কমিশন পাবে। এখন ওঁকে বলো পঁচিশ হাজার টাকা আমি দেব। এরকম ভিখিরির মতো অবস্থায় পঁচিশ হাজার পেলে এরা বর্তে যাবেন।"

দ্বিতীয়া জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলছে ?"

অর্জুন জবাব দিল, "পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারে।"

দ্বিতীয়া স্বামীকে বললেন, "অনেক কষ্ট করেছি। আর না। কোথায় রেখেছেন ওই মূর্তিটাকে ? আপনি আমাকে কখনও বলেননি, দিদিকে বলেছেন ?"

পেছনে দাঁড়ানো প্রথমা মাথা নেড়ে না বললেন নীরবে।

দ্বিতীয়া এখন রুখে দাঁড়িয়েছেন, "তা হলে দেখুন কী রকম মানুষ আপনি! এই বয়সেও গতর খাটিয়ে খাচ্ছি আর আপনি গুপ্তধন মাটিতে পুঁতে বসে আছেন। ফট করে মরে গেলে আমরা জানতেই পারব না ওটার কথা। আমাদের একটু ভাল থাকতে আপনি দেবেন না ?"

বৃদ্ধ মাথা নিচু করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কালোর মধ্যে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভাল। চিতায় পা দিয়ে বসে আছি, এখন টাকা নিয়ে কী করব ? অ্যাঁ ?"

অর্জুন কথাটা অনুবাদ করে ডরোথিকে শোনাতেই ডরোথি ব্যাগ খুলে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে দ্বিতীয়া বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে গেল, "প্লিজ, ওকে রাজি করাও।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধা ইংরেজি বুঝতে না পারলেও বেশ অনুমান করলেন ডরোথি কী বলতে চাইছে। কাঁপা হাতে টাকাগুলো নিয়ে তিনি স্বামীর কাছে ছুটে গেলেন, "এই দ্যাখো টাকা, আগাম দিয়েছে। বলো, কোথায় রেখেছ মূর্তিটাকে ?"

তারিণী সেন মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "ভুলে গেছি।"

"মিথ্যে কথা! তুমি ভুলে যাওয়ার লোক নও। ওই হেঁয়ালিটা প্রায়ই শোনাও। তোমাকে বলতেই হবে কোথায় রেখেছ।"

"বললাম তো, ভুলে গেছি।"

"আবার মিথ্যে কথা! রাজ্যের গল্প তোমার মনে আছে আর এটা ভুলে গেছ ?"

অর্জুন উঠল। সে দেখল ইতিমধ্যে উঠোনে ভিড় জমে গেছে। গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। তারিণী সেনের কাছে একটা মূর্তি আছে যার দাম অনেক। পঁচিশ হাজার দাম দিচ্ছে মেমসাহেব। এত টাকা পাওয়া যেতে পারে, এই গ্রামের মানুষ ভাবতেই পারে না! তারিণী সেনের সৌভাগ্যে তাদের মনে ঈর্ষা বাড়ছে। অর্জুন বলল, "আপনি চিন্তা করে দেখুন। আমরা নাহয় কাল আসব।"

তারিণী সেন মাথা নাড়লেন নিঃশব্দে। অর্জুনের মনে হচ্ছিল, বৃদ্ধ পুরো ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছেন। কিন্তু ওঁর ওপর যে অর্থনৈতিক চাপ, তাতে এখন মূর্তির হদিশ বলে না দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। ওরা মন্দিরের সামনে ফিরে এল। ইতিমধ্যে জনতার আকার বেড়ে গেছে। একজন এগিয়ে এসে বলল, "আমার কাছে ছোট-ছোট কিছু মূর্তি আছে। কিনবেন ?"

ডরোথি জানতে চাইলে অর্জুন অনুবাদ করে শুনিয়ে দিল।

"কী ধরনের মূর্তি ?"

"পাথরের। আসুন না!"

অর্জুন তাকে বোঝাল, "না ভাই। উনি বিশেষ একটা মূর্তির জন্যে এসেছেন, যে-কোনও মূর্তি কেনার বাসনা ওঁর নেই।" কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা। মূর্তি সে দেখাবেই। অর্জুনরা যাচ্ছে না দেখে সে একজনকে দিয়ে বাড়ি থেকে আনিয়ে নিল মূর্তিটা। অর্জুন দেখল চার ইঞ্চিটাক একটি মানুষের অবয়ব পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। ডরোথি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে বলল, "এর জন্যে আমি বড়জোর পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি।"

লোকটি ছোঁ মেরে ফিরিয়ে নিল, "মামার বাড়ি ! না দেখা মূর্তির জন্যে পঁচিশ হাজার, আর আমার জিনিস দেখে মাত্র পঞ্চাশ ?"

ডরোথি কিনবে না, আর লোকটি বিক্রি করবেই। এই সময় ডাক্তারবাবু এসে উদ্ধার করলেন ওদের। একটু ফাঁকায় সরিয়ে নিয়ে বললেন, "কী শুনছি মশাই ! পঁচিশ হাজার... ।"

"ঠিকই শুনেছেন। তারিণীবাবুর মাথা এখনও ঠিক কী করে আছে জানি না !"

"দিয়ে দিক। বাকি ক'টা দিন খেয়ে-পরে বাঁচবে তা হলে !"

"আপনি এ-কথা বলছেন ?"

"দেখুন, আমরা বাধা দিলে ওঁর তো কোনও উপকার হবে না ! মূর্তি উদ্ধার হলে সরকার নিয়ে নেবে। হয়তো একটা নামমাত্র মূল্য দিতে পারে। তাও সেই টাকা উনি জীবিত অবস্থায় পাবেন কি না সন্দেহ। তার চেয়ে দিয়েই দিক।"

"কিন্তু আমাদের দেশের কোনও অমূল্য সম্পদ বিদেশে চলে যাবে ?"

"এখন যে ওটা দেশে আছে তা আপনি কি জানেন ? এতকাল যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেখানেই তো চিরকাল থেকে যেতে পারত, ওই মেমসাহেব না এলে !"

অর্জুন মন্দিরটার দিকে তাকাল। ডাক্তারবাবু যা বলছেন তাতে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা লুকোচুরি আছে। এইটে কিছুতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অর্জুন অন্যমনস্ক হয়ে মন্দিরটাকে দেখছিল। ডাক্তারবাবু এখন ডরোথির সঙ্গে কথা বলছেন। বিকেল ঘন হয়ে এসেছে। পদ্মদিঘির পানায় এখন ঘন ছায়া। চোখ তুলতেই লাল মন্দিরটা নজরে এল। ছোটখাটো মন্দির। সে ধীরে-ধীরে মন্দিরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেই গাইড হতে-চাওয়া লোকটি এসে বলল, "এখন এই লাল মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। বেশিদিনের পুরনো না।"

"মন্দিরটার রং লাল কেন ?"

"জানি না বাবু। এটার কথা কেউ ভাবে না। আমাদের বড় মন্দিরই আসল মন্দির।"

অর্জুন উঁকি মেরে শিবলিঙ্গ দেখতে পেল। কালো পাথরের গায়ে কেউ সাদা দাগ এঁকে রেখেছে মাহাত্ম্য বাড়াতে। সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে পুজো হয় না ?"

"জল-বেলপাতা পড়ে। তবে শিবরাত্রির দিন ঘটা করে হয়।"

সন্ধে হয়ে আসছিল। অর্জুন ডরোথিকে নিয়ে বাইকে উঠল। মিনিট কুড়ির মধ্যে ওরা তিস্তা ব্রিজে পৌঁছে গেল। চমৎকার সূর্যাস্ত হয়ে চলেছে তিস্তার বুকে। বাইক থামিয়ে ওরা রেলিঙের ধারে চলে এল। তিস্তায় এখন শীর্ণ

জলের ধারা। আকাশে নানা রঙের মাখামাখি চলছে।

হঠাৎ ডরোথি বলল, "আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে না বলে উপায় ছিল না!"

অর্জুন হাসল, কিন্তু কিছু বলল না।

ডরোথি বলল, "আমি মূর্তি নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছি এটা তোমাদের সরকার মেনে নেবে না তা এর আগের বার দিল্লিতে এসে জেনেছিলাম। অতএব এই কথাটা আমি প্রকাশ্যে বলতে পারব না। তোমাকেও বলিনি।"

"মূর্তিটার কথা তোমার দাদু ডায়েরিতে লিখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তারিণী সেন ছাড়া ওই দু'জন বিপ্লবীর নামও ছিল ডায়েরিতে। দাদুর ধারণা ছিল তারিণী সেনের সঙ্গে কমলাকান্ত রায়ের যোগাযোগ আছে। মূর্তিটা কমলাকান্ত রায়কে লোকটা দিয়ে দিতে পারে। পরে বুঝেছিলাম, ভাবনাটা ভুল।"

"ভুল কেন ?"

"ওঁর কাছে খবর এসেছিল কমলকান্ত রায় মূর্তিটার কথা জানেনই না।"

"বেশ। এ-দেশে একটি মূর্তির কথা তোমার দাদু জেনেছিলেন। মূর্তিটা তাঁরও নয়। তবু এত বছর পরে সেটা পাওয়ার জন্যে তুমি মরিয়া হলে কেন?"

"আমি বাধ্য হয়েছি।"

"তার মানে?"

"আট মাস আগে আমার বাড়িতে হামলা হয়েছিল। আমরা তখন বাড়িতে ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে কিছু খোঁজা হয়েছে। পুলিশকে জানিয়েছিলাম। তারাও কোনও হদিশ করতে পারল না। এরপর ফোন পেলাম। তখনই জানলাম মূর্তিটার কথা। তার আগে আমি কখনও দাদুর ডায়েরি পড়িনি, ইচ্ছেও হয়নি।"

"কার ফোন পেয়েছিলে?"

"লোকটা তিব্বতি। যে তিব্বতিদের ওপর তারিণী সেন ডাকাতি করেছিল, ও তাদের বংশধর। শুধু ও না, তিব্বতীদের একটা সংগঠন ওই মূর্তি ফেরত চায়। ওদের ধারণা, আমার দাদু ওটা ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছেন। আমি ব্যাপারটা জানি না বললে ওরা বিশ্বাস করেনি। আমার ওপর সমানে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের কাছে গেলে ওরা আরও মারাত্মক হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ওরা আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া আরম্ভ করল। আমি ওদের দাদুর লেখা ডায়েরি দেখালাম। ওরা সেই সময়ের একটা খবরের কাগজ এনে আমাকে দেখাল, যাতে দাদুর ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে। দাদু বলেছেন এক হাজার পাউন্ড পেলে মূর্তিটা তিনি বিক্রি করতে রাজি আছেন। কাগজটি অবাক হয়ে লিখেছিল, মিস্টার রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড কী এমন জিনিসের মালিক হয়েছেন

জানা নেই, তবে এক হাজার পাউন্ড মূল্য জিনিসটিকে আরও মূল্যবান করে দিয়েছে। তিব্বতিরা বলল, "ওই কাগজের ইন্টারভিউ প্রমাণ করছে দাদু মূর্তিটা পেয়ে গিয়েছিলেন। আমি ফাঁপরে পড়ি। আমার পূর্বপুরুষের দায় মেটানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। গত বার দিল্লিতে এসে খোঁজখবর নিলাম। ওদের একজন লোক আমাকে সাহায্য করল। ওরা চাইছে আমি সব করি, কারণ মূর্তিটা যে আমার কাছে নেই, সেটা আমাকেই প্রমাণ করতে হবে।"

"তার মানে তারিণী সেন মূর্তিটা দিয়ে দিলে তুমি তিব্বতিদের সেটা ফিরিয়ে দেবে?"

"হ্যাঁ। ঠিক তাই।"

"গতরাত্রে তুমি যাদের সঙ্গে গ্রামে যেতে চেয়েছিলে, তারা কে?"

ডরোথি একটু অবাক হল! কিন্তু সেটা সহজেই কাটিয়ে উঠে বলল, "ওদের একজনের বাবা তিব্বতি মা ব্রিটিশ। আর-একজন বাঙালি। বাঙালি লোকটি শিলিগুড়িতে থাকে, আর প্রথমজন আমার সঙ্গে এসেছে। এয়ারপোর্টে তুমি বুঝতে পারোনি।"

"অমল সোমের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। ওই তিব্বতিরাই আলাপ করিয়ে দেয়। একজন বিদেশির পক্ষে এত বছর পরে তারিণী সেনকে খুঁজে বের করা মুশকিল। আমরা পুলিশকেও জানাতে চাইনি। এই শহরে তুমি প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরি করো। তোমাকে মিস্টার সোম অনুরোধ করলে তুমি কিছুতেই না বলবে না, এটা ওরা জেনেছিল।"

"অর্থাৎ আমার সব কিছুই তুমি জানো?"

"কিছুটা। তাই তোমার সঙ্গে অভিনয় করতে হচ্ছে।"

"এখন তো তারিণী সেনকে পেয়ে গেছ। তিব্বতিদের বলছ না কেন ওর কাছে গিয়ে মূর্তিটা নিয়ে নিতে। তারিণী সেন তো স্বীকার করেছে ওর কাছেই আছে।"

"ওরা তাই করবে। কিন্তু আমি চাইনি, ওরা তারিণী সেনের ওপর অত্যাচার করুক। মানুষটি কী গরিব! আমার দাদু ওর ওপর যে অত্যাচার করেছেন, তা নিজের চোখেই দেখেছি। আমার মনে হয়েছে অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা দিলে ও যদি ভালভাবে থাকে তাহলে দাদুর পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।"

"মূর্তিটার জন্যে তিব্বতীরা এত বছর পরে সক্রিয় হল কেন?"

"ওরা নাকি দীর্ঘদিন ধরে সন্ধান চালিয়েছে। ওই মূর্তি ওদের সৌভাগ্যের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত ওরা আমার দাদুর দেওয়া ইন্টারভিউ পড়ে আমার কাছে আসে।"

অর্জুন চুপচাপ শুনল। ডরোথির কথা বিশ্বাস করবে কিনা সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। সে চুপচাপ বাইক চালিয়ে ডরোথিকে তিস্তা ভবনে পৌঁছে দিল।

বাইক থেকে নেমে ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিছু বললে না ?"

"না। আমার মনে হয় তুমি আগামীকাল বন্ধুদের সঙ্গে ফিরে যেতে পারো। সেক্ষেত্রে আমার সাহায্য আর দরকার হবে না। আজ রাত্রেই তো তোমার বন্ধুরা জেনে যাবে, তারিণী সেনের কাছে মূর্তিটা আছে। কিন্তু লোকটার যদি কোনও ক্ষতি হয়, তা হলে আমি চুপ করে বসে থাকব না।" ডরোথি কোনও জবাব দিল না। অর্জুন ওকে চুপচাপ দাঁড় করিয়ে রেখে বাইকে স্পিড তুলল।

থানায় পৌঁছে দেখল অবনীবাবু জিপে উঠতে যাচ্ছেন। ওকে দেখে বললেন, "ফিরে এলেন ? ঠিক বিকেলবেলায় মিনিস্টার এসে হাজির। ইচ্ছে থাকলেও বেরোতে পারলাম না!"

"মিনিস্টার আছেন না গেছেন ?"

"আছেন। সার্কিট হাউসে। কিন্তু এখন আমি ফ্রি।"

"আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

ভেতরে ঢুকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল অর্জুন। ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, "অসম্ভব! জিনিসটা যে তিব্বতিদের, তা ওদের প্রমাণ দিতে হবে। দেশের আইন মেনে ওদের আবেদন করতে হবে, যদি ওটা ধর্মীয় মূর্তি হয়। এভাবে নিয়ে যেতে পারে না এবং দেব না।"

"দেবেন না ঠিক, কিন্তু আপনার কাছে থাকলে তো ওই প্রশ্ন উঠছে।"

"তারিণী সেন তা পঁচিশ হাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে ?"

"এখনও রাজি হয়নি।"

"তা হলে ওঁকে গিয়ে বলা যাক মূর্তিটার হদিশ দিতে।"

"যে-মানুষ টাকার বিনিময়ে খবর দেয়নি, সে পুলিশের ধমকে দেবে—এটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

"আশ্চর্য! আরে, হাজার হোক জিনিসটা তো ডাকাতি করে পাওয়া। ডাকাতির জিনিস তো ইল্‌লিগ্যাল জিনিস। সেটা লুকিয়ে রাখা তো অবৈধ ব্যাপার। এটা বুঝিয়ে বলব।"

"পঞ্চাশ বছর লুকিয়ে রাখলে সেটা আর অবৈধ কতখানি থাকে তা জানি না। এদেশ থেকে কয়েক শো বছর আগে হিরে-মানিক ডাকাতি করে বিদেশিরা নিয়ে গিয়েছিল। তার একটাও ফেরত পেয়েছি কি আমরা ? ওভাবে হবে না। আমার খুব ভয় হচ্ছে তারিণী সেন রাজি না হলে ওরা ওঁর ওপর অত্যাচার করবেই। এত দূরে যারা এত বছর পরে আসতে পারে, তারা কিছুতেই হার মানবে না। ওঁকে প্রোটেক্ট করা উচিত।"

"ঠিক আছে, আমি ময়নাগুড়ি থানাকে অনুরোধ করছি যাতে ওঁর বাড়ির সামনে পুলিশ পাহারা দেয়। এস.পি সাহেবের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।" অবনীবাবু ফোন তুললেন।

॥ সাত ॥

সত্যি, এখন কিছু করার নেই। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল অর্জুন। বৃদ্ধ তারিণী সেনের ইচ্ছের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। তিনি যদি ওদের দিতে চান, তা হলে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে। মূর্তিসমেত ওদের ধরে ফেললে বিচারের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু যদি না দেন, তা হলে হাজার চাপ দিয়েও পুলিশ বৃদ্ধের কাছ থেকে খবর বের করতে পারবে না।

আজ রাত্রে তিব্বতি ভদ্রলোক ডরোথির কাছে সব শুনবে। ওরা মূর্তির জন্য এসেছে, তা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ওরা আরও সতর্ক হবে। ওরা নিশ্চয়ই জানে, পুলিশ ওদের কাছে মূর্তি পেলে ছাড়বে না। মূর্তি না পাওয়া পর্যন্ত ওদের কিছু করার ক্ষমতা পুলিশের নেই। এক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা মূর্তি নিয়ে সরে পড়তে চাইবে। এবং সেটা আজ রাত্রেই।

ময়নাগুড়ি থানা থেকে পুলিশ নিশ্চয়ই এর মধ্যে পূর্বদহে পৌঁছে গিয়েছে। পুলিশ থাকতে ওরা কী করে তারিণী সেনের কাছে পৌঁছবে ? অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না। এই সময় মা ঘরে ঢুকলেন, "কিরে ঘুমোসনি ? সারাদিন কোথায় টো-টো করে ঘুরিস ?"

অর্জুন উঠে বসল, "আচ্ছা মা, একটা ধাঁধা শোনো। কালোর মধ্যে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভালো। মানে কিছু বুঝলে ?"

মা একটু ভাবলেন, "এ কী রকম দেবতা রে ?"

"দেবতা বলে মনে হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ। নমো করার কথা বলছে তো। নমো করা ভালো। তার মানে কেউ-কেউ নমো করে না তাই করতে বলছে।"

"কেউ-কেউ করে না, তাই করতে বলছে ?" অর্জুন লাফিয়ে উঠল। মাকে জড়িয়ে ধরে সে চেঁচাল, "ইউরেকা ! পেয়ে গেছি !" আর তখনই টেলিফোন বাজল।

দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলল অর্জুন, "হ্যালো !"

"এত রাত্রে বিরক্ত করলাম। দুঃখিত।" অবনীবাবুর গলা, "একটা খারাপ খবর আছে।"

"বলুন।"

"তারিণী সেন হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"আপনি কোত্থেকে খবর পেলেন ?"

"এইমাত্র ময়নাগুড়ির পুলিশ জানাল। ওরা গ্রামে যাওয়ার পর ঘটনাটা ঘটে।"

"কোন হাসপাতালে আছেন ?"

"সম্ভবত ময়নাগুড়ির হাসপাতালে।"

"খোঁজ নিন। হাসপাতালে যেন পাহারা থাকে।"

"আমি এস পি সাহেবকে বলেছি। উনিও ময়নাগুড়িকে নির্দেশ দিয়েছেন।"

"ভাল। অবনীবাবু, আমি এখনই বের হচ্ছি। আপনি যাবেন ?"

একটু দ্বিধা করলেন অবনীবাবু। তারপর বললেন, "চলুন।"

ময়নাগুড়ির হাসপাতালে ওরা যখন পৌঁছল, তখন রাত বারোটা। অবনীবাবুর জিপেই এসেছে অর্জুন। হাসপাতালে পৌঁছে ওরা অবাক। তারিণী সেনকে ওই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়নি। সঙ্গে-সঙ্গে থানায় যাওয়া হল। ও সি ছিলেন না। একজন এস আই বললেন, সন্ধের পর যে দু'জন পুলিশকে পূর্বদহে পাঠানো হয়েছিল, তারাই ফিরে এসে খবর দিয়েছে ওঁর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা। সেই পুলিশ কনস্টেবলদের সঙ্গে কথা বলতে চাইল অর্জুন। দু'জনেই থানায় ছিলেন। প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বললেন, হুচলুডাঙা থেকে পূর্বদহে যাওয়ার পথে ওঁরা একটা গাড়ি দেখতে পান। কৌতূহলবশে গাড়িটি থামাতেই কয়েকজন মানুষ বলে ওঠে, পেশেন্ট আছে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। গাড়িতে একজন বৃদ্ধের পাশে মহিলাও ছিলেন। তারপর তাঁরা পূর্বদহে পৌঁছে শুনতে পান, তারিণী সেন বিকেলবেলায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার তাঁকে ইঞ্জেকশন দেন। কিন্তু অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এই সময় একটা গাড়ি হঠাৎই গ্রামে আসে। সেই গাড়িতে করে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

অর্জুন গম্ভীরমুখে বলল, "দোষ আমার। গাড়িটা কি কালো অ্যাম্বাসাডার ?"

"হ্যাঁ সার।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "জলপাইগুড়ির হাসপাতালে খবর নেব ?"

"নিন। কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না।"

টেলিফোনে যোগাযোগ করা হল। থানার টেলিফোন বলে লাইন পেতে অপেক্ষা করতে হল না। জলপাইগুড়ির হাসপাতাল জানাল, তারিণী সেন নামের কোনও বৃদ্ধকে আজ বিকেলের পর ওখানে ভর্তি করা হয়নি। অর্জুন বলল, "চটপট পূর্বদহে চলুন। দেরি করলে দু'-কূলই যাবে।"

জিপে উঠতে-উঠতে অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দু'-কূলই মানে ?"

"তারিণী সেনের জীবন এবং মূর্তি।"

পূর্বদহে তখন কোনও প্রাণী জেগে নেই। এমন কি গ্রামের কুকুরগুলোও গলা খুলছে না। অর্জুন সোজা ডাক্তারবাবুর দরজায় হাজির হল মন্দিরের সামনে গাড়ি রেখে। খানিকটা ডাকাডাকির পর ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন

ঘুম-চোখে। অর্জুন অবনীবাবুর পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি চলে যাওয়ার পর তারিণীবাবুর কী হয়েছিল ?"

"উত্তেজনা। আর তা থেকে বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক বলব না, তবে যে কোনও মুহূর্তে হতে পারত। হয়নি যে তা বলব না, কারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর আমি কোনও খবর পাইনি।" ভদ্রলোক ধাতস্থ হচ্ছিলেন।

"আপনি ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"যারা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল তাদের আপনি চিনতেন ?"

"ওই যারা সকালে এসে টাকা দিয়ে গিয়েছিল, তারাই ফিরে এসেছিল।"

"আপনি জানতেন ওরা কী উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করছে। জানতেন না ?"

ডাক্তার বললেন, "দেখুন মশাই, আমি চাইব পেশেন্টের প্রাণ বাঁচুক। ওরা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইল, তখন দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই এই গ্রাম থেকে বৃদ্ধ মানুষটাকে নিয়ে যাওয়ার, মনে হয়েছিল ভগবানই ওদের পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া আমি তারিণীবাবুর গার্জেন নই যে, ঠিক করব কার সঙ্গে যাবে বা না যাবে। মৃত্যুপথযাত্রীর কোনও পছন্দ থাকে না।"

"ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি।"

"সে কী !"

"অন্তত ময়নাগুড়ি বা জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ওরা যায়নি। দ্রুত চিকিৎসার জন্যে এ-দুটো জায়গায় নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। সঙ্গে কে গেছেন ?"

"ওঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী।"

"প্রথমজন কোথায় ?"

"বোধ হয় বাড়িতেই আছেন।"

অর্জুন ওঁদের নিয়ে মন্দিরের সামনে এসে চারপাশে তাকাল। তারপর অবনীবাবুকে বলল, "আপনি জিপটাকে এমনভাবে সরিয়ে রাখুন যাতে এখানে এসে কেউ দেখতে না পায়।"

"কেন ?"

"যারা তারিণী সেনকে নিয়ে গেছে তাদের মনে হচ্ছে, আজই আবার এখানে আসতে হবে।"

অবনীবাবু যখন জিপটাকে আড়ালে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অর্জুন ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ওরা কেন ফিরে এসেছিল সে-ব্যাপারে কিছু বলেছে ?"

"হ্যাঁ। শিলিগুড়িতে ফিরে যাওয়ার আগে ওরা দেখে নিতে চায় উনি কেমন আছেন ? আমরা তখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। এখন... আচ্ছা, শিলিগুড়িতে

নিয়ে যায়নি তো ?"

"জানি না। ওরা তাই বলেছে ?"

"না। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল যে দোমহনিতে যাওয়ার কোনও শর্টকাট রাস্তা আছে কি না।"

অর্জুন অবাক হল, "দোমহনি ?"

"হ্যাঁ।"

তা হলে কি ভুল হল! রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড প্রায়ই তিস্তা পেরিয়ে দোমহনিতে আসতেন। কমলাকান্ত রায়কে ওখানেই অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। ওখান থেকেই তারিণী সেন তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বার্নিশে। তারিণী সেনের হাতকাটা হয়েছিল দোমহনির লালকুঠিতে। সেখানকার খোঁজ নিয়েছে যখন, তখন...। অর্জুন বুঝতে পারছিল না। লালকুঠির রং নিশ্চয়ই লাল। ওই হেঁয়ালির ছড়া কি সেই লালকুঠিকে কেন্দ্র করে ? ওখানেই কি মূর্তিটা রাখা আছে ? এ কি সম্ভব হবে! তারিণী সেনের মতো মানুষ, যিনি ভাল করে হাঁটতে পারেন না, তিনি কাছাকাছি না রেখে অত দূরে লুকিয়ে রাখবেন ? সে ধীরে-ধীরে লাল মন্দিরটার দিকে এগিয়ে যেতে অবনীবাবু তার সঙ্গ নিলেন। এখন আকাশে হাজার তারার ফিকে আলো। পৃথিবীতে অন্ধকার থাকলেও সেই আলোয় খানিকটা দৃষ্টি যায়। ছোট মন্দিরটাকে ঘুরে দেখল অর্জুন। কালোর মধ্যে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভালো। লালের মধ্যে কালো দেখা যাচ্ছে, লাল মন্দিরের ভেতরে কালো শিবলিঙ্গ। কিন্তু কালোর মধ্যে লাল কোথায় ? অবনীবাবু টর্চ জ্বেলে চারপাশে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খুঁজছেন ?"

"ছড়াটা মনে আছে ? কালোর ম... লাল... ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখানে কালো কোথায় ?"

"কিন্তু লালের মধ্যে কালো আছে। ওই শিবলিঙ্গ। টর্চটা দিন তো।" সে জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকল। দেওয়ালে আলো ফেলতেই দেখতে পেল ঠিক মাঝখান-বরাবর একটা মোটা কালো দাগ চারপাশে আঁকা রয়েছে। এরকম দৃশ্য অভিনব। ভেতরে একমাত্র শিবলিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই। সে লিঙ্গের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। কিছু শুকনো ফুলপাতা ছড়ানো রয়েছে। সেগুলোকে সরিয়ে মূর্তির পূর্ণ অবয়ব দেখল। মন্দিরের মেঝে ভেদ করে যেন উঠে এসেছে। অন্তত দশ ইঞ্চি মোটা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল অর্জুন। কালো শিবলিঙ্গের ঠিক নীচের দিকটায় যেন জোড়ের দাগ। জায়গাটায় রঙ করে দেওয়া হয়েছিল কি!' সে একটা শক্ত কাঠি তুলে ঘষতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সেখানে জোড়ের দাগ স্পষ্ট হল। এই ব্যাপারটা হয়তো অধার্মিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

এই সময় ডাক্তারবাবুর গলা কানে এল, "এটা আপনি কী করছেন ?"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। দেবমূর্তিকে নষ্ট করার কোনও বাসনা তার নেই। তবু...। সে জিজ্ঞেস করল; "এই শিবলিঙ্গ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?"

"আমার জন্মের আগে।"

অর্জুন ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এল বাইরে, "গ্রামের মানুষ মন্দিরটাকে গুরুত্ব দেয় ?"

"শিবরাত্রির দিন অবশ্যই দেয়।"

"শিবরাত্রির দিন বটগাছের তলায় পড়ে-থাকা পাথরও তো গুরুত্ব পায়।"

"আপনি কী বলতে চাইছেন ?"

"শিবলিঙ্গের নিচের দিকে একটা জোড় দেখতে পেলাম। তার মানে ওখানে কোনও মেরামতি হয়েছে। মন্দিরের বাইরের রঙ লাল, ভেতরে কালো দাগ, কালো দাগের মধ্যে আবার কালো শিবলিঙ্গ, এমন তো হতে পারে তারিণী সেন ছড়া মেলাতে ইচ্ছে করে শব্দ দুটো উলটে দিয়েছেন। লালের মধ্যে কালো না বলে কালোর মধ্যে লাল বলেছেন। শিবলিঙ্গের যেখানটা মেরামতি হয়েছে সেখানে অল্প লাল রং মাখানো আছে। তা হলে অবশ্য কালোর মধ্যে লাল বলতে আপত্তি নেই।" অর্জুন জোরে-জোরেই কথাগুলো উচ্চারণ করছিল। তারপর সে অবনীবাবুকে বলল, "এই মন্দিরটাকে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা পুরাতত্ত্ব বিভাগকে জানাব। যা ব্যবস্থা করার, তারাই করবে।"

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে মূর্তিটা ওখানেই লুকোন আছে ?"

"আমি যদি নিঃসন্দেহ হতাম, তা হলে তো এখনই খুঁড়ে ফেলতাম। আপনি এক কাজ করুন। জিপ নিয়ে ময়নাগুড়ি চলে যান। ওখানে ফোর্স পাবেন। আজই দোমহনির লালকুঠিতে তল্লাশি চালান। মনে হয়, তারিণী সেনকে ওখানে পেয়ে যাবেন।"

"আপনি যাবেন না ?"

"আমি এখানে পাহারায় থাকতে চাই, যতক্ষণ না সকাল হয়।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারেন। এটা আমার গ্রামের মন্দির। আমি এখনই লোকজনকে ডাকছি...।"

"না। লোকজন ডাকলে চলবে না। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তা হলে ওরা এখানে আসবে। লোকজন দেখলে ওরা ধরা দেবে না।"

অবনীবাবু চলে গেলেন। ওঁর জিপের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু উসখুস করছিলেন। মন্দিরের চাতালে অর্জুন বসেছিল তাঁর পাশে। চারপাশ নিঃশব্দ, পাতলা অন্ধকারে মাখামাখি। ডাক্তারবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা অর্জুনবাবু, এসব করে আপনার কী লাভ হয় ? এই কেসে তো আপনার কোনও ক্লায়েন্ট নেই যে, টাকা দেবে !"

অর্জুন হাসল, "টাকার চেয়ে অনেক বেশি পাব, যদি দেশের জন্যে মূর্তিটা

বাঁচাতে পারি।"

"কিন্তু আপনারও তো টাকা দরকার।"

"তা তো অবশ্যই।"

"চলুন, শুয়ে পড়বেন। আমার ওখানে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ অর্জুন প্রশ্ন করল, "আপনাকে ওরা কত টাকা ফি দিয়েছে?"

লোকটি যেন হকচকিয়ে গেল, "মা-মানে?"

"আপনার সাহায্য ছাড়া ওরা তারিণী সেনকে নিয়ে যেতে পারত না।"

"হ্যাঁ। উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।"

"আমি বিশ্বাস করি না। আপনাকে আমি ওদের সম্পর্কে সচেতন করে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি টাকার লোভে সেটা শোনেননি।"

"আপনি কি মনে করছেন তারিণী সেনের ক্ষতি করতে চেয়েছি আমি?"

"না। ওরা আপনাকে বুঝিয়েছে যে, ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে রোগ সেরে যাবে, আর এটা আপনি টাকার বিনিময়ে বুঝেছেন। তাই তো?"

এবার ভদ্রলোকের গলার স্বর পালটাল, "বিশ্বাস করুন, আমি ভাবতে পারিনি ওরা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে না।"

"আপনি যান। শুয়ে পড়ুন।"

ডাক্তারবাবু মন্দিরটার দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে গেলেন।

রাত থাকতেই গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। অর্জুন একা বসে ছিল, এবার দৌড়ে একটা আড়ালে চলে গেল। ওরা যদি তারিণী সেনের কাছে খবর নিয়ে মূর্তির জন্য ফিরে আসে, তা হলে তার পক্ষে একা বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে কোনও অস্ত্রও নেই। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায়, গ্রামের লোকদের জাগানো।

না, কালো অ্যাম্বাসাডার নয়। একটা পুলিশ ভ্যান থামল মন্দিরের সামনে। অর্জুন বেরিয়ে আসতেই ময়নাগুড়ি থানার এস আইকে চিনতে পারল। সে জানতে পারল, থানায় খবর দিয়ে অবনীবাবু ও সি-কে নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন দোমহনির দিকে। ভদ্রলোককে কী করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে অর্জুন অনুরোধ করল তাকে ভ্যানে করে দোমহনিতে পৌঁছে দিতে।

দোমহনি এমন কোনও বড় জায়গা নয়। এক সময় বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথের স্টেশন ছিল। তখন একটা রেলওয়ের কারখানাও এখানে অনেককে অন্ন দিত। এখন ওসব নেই, দোমহনির দিন গিয়েছে। অর্জুন যখন পুলিশ ভ্যানে চেপে দোমহনিতে পৌঁছল, তখন অন্ধকার অনেক হালকা। কিছু-কিছু মানুষ এই সময় বিছানায় থাকতে পারে না, তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে ওরা লালকুঠিতে পৌঁছল। অনেকটা নির্জনে ব্রিটিশ আমলের

প্রায় পোড়ো বাড়িটির সামনে অবনীবাবুর জিপ দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন পুলিশ পাহারায়। তাদের কাছে জানা গেল, সাহেবরা ভেতরে গিয়েছেন।

সাহেব শব্দটার অর্থ এখন বদলে গেছে। উচ্চপদস্থ মানুষকে সম্মান জানানোর জন্য সাহেব বলা হচ্ছে। অর্জুনের এটা পছন্দ হয় না। কেমন একটা কমপ্লেক্স আছে.যেন শব্দটিতে। অর্জুন গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি ময়নাগুড়ির ও সি-র সঙ্গে বেরিয়ে আসছিলেন, "না, মশাই। এখানে কেউ নেই। সমস্ত বাড়ি খুঁজেছি। সব খালি। কিছু লোক এখানে রাত্রে শোয়, তারা বলল কয়েক বছরের মধ্যে কেউ এখানে আসেনি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। তাপপর বলল, "চলুন, জলপাইগুড়িতে ফিরে যাই।"

যাওয়ার আগে ময়নাগুড়ির ও সি-কে সে বিস্তারিত বলে গেল লাল মন্দিরটার সম্পর্কে। এস আই যে ওখানে পাহারায় আছেন তা যেন কখনওই তুলে নেওয়া না হয়।

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে থানার দিকে যেতে-যেতে ভোর হয়ে এল। অর্জুন বলল, "আমাদের একবার তিস্তা ভবনে যাওয়া উচিত।"

"কেন ?"

"অনেকক্ষণ ডরোথির খবর নেওয়া হয়নি।"

অবনীবাবু থানা পেরিয়ে গেলেন।

দূর থেকেই কালো অ্যাম্বাসাডারটাকে দেখতে পেল ওরা। তিস্তা ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক পেছনে জিপ দাঁড় করিয়ে অবনীবাবু রিভলভারটা বের করলেন। গাড়িতে কেউ নেই। ওরা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। চৌকিদারটার দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই নীচের লনে শব্দ হল। কয়েকজন যেন দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি নেমে এলেন অবনীবাবু। দুটো মানুষ ততক্ষণে গেটের কাছে পৌঁছে গেছে। গুলি করবেন কি না চিন্তা করার আগেই ওরা কালো অ্যাম্বাসাডারে উঠে বসল। অবনীবাবু ছুটে গেলেন চিৎকার করতে-করতে। গাড়িটি ততক্ষণে মুখ বদল করে ছুটে যাচ্ছে শহরের দিকে।

অবনীবাবু চিৎকার করলেন, "চলে আসুন। ওদের ধরবই।"

অর্জুন হাত নেড়ে না বলল। অবনীবাবু শুনলেন না। জিপ চালু করে অনুসরণ করলেন।

অর্জুন ওপরে উঠে এল। ডরোথির ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢুকে সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। তারিণী সেন তার বিছানায় শুয়ে আছেন। পায়ের কাছে ওঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। পাশের চেয়ারে বসে ডরোথি ওর দিকে তাকাল, "উনি ঘুমোচ্ছেন।"

"কেমন আছেন উনি ?"

"ভাল।"

"ওঁকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন ?"

"উনি নিজের ইচ্ছায় এসেছেন। আমি জোর করে আনিনি। ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো।"

"ওঁকে তোমরা হাসপাতালে ভর্তি করবে বলে নিয়ে এসেছ !"

"আমি তো কিছুই জানি না। আমি কোনও প্রমিস করে ওঁকে আনিনি। উনিই আমার সঙ্গে সস্ত্রীক দেখা করতে এসেছেন। জিজ্ঞেস করো।"

অর্জুনের মনে হল তারিণী সেনের দ্বিতীয়া স্ত্রীকে প্রশ্ন করলে ওই জবাবই পাওয়া যাবে। সে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সঙ্গীরা পালাল কেন ?"

"এর উত্তর ওরা দিতে পারবে। আমি নই।"

"মূর্তির সন্ধান পেয়েছ ?"

"নাঃ। এই বৃদ্ধ বড় শক্ত মানুষ। কিছুতেই ভাঙবেন না। আমি ওঁকে শেষ পর্যন্ত দু' লক্ষ টাকার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু উনি ওই একই কবিতা বলে যাচ্ছেন।"

অর্জুন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, "দু' লক্ষ টাকাতেও উনি বলতে রাজি নন ?"

বৃদ্ধা বিকৃত মুখ করে জবাব দিলেন, "মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে।"

এই সময় তারিণী সেন চোখ খুললেন। অর্জুনকে দেখে হাসলেন।

অর্জুন এগিয়ে এল, "মূর্তিটার হদিশ দিলেন না ?"

"যে পারো খুঁজে নাও।"

"আপনাকে এখানে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে ?"

তারিণী সেন ডরোথির দিকে তাকালেন, "ছেলেমানুষ !"

"টাকার লোভেও ওদের মূর্তিটা দিলেন না ?" অর্জুন বিছানার পাশে দাঁড়াল।

"হাত বাঁচাতে যখন দিইনি, তখন...।"

"কেন দিচ্ছেন না ?"

"আমি ছিলাম ডাকাত। কমলাবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর কাছে কিছু না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমিও তো কিছু করতে পারি। দেশের জন্যে।"

অর্জুন শিহরিত হল। তারপর বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল। বৃদ্ধ মাথা নাড়তে লাগলেন, "হল না, হল না।"

"তা হলে ?"

"কমলা খাও। বুদ্ধি খুলবে।"

ঠিক এই সময় অবনীবাবু ফিরে এলেন। লোক দুটো ধরা পড়েছে। তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডরোথির ব্যাপারে কী করা হবে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। ওদের কারও বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও অভিযোগ টিকবে না। মূর্তিটা পাওয়া না গেলে সেটাকে চুরি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

আনা যাবে না। অর্জুনের মতে ডরোথিকে তার দেশে চলে যেতে দেওয়া উচিত। মেয়েটা কখনওই জাত-অপরাধী নয়। অপরাধীরা নিজের অন্যায় আগেভাগে স্বীকার করে না। তারিণী সেনকে পূর্বদহে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে।

অবনীবাবু একা বৃদ্ধকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বলছেন লাল মন্দিরে মূর্তি নেই ?"

"কিছুই বলিনি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

"অনুগ্রহ করে বলুন না !"

"কমলার রঙ লাল। কমলা খেয়েছ কখনও ?" বৃদ্ধ হাসতে লাগলেন।

ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল চেক-আপের জন্য। ওঁর স্ত্রীও সঙ্গে গেলেন। ডরোথির পাসপোর্ট নিয়ে গেলেন অবনীবাবু। সে রইল তিস্তা ভবনেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে দুপুরের মধ্যে জানিয়ে দেবেন, ডরোথি ফিরে যেতে পারবে কি না !

সকালের রাস্তায় হাঁটছিল অর্জুন। বাবুপাড়ায় কমলাকান্ত রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে সে বৃদ্ধকে দেখতে পেল। ভদ্রলোক একটি শিশুকে নিয়ে পায়চারি করছেন। অর্জুন তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি বললেন, "আসুন। আপনার চেহারা অমন কেন ?"

অর্জুন হাসল, "রাত জাগতে হয়েছিল।"

"চা খাবেন ?"

"আপত্তি নেই।"

"আসুন। একটু অপেক্ষা করতে হবে। পুজো শেষ হলেই প্রসাদও নেবেন।"

"আপনার বাড়িতে রোজ পুজো হয় নাকি ?"

"হ্যাঁ। বাবা এটা চালু করেছেন। হরেক রকম দেবদেবী।"

"দেখা যাবে ?"

"নিশ্চয়ই।"

বৃদ্ধ ওকে ভেতরে নিয়ে এলেন। ঠাকুরঘরের সামনে এসে অবাক হল অর্জুন। দরজাটা কালো রঙ করা। ভেতরে একজন মহিলা পুজো করছেন। আসনে অনেক রকম ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণ চোখে পড়ল। পাশে একটি লালচে অদ্ভুত মূর্তি।

"ওটা কোন দেবতা ?"

"জানি না। বাবা এনেছিলেন। বলেছিলেন ভক্তিভরে পুজো করতে ; করা হচ্ছে।"

"কাছে যেতে পারি ?"

"যান।"

অর্জুন লালচে পাথরের মূর্তিটাকে দেখল। বুদ্ধের সঙ্গে মিল আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এই মূর্তি উনি কোথায় পেয়েছিলেন ?"

"তা তো জানি না। সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট সকালে ওটাকে বাড়িতে এনে বলেছিলেন, 'লোকটা আমাকে অবাক করে দিল। এই দিনে এমন উপহার, আশা করিনি ! যত্ন কোরো একে, আর সাবধানে রেখো।' বাবাকে প্রশ্ন করার সাহস আমাদের ছিল না, তাই করিওনি। আসুন। পুজো হয়ে গিয়েছে।"

আধঘণ্টা পরে অর্জুন করলা নদীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একা। তারিণী সেন ডাকাত ছিলেন, কিন্তু সারাজীবনে তাঁর অর্থাভাব মেটেনি। শেষ সময়েও কিন্তু টাকার কাছে নিজেকে বিক্রি করলেন না। কমলাকান্তবাবুর প্রতি তিনি দুর্বল ছিলেন। নিজে যা পারেননি, তার জন্য হয়তো আফসোস ছিল ; নইলে স্বাধীনতার দিনে ওই উপহার কেন কমলাকান্তকে দেবেন !

এমন মানুষ দ্রুত কমে যাচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে। বৃদ্ধের হাসিমুখ মনে পড়ল। ফিক করে হেসে বলেছিলেন, "কমলা খাও। বুদ্ধি বাড়বে।"

বাড়েনি। রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড যে বিনা কারণে তারিণী সেন আর কমলাকান্তকে এক ব্র্যাকেটে রাখেননি, এটা সে যেমন বুঝতে পারেনি, তেমনই ডরোথি বা তিব্বতিরাও পারেনি।

অতএব এই রহস্য ফাঁস করে কোনও লাভ নেই।



ফুলে বিষের গন্ধ

সাতসকালে হাবু এল।

অর্জুন তখন সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে, দরজায় দাঁড়িয়ে একগাল হাসল হাবু। কোনও কোনও মানুষ, দেখতে যত খারাপই হোক, হাসলে এক ধরনের সুন্দর হয়ে ওঠে, হাবুও সেইরকম। পাজামার ওপর হাওয়াই শার্ট সোয়েটারে ঢেকে এই সময় ওর এখানে আসাটা অনর্থক হতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে হাবু অমল সোমের বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে পা বাড়ায় না। অমলদা যে দীর্ঘকাল জলপাইগুড়ির বাড়ি ছেড়ে বাইরে আছেন, তা শুধু হাবুর ভরসায়। অথচ মানুষটি কথা বলতে পারে না, বলতে চেষ্টা করলে মুখে অদ্ভুত যন্ত্রণার সঙ্গে অস্পষ্ট শব্দ বের হয়। কিন্তু ওর বুদ্ধি খুব। অমলদার সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়া আছে।

"কী ব্যাপার হাবু ?" অর্জুন সোজা হয়ে বসল।

দুটো হাত শূন্যে কোনও ছবি আঁকল, পর পর দু'বার। অর্জুন অর্থটা বোঝার চেষ্টা করল। সে কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কোনও খবর আছে ?"

হাবু মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ।"

"অমলদার ?"

হাবু এবার দাঁত বের করে সম্মতি জানাল।

"অমলদার চিঠি এসেছে ?"

দ্রুত মাথা নেড়ে না বলে একটা হাত শূন্যে ঘুরিয়ে মেঝের দিকে নামাল। অর্জুন চমকে উঠল, "অমলদা ফিরে এসেছেন ?"

হাবু আবার দাঁত বের করে হেসে হাত নেড়ে অর্জুনকে ডাকল।

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অমলদা ফিরে এসেছেন এটা একটা দারুণ খবর। এই মানুষটির কল্যাণেই সে আজ পরিচিতি লাভ করেছে। তার সত্যানুসন্ধান অভিযান শুরুই হত না যদি অমল সোম তাকে উৎসাহিত না করতেন। জলপাইগুড়ি শহরের হাকিমপাড়ায় চুপচাপ বসে থাকা ওই বিপত্নীক

মানুষটির উপস্থিত বুদ্ধি এবং ক্ষমতা বড় শহরে গেলে শোরগোল ফেলে দিত অনায়াসেই। সমস্যায় পড়ে অনেকেই ওঁর কাছে আসত এবং সেগুলো অমলদা সমাধান করতেন অনায়াসে। কিন্তু হঠাৎই সংসার এবং স্থির জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা এসে যায় ওঁর। অর্জুন তখন ওঁর কাছে শিক্ষানবিশি করছিল। অমলদাকে পাশে না পেলে সে অথই জলে পড়বে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অমলদা তাকে যে সাহস জুগিয়েছিলেন, তারই ওপর নির্ভর করে ও সত্যানুসন্ধানের কাজ একাই করে যাচ্ছে।

মাকে অমলদার ফিরে আসার খবরটা দিয়ে অর্জুন তার লাল বাইকে উঠে বসল। হাবু পেছনে উঠে অর্জুনের কোমর এমন করে জড়িয়ে ধরল যে বসতে অসুবিধে হচ্ছিল। অর্জুন যত তাকে আলগা করে ধরতে বলে তত তার বাঁধন শক্ত হয়। অর্জুন বাইক থামিয়ে মাটিতে নেমে হাবুকে দেখাল, কোথায় ওকে ধরতে হবে। হঠাৎ একটা নীল মারুতি প্রচণ্ড জোরে ছুটে এসে ওদের প্রায় গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ভয়ের চোটে হাবু আছড়ে পড়ল বাইকটার ওপর। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় লাগাল গাড়িটাকে ধরতে। রাগে অন্ধ হয়ে দু' হাত মাথার ওপর তুলে চিৎকার করতে করতে ছুটে যাওয়া মানুষটিকে দেখে কষ্ট হল অর্জুনের। জলপাইগুড়ি শহরে এত বেপরোয়াভাবে কেউ গাড়ি চালায় না। চৌধুরী মেডিক্যালের রামদা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "উৎপাত।"

অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "চেনেন?"

রামদা বললেন, "আলাপ নেই। যা শুনছি, তাতে আলাপ করার আগ্রহও নেই। শিল্পসমিতি পাড়ার বরেন ঘোষালের ছোট ভাই। বোম্বে না কোথায় থাকে। এখানে এসে নিজেকে খুব তালেবর ভাবছে। হবে একদিন অ্যাকসিডেন্ট।"

হাবু দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। অর্জুন বাইক নিয়ে কাছে এসে ওকে পেছনে তুলল।

গেট খুলে হাবুই ঢুকল প্রথম। দুটো শালিক লতিয়ে ওঠা মটরশুঁটি গাছে ঠোকর দিচ্ছে। হারু শব্দ করে তেড়ে যেতে তারা উড়ল। মাটি থেকে একটা ঢেলা তুলে শূন্যে ছুঁড়ল হাবু। রাগে তার চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেছে। অর্জুনের মনে হল নীল মারুতির ওপর রাগটা হাবু এভাবেই মিটিয়ে নিল।

দরজা খোলাই ছিল। অমলদা ইজি-চেয়ারে বসে বাংলা কাগজ পড়ছিলেন। মুখ তুলে অর্জুনকে দেখে বললেন, "এসো।"

অমলদার চুলগুলো এখন একদম সাদা। ফরসা রোগা মানুষটিকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। অর্জুন খুব খুশি হয়ে জিজ্ঞেসা করল, "কখন এলেন?"

"এই তো! বসো। তারপর কাজকর্ম কীরকম চলছে?"

"মোটামুটি। ওঃ, কী ভাল লাগল আপনাকে দেখে! আপনি যে আবার ফিরে আসবেন, তা আমি ভাবতেও পারিনি।" কথাগুলো না বলে পারল না

অর্জুন।

"কেন ? তুমি কি ভেবেছিলে আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি ?" অমলদা হাসলেন।

অমলদার সঙ্গে কথা বলতে লাগল অর্জুন। ওর মনে হচ্ছিল, মানুষটি আবার আগের মতো সহজ হয়ে গেছেন। উধাও হওয়ার আগে ওঁর সঙ্গে কথা বলা আনন্দদায়ক ছিল না। পাঁচটা প্রশ্ন করলে হয়তো একটার জবাব পাওয়া যেত। কথা বলতে বলতে অর্জুন একটা আওয়াজ পাচ্ছিল। খুব গম্ভীর এবং রাগী আওয়াজ। একটানা, থামছে না। অর্জুনকে বারংবার মুখ ফেরাতে দেখে অমলদা বললেন, "ওটা নাক ডাকার শব্দ।"

"নাক ডাকা ? এত জোরে ?"

"রাত্রে বাড়ির গেট থেকেও শুনতে পাবে। যাও, দেখে এসো।"

এ বাড়িতে এতদিন হাবু একা ছিল। তা হলে অমলদার সঙ্গে কেউ এসেছে। ওরকম আওয়াজ হলে কারও চোখে ঘুম আসা খুব মুশকিল। অর্জুন উঠল। ভেতরের বারান্দায় পা দিতেই বুঝল আওয়াজ বের হচ্ছে পাশের ঘর থেকে, যার দরজা বন্ধ, কিন্তু বাগানের দিকের জানালা খোলা। অচেনা লোকের যতই নাক ডাকুক, ঘুম ভাঙিয়ে দরজা খোলানোর কোনও যুক্তি নেই। অর্জুন বাগানে নেমে পড়ল। দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে শরীর সামান্য তুলে জানালার শিক ধরে ভেতরে তাকাতেই হতভম্ব হয়ে গেল সে। তার গলা থেকে চিৎকার ছিটকে এল, "আরে ! কী আশ্চর্য !"

আওয়াজটা ঈষৎ কম হল। দাড়িগোঁফ ভর্তি বিশাল মুখখানা সামান্য নড়ল। তারপর আবার যা ছিল তাই হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল জঙ্গলের মধ্যে টাইফুন বয়ে যাচ্ছে। অর্জুন চিৎকার করে উঠল আবার "মেজর ! মেজর ?"

আচমকা শব্দাবলী থেমে গেল। চোখ দুটো পিটপিট করে উঠল। মুখটা এবার জানালার দিকে ফিরল, কিন্তু বোঝা গেল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না বিশাল চেহারার মানুষটি। ডান হাত হাতড়ে আবিষ্কার করলেন বালিশের পাশে রাখা চশমা। সেটি নাকে গলিয়েই অত বড় শরীরটা লাফিয়ে উঠল, "হের অর্জুন।"

সঙ্গে-সঙ্গে চওড়া হাতটা বেরিয়ে এল গরাদের ফাঁক দিয়ে। অর্জুন হাসতে হাসতে হাত মিলিয়ে বলে উঠল, "উঃ।"

সেটা গ্রাহ্য না করে মেজর বললেন, "উঃ। কতদিন পর তোমার দেখা পেলাম ইয়ংম্যান। উম্, একটু বড় দেখাচ্ছে, অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে এর মধ্যে ?"

"এর মধ্যে মানে ? কতদিন পর দেখা হল হিসেব করুন।"

"তা ঠিক। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ? বৃদ্ধ ?"

"নো। নট অ্যাট অল।"

"ঠিক। এই কথাটা আমি সবাইকে বলি। সুস্থ যদি থাকতে চাও তা হলে নিজেকে তরুণ ভাবো। আচ্ছা, ডুয়ার্সে কি জন্তুজানোয়ার খুব কমে গেছে ?"

একেবারে প্রসঙ্গের বাইরে প্রশ্ন শুনে অর্জুন বুঝল মেজর একই রকম রয়ে গেছেন। সে মাথা নাড়ল, "তেমন রিপোর্ট পড়িনি।"

"খোঁজ নাও। গতরাত্রে আমি মশারি টাঙাইনি অথচ কোনও মশা আমাকে কামড়ায়নি। মশারা কখনওই ভেজিটেরিয়ান হতে পারে না। তার মানে ওরা এখানে দুর্লভ।"

"মশাদের আপনি জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে ফেলেছেন?"

"হোয়াই নট? মশা রক্তপায়ী জীব এবং শুধু পান করেই থেমে থাকে না, ম্যালেরিয়ার জার্মস ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। একটা বাঘ তোমার রক্ত খাবে চেটে, চেটে কিন্তু তোমার শরীরে রোগ ঢোকাবে না। কারেক্ট?" সিরিয়াস মুখে বললেন মেজর।

শিক ধরে আধঝোলা হয়ে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল কিন্তু মেজরের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। বিছানায় বসে এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন যেন অর্জুনও সেই একই আরামে রয়েছে। সে বলল, "এবার আমি নামছি।"

"নামছ মানে?"

"আমি আধঝোলা হয়ে কথা বলছি।"

"অ্যাঁ? তাই নাকি! দ্যাটস ব্যাড। জানালা দিয়ে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে? তোমার উচিত ছিল দরজায় নক্ করে আমাকে ডাকা। না, অর্জুন, এটা তোমার কাছে আমি এক্সপেক্ট করিনি।"

অর্জুন মেনে নিল, "আমি দুঃখিত কিন্তু।"

"না। কোনও অজুহাত নয়। এখানকার বাঙালিদের অনেক গণ্ডগোল। তোমার খুব প্রিয় বন্ধুর বাড়িতেও তুমি হুট করে যেতে পারো না। টেলিফোনে বা অন্য কোনওভাবে তাকে জানাবে যাওয়ার কথা। তার তো অসুবিধে থাকতে পারে। হয়তো সে ওই সময় একা থাকতে চাইছে, তুমি গায়ে পড়ে ডিস্টার্ব করছ। নিজের প্রয়োজনটাই ভাবো অন্যের কথা চিন্তা করো না।" মেজর দাড়িতে হাত বোলালেন।

"আমি দুঃখিত মেজর।" অর্জুন নীচে নেমে পড়ল।

মেজরের এসব কথায় একটুও রেগে গেল না অর্জুন। উনি তো ভুল বলেননি। আমাদের আচার-আচরণে এমন অনেক গোলমাল আছে, যা নিয়ে আমরা ভাবিই না।

মেজরের সঙ্গে ওর আলাপ কালিম্পং-এ বিষ্টু সাহেবের বাড়িতে যাওয়ার সময়। বিষ্টু সাহেবের বোনের দেওর উনি। লোকটি প্রকৃতিপাগল। প্রকৃতির মধ্যে বিরল কিছু খুঁজে বেড়ান। পৃথিবীর সব অদ্ভুত জায়গায় দিনের পর দিন অভিযান করেছেন। সাহারায় এক দিশি কুকুরের মধ্যে মেক্সিকান রক্ত দেখতে পেয়েছিলেন। কালিম্পং-এর একটা পপি দেখিয়ে ওঁর আমেরিকান বন্ধুকে চমকে দিয়েছিলেন। মেজর এখন থাকেন আমেরিকায়। নিউ ইয়র্ক শহরের

ম্যানহাটানে ওঁর ফ্ল্যাটে অর্জুন থেকে এসেছে। অমল সোমের সঙ্গে নিশ্চয়ই বিষ্টু সাহেব ওঁর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন।

হাবু চা নিয়ে এল। অর্জুন একটু আগে বাড়িতে চা খেয়ে এলেও আবার কাপ তুলে জিজ্ঞেস করল, "এখন আপনি এখানে থাকবেন তো?"

"হাবুটার জন্যে এই বাড়িটা যখন বিক্রি করতে পারছি না, তখন মাঝে মাঝে এসে থাকতে হবে হে। ক'দিন থেকে মনে হচ্ছিল জলপাইগুড়ি জেলাটা ভাল করে দেখা হয়নি। মেজর আমেরিকায় বসে খবর পেয়েছেন জয়ন্তী অঞ্চলে এক ধরনের ফুল ফোটে, যার গন্ধে মানুষ কেন বড় প্রাণীও অজ্ঞান হয়ে যায়, উনি সেই ফুল দেখতে চান। আমি এখানে এতকাল থাকলাম অথচ জানতে পারিনি এ-কথা। তাই নিজের জেলাটা ঘুরে-টুরে দেখতে চাই। তোমার এখন কাজের চাপ কীরকম?"

"কোনও চাপ নেই।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"বাঃ! তা হলে এই জেলায় কোনও ক্রাইম হচ্ছে না?"

বলতে বলতে বাড়ির সামনে গাড়ির আওয়াজ এসে থেমে গেল। অমলদা বললেন, "জিপে করে কেউ এল বলে মনে হচ্ছে!"

অর্জুন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দেখল জিপ থেকে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ভট্টাচার্যসাহেব নামছেন। অর্জুনকে দেখে হাত নাড়লেন তিনি। এই মানুষটিকে একজন আই. পি. এস. বলে চট করে মনেই হয় না। বারান্দায় উঠে ভট্টাচার্যসাহেব বললেন, "গুড মর্নিং। মিস্টার সোমের সঙ্গে দেখা করা যাবে?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে উনি এসেছেন?"

"কলকাতা থেকে খবর এসেছে।

কথার মধ্যেই অমলদা বেরিয়ে এলেন। অর্জুন ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ভট্টাচার্যসাহেবের। ওঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসানো হল। বোঝা যাচ্ছিল এস. পি. অমল সোম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। কলকাতা থেকে হুকুম এসেছে ওঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। তিনি ধরে নিয়েছেন অমল সোম একজন কেউকেটা এবং সেই কারণেই সকাল সকাল চলে এসেছেন।

অমলদা হাসলেন, "সত্যি, সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপারই আলাদা। হয় ছাব্বিশ মাসে বছর, নয় ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা। না মিস্টার ভট্টাচার্য, আপাতত কোনও সাহায্য চাই না। তেমন দরকার হলে নিশ্চয়ই জানাব। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখানকার ডি. এফ. ও-কে আমার কথা জানিয়ে দেন, তা হলে খুশি হব।"

ভট্টাচার্যসাহেব বললেন, "অবশ্যই। কিন্তু আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে। আপনার মিশনটা কী?"

অমলদা বললেন, "একটা বিষাক্ত ফুল খুঁজতে চাই। যার গন্ধে মানুষ তিরিশ

সেকেন্ডের বেশি বাঁচতে পারে না। আপনি কি এরকম ফুলের কথা শুনেছেন ?"

ভট্টাচার্যসাহেব অবাক হয়ে বললেন, "না। এরকম ফুল জলপাইগুড়ি জেলায় আছে ? অদ্ভুত ব্যাপার ! যদি থাকে তা হলে তো মানুষ মারা যেত এবং আমি খবর পেতাম।"

"হয়তো মারা যাওয়ার পর লোকে কারণটা বুঝতে পারেনি।"

"ওই ফুলের খবর আপনি কী করে পেলেন ?"

"আমি পেয়েছি মেজরের কাছে। পৃথিবীর যাবতীয় রহস্যময় জিনিসের সন্ধান করাই ওঁর কাজ। হয়তো উনি যে খবরটা পেয়েছেন সেটা সত্যি নয়, কিন্তু অনুসন্ধান না করে তো সেটা জানা যাবে না।"

এই সময় চিৎকার শোনা গেল। চিৎকার না বলে গর্জন বলাই ভাল। অর্জুন দ্রুত উঠোনের বারান্দায় ছুটে গেল। সে দেখল মেজর ঊর্ধ্বমুখী হয়ে সমানে হাত নেড়ে অদ্ভুত সব শব্দ উচ্চারণ করছেন। উচ্চারণের ধরনে সেগুলো যে গালাগাল, তা অনুমান করা যায়। অর্জুন জিজ্ঞেস করতে আঙুল তুলে আমগাছের ডাল দেখালেন। সেখানে বসে একটা কাক মুখে টুথব্রাশ নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে মেজরকে দেখছে।

অর্জুন হেসে ফেলল, "ও কী করে টুথব্রাশ পেল ?"

"কাকটার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয়েছিল ওটার গায়ে মঙ্গোলিয়ান রক্ত আছে। দেখতে এলাম। ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে ব্রাশটা নিয়ে গেল !"

"ছোঁ মেরে ? কাকের তো এত সাহস হয় না ?"

"মঙ্গোলিয়ান কাক দেখেছ ! পাজির পাঝাড়া।"

"আপনি এতক্ষণ কি ওই ভাষায় গালাগাল দিচ্ছিলেন ?"

"গালাগাল কে বলল ? আমি আদর করে ডাকছিলাম।"

"আদর ? ওইভাবে ধমকানো কি আদর হতে পারে ?"

মেজর মাথা নাড়লেন হতাশায়, "তোমাকে নিয়ে পারা গেল না ! যে যা, তার বাইরে কিছু ভাবতে পারো না ? তুমি যদি বোলপুরের স্টেশন মাস্টার হতে আর রবীন্দ্রনাথ যদি সেখানে দাড়ি কামিয়ে ট্রেন থেকে নামতেন, তা হলে তো তাঁকে চিনতেও পারতে না !"

॥ দুই ॥

কথাটা বেশ নাড়া দিল অর্জুনকে। সত্যি তো, বেশি বয়সের রবীন্দ্রনাথকে দাড়ি-কামানো অবস্থায় দেখলে কি চেনা যেত ? বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মাথায় হঠাৎ চুল গজিয়ে গেলে অথবা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মাথায় ইয়া বড়া টাক গজালে এবং মুখে দাঁড়ি না থাকলে কী কাণ্ডই না হত ! অনেক দিন ধরে

কোনও মানুষকে যেভাবে আমরা দেখে এসেছি, তার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলে হিসেব পাল্টে যায়। গোয়েন্দারা যে ছদ্মবেশ ধরেন তা অপরাধীকে ভুল ভাবানোর জন্য, কিন্তু সেটা শুধুই ছদ্মবেশ। কিন্তু কারও চেহারা একটু হেরফেরে আপনা-আপনি যে আমূল পালটে যেতে পারে, তা তো মাথায় আসেনি। এই যেমন মেজর। মোটাসোটা, ভুঁড়িওয়ালা চেহারায় সবসময় মুখভর্তি দাড়ি আর হাতে পাইপ, ওঁকে যদি ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে দাড়ি কেটে দেওয়া যায়, তাহলে উনি সম্ভবত নিজেকেই চিনতে পারবেন না।

অমলদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অর্জুন তার লাল মোটর বাইক চালিয়ে বাবুপাড়ার দিকে যেতে যেতে এইসব কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে ফেলল। কোনও কুখ্যাত অপরাধী ছদ্মবেশের সাহায্য না নিয়ে দাড়ি কামিয়ে টাক গজিয়েও নিজেকে নিশ্চিন্ত আড়ালে রাখতে পারে। টাকে চুল গজাবার ওষুধ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু মাথা ভর্তি চুল খসিয়ে টাক ফেলতে তো কোনও অসুবিধে নেই।

করলা ব্রিজ পার হওয়ার সময় সে লোকটাকে দেখতে পেল। দুটো খাঁচায় পাখি ভর্তি করে বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে চলেছে। এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী পাখি-শিকার এবং তা নিয়ে ব্যবসা করা সম্পূর্ণ বেআইনি। লোকটা হাঁটছে হনহনিয়ে। অর্জুন একেবারে সামনে নিয়ে বাইকটাকে দাঁড় করাতেই লোকটা রেগে গেল, "কী ব্যাপার ?"

"পাখি বিক্রি করবে ?"

"তা তো নিশ্চয়ই। নইলে এত কষ্ট করে আসতে যাব কেন ?"

"কী কী পাখি আছে ?"

"আপনি পাখি চেনেন ? ময়না টিয়া আমি বিক্রি করি না।"

অর্জুন সেটা লক্ষ করেছে। লোকটার খাঁচায় কোনও চেনা পাখি নেই। সে জিজ্ঞেস করল, "তোমার খাঁচার পাখিগুলো বেশ নতুন। আগে কখনও দেখিনি। কোত্থেকে ধরেছ ?"

লোকটা অসহিষ্ণু গলায় বলল, "বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন। গল্প করার সময় আমার নেই। এমনিতেই খুব দেরি হয়ে গিয়েছে।"

"কিন্তু ভাই, তোমাকে যে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।" অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল।

"কেন ঝামেলা করছেন ? থানায় নিয়ে গেলে আমি দু'দিন পরে ছাড়া পেয়ে যাব কিন্তু এই পাখিগুলো বাঁচবে না। এরা কী খায় তা পুলিশ জানে না, জানলেও যত্ন করে খাওয়ানোর সময় কোথায় তাদের ? আপনি যদি এদের মেরে ফেলতে চান, তা হলে থানায় নিয়ে চলুন।"

লোকটার কথা বলার মুনশিয়ানা চমকপ্রদ। অর্জুন বুঝল কথাগুলোয় যুক্তির অভাব নেই। সে বলল, "তুমি অন্যায় করছ, ফের ভয়ও দেখাচ্ছ ?"

"না বাবু, আমি তো কোনও ভয় দেখাইনি।"

"তুমি কোথায় বিক্রি করবে এদের?"

"একজন স্টেশনের সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাকে জিম্মা করে দিলেই সে আমাকে দাম মিটিয়ে দেবে। এর বেশি কিছু জানিনা আমি।"

"সেই লোকটি পাইকার হলে কাকে বিক্রি করছে সে?"

"সে-খবর আমাকে বলবে কেন?"

"পাখিগুলো ধরেছ কোথায়?"

"নীলগিরি জঙ্গলে। বাবু এবার চলি।"

"নীলগিরির জঙ্গল তো অনেকদূর। ওখানে পাখি ধরে তুমি এতটা পথ হেঁটে আসছ?"

"পাগল। এতটা পথ কি হাঁটা যায়। লরির মাথায় চেপে এসেছি। বাইপাসের কাছে নেমে গিয়ে শহরে ঢুকেছি। জলপাই মোড়ে নামলে হাঁটতে কম হত কিন্তু ওখানে পুলিশ থাকে। আচ্ছা, নমস্কার।" লোকটি পাশ কাটিয়ে হনহন করে চলতে লাগল পাখির খাঁচা লটকানো বাঁশ কাঁধে নিয়ে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হবার পরও ডুয়ার্সের মানুষ পাখিকে বন্যপ্রাণী বলে মনে করে না। বাঘ গণ্ডার হরিণ শিকার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চোরাশিকারিদের সঙ্গে বনবিভাগের সংঘাত হয় অবশ্য কিন্তু ইদানীং কালেভদ্রে তেমন ঘটনা ঘটে। কিন্তু পাখি অথবা ক্ষুদ্র প্রাণীদের যেমন খরগোশ অথবা সাপকে বন্যপ্রাণী হিসেবে ডুয়ার্সের মানুষ এখনও ভাবে না। জানতে পারলে বনবিভাগ বাধা দেয়, কিন্তু সেটা তেমন জোরালো নয়।

অর্জুনের মনে হল লোকটাকে অনুসরণ করলে ওর পাইকারকে ধরা যেত। ওই লোকটা ওইরকম অচেনা পাখি কাকে বিক্রি করে তা জানলে বনবিভাগ উপকৃত হত। কিন্তু সে বাবুপাড়ায় এসেছে যে কাজের জন্য, তা অনেক জরুরি।

জলপাইগুড়ি শহরের যে কোনও মানুষ এস.পি.রায়ের বাড়ি চেনে। এই মানুষটি দীর্ঘকাল ধরে শহরের মানুষের নানা উপকারে সময় এবং অর্থ দিয়েছেন। বাল্যকালে অর্জুন তাঁকে দেখেছিল। রায় সাহেব মারা যাওয়ার পর ওঁর ছেলে এপি একই রকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। চা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত রায়-পরিবার প্রভূত বিত্তশালী কিন্তু তাঁদের বাড়িঘরের চেহারায় যে আটপৌরে ভাব তা শহরের মানুষকে বিস্মিত করে। বাইক থেকে নেমে অর্জুন দেখল এপিদা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সন্তুদের সঙ্গে গল্প করছেন। ওকে দেখতে পেয়ে এপিদা হাত তুললেন, "এসো অর্জুন।"

এপিদার বয়স মধ্য পঞ্চাশ। স্বাস্থ্য ভাল। সকালবেলায় সুট টাই পরে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন তাঁকে বলল, "অমলদা গতকাল ফিরে এসেছেন। উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।"

"ও তাই নাকি ? অমলবাবু ফিরে এলেন শেষ পর্যন্ত। ভাল খবর। তা কী ব্যাপার ?"

"উনি কয়েকদিনের জন্য হাসিমারা অঞ্চলে থাকতে চান। আপনাদের তো চা বাগান আছে ওদিকে। যদি অসুবিধে না হয়।"

"কিসের অসুবিধে ? উনি যাবেন, এটা তো আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু ভাই, আমার নিয়ন্ত্রণে যে বাগানগুলো, তা এদিকে। ঠিক আছে, সন্তু কথা বলে রাখবে। ওপারে মধু-বাগান আছে, আমার ভাইয়ের, অসুবিধে হবে না কোনও। হ্যামিলটনেও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমি এখনই বাগডোগরায় যাচ্ছি কলকাতার প্লেন ধরব বলে, না গেলে সঙ্গে যেতাম। সন্তু, তুমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ো।" এ পি রায় ঘড়ি দেখলেন।

সন্তুদা মাথা নাড়লেন, "কোনও চিন্তা নেই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

কথাবার্তা পাকা করে অর্জুন বাড়ি ফিরছিল, হঠাৎ সেই পাখিওয়ালার কথা মনে এল। সে বাইক ঘুরিয়ে দু'মিনিটের মধ্যে স্টেশনে চলে এল। ইদানীং তিস্তা-তোর্সা ট্রেনের দৌলতে জলপাইগুড়ি স্টেশনের চেহারা সামান্য ফিরেছে। রোড স্টেশন হয়ে যাওয়ার পর অবহেলার ছাপ প্রকট হচ্ছিল। ঝুপড়ি দোকান, রিকশার ভিড় সত্ত্বেও দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল না অর্জুনের। কিন্তু পাখিওয়ালা বা তার খাঁচা-দুটোকে দেখতে পেল না। লোকটা এত তাড়াতাড়ি হাওয়া হয়ে গেল ? সে বাইক নিয়ে দুবার পাক দিতেই একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে লোকটাকে বসে থাকতে দেখল। বাইক থেকে নেমে দোকানে ঢোকার সময় সে লক্ষ করল খাঁচা দুটো নেই।

গেলাসের চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে ৺..রাম করে খাচ্ছিল লোকটা, অর্জুন গিয়ে পাশে বসতেই চমকে উঠল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বিক্রি হয়ে গিয়েছে ?"

বাধ্য হয়ে স্বীকার করল লোকটা, "হ্যাঁ।"

"কে কিনল ?"

"আমি কি সব খদ্দেরের নাম জেনে বসে আছি !"

"যে খদ্দের তোমাকে এখানে পাখি নিয়ে আসতে বলেছে, তার নাম জানবে না !"

হঠাৎ লোকটা সোজা হয়ে বলল, "আপনার মতলব কী বলুন তো বাবু ?"

অর্জুন হাসল, "তুমি যে পাখি ধরে এনেছ, তা কেউ বাড়িতে পোষে না। যে কিনেছে তার উদ্দেশ্য কী, সেটা আমি জানতে চাইছি।"

"জেনে কী করবেন ? আপনি কি পুলিশ ?"

"না। তবে পুলিশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল। তুমি জানো পাখি ধরে নিয়ে এসে বিক্রি করা বেআইনি। আর ওই সব বিরল জাতের পাখি যদি তুমি ধরে শেষ করে দাও, তার জন্য কী শাস্তি হতে পারে তা নিশ্চয়ই জানো।"

অর্জুন গম্ভীর হল।

লোকটা চা শেষ করে বিড়ি ধরাল, "এর মধ্যে চার বার থানায় রাত কাটিয়েছি আমি। কোনও বার অবশ্য জেল হয়নি। পাখি ধরার কেস তৈরি করতে পুলিশ সময় পায়নি।"

"বাঃ, চমৎকার!" অর্জুন না বলে পারল না।

লোকটি মাথা নাড়ল, "আপনারা শহরের বাবুরা আমাদের পেটের জ্বালা বুঝবেন না। আমি জঙ্গলের ধারে থাকি। সেখানে কোনও কাজকর্ম নেই। আমার বউ-বাচ্চাকে দু' বেলা ভাত দিতে পারি না। জঙ্গলের গাছ কাটা নিষেধ, তো কাটা হয় না। একমাত্র পাখি ধরার কায়দাটাই ভাল জানি। তাই ধরে আনলে যদি ওদের দু' বেলা ভাতের ব্যবস্থা হয়, তাহলে জেলে গেলেও সেটা আমাকে করতে হবে বাবু।"

অর্জুন বলল, "তুমি অন্যায় করে সাফাই গাইছ। অন্য কাজকর্ম করো না কেন? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো ক্যাজুয়াল লোক নেয়। শ্রমিকের কাজও তো করতে পারো।"

"ঠিক আছে, আপনি আমাকে ফরেস্ট ডিপার্টের কাজ পাইয়ে দিন, আমি এসব করব না।"

অর্জুন ভাবল। এই চেষ্টাই করা যেতে পারে। এই জেলার ফরেষ্ট অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। ভদ্রলোককে অনুরোধ করলে উনি নিশ্চয়ই রেঞ্জারকে বলে দেবেন একে একটা কাজ দিতে। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কী?"

"সুন্দর রায়।"

"সুন্দর! বাঃ, চমৎকার নাম। এত সুন্দর নামের মানুষ কখনও পাখি ধরে?"

কথাটা শোনামাত্র লোকটার মুখ কীরকম হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে গাঢ় গলায় বলল, "বিশ্বাস করুন বাবু, একটুও ইচ্ছে হয় না। পাখিগুলো ধরা পড়ার পর যখন ডানা ঝাপটায়, তখন বুকের ভেতরটা কীরকম করে।"

"তবু তোমাকে ধরতে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ বাবু। টাকার লোভ বড় মারাত্মক। একটা টিয়া কিংবা ময়নার বাচ্চা ধরলে দশ পাওয়া যায়। কিন্তু এই পাখিগুলোর জন্য তিরিশ পাই। আজ প্রায় কুড়িটা এনেছি। ছয়শো পেয়েছি নগদ। মাসে দুবার। পেটে ভাত পড়লে বুকের কষ্ট মনে থাকে না।"

"কিন্তু এই পাখিগুলোর দাম বেশি কেন?"

"জানি না বাবু। দিব্যি দিয়ে বলছি। তবে শুনেছি, এদের মাংস সেদ্ধ করে খেলে কলজের জোর বাড়ে, বাতের ব্যথা কমে যায়।"

"তার মানে ওই পাখিগুলোর প্রত্যেকটাকে মেরে ফেলা হবে।"

লোকটা ঠোঁট কামড়াল। মাথা নিচু করল।

"সুন্দর, তোমার বাড়ি কোথায় ?"

"জলদাপাড়া ফরেস্ট ছাড়িয়ে সুহাসিনী বাগানের দিকে যেতে যে জঙ্গলটা, তার গায়ে। ওখানে পার্বতী দিদিমণি আছেন—যিনি হাতি পোষ মানান। তিনি আমাকে চেনেন।"

"তোমাকে আবার কবে এখানে পাখি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে ?"

"সামনের অমাবস্যা। পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় আসতে হয়।"

"তুমি চাকরি পেলে এসব ছেড়ে দেবে তো ?"

"জল্পেশ্বরের দিব্যি, কক্ষনো করব না।"

"তুমি আমার সঙ্গে চলো।"

জলপাইগুড়ির ডি এফ ও অফিসে গিয়ে বড়কর্তার দেখা পেল অর্জুন। ভদ্রলোক প্রবীণ এবং সহজ মানুষ। অর্জুন সুন্দরের পরিচয় দিল, "এই লোকটা পাখি চুরি করে বিক্রি করে পেটের তাগিদে, আপনি যদি ওকে মাঝে মাঝে আপনার ডিপার্টমেন্টের ঠিকে কাজ দেন, তাহলে চুরিটা বন্ধ হয়—ওর পরিবারও বাঁচে।"

"পাখি চুরি করে বিক্রি করে ? এ তো কালপ্রিট।"

"ঠিকই। কিন্তু এখনও শাস্তি হয়নি বলে ওকে যদি সুযোগ দেন।"

"কী বলছেন ? জেনেশুনে একজন চোরকে কেউ আর ঢোকায় ?"

"ওকে একটা সুযোগ দিন, দেখবেন ও পালটে যাবে।"

ডি এফ ও যেন বাধ্য হয়ে বললেন, "ঠিক আছে, ওকে রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে আমার আপত্তি নেই।"

বাইরে বেরিয়ে এসে সুন্দর বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাবু, কিন্তু আমাকে ওরা কাজ দেবে না। এ পৃথিবীতে একবার খারাপ হলে আর ভাল হবার সুযোগ পাওয়া যায় না। আমার কপালে যা লেখা আছে—তা কে খণ্ডাবে।"

"তবু তুমি রেঞ্জার সাহেবের কাছে যাও। আচ্ছা, দাঁড়াও, আমরা কাল বাদে পরশু তোমার ওদিকেই যাচ্ছি। তখন আমি তোমাকে নিয়ে রেঞ্জারের কাছে যাব। কিন্তু তুমি কথা দাও, তার আগে আর পাখি ধরবে না।" অর্জুন বলল।

সুন্দর বলল, "জল্পেশ্বরের দিব্যি দিয়েছি, কথার খেলাপ হবে না। আমি যদি সৎ পথে বেঁচে থাকতে পারি, তা হলে চুরিচামারি করতে যাব কেন ?"

সন্তুদা বলেছিলেন, দরকার হলে গাড়ি দিতে পারেন চা-বাগানে যাওয়ার জন্য। ডুয়ার্সে এখন প্রচুর মিনিবাস এবং বাস চালু হলেও নিজস্ব গাড়ি থাকলে সময় কম লাগে। অমল সোম বললেন, "আমরা বাসে যাব।"

"বাস !" মেজর আঁতকে উঠলেন, "গাড়ি যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন বাসে কেন ? এখানকার বাসে তো দাঁড়ালেও সোজা হয়ে থাকা যায় না।"

অমলদা হাসলেন, "ওই অভিজ্ঞতাটুকু আপনার হোক। পৃথিবীর অনেক বিরল জিনিস আপনি দেখেছেন, কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ কী কসরত করে বাসে যাতায়াত করেন তা নিশ্চয়ই জানেন না। অবশ্য ইচ্ছে হলে আপনি অর্জুনের বাইকে চেপে যেতে পারেন, আমি বাসে যাব।"

অর্জুন শুনছিল, "আমি বাইক নেব ?"

"অবশ্যই। কখন ওটা কী প্রয়োজনে লাগবে, কে জানে ?"

মেজর ঠিক করলেন তিনি বাইকেই যাবেন। চা-বাগানগুলোর গেস্ট হাউসে সবই পাওয়া যায় অতএব লাগেজ বেশি নিতে হবে না। কিন্তু অমলদা বাসে যাবেন শোনার পর অস্বস্তি হচ্ছিল অর্জুনের। অমলদা সেটা পরিষ্কার করলেন, "গাড়ি করে যেতে চাই না কারণ ওখানকার মানুষ ভাববে আমরা বেশ দরের লোক। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওপর নজর পড়বে। এটা আমি চাই না।"

মেজরের বিপুল শরীর নিয়ে তার বাইক কতদূর ঠিকঠাক যেতে পারবে, তাই ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল অর্জুন।

॥ তিন ॥

ঠিক হয়েছিল হাসিমারার তেমাথায় অমলদা সকাল এগারোটায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। সকালের বাস ধরে গেলে ওঁর পক্ষে ওই সময়ে পৌঁছতে অসুবিধে হবে না। অর্জুন আটটা নাগাদ অমলদার বাড়িতে গিয়ে দেখল, মেজর তৈরি হয়ে বসে আছেন। দেখা হওয়ামাত্র দাঁড়িয়ে উঠলেন, "লেটস স্টার্ট !" যাওয়ার আগে হাবুর হাতের চা খেয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল অর্জুনের, কিন্তু মেজরের ভঙ্গি দেখে সেটা বলতে পারল না। মেজরের হাত খালি, দুই কাঁধে স্ট্র্যাপ ঝোলানো ব্যাগ পিঠে ঝুলছে।

বাইকের ইঞ্জিন চালু করার পর মেজর বসতেই মনে হল চাকা কিছুটা ছোট হয়ে গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মেজর বললেন, "অল রাইট ?"

বাইক চালু করে অর্জুন বলল, "ঠিক আছে, আপনি চেষ্টা করুন সহজ হয়ে বসতে।"

"সহজ ? আমার মতো সহজ পৃথিবীতে আর কে আছে জানি না। একবার আল্পসে স্কি করছিলাম। বাধ্য হয়ে নয়, নটোরিয়াস একটা গ্যাং পেছনে তাড়া করছিল, হঠাৎ বাঁ হাঁটুতে অসম্ভব যন্ত্রণা। নিজেকে বললাম, সহজ হও, সঙ্গে-সঙ্গে সহজ হয়ে গেলাম। বরফের ওপর আমার স্পিড্ দেখে ব্র্যালবার্ন তো হতভম্ব। পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারেনি।" ছোট্ট হাসি বের হল মেজরের দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা ঠোঁট থেকে।

অর্জুন জানতে চাইল, "ব্র্যালবার্ন কে ?"

"জুরিখে থাকে ছোকরা। তিন-তিনবার স্কিতে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। মেজরের ভারী শরীর ব্যাক সিটে মাঝে-মাঝে নড়ছে। অর্জুন সতর্ক হয়ে চালাচ্ছিল। মেজর যা বলেন তা শুনলে স্রেফ গুল বলে মনে হয়। কিন্তু আমেরিকা ইংল্যান্ডে গিয়ে মেজরের পরিচিতি সে নিজের চোখে দেখে এসেছে এবং তারপর তো অবিশ্বাস করার উপায় নেই।

তিস্তা ব্রিজ ছাড়িয়ে ময়নাগুড়ি বাইপাস দিয়ে যেতে-যেতে অর্জুনের মনে হল মেজরকে বলা দরকার। এদিকে উনি আগে আসেননি। অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে বলল, "ওই যে রাস্তাটা দেখছেন, ওটা জল্পেশ্বর মন্দির পর্যন্ত গিয়েছে। ডুয়ার্সের সবচেয়ে নামকরা শিবমন্দির।"

"বিশেষত্ব কী ?"

"খুব প্রাচীন মন্দির। কোচবিহারের রাজা স্বপ্নে আদেশ পেয়ে ওখানে এমন একটা শিবলিঙ্গ পেয়েছিলেন, যার কোনও শেষ নেই।" অর্জুন বলতে-বলতে বাইক মোড়টা পেরিয়ে গেল।

"হল্ট্।" মেজর চিৎকার করে উঠতেই অর্জুন ব্রেক কষল।

মেজর বললেন, "শেষ নেই। তার মানে পাথরটা মাটির তলায় পোঁতা। তাই তো ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তার শেষ নেই মানে ? মাটি খুঁড়ে দেখা হয়নি ?"

"হয়েছিল। বলা হয়েছে অখণ্ড শিব।"

"ইন্টারেস্টিং। লেট্স গো, নিজের চোখে দেখে আসি। এরকম পাথর গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে প্রচুর পাওয়া যায়। তুমি জানো কি, ওখানে যেসব পাহাড়ের চূড়া রয়েছে, তাদের নাম সব ভারতীয় দেবতাদের নামে। শিব, বিষ্ণু, ইত্যাদি। দুটোর মধ্যে মনে হচ্ছে যোগসূত্র আছে।"

অর্জুন খবরটা শুনে অবাক হল। কিন্তু এখন যদি বাইক ঘুরিয়ে জল্পেশ্বরের রাস্তা ধরা হয়, তা হলে হাসিমারায় পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যদিও অমলদা বাসে যাচ্ছেন এবং পৌঁছতে দেরি হবে, তবু ফেরার সময় নাহয় মন্দিরটা দেখা যেতে পারে। মেজর রাজি হলেন।

অর্জুন বাইকের গতি বাড়াল। খানিকক্ষণ পরে মেজর কিছু সময় গুনগুন করে গলা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "হিন্দিতে র‍্যাপ গাইতে শুনেছি, বাংলায় কেউ গাইছে ?"

"র‍্যাপ ?" অর্জুন হাওয়ার জন্যে চেঁচাল।

"হ্যাঁ।"

"জানি না। তবে এখন জীবনমুখী গান খুব হচ্ছে।"

"কী মুখী ?"

"জীবনমুখী।"

"ও, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাগুলোয় সুর দেওয়া হচ্ছে বুঝি? ওটা তো হেমন্তকুমার অনেক দিন আগেই গেয়েছেন। নতুন কী হল! র‍্যাপ ব্যাপারটা একদম আলাদা। আফ্রিকাতে এক ধরনের পাখি আছে, যাদের ডানা তিন ফুট লম্বা। রেগে গেলে তারা হাততালি দেওয়ার মতো করে ডানাতালি দেয়। তাতে যে আওয়াজ ওঠে তার সঙ্গে র‍্যাপের রিদ্‌মের মিল আছে। বুঝলে?"

মেজরের সঙ্গে থাকলে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। কিন্তু এই র‍্যাপ গান বেশিক্ষণ শুনতে অর্জুনের একটুও ভাল লাগে না। মেজর যদি উৎসাহিত হয়ে হেঁড়ে গলায় র‍্যাপ গাইতে আরম্ভ করেন, তা হলে বিপদ। সে প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে বলল, "ওই দেখুন, জলঢাকা নদী।"

দু'পাশে ধানের মাঠ, বড় পিচের রাস্তাটা উঁচুতে উঠছে ব্রিজে পৌঁছতে এবং তারপরেই বেশ চওড়া নদী। যদিও এসময় নদীতে জল নেই তেমন, তবু দৃশ্যটি দেখতে ভালই লাগে। মেজর বললেন, "পাঁচ মিনিটের জন্যে বিশ্রাম নেওয়া যাক।"

"বিশ্রাম?" অর্জুন গতি কমাল ব্রিজের ওপর।

"আমার পা অসাড় হয়ে আসছে হে। একটু স্বাভাবিকভাবে রক্ত সঞ্চালন করুক, তারপর আবার পেছনের সিটে বসব।"

অতএব অর্জুন ব্রিজের একধারে বাইকটাকে রাখল। নীচে পা দিয়ে কয়েক সেকেন্ড মেজর নড়বড় করলেন। বোঝা যাচ্ছিল ওঁর পায়ে জোর নেই। সেটা ফিরে এলে চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি তারপরে কী?"

"ধুপগুড়ি।"

"আচ্ছা! এরকম নাম আরও আছে?"

"হ্যাঁ, লাটাগুড়ি, বিনাগুড়ি। ডুয়ার্সে গুড়ি ছাড়া আর একটা শব্দ পাওয়া যায়, কাটা। যেমন নাগরাকাটা, গয়েরকাটা, ফালাকাটা।"

"এই গুড়ি আর কাটার মানে জানো?"

অর্জুন একটু ভাবল। একসময় কার কাছে যেন ঐতিহাসিক কিছু তথ্য শুনেছিল। ভুটান এবং তিব্বতের মানুষেরা এই অঞ্চলে নিয়মিত আসতেন এবং তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে এদিকের অনেক জায়গার নাম হয়েছে। সে বলল, "আলাদা করে বলা মুশকিল। যেমন জলপাইগুড়ি। লোকে ভাবে এখানে অনেক জলপাই গাছ ছিল। গুড়ি মানে জায়গা। কিন্তু এ তথ্য ঐতিহাসিকরা মানেননি। আসল শব্দ হল জিলেপিগোড়ি। জিলে মানে বাজার বা বিনিময় কেন্দ্র, পে মানে উল বা কম্বল, গো মানে দরজা আর রি-এর অর্থ পাহাড়। ভোট-তিব্বতিতে এই জিলেপিগোড়ি-র নামে পাহাড়ের দরজায় কম্বল উল বিক্রি করার জায়গা বা বাজার।"

মেজর বললেন, "মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাই গুড়ি মানে জায়গা আর কাটা মানে টুকরো করা ভেবে নিচ্ছি। ওসব জায়গায় গাছটাছ টুকরো হত।"

"ভাবুন, কিন্তু কাউকে বলবেন না। জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, যাঁর কাছে সমস্ত তথ্য পাবেন।" অর্জুন বলল।

মেজর নদীর দিকে তাকালেন, "জলঢাকা। তার মানে জলে ঢেকে যায় চারদিক।"

"মোটেই নয়।" অর্জুন হেসে ফেলল, "শব্দটা হল জলঢাক্কা। ভোট-তিব্বতিতে একে বলা হত দিচু। 'দি' মানে এই, this, আর 'চু'-এর অর্থ নদী। এই নদীর ধার দিয়েই শুনেছি ভোট-তিব্বতে যাওয়ার রাস্তা ছিল।"

"ইন্টারেস্টিং। এই নদীকে ফলো করলে তিব্বতে যাওয়া যায়? ইদানীং কেউ কি গিয়েছে?"

"জানি না। সম্ভবত না।"

"তা হলে এটা নিয়ে পরে ভাবতে হবে।"

ওরা যখন কথা বলছিল, তখন জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটা নীল মারুতি জিপসিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। জিপসি যে চালাচ্ছে হয় তার হাত পাকা নয়, অথবা নেশা করে স্টিয়ারিং-এ বসেছে। জিপসিটা প্রচণ্ড গতিতে রাস্তার এপাশ-ওপাশ করতে-করতে ছুটে আসছে। ব্রিজের ওপর উঠেও সেটার ধরন যখন পালটাল না, তখন অর্জুন তার বাইকটাকে ফুটপাতের ওপর তুলে আনার চেষ্টা করল।

একচুলের জন্যে বেঁচে গেল অর্জুনের বাইক। হাওয়ার ধাক্কায় টলে গিয়েছিল অর্জুন, মেজর চিৎকার করে গালাগালি করছিলেন। জিপসিটা কিন্তু কোনও রকম ভ্রূক্ষেপ না করে তেমনই এলোমেলো হয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। মেজর চিৎকার করলেন, "ফলো হিম। ওকে ধরে থানায় নিয়ে যেতে হবে।"

মেজরকে পেছনে বসিয়ে বাইক চালাল অর্জুন। গতি বাড়াতেই ওরা তীরের মতো ছুটল। যেহেতু রাস্তার এপাশ ওপাশ মাড়িয়ে জিপসিটা এগোচ্ছে তাই কাছাকাছি পৌঁছতে বেশি দেরি হল না। কিন্তু ওই রাস্তা জুড়ে চলার জন্যেই টপকে যাওয়া যাচ্ছে না। মেজর চিৎকার করলেন থামার জন্যে, অর্জুন হর্ন বাজাল। কিন্তু গাড়ির ড্রাইভারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এবার উলটো দিক থেকে একটা বাস আসছে দেখা যেতেই জিপসিটা আচমকা রাস্তার ডান দিকে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসটা চলে যেতে অর্জুন বাইক নিয়ে এল পাশে। জিপসির একমাত্র আরোহী তখন কালো চশমার আড়াল থেকে তাদের দেখছে।

মেজর সদর্পে এগিয়ে গেলেন, "এ কী রকম গাড়ি চালানো হচ্ছে, অ্যাঁ? ড্রিঙ্ক করেছ নাকি?"

লোকটি কোনও উত্তর দিল না। অর্জুন লক্ষ করল লোকটি আদৌ নেশাগ্রস্ত নয়। গায়ের রং টকটকে ফর্সা, রোগা, ঠোঁটের ওপর ধনুকের মতো কুচকুচে কালো গোঁফ।

"তোমার ঠাকুর্দার নাম কী ?" অদ্ভুত শীতল গলায় প্রশ্নটা এল।

"অ্যাঁ ? মানে ? হোয়াট ইজ দিস ?" মেজরের শরীর এক পা পিছিয়ে গেল।

"আমার সঙ্গে ওই ভাষায় কথা বললে সেই নামটি তোমাকে ভুলে যেতে হবে। এটা অবশ্য দ্বিতীয়বারে। তৃতীয়বারে ঠার্কুদার ছেলের নাম তোমাকে ভুলতে হবে। চতুর্থবারে ...।" গিয়ার চেঞ্জ করল লোকটি, "ডুয়ার্সে এসেছ, জেনে রেখো আমি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে কৈফিয়ত দিই না।" আচমকা গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেল জিপসি। এবার আর এঁকেবেঁকে নয়, সোজা, মুহূর্তেই চোখের আড়ালে চলে গেল বাঁক নিয়ে।

"বদমাশ, ভিলেন।" মেজর আকাশে মুঠো করা দু' হাত ছুঁড়লেন, "আমাকে ভয় দেখাচ্ছে ? অন্যায় করেও আমার সঙ্গে এই ব্যবহার ! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, তোমার মতো পুঁটি মাছকে এই শর্মা তোয়াক্কা করে না। যদি আবার দেখা পাই—।" শূন্যে শব্দগুলো ছুড়ে দিচ্ছিলেন মেজর সশব্দে।

এইসময় একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি জলপাইগুড়ির দিক থেকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছিল। মেজরের উত্তেজিত চেহারা দেখে উলটো দিকে দাঁড়িয়ে গেল সেটা। গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। বৃদ্ধের আদেশে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ?"

মেজর আড়চোখে তাকালেন। তারপর বৃদ্ধ বুঝেই গলা চড়ালেন, "এই ডুয়ার্সে কি জঙ্গলের আইন চলে ? মগের মুল্লুক ? আমার বাপ-ঠার্কুদার নাম ভুলিয়ে দেবে বলল ?"

এবার ওপাশের দরজা খুলে বৃদ্ধ নেমে এলেন, "যিনি বলেছেন, তিনি কি নীল জিপসিতে ছিলেন ?"

"ইয়েস। নীল জিপসি।"

বৃদ্ধ সঙ্গে-সঙ্গে হাতজোড় করলেন, "যদি কোনও তিক্ততা হয়ে থাকে, তা হলে আমি তার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করছি। আপনাকে অনুরোধ করব ভুলে যেতে।"

অর্জুন এতক্ষণ নাটকের দর্শকের মতো দেখে যাচ্ছিল। এখন ওই বৃদ্ধের বক্তব্য শোনার পর তার আগ্রহ বাড়ল। সে বৃদ্ধের সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার পরিচয় ?"

"আমার নাম হরপ্রসাদ সেন। আপনারা যাঁকে দেখেছেন, তিনি আমাদের ছোটসাহেব। ব্যানার্জি টি গার্ডেনসের পরবর্তী মালিক। আমাদের বড় সাহেব স্বর্গত অশ্বিনী ব্যানার্জি ডুয়ার্সে গোটা চারেক চা বাগানের মালিক ছিলেন। উনি

চলে যাওয়ার পর মিসেস ব্যানার্জিই সব দেখাশোনা করেন। ওঁদের কোনও সন্তান নেই। ছোট সাহেব মিসেস ব্যানার্জির ভাই। মানুষটি খুব খামখেয়ালি। আজ আমাদের একসঙ্গে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু উনি আগে চলে এলেন।" বৃদ্ধ বললেন।

"আপনি কী করে আন্দাজ করলেন যে উনি এখানে গোলমাল করেছেন।"

"এর আগে পথে দুটো গোলমাল থামিয়ে এসেছি। আশংকা হল এখানেও করতে পারেন।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এরকম লোককে তো জেলে পোরা উচিত।"

"তা সম্ভব নয়। ওঁর প্রতাপ-প্রতিপত্তি প্রচুর। তবে আমাদের মালকিন অন্য ধরনের মানুষ। তিনি ভাই-এর ব্যবহার সমর্থন করেন না, আবার তাকে শাসনও করতে পারেন না।"

"আপনারা কোন চা বাগানে যাচ্ছেন ?"

'নিম টি এস্টেট।"

এবার মেজর এগিয়ে এলেন, "শুনুন মশাই, আপনাদের ছোট সাহেব যে অভদ্র ব্যবহার করেছেন তার ফল ওঁকে ভোগ করতে হবে। ওঁকে সামনে এসে ক্ষমা চাইতে হবে।"

"প্লিজ, এ নিয়ে আর জোরাজুরি করব না। এই যে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তা জানতে পারলে উনি চিবিয়ে খাবেন। অবশ্য আমি স্বেচ্ছায় এটা করিনি, মিসেস ব্যানার্জির নির্দেশ আছে বলেই করেছি। তবে ছোট সাহেবকে না ঘাটানোই ভাল।"

"ভদ্রলোকের পুরো নাম কী ?"

"নীল চ্যাটার্জি। ডুয়ার্সে সবাই ওকে নীল বলেই জানে। আচ্ছা নমস্কার।" বৃদ্ধ ফিরে গেলেন গাড়িতে। অ্যাম্বাসাডারটা বেরিয়ে গেল।

মেজর বললেন, "বড়লোকের অপদার্থ ছেলে। চাবকে সোজা করে দিতে হয়।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। মেজরকে পেছনে বসিয়ে সে স্পিড তুলল। বেশ দেরি হয়ে গেছে। অমলদা হাসিমারা বাজারে অপেক্ষা করবে। তবে যাই হোক, নীল চ্যাটার্জি বেশ ইন্টারেস্টিং চরিত্র। মনে হচ্ছে লোকটার সঙ্গে এ যাত্রায় আবার দেখা হবে।

অপমানিত হয়েছেন বলেই মেজর আর একটাও কথা বলেননি। মন খারাপ হলে মানুষ চুপ করে যায়। ধূপগুড়ি গয়েরকাটা পেরিয়ে বীরপাড়া ছাড়ানোর পর অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী হল ?"

"তোমার ব্যবহার দেখলাম।" পেছনে বসা মেজর জবাব দিলেন।

"কী রকম ?"

"লোকটা, আমার পূর্বপুরুষের কথা বলে অপমান করল, আর তুমি সেটা

কান পেতে শুনলে ? আমি তোমার বয়সে হলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতাম।"

"তাতে জেলে যেতে হত। তা ছাড়া আমি দেখলাম, আপনি বেশ দক্ষ হাতে সিচ্যুয়েশন ট্যাক্‌ল করছিলেন। তাই মাথা গলালাম না।"

"বলছ ? দক্ষ হাতে ! বাংলা ভাষার কোন মাথামুণ্ডু নেই।"

"তার মানে ?" হঠাৎ এমন মন্তব্যে হকচকিয়ে গেল অর্জুন।

"দক্ষ মানে এফিসিয়েন্ট। তাই তো ? আবার শিবের শ্বশুরের নাম দক্ষ। সেই পাজি লোকটার যজ্ঞ নষ্ট করতে শিবকে কী কাণ্ড করতে হয়েছিল। ওই লোকের নাম দক্ষ হয় কী করে ?"

অর্জুন হাসল, "দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার বুড়ো আঙুল থেকে জন্ম বলে ওঁর নাম দক্ষ।"

"তুমি দেখছি পুরানের গল্পগুলো ভাল জানো।"

"না। শুধু 'পৌরাণিক অভিধান' বলে একটা বই পড়েছি। দারুণ ইন্টারেস্টিং। একবার ধরলে আর ছাড়তে পারবেন না। ডান দিকে জলদাপাড়া ফরেস্ট।"

ওরা বাঁক নিচ্ছিল। মেজর তাকালেন, এমন কিছু জঙ্গল নয়। বাঘ সিংহ তো থাকবে না, হাতি, গণ্ডার আছে বলছে। আসলে বাঘ, সিংহ ছাড়া জঙ্গল একেবারেই আলুনি।

ওরা হাসিমারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুন্দর পিচের নির্জন রাস্তা। পাখি ডাকছে। দু' পাশে জঙ্গল। একটা নদী পড়ল। অর্জুনের মনে পড়ল সেই পাখি শিকারী সুন্দরের কথা। লোকটার চাকরির জন্যে ফরেস্ট অফিসে নিয়ে যেতে হবে। কাছাকাছি যেখানে প্রকৃতীশ বড়ুয়ার মেয়ে পার্বতী বড়ুয়া থাকেন, সেখানে গেলে সুন্দরের ঠিকানা পাওয়া যাবে।

সে বলল, "এই সামনের জঙ্গলের কোথাও এমন একজন ভদ্রমহিলা থাকেন, যাঁর ছবি ছাপা হয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর মলাটে।"

"তাই নাকি ? কেন ?" মেজর জানতে চাইলেন।

"ডুয়ার্সের হাতিরা তাঁর কথায় ওঠে-বসে। হাতিকে ওঁর মতো আর কেউ চেনে না।"

"দারুণ ব্যাপার ! আলাপ করা যাবে ?" মেজর নড়ে-চড়ে বসলেন।

॥ চার ॥

অর্জুন ঘড়ি দেখল। দেরি হয়ে গিয়েছে যথেষ্ট। অপেক্ষা করতে-করতে অমলদা অবশ্যই বিরক্ত হয়ে যাবেন। সে মাথা নেড়ে বলল, "ফেরার সময় যাব। এখানে থাকলে যে-কোনও দিনই আসতে পারি।"

'যাব' এবং 'আসতে পারি' পাশাপাশি দুটো বাক্য ব্যবহার করে নিজেই হেসে

ফেলল অর্জুন। সে একই গতিতে বাইক চালাচ্ছিল। গত বর্ষায় এদিকের যে সমস্ত ব্রিজ ভেঙেছে, তা এখনও সারানো হয়নি। নদীর ওপর বাঁধ তৈরি করে পথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনের বর্ষায় সব ধুয়ে যাবে, তখন এই এলাকার অবস্থা হবে করুণ। ডান দিকে সুহাসিনী চা-বাগান। বাগানের নামটা পড়া মাত্র বেশ ভাল লাগল। নিপাট বাঙালি নাম ভুটানের গায়ে।

সে মেজরকে বলল, "ওই যে পাহাড় দেখছেন, ওটা ভুটান। ফুন্টশিলিং নামে একটা শহর আছে ওখানে। পারো কিংবা থিম্পু যাওয়ার রাস্তা।"

"তুমি কি পাসপোর্ট নিয়ে এসেছ?"

"ওসব লাগে না। দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী মানুষ এমনিই যাওয়া-আসা করতে পারে।"

"গুড। যাওয়া যাবে তা হলে।"

মন্দিরটাকে বাঁ দিকে রেখে এগোল অর্জুন। মেজর বেশ মজার মানুষ। যে-কোনও নতুন কিছু শোনেন, তাতেই আগ্রহী হয়ে যান। বন্ধনহীন জীবন যাপন করলে বোধ হয় মানুষ এইরকম হয়!

হাসিমারার বাজার এলাকা ছোট। তিন মাথার মোড়ে বাইক থামাতেই মেজর বললেন, "আমাকে ধরতে হবে। বাইকটা হেলিয়ো না।"

"কেন?" অর্জুন অবাক হল।

"কোমর থেকে পা অবশ হয়ে আছে। মনে হচ্ছে ওগুলো আমার নয়।"

অর্জুন বাঁ হাতে বাইকটাকে সামলে ডান হাতে মেজরের হাত ধরল। মাটিতে পা দিয়েই মেজর এমন লটপট করতে লাগলেন যে, দু'পাশের দোকানের মানুষজন শব্দ করে হাসতে লাগল। মেজর ওই অবস্থায় খেপে গেলেন, "হাসির কী আছে, অ্যাঁ? মানুষের দুরবস্থা দেখে কী করে হাসি বের হয়?"

অর্জুন বলল, "ইগনোর করুন। কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গেলেও লোকে হাসে। তবে আপনি ইতিমধ্যেই এখানে পরিচিত হয়ে গেছেন, আর রাগ করলে সেটা পাকা হয়ে যাবে।"

"ও হ্যাঁ, মিস্টার সোম তো বলেছিলেন সাধারণ মানুষ হয়ে থাকতে।" মেজর ততক্ষণে সামান্য বল পেয়েছেন পায়ে, "আসলে কী জানো, আমার শরীরটা এমন, যেখানে যাই সেখানকার মানুষ এক নজর দেখেই মনে রেখে দেয়। নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে প্রথম নর্থ পোলে যাই। একটা এস্কিমোর গ্রামে কিছুক্ষণ ছিলাম। নাইনটিন এইট্টি ফাইভে সেখানে যেতেই দেখলাম, অনেকেই আমাকে চিনতে পেরেছে। বুঝতেই পারছ, আমার পক্ষে ছদ্মবেশ ধারণ করা অসম্ভব!"

অর্জুন বলল, "অমলদা ছদ্মবেশের কথা বলেননি, বলেছেন আমরা যে সাধারণ মানুষ—এই ইম্প্রেশন রাখতে। আপনার খিদে পায়নি?"

"খুব। কিন্তু এখানকার দোকানের যা চেহারা তাতে খেতে ভরসা হচ্ছে না ভাই।"

"কেন?"

"ভারতে এলে বাইরের ভাজাভুজি আমি একদম খাই না। তবে রসগোল্লা খাওয়া যেতে পারে।"

অর্জুন কথা বাড়াল না। বিদেশে যাঁরা দীর্ঘকাল আছেন, তাঁদের পক্ষে চট করে ভারতীয় খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। কোনও উন্নাসিকতা নয়, ওঁদের শরীরের সিস্টেম ভেজাল অথবা পোড়া তেল বরদাস্ত করতে পারে না। বিষ্টুসাহেব এ-ব্যাপারে একটা নিষ্ঠুর উপমা দিয়েছিলেন অনেক কাল আগে। ফুটপাতে যেসব শিশু বড় হয়, তাদের সহ্যশক্তি অনেক বেশি। নোংরা, বাসি খাবার খেলেও কিছু ক্ষতি হয় না তাদের। কারণ সেটাকে অতিক্রম করার শক্তি একটু-একটু করে অর্জন করেছে তারা। কিন্তু যত্ন এবং নিরাপত্তার মধ্যে সমস্ত সুবিধের সঙ্গে যারা বড় হচ্ছে, তারা একদিনও ফুটপাতের শিশুর সঙ্গী হতে পারবে না। আমেরিকান খাবারদাবারের সঙ্গে আমাদের সাধারণ দোকানের খাবারের এতটাই প্রভেদ।

মেজর গোটাচারেক রসগোল্লা খেয়ে বললেন, "অমৃত।"

অর্জুন জিলিপি খেল। ভাজা মিষ্টি খেতে ওর খুব ভাল লাগে। যদিও এখন ভর-দুপুর, এসব খাওয়ার সময় নয়, তবু অমলদাকে ফেলে ভাতের হোটেলের সন্ধানে যাওয়া যায় না।

দাম মিটিয়ে ওরা দেখতে পেল, একটা জিপ তাদের বাইকের পাশে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভার গোছের একজন নীচে নেমে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। পাশের দোকানদার লোকটাকে কিছু বলতে সে এগিয়ে এসে নমস্কার করল, "আপনারা জলপাইগুড়ি থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন বোঝার চেষ্টা করল।

"আপনাদের মধ্যে একজনের নাম অর্জুন?"

"হ্যাঁ, ঠিকই।"

"তা হলে আমার সঙ্গে চলুন। সাহেবরা অপেক্ষা করছেন। আমি এক ঘণ্টা আগেও এসেছি।"

"কোথায় যাব? কোন সাহেব?"

"সুহাসিনী বাগানের সাহেব। আপনাদের একজন বোধ হয় আগেই এসে গেছেন।" লোকটা জিপের দিকে এগোল। মেজর বললেন, "এটা কীরকম হল! মিস্টার সোম প্রচারিত হতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু এখন তো সবাই দেখল। যাক গে, যাবে নাকি?"

"মনে হচ্ছে অমলদাই পাঠিয়েছেন। কাছেই তো বাগানটা। আপনি কি জিপে বসবেন?"

"অবশ্যই।" গটগট করে মেজর জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন।

জিপটাকে অনুসরণ করে অর্জুন চা-বাগানের ভেতর একটা সুন্দর বাংলোর সামনে পৌঁছে গেল। খানিক দূরে ফ্যাক্টরির আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে এখন কাজের সময়। বাংলোয় ঢোকার সময় যে দরোয়ান গেট খুলেছিল, তাকে দেখতে অনেকটা হিন্দি সিনেমার অনুপম খেরের মতো।

গাড়ির শব্দ পেয়েই সিঁড়ি বেয়ে যে মানুষটি নেমে এলেন তাঁকে অর্জুন চেনে। ইদানীং জলপাইগুড়ির বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ইনি উপস্থিত হন। ছিপছিপে পেটা শরীরের পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিটি একসময় পাহাড়ে উঠতেন। ভদ্রলোক হাত তুলে হাসতে-হাসতে বললেন, "ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, এই চা-বাগানে আপনাদের পেয়ে আমি খুব গর্বিত। কি অর্জুনবাবু, ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি?"

"চলে যাচ্ছে ভাই। পাণ্ডববর্জিত হয়ে থাকি, তবু তৃতীয় পাণ্ডবের সান্নিধ্য পাব বলে এখন পুলকিত। আসুন সার, আমি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।" মেজরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

"আমি বোধ হয় আপনার নাম শুনেছি। আপনি অভিনেতা?" মেজর বেশ হাসি-হাসি মুখে হাত ঝাঁকালেন।

"না সার! তিনি আমার শ্রদ্ধার মানুষ এবং অনেক বয়স্ক। সেই ভানুবাবু থাকতেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে আমার নামের মিলের জন্যে প্রথমে সঙ্কোচ বোধ করতাম, এখন করি না। আপনার পরিচয় আমি একটু আগে অমলবাবুর কাছে শুনেছি, আসুন, লাঞ্চ রেডি।"

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে অর্জুন বুঝল, চা-বাগানের ম্যানেজাররা বেশ আরামেই থাকেন। সুন্দর সাজানো ড্রইংরুমের সোফায় বসে ছিলেন অমল সোম, সামনের গ্লাসে পানীয়, জিজ্ঞেস করলেন, "পথে কোথায় কোথায় নেমেছিলে?"

"আমি বেশি স্পিড নিতে পারিনি; অবশ্য এক জায়গায় একটু সময় নষ্ট হয়েছে।" অর্জুন বলল।

"আপনার শরীরের অবস্থা কেমন মেজর?"

"নামার সময় মনে হচ্ছিল কোমরের নীচটা নেই। হরিব্‌ল রাস্তা।"

"আমি এমনটা হবে আন্দাজ করেছিলাম। হাসিমারায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই ভানুবাবুর কথা মনে এল। কোনও-কোনও মানুষের সহ্যশক্তি সাধারণের চেয়েও বেশি। ভানুবাবুও তেমনই। তারপর এসে যখন জানতে পারলাম ওঁর স্ত্রী চন্দ্রিমা এখন কল্যাণীতে, তখন মনে হল আজকের দিনটায় এখানে জেঁকে বসা যেতে পারে।" অমল সোম হাসলেন।

"এ-কথা চন্দ্রিমা শুনলে দুঃখ পাবে। ও থাকলে আরও বেশি যত্ন করত।" ভানুবাবু প্রতিবাদ করলেন।

"আমি ওঁকে দুঃখ দিতে চাইনি। কিন্তু তিনটে উটকো লোককে উনি কেনই বা যত্ন করতে যাবেন!"

ভানুবাবু মাথা নাড়লেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "লাঞ্চের আগে কোনও ড্রিঙ্ক?"

মেজর মাথার ওপর হাত তুললেন, "নো। আমি, যাকে বলে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, ঠিক তাই।"

টেবিলে বসে খাবারের ব্যবস্থা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। খানসামা খাবার পরিবেশন করছিল। মেজর খেতে-খেতে 'দারুণ', 'ডিলিসিয়াস', ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করছিলেন। অমল সোম বললেন, "মেজর, ভানুবাবু এডমন্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্টে ইয়েতিব সন্ধানে গিয়েছিলেন।"

খাওয়া থামিয়ে মেজর কিছুক্ষণ তাকালেন, "বঙ্গ সন্তান হয়ে সাহেবকে বোঝাতে পারলেন, যা-যা দেখতে পাওয়া গেল না—তা নেই বলে ঘোষণা করা ঠিক নয়?"

"আমরা কোনও প্রমাণ পাইনি।"

"আপনারা না পেতে পারেন, আমি পেয়েছি। আমি একবার তেইশ হাজার ফুট উঁচুতে তিন রাত্তিব ছিলাম। প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের জন্যে না পারছিলাম এগোতে, না পিছোতে। আমার সঙ্গী ছিল অস্ট্রেলিয়ার ব্রায়ান নিকলসন। নাম-করা মাউন্টেনিয়ার। তৃতীয় দিনে ব্রায়ানকে টেন্টে রেখে আমি একটু বেরিয়েছিলাম বরফের কন্ডিশন বুঝতে। মিনিট তিনেক গিয়েছি, এমন সময় চিৎকার কানে আসতেই কোনও রকমে ফিরে এলাম টেন্টে। দেখলাম ব্রায়ান অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ওর জ্ঞান ফিরতেই ভয়ার্ত গলায় বলল, সেখানে থাকবে না। আমি বেরিয়ে যেতে সে টেন্টের বাইরে পা বাড়িয়ে চারপাশ দেখছিল, এমন সময় কেউ তার মাথায় আঘাত করে। ওকে যে টেনে টেন্টের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার দাগ তখনও স্পষ্ট। অবশ্য টিনফুডের কয়েকটা কৌটো ছাড়া কিছু খোয়া যায়নি। তবে বরফের ওপর আমি সেই পায়ের ছাপ দেখেছিলাম, হিলারি যাকে পাহাড়ি মানুষের পদচিহ্ন বলেছেন। বাট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, পাহাড়ি মানুষ ওই উচ্চতায় এবং অমন ওয়েদারে কাউকে আঘাত করার জন্যে নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়াবে না।" মেজর একটানা বলে গেলেন।

ভানুবাবু চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, "এই ঘটনায় প্রমাণ হচ্ছে না, যে আঘাত করেছিল সে একজন ইয়েতি। হিংস্র প্রাণী নিজের অজান্তেই অস্তিত্ব গোপন করতে পারে না। ব্রায়ানকে সে আঘাত করতে যাবে কেন? আর টিনফুডের ব্যবহার কোনও ইয়েতি জানে, এটাও—।" ভানুবাবু হাসলেন।

"তা হলে ওখানে কে গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ, সেটা রহস্য ! কিন্তু রহস্যের সমাধান হওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।"

অমল সোম এবার কথা বললেন, "এবার আমার সিদ্ধান্তে আসি। ইয়েতি নেই শুনতে ভাল লাগছে না। আবার একজন ইয়েতিকে বাক্সবন্দি করে চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়েছে ভাবলেও খারাপ লাগে। অতএব ওই রহস্যের সমাধান হওয়ার আগে ইয়েতি যেমন আছে তেমন থাকুক।"

মেজর মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার এখান থেকে নীলগিরির জঙ্গল কতটা দূরে ? গিয়েছেন কখনও ?"

ভানুবাবু মাথা নাড়লেন, "বড়জোর আধঘণ্টা লাগে। কাজেকর্মে যেতে তো হয়ই।"

"ওখানকার কোনও রহস্যের খবর রাখেন ?"

"যেমন ?"

"একটি ফুল আছে। তার গন্ধে যে বিষক্রিয়া হয়, তাতে একজন মানুষ মারা যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, এরকম একটা গুজব কানে এসেছে বটে কিন্তু প্রমাণ পাইনি।"

"ফুলটাকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন ?"

"না। তার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রয়েছে।"

অমল সোম বললেন, "মেজর ওই ফুলের সন্ধানে এসেছেন।"

"ইন্টারেস্টিং। আমি এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। নীলগিরির রেঞ্জারসাহেব আমার বিশেষ পরিচিত। আগামীকালই আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি। কিন্তু আপনি তো আমেরিকায় থাকেন। নীলগিরির খবরটা কী করে পেলেন ?"

মেজর জবাব না দিয়ে হাসতে লাগলেন এমন ভঙ্গিতে যে, গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এদিকের জঙ্গলে জীবজন্তু কীরকম আছে ?"

"আটত্রিশ রকমের প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

"মাই গড ! আটত্রিশ ?" মেজর বললেন।

"হ্যাঁ, ভালুকই তিন রকমের, শ্লথ ভালুক, কালো ভালুক আর হগ বিয়ার। এরা খুদি-খুদি ভালুক। আর্কটনিক্স কোলারিস। বাঘ সাত রকমের। সাধারণ বাঘ, চিতাবাঘ, ক্লাউডেড লেপার্ড, এদের বক্সা পাহাড়ে পাওয়া যায়, নিওফেলিস নেবুলোসা, লেপার্ড ক্যাট, জাঙ্গল ক্যাট, নেসার ক্যাট, সিভেট ক্যাট। কেউ-কেউ অবশ্য বিরল হয়ে আসছে। আমার বাগানে মাঝে-মাঝেই চিতার উৎপাত হয়। পাতা তোলার সময় শ্রমিকরা আক্রান্ত হলে ব্যবস্থা নিতে হয়। বাগানের মধ্যে আমাকে ফাঁদ পাততে হয়েছে। গত রাতেই সেই ফাঁদে একটা

প্রমাণ সাইজের চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে খবর দিয়েছি, তারা এসে সাহেবকে নিয়ে যাবেন।”

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বাইরের ঘরে এসে অর্জুনের মনে পড়ল। সে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, ব্যানার্জি টি গার্ডেন্সটা কোথায় ?”

“নীলগিরির ওপাশে।” ভানুবাবু জবাব দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর উত্তেজিত গলায় বললেন, “আপনি কি নীল চ্যাটার্জিকে চেনেন ?”

ভানুবাবু অবাক হয়ে তাকালেন, “সর্বনাশ ! নীলকে আপনারা চিনলেন কী করে ? বিশেষ করে আপনার তো ওকে চেনার কথাই নয় !”

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “লোকটা কে ?”

“ওই ব্যানার্জি টি কোম্পানির ভবিষ্যৎ মালিক। মিসেস ব্যানার্জির ভাই। কিন্তু এটাই ওর একমাত্র পরিচয় নয়। ডুয়ার্সের এই তল্লাটে এমন কেউ নেই, যে ওকে ভয় না পায়। ওর মন বলে কোনও বস্তু নেই।”

॥ পাঁচ ॥

সাধারণত একজন টি প্ল্যান্টার আর একজন সমশ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে কটু কথা বলেন না। ডুয়ার্স দার্জিলিং এবং আসামে যে-ক'টি চা বাগান আছে, তার মালিক ম্যানেজারের খবর প্রত্যেকের কম-বেশি জানা। একজন ভাল ম্যানেজার টানা একই বাগানে দীর্ঘকাল চাকরি করেছেন এমনটা অবশ্য খুব বেশি দেখা যায় না। যিনি ভাল কাজ জানেন, তাঁকে অন্য কোম্পানি বেশি মাইনে দিয়ে নিয়ে যায়। তাই কেউ চট করে অন্য বাগান সম্পর্কে মন্তব্য করে জনপ্রিয়তা হারাতে চায় না। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যানেজার হিসেবে সুনাম প্রচুর এবং সেইসঙ্গে ভদ্রলোক বলেও স্বীকৃত। তাই ব্যানার্জি টি এস্টেট সম্পর্কে তিনি আর মুখ খুললেন না। বললেন, “এবার আপনাদের বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আমার পাশের বাংলোয় সব ব্যবস্থা রয়েছে, চলুন ওখানে।”

অর্জুনের নীল-সম্পর্কিত কথাবার্তা চালিয়ে যেতে আগ্রহ ছিল। তার মনে পড়ল শিল্পসমিতি পাড়ার বরেন ঘোষালের ছোট ভাই ওই একই রকম বেপরোয়া গতিতে মারুতি চালায়। নীলের সঙ্গে ওর এত মিল কী করে হয় ? চা-বাগান এলাকায় মালিক এবং সেইসঙ্গে ম্যানেজারই সব ছিল এতকাল। দিন বদলালেও যা কর্তৃত্ব থেকে গেছে, তাতে নীলের পক্ষে নিজের এলাকায় যা করা সম্ভব, তা বরেন ঘোষালের ভাইয়ের পক্ষে জলপাইগুড়ি শহরে কী করে সম্ভব হচ্ছে ?

ওরা যে বাংলোয় গেল, সেটি কাঠের এবং বিশাল। সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা আছে। দোতলার বিরাট বারান্দায় চা-বাগানের দিকে মুখ করে চেয়ার টেবিল

পাতা। তার সামনে সিলিং-এ একটা প্রমাণ সাইজের মৌচাক ঝুলছে। মৌমাছিদের ভিড়ে সেটা টসটস করছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা কামড়ায় না ?"

ভানু ব্যানার্জি হাসলেন, "না। আমাদের খুব বন্ধু ওরা। তবে বিরক্ত করলে একটু-আধটু হুল ফুটিয়ে দিলেও দিতে পারে। প্রত্যেক বছর ওরা এখানে চাক বাঁধে।"

"আপনারা মধু পান ?"

"ইচ্ছে করলেই পেতে পারি, কিন্তু এই চাক ভাঙা হয় না। মধু শেষ হলে ওরা নিজেরাই উড়ে যায়, তখন চাক শূন্য। ওরা বোধ হয় সেটা জানে আর তাই আমাদের বন্ধু ভাবে।"

মেজর বললেন, "ইন্ডিয়ান মৌমাছিদের হুলে তেমন বিষ থাকে না হে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কোন মৌমাছি বেশি বিষাক্ত ?"

অমল সোম হেসে ফেললেন, "তুমি কী হে! কবিরা মৌমাছি নিয়ে কত সুন্দর কবিতা, গান লেখেন, আর তুমি তাদের বিষাক্ত বলছ ? হুল ওদের আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র মাত্র, কিন্তু ওরা বিষাক্ত হবে কেন ? নিজেদের মধ্যে কী সুন্দর ভাব দ্যাখো তো, শত-শত মৌমাছি কী চমৎকার একসঙ্গে আছে। আমরা সেটা ভাবতে পারি না। চলুন, ঘরে যাই।"

মৌমাছিদের সম্মিলিত আওয়াজ অদ্ভুত ভারী সুর তুলছিল। অর্জুন দেখল, বেশ কিছু মরা মৌমাছি নীচে পড়ে আছে। ওরা নিশ্চয়ই অসুস্থ অথবা বৃদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে, নিজেরা তো মারামারি করে না।

ভানু ব্যানার্জি অমল সোমকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। মেজর মৌমাছির চাকের নীচে চলে গেলেন। তাঁর মাথার ঠিক দু' হাত উঁচুতে চাকের শেষ। ওপর দিকে তাকাতেই কিছু একটা তাঁর নাকের ডগায় পড়ল। সেটা আঙুলে তুলে দেখে নিয়ে জিভে ঘষলেন মেজর। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল, "ডিলিসিয়াস! ভারী মধুর মধু।" তারপরেই সচেতন হয়ে বললেন, "সুহাসিনী বাগান থেকে নীলগিরির জঙ্গল খুব বেশি দূরে নয়, উনি তাই বললেন তো ?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"তা হলেও এই মৌমাছিগুলো কাছাকাছি থেকেই মধু সংগ্রহ করছে। যদি সেই বিষাক্ত ফুলের মধু ওরা আনত, তা হলে এতক্ষণে আমার মৃতদেহ দেখতে পেতে তোমরা।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "মৌমাছিরা সেই ফুলের কাছে গেলে গন্ধেই মারা যাবে, মধু নিয়ে আসবে কী করে ? তা ছাড়া সেই সব ফুলে মধু নাও থাকতে পারে।"

"কারেক্ট। তবে প্রকৃতির ব্যাপার তো, মৌমাছিরা নিশ্বাস বন্ধ করেও ফুলের বুকে ঢুকে পড়তে পারে। তবে ওই মধু সেই সব ফুলের নয়।" বলতে বলতে চাকের নীচ থেকে সরে এলেন মেজর। কয়েকটা মৌমাছি ওই সময়ে তাঁর

কাঁধ-মাথায় এসে বসেছিল, চলে আসামাত্র তারা উড়ে গেল।

দুটো ঘর। একটায় অমলদা, অন্যটিতে মেজরের সঙ্গে অর্জুন। অমলদা বললেন, "দেখছি, ওঁদের ভাব বেশি, একসঙ্গে থাকলে অনেক গল্প করতে পারবেন।" আসলে অমলদা একা থাকতে বেশি পছন্দ করেন, তা চমৎকার ঘুরিয়ে বললেন।

দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে মেজর প্রথমেই বললেন, "হুম, ব্রিটিশ কালচার।"

"তার মানে?" অর্জুন ব্যাগ রাখছিল।

"ফুটবল খেলার মাঠের মতো বেডরুম, বাথরুমটায় না গিয়েও বলতে পারি হাডুডু খেলা যাবে। সঙ্গে নিশ্চয়ই সাজগোজ করার ঘর আছে। দ্যাখো গিয়ে।"

অর্জুন দেখল এবং মিলে গেল মেজরের অনুমান। ভানু ব্যানার্জি এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়, "এদেশে চা-বাগানের চর্চা ব্রিটিশরাই শুরু করেছিল, তাই ওদের প্রভাব সর্বত্র থাকবেই। আচ্ছা, আমাকে এখন কাজে যেতে হচ্ছে, কোনও দরকার নেই তো?"

মেজর বললেন, "নাথিং। পেট ভর্তি খাওয়ার পর ভাল বিছানা পাচ্ছি, আর কিসের দরকার?"

অর্জুন বলল, "বাঘটাকে দেখা যাবে?"

ভানু ব্যানার্জি মাথা নাড়লেন, "নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, আমি আধঘণ্টা বাদে একটা জিপসি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওটা নিয়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারেন। ড্রাইভার ছেলেটি বেশ ওস্তাদ।"

ভানু ব্যানার্জির পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়ি থেকে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মেজর বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন, "আজকাল টের পাই, বুঝলে, বয়স হচ্ছে একটু-একটু করে। এখন শুতে পেলে আর কিছুর দরকার হয় না, আবার বেশিক্ষণ শোওয়াও যায় না। যন্ত্রণা। আধ ঘণ্টা পর ডেকে দিয়ো, সঙ্গে যাব, তাই চেঞ্জ করলাম না।"

কথা শেষ হওয়ামাত্র নাক ডাকতে লাগল মেজরের। একটা মানুষ কতটা ভাগ্যবান হলে এমন সহজে ঘুমাতে পারে এবং অন্যের ঘুম নষ্ট করে অনায়াসে, তা মেজরকে না দেখলে বোঝা যাবে না। অর্জুন বাইরে বেরিয়ে চেয়ারে বসে মৌচাকের দিকে তাকাল। মোটা-মোটা মৌমাছিরা জানালা দিয়ে উড়ে এসে চাকের গায়ে সেঁটে যাচ্ছে। পাশের গাছগাছালিতে পাখি ডাকছে। পৃথিবীটা কী সুন্দর এখানে!

অমলদা কিছু বললে সে আজ পর্যন্ত অবাধ্য হয়নি। সেই কারণে বলামাত্র এখানে চলে এসেছে। এখানে আসার কারণ হিসেবে সেই ফুলটার হদিস জানার কথা বলা হয়েছে, যার বুকের গন্ধে বিষ আছে। কিন্তু এ-ধরনের ফুল থাকলে এত দিন নাম শোনা যায়নি কেন? জঙ্গল যতই বড় হোক, ফরেস্ট

ডিপার্টমেন্ট থেকে তো সঙ্গে-সঙ্গে এলাকাটা ঘিরে ফেলে ফুলের গাছগুলো নষ্ট করে দেবে। তা দিচ্ছে না কেন ? যদি ধরে নেওয়া যায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ব্যাপারটা জানে না, তা হলে তো আরও অবিশ্বাস্য হবে। যেখানে বিষ ছড়াচ্ছে সেখানে কেউ জানে না, আর বিদেশের কাগজে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ছাপা হচ্ছে ? অবশ্য অমলদা যেখানে আছেন, সেখানে তার মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। অর্জুন ঠিক করল সে নিজেকে একজন টুরিস্ট ছাড়া কিছু ভাববে না। এ যাত্রায় নিছকই বেড়াতে আসা, এইভাবেই উপভোগ করবে। হঠাৎ ওর নজর গেল মৌমাছির চাকটার ওপর। চাকের নীচের দিকের একটা অংশ আচমকা ঝুলে পড়েছে। এমনভাবে ঝুলছে যে, নীচে পড়ে যাওয়া অনিবার্য। সঙ্গে-সঙ্গে একদঙ্গল মৌমাছি ওপরের অংশ থেকে উড়ে এসে ঘিরে ফেলল জায়গাটাকে। তারপর ধীরে-ধীরে আবার আগের আকারে নিয়ে গেল ওরা। অর্জুন মুগ্ধ হয়ে দৃশ্যটি দেখল। দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এ খবর ওরা কী করে পেল এবং সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার অভ্যেস কেমন করে তৈরি হল, তা নিয়ে ভাবতে গেলে কোনও থই পাওয়া যাবে না। শুধু এই শিক্ষা যদি মানুষেরা পেত !

অমলদা শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিলেন। সি এইচ স্টকলির লেখা 'স্টকিং ইন দ্য হিমালয়াজ অ্যান্ড নর্দার্ন ইন্ডিয়া।' খাঁচায় আটকানো চিতা বাঘ দেখার চেয়ে সেই বই পড়া নাকি বেশি সুখের, তাই তিনি গেলেন না। প্রায় নতুন জিপসিতে অর্জুন আর মেজর বসে পড়ল।

ড্রাইভারের নাম বৃন্দাবন। বয়স তিরিশের নীচে। কথা বলার জন্যে মুখিয়ে ছিল। ফ্যাক্টরি এলাকা ছাড়িয়ে চা-বাগানের মধ্যে ঢুকেই বলল, "সার, এর আগে চিতাবাঘের গায়ে হাত দিয়েছেন ?"

মেজর মাথা নাড়লেন, "চিতাবাঘ কি বাড়ির কুকুর যে, গায়ে হাত বোলাব ?"

"আমি বুলিয়েছি সার। আসলে খাঁচাটা ছোট তো, পেছন থেকে গায়ে হাত দিলে বাঘটা কিছু বলতে পারে না। এটা একদম খাঁটি চিতা।"

দূর থেকেই জায়গাটা বোঝা গেল। বেশ কিছু আদিবাসী মানুষ ভিড় করে আছে। জিপসি দেখে তারা একটু সরে দাঁড়াল। বৃন্দাবন তাঁদের নিয়ে এল খাঁচার সামনে। ফুট দশেক লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া একটা মজবুত খাঁচা জঙ্গলের মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে রাখা আছে যে, চট করে বোঝা যায় না। চিতাবাঘটি প্রমাণ সাইজের। দুটো থাবা সামনে রেখে চুপচাপ বসে মানুষ দেখছে। পাশে একটা ছাগলের অবশিষ্ট অংশ পড়ে আছে। ওই ছাগলটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

মেজর একটু ঝুঁকে এগোতেই চিতাবাঘটা চট করে সোজা হওয়ার চেষ্টা করল এবং সেইসঙ্গে চাপা গর্জন করে উঠল। মেজর হকচকিয়ে গিয়ে দু' পা পিছিয়ে এসে বললেন, "কী ব্যাপার !"

চিতা থাবা তুলে সামনের বন্ধ দরজায় আঘাত করল। চারপাশের দর্শকরা এতে খুব মজা পেল। এতক্ষণ জন্তুটা চুপচাপ বসে থাকায় তাদের আনন্দ হচ্ছিল না। বাঘটাকে খোঁচানো নিষেধ, তাই তারা ধৈর্য ধরে বসে ছিল। মেজরকে দেখে বাঘের প্রতিক্রিয়া হওয়ায় তারা উৎসাহিত হয়ে মেজরকে অনুরোধ করতে লাগল আবার খাঁচার সামনে এগিয়ে যেতে।

মেজর গম্ভীর মুখে দেখলেন লোকগুলোকে। তারপর অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা আমাকে কী মনে করছে? ক্লাউন? দেব নাকি তিম্পেনির ধমক?"

"সে জিনিসটা কী?"

"তিম্পেনির ঢাকের নাম শোনোনি? আফ্রিকায় খুব জনপ্রিয়। সেই ঢাক বাজলে জঙ্গলে-জঙ্গলে খবর ছড়িয়ে যায়। ওই ঢাক থেকেই আমার ধমক।"

"কিন্তু বাঘটা আপনাকে দেখে খেপে যাচ্ছে কেন বলুন তো?"

"খেপে যাচ্ছে? কোথায়? আবার সেই একই ভুল। গর্জন শুনেই মনে করলে খেপে যাচ্ছে? জন্তু-জানোয়ারের ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার চেষ্টা করো। ও আমার সাহায্য চাইছে।" মেজর বৃন্দাবনের দিকে তাকালেন, "ওকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কখন নিয়ে যাবে?"

"আজই নিয়ে যাওয়ার কথা।"

"এই এলাকায় আর কোনও বাঘ আছে?"

"আরও দুটো আছে।"

"তারা নিশ্চয়ই এর ধরা পড়ার কথা জেনে গেছে। এই খাঁচায় আর নতুন বাঘ ধরা পড়বে না। বড়সাহেবকে বলো এটাকে ছেড়ে দিতে।"

"ওকে ছেড়ে দিলে কুলিরা খেপে যাবে। গত সপ্তাহেই একটা বাঘ দু-দুটো গোরু মেরেছে। এখন বাগানের সবাই বাঘের ওপর খুব রেগে আছে। ওকে ছাড়া চলবে না।" বৃন্দাবন মাথা নাড়ল।

"তা হলে এখান থেকে বেরিয়ে চলো। বাঘটাব অসহায় অবস্থা দেখতে আমার ভাল লাগছে না।"

ওরা জিপসিতে বসতেই চিতা ডেকে উঠল। মেজরের চলে যাওয়া যেন বেচারা পছন্দ করছে না, এরকম মনে হচ্ছিল। বৃন্দাবন হেসে বলল, "আপনাকে ওর মনে হয় পছন্দ হয়েছে।"

মেজর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

খানিকটা যাওয়ার পর অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা একটু আশেপাশে ঘুরে আসতে চাই।"

"বলুন সার, কোথায় যাবেন?"

"সুহাসিনী বাগানের কাছেই কোনও জঙ্গলে পার্বতী বড়ুয়া নামে একজন বিখ্যাত মহিলা থাকেন।"

কথা শেষ করতে দিল না বৃন্দাবন, "বুঝেছি। পার্বতীদি কি এখন এদিকে আছেন ? চলুন, ঘুরে আসি। বেশি দূরে তো নয়।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "সেই লেডি উইদ অ্যান এলিফ্যান্ট ?"

"আমি যা শুনেছি, তা ঠিক হলে কম বলা হল। উনি গৌরীপুরের রাজ পরিবারের মেয়ে। ওঁর বাবার নাম ছিল প্রকৃতীশ বড়ুয়া।" অর্জুনকে কথা শেষ করতে দিল না বৃন্দাবন, "লালজি, ওঁকে লালজি বললে সবাই চিনত। একদম বুড়ো বয়সেও হাতি নিয়ে ঘুরতেন।"

"বড়ুয়া টাইটেল তো অসমের মানুষের হয় ?"

"গৌরীপুর অসমেরই। তবে প্রকৃতীশ বড়ুয়ার দাদা ছিলেন বাঙালির গর্ব। আমাদের বাংলা সিনেমার প্রথম দিকে যাঁর অবদান চিরস্মরণীয়, সেই প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন। আমি একটা ছবি দেখেছি, 'মুক্তি'।" অর্জুন বলল।

"মাই গড। আমার ফেভারিট হিরো ছিল হে। ওঁকে নকল করে একসময় আমি শার্ট বানাতাম, বড়ুয়া' কলার। রাজকুমার ছিলেন। আচ্ছা! ইন্টারেস্টিং। ওঁর ভাইঝি পার্বতী বড়ুয়া ?" মেজরকে এতক্ষণে বেশ উৎফুল্ল দেখাল। পিচের রাস্তায় গাড়ি ওঠামাত্র পঙ্কজ মল্লিককে নকল করে গাওয়ার চেষ্টা করলেন, "দিনের শেষে ঘুমের দেশে...।"

একটা ভাঙা ব্রিজের পাশ দিয়ে জিপসি নেমে গেল, ঝোরাতে এখন জল নেই। তারপর কাঁচা পথ ধরে এগোতে লাগল দুলতে-দুলতে। গাড়ির পেছনে ধুলোর ঝড় উঠেছে। এখন বিকেল, তবে সন্ধে নামতে কিছুটা সময় বাকি। মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর ওরা নীচের মাঠে একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পেল। বৃন্দাবন বলল, "যাক, পার্বতীদিদি আছে।"

"কী করে বুঝলে ?" মেজর জানতে চাইলেন।

"ওপাশে দেখুন, দুটো হাতি দাঁড়িয়ে আছে।"

জিপসির আওয়াজ পেয়ে গাছের তলায় দাঁড়ানো হাতি দুটো কান খাড়া করল। একজন কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। বাড়িটার কাছে এসে নিরাপদ দূরত্বে থেকে হর্ন বাজাতে লাগল বৃন্দাবন। খুব সাধারণ হালকা কাঠের বাড়ি। কোনও রকম জাঁকজমক নেই। তার দোতলার বারান্দায় একটি শীর্ণ শরীর দেখা গেল। বৃন্দাবন গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করল, "সাহেবের বন্ধুরা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। নিয়ে আসব ?"

মহিলা হাত নেড়ে আসতে বললেন। মেজর ফিসফিস করলেন, "এই সেই লেডি, আই মিন রাজকুমারী ?" অর্জুন জবাব দিল না।

ততক্ষণে মহিলা নীচে নেমে এসেছেন। ওরা নেমে এগিয়ে গেল। ফরসা, ছিপছিপে, রোগা বলাই ভাল, আটপৌরে চেহারার তিরিশের কাছাকাছি মহিলা তখন হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছাকাছি হতেই বললেন, "আসুন।

আপনারা ভানুদার বন্ধু যখন, তখন আমারও দাদা।"

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত প্রায়ই হয়, কিন্তু তাই বলে এইরকম ? অর্জুন ভেবেছিল এই পার্বতী বড়ুয়া হান্টারওয়ালী টাইপের কেউ হবেন, কিন্তু আটপৌরে শাড়ি পরা মহিলাকে দেখে দিদি ছাড়া কিছু ভাবা যায় না ! এঁরই ছবি 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফি'-র মলাটে ছাপা হয়েছে ?

খুব যত্ন করে পার্বতী ওদের দোতলার বারান্দায় নিয়ে এলেন। কয়েকটা বেতের চেয়ার আছে সেখানে। বৃন্দাবন নীচে রইল। পার্বতী জিজ্ঞেস করল, "চা খাবেন ? লেবু দিয়ে দেব, দুধ-চা দিতে পারব না। না কি কফি ?"

মেজর চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। এই জঙ্গলের মধ্যে একজন মহিলা এভাবে একা থাকতে পারেন, তা যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "চা কি আপনি করবেন ?"

"না, না। লেবু চা বলি, অ্যাঁ ?" তারপর বারান্দার এক কোণে গিয়ে নীচের দিকে মুখ করে কাউকে চা তৈরির নির্দেশ দিলেন। মেজর বললেন, "অদ্ভুত !"

ফিরে এসে পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন, "কে অদ্ভুত ?"

"আপনি এখানে একা থাকেন, ভাবতেই পারছি না !"

"অসুবিধে কোথায় ?" পার্বতী হাসলেন।

"আপনার ভয় লাগে না ?"

পার্বতী মাথা নেড়ে আঙুল তুলে দেখালেন, "ওরা আছে। জঙ্গলের দেবতা। ওরা সঙ্গে থাকলে আমি যমকেও ভয় পাই না।"

॥ ছয় ॥

দুটো হাতিকে সঙ্গী করে একজন মহিলা এমন নির্জন জঙ্গলে আছেন এবং তিনি নিজেকে বাঙালি ভাবেন। যদিও ওঁর কাজের মহিলা এখানে আছেন, কিন্তু সেই বৃদ্ধার থাকা আর না-থাকা একই। মেজর খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার অসুবিধে হয় না ?"

"না। কিসের অসুবিধে ? সবই তো আছে এখানে। নিজের নলকূপ, ইলেকট্রিক আনিয়েছি খুব লড়াই করে। খাই-দাই, বংশী বাজাই। অবশ্য প্রায়ই বেরিয়ে যেতে হয় এ-জঙ্গল সে-জঙ্গল। এখানে আর থাকি কতদিন ! এই মাসি থাকে। এদিকের মানুষ, সাহস খুব।"

পার্বতী বললেন, "আসুন, কাজের কথা বলি। এত কষ্ট করে এখানে এলেন কেন ?"

মেজর বললেন, "বিদেশের একটা কাগজে পড়েছি, এদিকের জঙ্গলে নাকি এখন এক ধরনের ফুল ফোটে, যার গন্ধ নাকে গেলে বড় জন্তুও মারা যায়। আসলে আমি একজন অভিযাত্রী। পৃথিবীর নানা প্রান্ত ঘুরেছি। অভিযান

করেছি মেরুতেও। খবরটা পেয়ে স্থির থাকতে পারলাম না।"

"ফুলটাকে পেয়েছেন ?"

"আমরা আজই জলপাইগুড়ি থেকে এখানে এসেছি।"

"কী জানি বাবা। এতকাল এখানে পড়ে আছি, কোনও দিন তো শুনলাম না এমন ফুলের কথা !"

"আপনিও শোনেননি ?" মেজর যেন অবিশ্বাস করলেন।

"না। কাগজে ওরকম উলটোপালটা কথা খুব লেখে। এই যেমন আমাকে নিয়ে বিদেশের কাগজ লিখল আমি নাকি ম্যাজিক জানি, তাই হাতিরা আমার কথা শোনে। একটা কাগজ লিখল আমি নাকি কুইন অব ফরেস্ট। ভাবুন ! কিন্তু আমার কাছে কেন ?"

একটু আগে, যখন পরিচয় হয়েছিল, তখন পার্বতী অর্জুনের দিকে কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। সে সত্যসন্ধান করে, জানার পরেও কিছু বলেননি। অর্জুন এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'আমি আপনার কথা খুব শুনেছি। আপনাকে দেখার আগ্রহ ছিল। বুদ্ধদেব গুহর লেখায় আপনার বাবার কথাও পড়েছি। এত কাছাকাছি যখন এলাম, তখন ঠিক করলাম আলাপ করতে হবে।"

এই সময় দুটো প্লেটে গরম-গরম হালুয়া এসে গেল। পার্বতী একটা বেতের টুলে ডিশদুটো রেখে বললেন, "নিন, খেয়ে নিন।"

মেজর তাকালেন, "সুজি ? মিষ্টি দেওয়া ?"

"আপনার মিষ্টি খাওয়া বারণ ?"

"হ্যাঁ, মানে, রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়ছে।"

"বাড়ুক। আপনাকে একটা টোটকা দিচ্ছি। সপ্তাহে দু' দিন বাজার থেকে একটা ছোট চারাপোনা কিনে আন৻ ,ন। মাছটা যেন জ্যান্ত হয়। ওর পিত্তিটা ঠিকঠাক বের করে পাকা কলার ভেতর ঢুকিয়ে খেয়ে নেবেন। সুগার বেশি থাকলে একদিন অন্তর খেতে হবে। দেখবেন অসুখটা আর শরীরে নেই। খান।"

মেজর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চারাপোনা মানে ?"

অর্জুন বলল, "রুই-মৃগেলের বাচ্চা। আপনাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব।"

ওরা সুজির প্লেটে হাত দিল। এক চামচ মুখে পুরে মেজর বললেন, "ডিলিসিয়াস।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "হাতির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কত দিনের ?"

"ছ' মাস বয়স থেকে। বাবার কোলে চেপে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরতাম। আমি যা জেনেছি, তা বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। ওঁকে সরকার খুব সম্মান করত, উপদেষ্টা করে রেখেছিল। তখন আবহাওয়া অন্যরকম ছিল। এখন

বেশির ভাগ মানুষ দায়িত্বহীন। জঙ্গলকে না ভালবেসে ফরেস্টের চাকরি করে। এই কিছু দিন আগে রাত্তিরবেলায় জিপ এল আমার কাছে। শুনলাম মাদারিহাট জঙ্গলে একটা হাতি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গেলাম। সারা রাত থেকে হাতিটাকে সুস্থ করে তুললাম। এর পরে কী-কী করতে হবে, বলে এলাম। কিন্তু নিশ্চয়ই তা করেনি। পরে খবর পেলাম বেচারা মরে গেছে। এসব দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়।"

"আমি শুনেছি ভুটান থেকে একদল মানুষ আসে হাতি ধরার জন্যে।"

"হ্যাঁ। ওরা আমার বাবার আমল থেকে আসে। বছরে দু'-তিন মাস। অদ্ভুত ধৈর্য। সরকার যে-ক'টা বাচ্চা হাতি চান, ত: আমি ওদের নিয়ে ধরে দিই। যে টাকা পাওয়া যায়, তার অনেকটাই ওদের দিয়ে দিই। জীবন বিপন্ন করে রোজগার করতে হয়।"

"বিপন্ন বলছেন কেন ?"

"যে-কোনও মুহূর্তেই, একটু অসতর্ক হলে প্রাণ যাবে বনের হাতির পায়ে।"

"আপনার কথা সেই হাতি শুনবে না ?"

"শোনে কখনও ? যে মা জানছে তার বাচ্চাকে আমি নিতে এসেছি, সে কখনও আমাকে পছন্দ করবে ? কক্ষনো না। সে অনেক গল্প। নিন, চা খান।"

চা এসেছিল। কাপে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি সুন্দরকে চেনেন ?"

"কোন সুন্দর ?"

"কাছাকাছি কোনও গ্রামে থাকে। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাখি ধরে।"

পার্বতীর মুখ আচমকা কঠিন হয়ে গেল, "ওকে আপনি চিনলেন কী করে ?"

"দু' দিন আগে ওকে দেখেছি জলপাইগুড়িতে। অদ্ভুত ধরনের পাখি খাঁচায় করে নিয়ে গিয়েছিল বিক্রি করতে। আমি ওকে পুলিশে দিতে চেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ও কথা দিয়েছে, চাকরি পেলে আর পাখি চুরি করবে না। আমার সঙ্গে ডি এফ ও-র কথা হয়েছে। তাই ওর খোঁজ করছি।" অর্জুন বলল।

"আপনি কি মনে করেন চাকরি পেলে সুন্দর পালটে যাবে ?"

"ও শপথ করে তাই বলেছে।"

"কী জানি! তবে আজকাল বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। লোকটা একটা ক্রিমিন্যাল। প্রথম-প্রথম টিয়া, ময়না ধরত। সংসারী মানুষের শখ মেটাতে ওই সব পাখিদের খাঁচায় ঢুকতে হত। তারপর কানে এল সুন্দর আর টিয়া, ময়না ধরে না। ও ধরছে হিল প্যার্ট্রিজ, লেসার ফ্লোরিকান অথবা রিটার্ন। আমি অনেক বলেছি, কিন্তু কানে তোলেনি। শুনেছি, মাঝে-মাঝেই ওর কাছে গাড়ি চালিয়ে লোকজন আসে। কী বলে তা জানি না, কিন্তু অবস্থা ফিরে যাচ্ছে সুন্দরের। ওই সব পাখি ধরার জন্যে ওর যেমন শাস্তি হওয়া উচিত, তেমনই

যারা ওর কাছে পাখিগুলো কেনে, তাদেরও জেলে পাঠানো দরকার।"

"সুন্দর রায় কোথায় থাকে?"

"বেশি দূরে নয়। আমার বাড়িতে আসতে যে ভাঙা ব্রিজটা দেখলেন, তার থেকে সিকি মাইল মাদারিহাটের দিকে গেলে ডান হাতে ছোট্ট গ্রাম পাবেন। এদিকে পায়ে হাঁটা পথ আছে, আরও কম দূরত্বের। আমি তো আজকাল ওর মুখ দেখতে চাই না।"

"কিন্তু ও আপনার নাম করেছে। এমনভাবে বলেছে যাতে মনে হয় সম্পর্ক ভাল।"

"বদমাশ! আসলে ও জানে, আমি ওর বউ-ছেলেকে ভালবাসি। যখন ওর রোজগার ছিল না তখন ওদের ডেকে এনে খাওয়াতাম। সুন্দরের ছেলেটা হাতির সঙ্গে থাকতে খুব ভালবাসে। হাতির কাজ শিখতে চায়। মাত্র সাত বছর বয়স কিন্তু স্বচ্ছন্দে হাতির পিঠে উঠে যায়। দেখুন, ওর বাপকে যদি চাকরি করাতে পারেন, তা হলে পরিবারটা রক্ষা পায়।"

কথা বলায় ব্যস্ত থাকলেও পার্বতীর কান যে পরিষ্কার, তা বোঝা গেল। তিনি আপন মনে বললেন, "এই সময়ে আবার কে আসছে!"

খুব ক্ষীণ একটা আওয়াজ এগিয়ে আসছিল। আওয়াজটা গাড়ির ইঞ্জিনের। তারপরেই ওরা গাড়িটাকে দেখতে পেল। নীল মারুতি। বাঁক নিয়ে যেই দেখল আর-একটি জিপসি দাঁড়িয়ে আছে, অমনি মারুতিটা থেমে গেল। মারুতিতে দু'জন আরোহী। তারপরই হর্ন বাজাল।

অর্জুন দেখল আওয়াজ হওয়ামাত্র হাতিদুটো ধীরে-ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে। তাই দেখে তাদের ড্রাইভার চটপট গাড়িতে উঠে বসল। একেবারে বাড়ির সামনে পৌঁছে হাতিদুটো স্থির হয়ে দাঁড়াল। যেন তাদের অতিক্রম করে কেউ যেন পার্বতীর কাছে পৌঁছ না পারে এমন ভঙ্গি। মারুতির লোকদুটো কী করবে বুঝতে পারছিল না। হাতিদুটোর ভঙ্গি ওদের সাহস কেড়ে নিয়েছে। একজন চিৎকার করল, "ওখানে কেউ আছেন?"

পার্বতী উঠে ব্যালকনির একধারে এগিয়ে গেলেন, "কী চাই ভাই?"

"আপনি পার্বতী বড়ুয়া?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সুন্দর কি এখানে এসেছে?"

প্রশ্নটা শুনে অর্জুন চমকে তাকাল। এবং তারপরেই সে চিনতে পারল। অমলদার খবর নিয়ে হাবু যে-সকালে তাকে ডাকতে গিয়েছিল, সেই সকালেই ওই নীল মারুতিটাকে সে জলপাইগুড়ির রাস্তায় বেপরোয়া চালাতে দেখেছে। এক ঝলক যে-মুখটাকে সেদিন দেখেছিল, তার সঙ্গে আজকের ড্রাইভারের কোনও পার্থক্য নেই। রামদা বলেছিলেন বরেন ঘোষালের ছোট ভাই।

পার্বতী চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, "এখানে সে আসবে কেন?"

"সেটা আপনি জানেন। আমরা খবর পেলাম ও এখানে আসতে পারে, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"আপনারা কারা ?"

এবার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না ওরা। ওই ছোট রাস্তাতেই গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে গেল দ্রুতগতিতে। গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ামাত্র কচি গলায় অদ্ভুত শব্দ বাজল। অর্জুন দেখল হাতিদুটো বেশ সহজ হয়ে শুঁড় নেড়ে ফিরে যাচ্ছে নিজের জায়গায়। আর পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একটি বাচ্চার সঙ্গে ঘোমটা টানা মহিলা।

পার্বতী বললেন, "নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল হয়েছে। সুন্দরের বউ-ছেলে আসছে।"

বাচ্চাটা এদিকে না এসে হাতিদের কাছে চলে গেল। নিজের মনে কথা বলে চলেছে সে। একটা হাতি বসে পড়তেই সে চট করে পিঠে উঠে একেবারে আকাশের দিকে মুখ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। মহিলাটি সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়াতেই পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ? সুন্দরের কী হয়েছে ?"

মহিলা দিশি ভাষায় জড়ানো গলায় যা বলল, তার সারার্থ হল : এবার শহর থেকে ফিরে এসে সুন্দরের হাবভাব পালটে গিয়েছিল। কেবলই বলত, অনেক অন্যায় করেছি, আর নয়। এবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ঘর থেকে বের হত না। গম্ভীর মুখ দেখে মহিলা কিছু বলতে সাহস পায়নি। গতকাল হাসিমারা থেকে একটা লোক এসেছিল ডাকতে, সে দেখা করেনি। স্ত্রীকে বলেছিল বলতে, বাড়ি নেই। লোকটা বলে গিয়েছিল সুন্দর যেন নীলুবাবুর সঙ্গে দেখা করে। শোনার পর বেশ ভয় পেয়ে যায় সুন্দর। স্ত্রীকে বলে, কিছু দিনের জন্য সে এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যাবে। দরকার হলে আরও ভেতরে ভুটানের জঙ্গলে ঢুকে যাবে। যা টাকা আছে, তাতেই বউ যেন কোনও মতে চালিয়ে যায়। জলপাইগুড়ি থেকে কেউ যদি তাকে চাকরি করার জন্য খোঁজ করে, তা হলে বলতে হবে পরে দেখা করবে। মহিলা অনেক জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও সুন্দর কারণ বলেনি। আজ একটু আগে ওই নীল গাড়িটা সুন্দরের খোঁজে এসেছিল। ও সঙ্গে-সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। এখন দুশ্চিন্তায় মাথা ঠিক রাখতে পারছে না মহিলা। তাই ছেলেকে নিয়ে ছুটে এসেছে পার্বতীর কাছে।

সব শোনার পর পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কথা ওদের কে বলেছে ? তুমি ?"

মহিলা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। কারণ, একটা লোক এমন শাসাচ্ছিল যে, মহিলা মনে করেছিল দিদির কাছে পাঠিয়ে দিলে ওরা শায়েস্তা হয়ে যাবে।

পার্বতী ঘুরে দাঁড়ালেন, "কী করি বলুন তো। এই মেয়েটার স্বামী হল সুন্দর রায়। নিশ্চয়ই কোথাও কোনও অন্যায় করে এসেছে, তাই লোকজন ওকে

খুঁজছে। এখন উপায় না দেখে বউ-ছেলেকে ফেলে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। এইরকম লোককে কখনও বিশ্বাস করা যায় ?”

অর্জুন বলল, “আপনি যা ভাবছেন, তা নাও হতে পারে। শুনলেন তো, শহর থেকে ফিরে আসার পর ওর মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল। লোকটার মধ্যে অন্যায়বোধ ছিল, হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলার পর সেটা বেড়ে যাওয়ায় ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। এই লোকগুলো হয়তো কোনও অন্যায় কাজে লাগাতে চায় বলেই ও জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। সুন্দরকে না পেলে এর কারণ জানা যাবে না। তা ছাড়া ওই নীলগাড়ির ড্রাইভার লোক ভাল নয়। ওর সম্পর্কে শহরের লোকদের ধারণা ভাল নয়।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “কে ও ?”

“জলপাইগুড়ির শিল্পসমিতি পাড়ায় বরেন ঘোষালের ছোট ভাই। উনি থাকেন বোম্বাইয়ে, সম্প্রতি উদয় হয়েছেন। কিন্তু—” অর্জুন হঠাৎ চুপ করে গেল। সে দুটো মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কী হতে পারে ভেবে পাচ্ছিল না। মেজর বললেন, “সেন্টেন্স শেষ করোনি।”

“ওই মহিলা বললেন একটা লোক এসে হুকুম করে গিয়েছিল, নীলুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। এই নীলুবাবুর পরিচয় আপনি জানেন ?” অর্জুন পার্বতীকে জিজ্ঞেস করল।

পার্বতী মাথা নাড়লেন, “ব্যানার্জি টি এস্টেটের ওনারের ভাই। শুনেছি খুব বাজে লোক, কিন্তু আমার সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি।”

“বাঃ। নীলুবাবুর সঙ্গে বরেন ঘোষালের ছোটভাইয়ের একটা যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। গাড়ি চালানোর ব্যাপারে দু'জনের তো চমৎকার মিল। কিন্তু এই জঙ্গলে কোনও মানুষের পক্ষে বেশি দিন লুকিয়ে থাকা কি সম্ভব ? যত দূর জানি, এদিকের জঙ্গলে ফলটল তেমন নেই।” অর্জুন বলল।

“ঠিকই শুনেছেন। মানুষ যেসব ফল খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা পাওয়া যাবে না। তবে মাটির নীচে যেসব হয়, যেমন শাঁকালু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। তাই সুন্দরকে খাবারের জন্য বেরিয়ে আসতেই হবে। তবে এদিকে সে নাও আসতে পারে। জঙ্গলের বুকেই ছোট-ছোট পাহাড়ি গ্রাম আছে। সেখানেই যাওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এদের এখন কী বলি!” পার্বতীকে চিন্তিত দেখাল। তিনি ব্যালকনি থেকেই গলা তুললেন, “ঠিক আছে। তুমি ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। মনে হয়, রাত নামলে সুন্দর বাড়িতে ফিরে যাবে। আর যদি না যায়, তা হলে কাল সকালে এসো। বাচ্চাটাকে কিছু খাইয়েছ ?”

“হ্যাঁ। কিন্তু যে-টাকা ও শহর থেকে পাখি বিক্রি করে এনেছে, তাতে হাত দেইনি। ও বলেছে, পাপের টাকা।”

“সেই টাকা কোথায় ?”

"হাঁড়িতে রেখে দিয়েছে।"

পার্বতী একটু চিন্তা করলেন, "তা হলে ও এখানে থাক। তুমি জামা-কাপড় নিয়ে চলে এসো।"

মহিলা দ্রুত জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। ওপাশে ছেলেটা তখনও হাতির পিঠে শুয়ে আছে। মেজর সেটা লক্ষ করে মন্তব্য করলেন, "জুনিয়ার টারজান।"

পার্বতী চিৎকার করলেন, "মধু, নেমে আয়। সন্ধে হয়ে আসছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর যে সংখ্যায় আপনার ছবি ছাপা হয়েছিল, সেটা কি এখানে আছে? থাকলে দেখতাম।"

পার্বতী ভেতরে চলে গেলেন। এই সময় দূরে রেলের কয়লার ইঞ্জিনের হুইস্‌ল শোনা গেল। আর তারপরই চরাচর কাঁপিয়ে একটা রেলগাড়ি দূরের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেল আসামের দিকে। শেষ আলোয় মাখামাখি আকাশ এবং জঙ্গলের পটভূমিকায় রেলগাড়ির চলন্ত দৃশ্য কী মনোরম! ছেলেটা চট করে হাতির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সেই রেলগাড়ির ছুটে যাওয়া দেখছিল। হঠাৎই অর্জুনের মনে পড়ে গেল পথের পাঁচালির অপুর রেলগাড়ি দেখার দৃশ্য। ওই ছেলেটার সঙ্গে অপুর এই মুহূর্তে কোনও পার্থক্য নেই। দু'জনের চোখের অভিব্যক্তি একই।

পার্বতী একটা ঝকঝকে রঙিন পত্রিকা নিয়ে এলেন। পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান পত্রিকা, যার মলাটে হাতির পিঠে বসে থাকা পার্বতীকে দেখা যাচ্ছে। পার্বতী সম্পর্কে একটা সুন্দর ক্যাপশন রয়েছে মলাটে। ভেতরেও তাঁকে নিয়ে অনেকটা লেখা।

"এটা বের হওয়ার পর কেউ যোগাযোগ করেনি আপনার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, বিদেশিরা করেছেন। তাঁরা ক্যামেরা নিয়ে আসেন টিভির জন্যে। এই তো, বিখ্যাত এক ইংরেজ সাহেব আসছেন দিল্লিতে। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর অফিসের লোকজন আমাকে দিল্লিতে যেতে লিখেছেন। কে যাবে? আমার কাজ নেই নাকি? যাদের দরকার, তাঁরা আসুন আমার কাছে। আমি কেন যাব? তাই জানিয়ে দিয়েছি।"

অর্জুনের খুব শ্রদ্ধা বাড়ল। সে বলল, "দিদি, আপনার কাছে আবার আসব।"

"আসুন ভাই। এসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে একা থাকতে ভয় লাগে কি না। বনের জন্তুকে আমি মোটেই ভয় করি না। ভয় মানুষকে। মানুষের মতো লোভী জানোয়ার ভগবান আর সৃষ্টি করেননি।"

॥ সাত ॥

সন্ধের পরেই চা-বাগানের শ্রমিক-পল্লীতে মাদল বাজে। আজ হালকা জ্যোৎস্না উঠেছে। বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে অমল সোম বললেন, "পার্বতীকে কখনও দেখিনি, কিন্তু ওর বাবা লালজিকে আমি ভাল চিনতাম। ভানুবাবু, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল?"

ভানু ব্যানার্জি এখন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে দিব্যি বাঙালি হয়েছেন, বললেন, "হ্যাঁ। ভালই আলাপ ছিল। সারা জীবন জঙ্গলে ঘুরেছেন রাজবাড়ির ছেলে হয়েও, প্রচুর ইন্টারেস্টিং গল্প শোনা যেত। ওঁর মেয়ে এই পার্বতীটা অনেকখানি বাবার স্বভাব পেয়েছে।"

অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। হালকা সরের মতো জ্যোৎস্নায় গাছপালায় ঘেরা বাংলোর চৌহদ্দিকে কী মনোরম মনে হচ্ছে। হঠাৎ অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুন, তুমি ওই সুন্দর নামের পাখি-চোরটার জন্য চাকরির চেষ্টা করেছ, তুমি কি মনে করেছ ও শুধরে যাবে?"

অর্জুন মুখ ফেরাল, "যেতে তো পারে। শুনলাম, জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসে লোকটার প্রচণ্ড পরিবর্তন হয়েছে। ঘর থেকেই বের হয়নি। তারপর পুরনো লোকজন দেখা করতে চায় বলে সে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। আমার তো মনে হয়, ওকে সাহায্য করা উচিত।"

"বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না বলে সে জঙ্গলে গিয়ে লুকোবে কেন?"

"হয়তো ওর সেই সব বন্ধু অন্যায় কাজকর্ম করে থাকে।"

"সেই কাজে যাদের ওকে প্রয়োজন, তাদের ছায়া এড়িয়ে সে কতদিন লুকোতে পারবে? হ্যাঁ, ওই যে নীলুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে লোকগুলো, তিনিই কি ব্যানার্জি টি গার্ডেন্সের পরবর্তী মালিক নীল চ্যাটার্জি? ওঁর যে আচরণ রাস্তায় তোমরা দেখেছ, তার সঙ্গে অবশ্য এই সুন্দরের মতো লোককে দেখা করতে বলা চমৎকার মানিয়ে যায়।" অমলবাবু বললেন।

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "কিন্তু মিস্টার সোম, নীলের দিদি মিসেস ব্যানার্জি কিন্তু খুব ভালমানুষ। বরং ওঁর স্বামী অশ্বিনী ব্যানার্জি খুব কড়া ধাতের লোক ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় নীল দু-একবার দিদির কাছে এসেছে মাত্র, পাকাপাকিভাবে থাকতে পারেনি। অশ্বিনী ব্যানার্জির মৃত্যুর পর দিদিকে সাহায্য করতে এদিকে চলে আসে সে।"

অর্জুন বলল, "আমাদের সঙ্গে যে বৃদ্ধলোকটি কথা বলেছেন, তাঁর নাম হরপ্রসাদ সেন।"

ভানু ব্যানার্জি মাথা নাড়েন, "হ্যাঁ, মিস্টার সেন অনেক প্রবীণ মানুষ। একসময় চা-বাগানের ম্যানেজারি করতেন। নীল তাঁকে পছন্দ না করলেও মিসেস ব্যানার্জির অনুরোধে উনি অফিসের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। আমি

বলি কী, এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।"

মেজর চুপচাপ শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন, "কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি, চা-বাগানের মালিকদের তো প্রচুর পয়সা। নীল চ্যাটার্জি মালিক হতে যাচ্ছেন, নীল মারুতিতে চড়েন। তিনি কেন সুন্দরের মতো একটা পাখিচোরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন?"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "নীল কখন কী করবে তা প্রেডিক্ট করা মুশকিল। আমি ওকে হাইওয়ের ধারে পাঞ্জাবি ধাবায় বসে আড্ডা মারতে দেখেছি। ব্যানার্জি টি গার্ডেন্সে এখন কোনও শ্রমিক বিক্ষোভ নেই। গত বছরে বিক্ষোভ করতে পারে এমন তিনজন শ্রমিক নেতার মৃতদেহ তোর্সা নদীর চরে পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ খুনিকে ধরতে পারেনি, কিন্তু শ্রমিকরা বুঝে গিয়েছে বিক্ষোভ জানালে তাদেরও একই অবস্থা হবে।"

মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ যে দেখছি ডিক্টেটরশিপের চেয়েও খারাপ অবস্থা। পুলিশ কী জন্য আছে? আপনারা ওর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন না কেন?"

ভানু ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন, "দেখুন, শহর, গ্রাম-গঞ্জের সঙ্গে চা-বাগানের পার্থক্য হচ্ছে, এখানে গাছপালা বেশি, মানুষ কম। যে মানুষেরা থাকেন তাঁরা এক-একটা ছোট গোষ্ঠীতে, চা-বাগানকে কেন্দ্র করে। কিছু দিন আগেও পুরো ডুয়ার্স, ম্যানেজারের শাসনে শাসিত হত। এখনও আমরা অন্য বাগানের সমস্যায় নাক গলাই না। তার জন্যে অ্যাসোসিয়েশন আছে। নীল চ্যাটার্জি যতক্ষণ আমাকে বিব্রত না করছে, ততক্ষণ আমি আমার বাগান নিয়েই ব্যস্ত থাকব। যাকগে, আপনারা কি কালই নীলপাড়া ফরেস্টে যেতে চান?"

অমল সোম বললেন, "সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে।"

"আপনারা আমার এখানে থেকেও যাতায়াত করতে পারেন। একটু সময় লাগবে হয়তো...।"

"মধু চা-বাগান কীরকম? এ পি রায় ওখানে বোধ হয় আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন।"

"মধু থেকেও বেশ কিছুক্ষণ লাগবে। আপনারা ফরেস্টের ভেতরে থাকতে চান? একটা বাংলো আছে, কোচবিহার থেকে বুক করতে হয়। আমি সেই চেষ্টা করতে পারি।"

মেজর বললেন, "দ্যাট্স গুড। জঙ্গলের ভেতর থাকার থ্রিলই আলাদা। তারপর এদিকে এসে যখন শুনলাম চিতা-টিতা আছে, তখন আমি ওই বাংলোয় থাকতে চাই।"

কোচবিহার থেকে অনুমতি আনতে দুপুর হয়ে যাবে। ঠিক হল, লাঞ্চ সেরে ওরা এখান থেকেই জঙ্গলে চলে যাবে। ডিনার শেষ করে শুতে যাওয়ার সময় ভানু ব্যানার্জি তাঁর বাংলোর বেয়ারার হাত দিয়ে চিরকুট পাঠালেন। তাতে

লেখা, তিনি কোচবিহারের ডি এফ ও-র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। অমল সোমের কথা বলতেই ভদ্রলোক জানিয়েছেন, আগামিকাল সকালে তিনি নিজেই চলে এসে বাংলোর ব্যবস্থা করে দেবেন।

চিরকুটটা পড়া হলে মেজর সপ্রশংস গলায় বললেন, "বাঃ, এদিকের কর্তারা দেখছি আপনাকে খুব খাতির করে। আপনার জন্যে গর্ব হচ্ছে মশাই।"

অমল সোম কোনও কথা বললেন না।

সকাল সাড়ে দশটায় কোচবিহারের ডি এফ ও অনুপম ত্রিবেদী জিপ নিয়ে এলেন। অমল সোমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর তিনি যে সেই ঘরে ঢুকেছেন, আর বেরনোর নাম নেই। ভদ্রলোকের এত কী কথা থাকতে পারে, বারান্দায় বসে মেজর ভেবে পাচ্ছিলেন না। অর্জুনকে তিনি বললেন, "ব্যাপারটা কী, জানো ?"

"কোন ব্যাপার ?"

"জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এখানে জেলার ফরেস্টের বড়কর্তা স্বয়ং এসে আলোচনায় বসেছেন, রহস্যময়।"

অর্জুন বলল, "অমলদা নিজে থেকে না বললে আপনাকে চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে, কখন রহস্যের সমাধান হয়। তবে ডি এফ ও সাহেব এসেছেন যখন, তখন ফরেস্ট বাংলোয় আরামে থাকা যাবে। এদিকের বাংলোর বাবুর্চিরা দারুণ মুরগির মাংস রান্না করে।"

"মুরগি ?" মেজর সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর দাড়িগোঁফের আড়াল ভেদ করেও অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল, "মুরগি খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি হে।"

"কিন্তু আপনি তো পাঁঠার মাংস খান !"

"খাই। কেননা ইন্ডিয়ান পাঁঠার মতো নির্বোধ প্রাণী পৃথিবী থেকে চলে গেলে কোনও ক্ষতি হয় না। তুমি কত বড় মুরগি দেখেছ ?"

"বেশ বড়, দু'-আড়াই কেজি হবে।"

"দুর ! আমি অবশ্য ওজন নিতে পারিনি, দাঁড়িপাল্লা ছিল না। তবে চারজন পোর্টার বেশ কসরত করে ওকে তুলেছিল। ঘটনাটা বলি শোনো : সেবার আফ্রিকায় গিয়েছি বিশ্রাম নেব বলে। আমার বন্ধু লোপেজ থাকত জাইরে নদীর কাছে। সারা বছর বৃষ্টি হয় সেখানে। লোপেজের সঙ্গে আমি কিনসামা শহর থেকে আশি মাইল দূরে এক জঙ্গলে তাঁবু ফেলে তোফা ছিলাম। লোপেজ বলেছিল, বৃষ্টি বেশি হলেও সাপখোপ ছাড়া হিংস্র প্রাণী ওদিকে বড় একটা নেই। একদিন বৃষ্টি নেই দেখে জাইরে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। চারপাশে মাথাসমান ঝোপ। হঠাৎ শব্দ শুনে দেখি একটা উটপাখির মতো প্রাণী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। লোপেজ বলল, "পালাও। এরা মাঝে-মাঝেই হিংস্র হয়। আমরা দৌড়তে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটা

পেছনে ধাওয়া করল কঁক-কঁক করতে করতে। এমন বীভৎস গলা আর ডানার আওয়াজ আমি জীবনে কখনও শুনিনি ! প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে লোপেজ গুলি চালাল। দুটো গুলিতেই ওটা পড়ে গেল ধুপ করে। তখন কাছে গিয়ে দেখলাম উটপাখি নয়, মুরগি।" মেজর চোখ বন্ধ করে বলে গেলেন।

"মুরগি আপনাদের তেড়ে এসেছিল ?"

"ইয়েস মাই বয়। পুঁচকে মুরগিগুলোকে দ্যাখোনি শত্রু দেখলে তেড়ে যেতে ? তা লোপেজের লোকেরা কোনওমতে ওটাকে বয়ে নিয়ে এল তাঁবুতে। ধুমধাম করে মাংস রান্না করল। কিন্তু মুখে দিয়েই মন খারাপ হয়ে গেল। ওই বিশাল পাখির তেজস্বী ভঙ্গি মনে পড়ে যেতে আর খেতে পারলাম না। সেই থেকে আমার জীবনে মুরগি বন্ধ।"

"ওটা সত্যিই মুরগি, না অন্য কিছু ?"

মেজর পিটপিট করলেন, "তুমি কখনও আফ্রিকায় গিয়েছ ?"

"না।"

"বিবর্তনের নিয়ম মেনে পৃথিবীর সব প্রাণী ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এই যে হাতি দেখতে পাও, এদের হাজার পুরুষ আগের চেহারাটা কল্পনা করো। পাহাড়ের মতো। সেইজন্যে হাতির সঙ্গে পাহাড়ের উপমা এখনও দেওয়া হয়। কিন্তু সময় ওদের ছোট করে দিয়েছে। একটা টিকটিকি কুমিরের চেয়ে বড় ছিল আকৃতিতে। মুরগির ক্ষেত্রে তাই হওয়া স্বাভাবিক। তা আফ্রিকায় এখনও কিছু প্রাণী অতীতের ছায়া ধরে রেখেছে। ওটা মুরগিই।"

"তা হলে তো আপনার ওখানে খাওয়ার কষ্ট হবে। ডালভাতের ওপর থাকতে হতে পারে।"

মেজর হাসলেন, "কুছ পরোয়া নেই। আমার স্টকে কিছু সার্ডিন আছে। তাই দিয়ে চমৎকার ভাত খাওয়া যায়—সার্ডিনের বাটিচচ্চড়ি আর ভাত।"

"সার্ডিন মাছ ?"

"ইয়েস মাই বয়। টিনে প্যাক করা। সবসময় সঙ্গে রাখি। তবে ওরা যেভাবে খায়, সেভাবে নয়। মাছটাকে টিন থেকে বের করে দিশি প্রথায় বাটিচচ্চড়ি বানিয়ে নিয়ে ভাতের ওপর ঢালো। আহা !" মেজর যেন এখনই তার স্বাদ পেয়ে গেলেন।

এই সময় অমল সোমের ঘর থেকে দু'জনে বেরিয়ে এলেন।

অমল সোম অনুপম ত্রিবেদীর সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিলেন। 'হ্যান্ডসাম' শব্দটা চট করে মনে এল অর্জুনের। মিস্টার ত্রিবেদী বললেন, "আপনার কথা আমি শুনেছি অর্জুনবাবু। পরিচয় হওয়ায় খুশি হলাম। আপনারা যে আমাদের জঙ্গলে থাকবেন, সেইজন্য গৌরবান্বিত বোধ করছি। শুনলাম এখানে আসার সময় নীল চ্যাটার্জির সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয়েছে।"

"আলাপ ?" মেজর খেপে গেলেন, "লোকটা আমাকে অপমান করেছে। একবার হাতের কাছে পেলে এমন শিক্ষা দিতাম যে, বাছাধন টাইট হয়ে যেত !"

"আপনারা বেড়াতে এসেছেন, ওসব না করাই ভাল। নীল আমাদের কাছেও সমস্যা। জঙ্গলের নিয়মকানুন মানছে না। অথচ ওর বিরুদ্ধে এমন কোনও সাক্ষী জোগাড় করতে পারিনি যে, আমরা ব্যবস্থা নেব। ওহো, আপনি যে ফুলের সন্ধানে এসেছেন, তার নাম কী ?"

মেজর বললেন, "বুনো ফুল। বাংলা নাম জানি না। তবে আমি নাম রেখেছি বিষগন্ধা।"

ত্রিবেদী বললেন, "কয়েকটা মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে অবশ্য এসেছে এবং সেই সব মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন নেই। আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। জঙ্গলে মাঝে-মাঝেই সংক্রামক রোগ ছড়ায়, প্রাণীরা মারা যায়। তখন যে এলাকায় এটা ঘটে, সেই এলাকা থেকে বন্যপশুদের সরিয়ে দেওয়া হয়। যাদের সরানো সম্ভব হয় না, তাদের প্রতিষেধক দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এই মৃত্যুগুলো ঠিক এক জায়গায় হয়নি আর ঘন-ঘন হয় না। আপনি যদি কারণ আবিষ্কার করতে পারেন, তা হলে বিশাল উপকার হবে।"

মেজর মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, "আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব। কী অর্জুন ?"

"নিশ্চয়ই।" অর্জুন সমর্থন করল।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত মেজর বললেন, "দেখুন মিস্টার ত্রিবেদী, একটা ছোট লাইটারকে যদি আমি, মানে আমরা, অতবড় আমেরিকা থেকে উদ্ধার করতে পারি, তা হলে এটাও সম্ভব হবে।"

"কী ব্যাপার ?" ত্রিবেদী কৌতূহলী হল।

অমল সোম বাধা দিলেন, "ও-গল্প অন্য সময় শুনবেন।"

লাঞ্চ সেরে ওরা ত্রিবেদীর জিপে উঠল না। ত্রিবেদী বললেন, "আপনারা মিস্টার ব্যানার্জির জিপসিতে আসুন। আমার জিপটিকে জঙ্গলের সবাই চেনে। আমি নীলপাড়ার রেঞ্জারকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। সে আপনাদের জন্যে বাংলোয় অপেক্ষা করবে। আমি আগামিকাল আমার রুটিন ভিজিটে ওখানে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে আসব।"

অর্জুনের খটকা লাগল। যাওয়া হচ্ছে একটি ফুলের সন্ধানে। ভুল করে তার কাছাকাছি চলে না গেলে বিপদ নেই। মেজর অবশ্য কয়েকটা মাস্ক নিয়ে এসেছেন, যা নাকে পরলে বিষ শরীরে ঢুকবে না। এই আবিষ্কারের সঙ্গে কোনও শত্রুপক্ষের সম্পর্ক নেই যে, তাদের সঙ্গে সংঘাতে যেতে হবে বলে এই লুকোচুরি দরকার। তার মনে পড়ল, জলপাইগুড়ি থেকে আসার সময় অমল সোম বলেছিলেন, এমনভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে চান, যাতে স্থানীয় মানুষ তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহলী না হয় ! ত্রিবেদীর সঙ্গে অমল সোমের কী কথা

হয়েছে তা জানা না গেলেও, অর্জুন অনুমান করল অনেক বড় রহস্য তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ভানু ব্যানার্জির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা সুহাসিনী চা-বাগান ছেড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসিমারায় চলে এল। অমল সোম বসেছিলেন ড্রাইভারের পাশে, ওরা পেছনে। ভানু ব্যানার্জি কয়েকটা বড় বাক্সে চাল-ডাল-আনাজ দিয়ে দিয়েছেন, যদি প্রয়োজনে লাগে।

মেজর গম্ভীর গলায় বললেন, "অর্জুন! তুমি বাইকটাকে নিয়ে এলে ভাল করতে!"

অমল সোম বললেন, "আমি নিষেধ করেছি। এদিকের রাস্তায় পাথর বেশি। তা ছাড়া জঙ্গলে বাইক চালালে ওখানকার বাসিন্দাদের বিরক্ত করা হবে।"

মেজর কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা যে জঙ্গলে যাচ্ছি, তার কোনও চরিত্র, আই মিন বিশেষত্ব আছে?"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। নীলগিরি খুব গভীর জঙ্গল। শোনা যায়, যারা ডাকাতি করে, তাদের জায়গাটা খুব প্রিয়। তবে এই সময় হাতিরা ওখানে বেশি পরিমাণে রয়েছে বলে আমরা তাদের দেখা নাও পেতে পারি। এ ছাড়া জন্তু আছে প্রচুর। নীলগিরিতে খঞ্জন নামে এক ধরনের পাখি পাওয়া যায়, সাদা বুকের ঠিক মাঝখানে কালো চিহ্ন রয়েছে। একসময় এখানকার মানুষ ওই চিহ্নটাকে শালগ্রাম শিলা অথবা বিষ্ণুর প্রতীক বলে মনে করত। এ ছাড়া পাইথন কোবরার জন্যে জঙ্গলটা বিখ্যাত।"

মেজর বললেন, "হুম্। কার্বলিক অ্যাসিড সঙ্গে আনা উচিত ছিল!"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি সাপকে ভয় পান?"

"ঠিক ভয় নয়, ঘেন্না করি। কেমন কিলবিল করে চলে। সাবধানে পা ফেলো।" জিপসির ভেতর বসেই পা সরিয়ে নিলেন মেজর।

অমল সোম বললেন, "তোমরা কেউ সারাও বলে প্রাণীর নাম শুনেছ?"

মেজর বললেন, "সারাও? নো। অর্জুন শুনেছ?"

অর্জুন মাথা নেড়ে 'না' বলল।

অমল সোম বললেন, "ওর নেপালি নাম থর, আর বৈজ্ঞানিকরা নাম দিয়েছেন ক্যাপ্রিকরনিস সুমাত্রেনসিস্।"

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে ডায়েরি বের করে নামটা লিখে রাখলেন। অমল সোম বললেন, "এটা ছাগল আর অ্যান্টিলোপের মাঝামাঝি গোছের প্রাণী। জিম করবেট যাকে গোরাল বলেছেন তার সঙ্গে এই সারাওয়ের কিছু মিল রয়েছে। এদের শরীরের তুলনায় মাথা বেশ বড়। মাথা ও মুখ গাধার মতো, কান বড়, চোয়ালের পাশে লম্বা-লম্বা চুল, উচ্চতা তিন ফুটের মতো। গোল খাঁজকাটা শিং বাঁকানো মোচার মতো। বেশির ভাগের শরীরের রং হয়

কালো আর পা মরচে-পড়া লাল। সারাও অদ্ভুত খাড়া পাহাড় বেয়ে স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করতে পারে। এদের শ্রবণশক্তি তীব্র, খোলা জায়গায় আসে না। ১৮৩২ সালে ব্রায়ান হজসন এদের আবিষ্কার করেন।" অমলদা নিবিষ্ট গলায় বলে যাচ্ছিলেন।

"আপনি এই প্রাণীটি সম্পর্কে এত জেনেছেন কেন?" মেজর প্রশ্ন করলেন।

"জানতে তো সব সময় ইচ্ছে করে! তার ওপর সারাও লুপ্তপ্রায় না হলেও পশ্চিমবঙ্গে বিরল হয়ে এসেছে। হঠাৎ বিদেশে এর চাহিদা বেড়েছে। এক-একটি প্রমাণ সাইজের সারাও অন্তত এক লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, এমন খবরও আছে।"

"এক লক্ষ টাকা? তা হলে ওর মাংসের কেজি কত?"

"শুধু মাংস নয়, ওর শিং, লোম, ক্ষুর সব কিছুরই চাহিদা। জার্মানীর এক বৈজ্ঞানিক নাকি আবিষ্কার করেছেন, সারাওয়ের শিঙের গুঁড়ো খেলে বাত সেরে যায়। বাত হয় প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধদের। ওই বয়সী মানুষের হাতে টাকা থাকা স্বাভাবিক। সুস্থভাবে চলাফেরা করার জন্যে সেই সব মানুষ দু'হাতে খরচ করতে রাজি।" কথাগুলো বলে আচমকা চুপ করে গেলেন অমল সোম। একদৃষ্টিতে চা-বাগান দেখতে লাগলেন।

এখন জিপসি যাচ্ছে পাথর-বিছানো পথ ধরে। এক দিকে চা-গাছগুলো গালচের মতো বিছানো, অন্য দিকে জঙ্গল। অর্জুনের মাথায় বিদ্যুৎ চলকে উঠল। অমল সোম কি এখানে সারাও-এর সন্ধানে এসেছেন না, তাঁর শিকারীর তল্লাশে? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মেজরের ফুলের ব্যাপারে তিনি তেমন উৎসাহী নন, হলে এ নিয়ে আলোচনা করতেন। জলপাইগুড়ির এস পি এবং কোচবিহারের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা কি জানেন অমল সোমের আসার উদ্দেশ্য কী? অর্জুনের খুব খারাপ লাগছিল। আজকাল অমল সোম কোনও ব্যাপারেই তার সঙ্গে আলোচনা করেন না। যেদিন থেকে সে নিজে সত্যসন্ধানে নেমে পড়েছে, সেদিন থেকেই উনি তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেছেন। অথচ ওই মানুষটিকে সে তার গুরুদেব বলে মনে করে। সে ঠিক করল, নিজে থেকে না বললে একটা প্রশ্নও করবে না। বেড়াতে এসেছে, খাবেদাবে, বেড়িয়ে চলে যাবে। আর মেজর যদি সাহায্য চান, তা হলে ফুলের সন্ধান করবে।

ওপাশে গাড়ির আওয়াজ হচ্ছিল। অর্জুন দেখল একটা নীল মারুতি ধুলো উড়িয়ে আসছে। দেখামাত্রই তার মনে নীল চ্যাটার্জির মুখ ভেসে উঠল। কিন্তু মারুতিটা আসছে সোজা আর প্রচণ্ড জোরে। হঠাৎ অমলদা বললেন, "ড্রাইভার ভাই, আপনি যেমন চালাচ্ছেন তেমন চালান, সাইড দেওয়ার জন্যে নীচে নেমে যাওয়ার দরকার নেই।"

প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা লাগতে-লাগতে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। উলটোদিকের গাড়ি এত জোরে ব্রেক কষেছিল যে, চাকার শব্দ হল মারাত্মক। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চালক জিজ্ঞেস করল, "কী রে, মরার ইচ্ছে হয়েছে নাকি ?"

অমল সোম জবাব দিলেন, "মৃত্যু তো আপনি ডেকে এনেছিলেন! এত ছোট রাস্তায় অত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন কেন, তার জবাব আগে দিন।"

অর্জুন ততক্ষণে চালককে চিনতে পেরেছে। জলপাইগুড়ির শিল্পসমিতি পাড়ার বরেন ঘোষালের ছোট ভাই, যে হাবুকে প্রায় চাপা দিয়ে ফেলেছিল।

॥ আট ॥

"তুমি আমাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছ চাঁদু ?" অদ্ভুত গলায় বলল চালক।

"বয়স্কদের সঙ্গে তুমি এ ভাষায় কথা বলো বুঝি ? গাড়ি সরাও নইলে একে বলব তোমার ওই টিনের বাক্সটাকে গুঁড়িয়ে দিতে। ড্রাইভার ভাই, আপনি ব্যাক করুন তো!" অমল সোমের হুকুম হওয়া মাত্র ড্রাইভার বেশ কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে গেল জিপসিটাকে। তারপর নিচু গলায় বলল, "ধাক্কা মারতে বলবেন না, আমি কখনও অমন কাজ করিনি।"

জিপসিটাকে পেছনে হটে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াতে দেখে উলটো দিকের গাড়ির চালক অনুমান করল পরিস্থিতি ভাল নয়। সে চিৎকার করল, "কী হচ্ছে এসব ? ইচ্ছে করে অ্যাকসিডেন্ট করবেন নাকি ?"

তুমি থেকে আপনিতে ওঠায় অমল সোম ঈষৎ খুশি হলেন। তিনি গলা তুলে বললেন, "সেই রকমই ইচ্ছে আছে। বেয়াদপ বানরদের শিক্ষা দিতে আমার খুব ভাল লাগে। তবে তুমি যদি গাড়িটাকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে যাও, তা হলে আলাদা কথা।"

"আপনি কার সঙ্গে এসব করছেন, তা জানেন ? নীল চ্যাটার্জি আমার বন্ধু।"

"সে আবার কে ?" অমল সোম যে চমৎকার অভিনয় করতে জানেন, তা মেজর বুঝতে না পেরে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওঁকে হাত তুলতে দেখে থেমে গেলেন।

"বুঝবেন, বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে নীল চ্যাটার্জি কে ?" কথা শেষ করেই ওই ছোট রাস্তাতেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল চালক। তারপর একরাশ ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল, যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। ড্রাইভার বলল, "এবার নীলবাবু এসে ঝামেলা করবেন।"

"আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাটা প্রোটেকটেড প্লেস। ঝামেলা করতে এলে তিনি বিপদে পড়বেন। তা ছাড়া আমরা কোথায় যাচ্ছি তা জানতে তো

সময় লাগবে।" অমল সোম তাকে আশ্বস্ত করলো।"

চাপা গলায় মেজর বললেন, "আস্পর্দ্ধা দ্যাখো।"

অর্জুন বলল, "আমেরিকায় শুনেছি অল্প বয়সীরা এর চেয়েও খারাপ ব্যবহার করে।"

একটু হকচকিয়ে গেলেন মেজর, "তা করে। কিন্তু আমাদের বেশ সাবধানে থাকতে হবে। এই সব চুনোপুঁটি গুণ্ডাদের আর যাই হোক বিশ্বাস করা চলে না।" মেজর তাঁর ব্যাগটা কোলে টেনে নিলেন। যেন সেটাই তাঁর আত্মরক্ষার অস্ত্র।

অর্জুন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি সঙ্গে কোনও অস্ত্র এনেছেন?"

দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে বিরাট মুখে এবার হাসি ফুটল, "সাসপেন্সে থাকো।"

আগের গাড়িটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ধুলোর ঝড়টাও মিলিয়ে গেল। কিছুটা চলার পর অমল সোম ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি থামাতে। তারপর মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে ইশারা করলেন নামতে।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে আবার কী দরকার?"

অমল সোম বললেন, "অর্জুনের সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা বলব।"

ওরা গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল একটা বাঁক ঘুরে। অমল সোমের আচরণে একটুও অবাক হয়নি অর্জুন। রাস্তার একপাশে সেগুন গাছের আড়ালে পৌঁছে অমল সোম প্রশ্ন করলেন, "আমাদের নেমে আসার উদ্দেশ্য কী বলো তো?"

"আপনি সন্দেহ করছেন শিল্প সমিতি পাড়ার বরেন ঘোষালের ছোট ভাই আদৌ এগিয়ে যায়নি। সে রাস্তার পাশে কোথাও গাড়ি লুকিয়ে আমাদের পিছন নেবে বলে অপেক্ষা করছে। এখনঽ তাকে দেখা যাবে। তাই তো?" অর্জুন উত্তর দিল।

"গুড। এই কাজটা তুমি হলে করতে না?"

"হ্যাঁ। আমার শত্রুদের ঠিকানা নিশ্চয়ই আমি জানতে চাইতাম। তবে ছেলেটাকে যে রকম নিশ্চিত দেখাচ্ছিল, তাতে ও বোধ হয় নীল চ্যাটার্জিকে সরাসরি জানাবার কথাই ভাবছে।"

অর্জুনের অনুমানই ঠিক হল। মিনিট পনেরোর মধ্যে কোনও গাড়িকে পেছনে আসতে দেখা গেল না। অগত্যা ওরা আবার জিপসি চালু করল। এখন থেকেই একপাশে চায়ের বাগান, অন্যপাশে ফরেস্ট শুরু হয়ে গিয়েছে। ফরেস্টে ঢোকার চিহ্নিত পথে ওরা এগোল। খানিকটা যাওয়ার পর চেকপোস্ট। লোহার রড় ব্যারিকেড তৈরি করেছে। পাশের ওয়াচ-রুম থেকে বনরক্ষী এগিয়ে এলে ড্রাইভার পরিচয় দিল। ডি এফ ও সাহেব যে এখানেও খবর দিয়ে রেখেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল বনরক্ষীর সন্ত্রস্ত হয়ে সেলাম

করার ভঙ্গি দেখে। এখন দু'পাশে ঘন জঙ্গল আর অজস্র পাখির চিৎকার। মাঝে-মাঝে বানরেরা রাস্তার ধারে নির্লিপ্তের মতো বসে আছে।

অমল সোম বললেন, "উত্তর বাংলায় মোট ৩১৫১ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে।"

"উদ্ভিদ ?" মেজর সোজা হলেন।

"হ্যাঁ। তার মধ্যে গাছ হল ৫৪০ রকমের, গুল্ম ১৮৭৯, লতা ২১৬ আর মস, লাইকেন, ফার্ন ৫১৬ ধরনের। ঠিক একশো বছর আগে জে এম কোয়ান একটা বই লিখেছিলেন, 'দি ট্রিস অব নদার্ন বেঙ্গল ইনক্লুডিং শ্রাব্‌স, উডি ক্লাইম্বার্স, বাম্বুস, পাম অ্যান্ড ট্রি ফার্নস।' তাতে তিনি ৯৮৮ প্রজাতির উল্লেখ করেছিলেন।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কী ধরনের গাছ সংখ্যায় বেশি ?"

"শাল, নিম, কাওলা, শিশু আর গামার। এ ছাড়া খয়ের, শিরীষ, ওদাল, শিমুল, বনকাপাস, জামরুল, অমলতাস, নাগেশ্বর গাছ দেখতে পাবে। এখানে ইউক্যালিপটাস গাছ কম, কিন্তু চাপ এবং বহেড়া গাছ পরিমাণে বেশি। এদের ফলও হয় প্রচুর। তাই এদিকে জীবজন্তুর আধিক্য বেশি।" অমল সোম বললেন।

"বাঘ আছে ?" মেজর প্রশ্ন করলেন।

"তিনি যে আছেন, তা সুহাসিনীতে ভানু ব্যানার্জি প্রমাণ দিয়েছেন।"

মেজর শব্দ করে হাসলেন, "তবু রক্ষে সিংহ নেই। বুঝলে অর্জুন, ওই প্রাণীটিকে আমি একদম বুঝতে পারি না। তুমি সিংহ দেখেছ ?"

"সার্কাসে দেখেছি।"

"কেমন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ভাবভঙ্গী। একবার আফ্রিকায়—।"

"আমরা বোধহয় এসে গিয়েছি।" অমল সোম গল্পটাকে গড়াতে দিলেন না।

ততক্ষণে চোখের সামনে চমৎকার একটা বাংলো ভেসে উঠেছে। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বোধহয় একজন সুবেশ যুবক বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল।

জিপসি থামতেই যুবক এগিয়ে এসে নমস্কার করল, "মিস্টার সোম ?"

অমল সোম জিপসি থেকে নেমে বললেন, "আমি।"

"আসুন সার। বড়সাহেব জানিয়ে দিয়েছেন আপনাদের আসার কথা। আমার নাম রঞ্জিত দত্ত, এখানকার রেঞ্জের দায়িত্বে আছি।"

অমল সোম তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর একজন আর্দালি ব্যাগপত্র বয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। জিপসির ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কি দরকার আছে ?"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "না। কিন্তু তুমি একা ফিরবে ?"

প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পেরে ড্রাইভার বলল, "আমি লোকাল মানুষ, আমার কিছু

হবে না। আর হলে কে আটকাবে ? চলি।"

জিপসি চলে গেলে রঞ্জিত দত্ত জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ?"

অমল সোম বললেন, "তেমন কিছু নয়।"

দোতলায় ব্যালকনি-সমেত দুটো পাশাপাশি ঘরে থাকার ব্যবস্থা। চমৎকার আয়োজন। মেজর বললেন, "গুড।"

দোতলা থেকে জঙ্গলের চেহারা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। মনে হচ্ছিল ছুটতে-ছুটতে জঙ্গল ওই ফাঁকা জায়গায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। পাখি ডাকছে খুব। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে মাঝে-মাঝে। কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ।

রঞ্জিত দত্ত বলল, "এই বাংলোতে একজন বাবুর্চি আর একজন আর্দালি চব্বিশ ঘণ্টা থাকবে। আপনাদের যখন যা দরকার ওদের বললেই হবে।"

গাড়ি থেকে সবজির ঝুড়ি নামানো হয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে রঞ্জিত বললেন, "আরে ব্বাস, এসব আনতে গেলেন কেন ? আমি তো মাছ-মাংসের ব্যবস্থা করেছি।"

অমল সোম বললেন, "আমাদের না লাগলে আপনার সংসারে লাগতে পারে।"

"আমি সার একা। কলকাতার ছেলে, জঙ্গলের চাকরি নিয়ে এখন আর শহরে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। আপনারা চা খাবেন ?"

অমল সোম কাঁধ নাচালেন, তারপর পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। রঞ্জিত দত্ত ইশারা করতেই আর্দালি নীচে নেমে গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কতদূরে থাকেন ?"

"হাফ কিলোমিটার দূরে। এদিকে এখন হাতির উৎপাত বেশি।"

"কেন ?" মেজর মুখ খুললেন।

"এই সময়টা ওরা আশেপাশের গ্রামে হানা দেয় খাবারের জন্যে। কেউ কেউ এই বাংলোর সামনে চলে আসে কিছু পাওয়া যাবে বলে। মনে হয় ওদের দর্শন আপনারা পেয়ে যাবেন দু-এক দিন থাকলেই।" রঞ্জিত দত্ত মাথা নাড়ল।

"আপনি আফ্রিকান হাতি দেখেছেন ?" আচমকা মেজর প্রশ্ন করলেন।

"না।" হকচকিয়ে গেলেন রঞ্জিত দত্ত।

"তাদের কাছে ভারতীয় হাতিকে শিশু মনে হবে। বাই দ্যা বাই, মিস্টার দত্ত, আপনি যখন এখানকার রেঞ্জার, তখন নিশ্চয়ই আপনার কাছে জঙ্গলের একটা ম্যাপ পাওয়া যাবে !"

রঞ্জিত দত্ত বললেন, "ম্যাপ আছে, তবে সেটা দেখতে আমার অফিসে আপনাকে যেতে হবে। দেওয়ালে টাঙানো তো, খুলে আনা যাবে না।"

"আপনি এখানে কতদিন আছেন ?"

“আট মাস।”

“এই জঙ্গলের কোনও রহস্যময় বস্তু, যেমন ধরুন, গাছপালা, পশুপাখি, ফুল, এসবের সন্ধান পেয়েছেন?” মেজর এমন ভাবে প্রশ্ন করলেন যে অর্জুন বুঝল তিনি আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে চান না।

রঞ্জিত দত্ত মাথা নাড়লেন, “সত্যি কথা বলতে কী এখন জঙ্গল তার সমস্ত রহস্য হারিয়েছে। তবে আমরা একটা হরিণের বাচ্চা পেয়েছিলাম যার চামড়া দেখলে মনে হবে নেকড়ে বা শেয়াল জাতীয় কোনও প্রাণীর।”

মাথা নাড়লেন মেজর, “এমন কোনও ফুলের সন্ধান পাননি, যার গন্ধ নাকে গেলে মানুষ মরে যেতে পারে। কিলার ফ্লাওয়ার!”

রঞ্জিত দত্ত মাথা নেড়ে ‘না’ বললেন।

“আপনি সমস্ত জঙ্গল চষে দেখেছেন?”

“সেটা কি সম্ভব?” হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে এমন ভঙ্গিতে রঞ্জিত দত্ত বললেন, “অবশ্য ঘুম থেকে সান্দাকফু যাওয়ার পথে বিকেভঞ্জন নামে একটা জায়গার কথা শুনেছি। সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে যখন ফুল ফোটে, তখন বাতাসে অক্সিজেন কমে যায়। ওই ফুল নাকি অক্সিজেন শুষে নেয়। ফুলটার নাম লোকেতি।”

“লোকেতি?”

“হ্যাঁ।”

“আচ্ছা মিস্টার দত্ত, আপনার এই জঙ্গলে স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করা যাবে?”

“না করাটাই ভাল। হঠাৎ যদি কোনও হিংস্র জন্তুর সামনে পড়ে যান, তা হলে বিপদ হবে। আপনারা যখন ঘুরতে চান বলবেন, আমি সঙ্গে গার্ড দিয়ে দেব। আচ্ছা, আমি কি এখন একটু অফিসে যেতে পারি, অনেক কাজ ফেলে এসেছি।” সবিনয়ে বললেন রঞ্জিত দত্ত। মেজর তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লেন। ভদ্রলোক একবার অমল সোমের ঘরের দিকে তাকিয়ে নীচে নেমে গেলেন। একটু পরে তাঁকে সাইকেলে চেপে উলটো দিকের জঙ্গলে মিলিয়ে যেতে দেখা গেল। আধ কিলোমিটার দূরত্ব এমন কিছু বেশি নয়।

অমল সোম তাঁর ঘরে বসেই চা খেলেন। বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে মেজর বললেন, “আমি লক্ষ করেছি অর্জুন, তোমার দাদার মধ্যে একটুও রোমান্টিক ব্যাপার নেই। এই জঙ্গলে এসে কেউ কি ঘরে বসে থাকে? আমার ইচ্ছে করছে এখনই বেরিয়ে পড়ি।”

“যাবেন?”

“যেতে পারি। তবে প্রথম দিন তো, বেশিদূর না যাওয়াই ভাল। ওই রেঞ্জার ছোকরার অফিস থেকে ঘুরে আসা যাক। ম্যাপটা নোট করে নেওয়া যাবে।” মেজর উঠে দাঁড়ালেন।

বেরোবার আগে অর্জুন অমল সোমের দরজায় যেতে তিনি বললেন, "ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘুরে এসো।"

অমল সোম শুয়েছিলেন চোখ বন্ধ করে। একটু আগেও ওঁকে যখন অসুস্থ বলে মনে হয়নি, তখন এভাবে শুয়ে থাকা বিস্ময়ের।

নীচে নেমে মেজর বললেন, "সাসপেন্সটা এবার ভাঙি ?"

অর্জুনের খেয়াল ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল। "কোন সাসপেন্স ?"

"বাঃ, তখন তুমি জিজ্ঞেস করলে না, আমি সঙ্গে কোনও অস্ত্র এনেছি কিনা ?"

অর্জুনের মনে পড়ল। মেজর বললেন, "জঙ্গলে ঢুকতে হবে বলে আমি তৈরি হয়েই এসেছি। চলো, আর একটু এগিয়ে যাই, আর্দালিটা বারান্দা থেকে আমাদের লক্ষ করছে।"

অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে দেখল লোকটাকে। আদৌ কোনও মতলব আছে বলে মনে হল না। গাড়ি চলার পথ ছেড়ে মেজর জঙ্গলে ঢুকলেন। গা ছাড়া-ছাড়া গাছগাছালি। পাতা মাড়িয়ে হাঁটা যায়। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখানে ঢুকলেন কেন ?"

"গায়ের পাশে গাছ না থাকলে জঙ্গলে হাঁটার থিম থাকে না। কাঠঠোকরা ডাকছে শুনতে পাচ্ছ ? কী রকম একটা ছন্দ আছে। গুড। হ্যাঁ, এইবার দ্যাখো।" মেজর বুক পকেট থেকে একটা কলম বের করলেন। মোটা ডট পেন।

"এটা কী ?"

"কলম।"

"ঠিকই, কিন্তু এ কলম সে কলম নয়। দাঁড়াও।" মেজর মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালেন। হতাশ হয়ে বললেন, "সব নিরীহ পাখি। আরও একটু চলো।"

কিছুক্ষণ হাঁটার পর গাছের পাতায় সরসর শব্দ বাজল। ওরা দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। পাতার স্তূপ রয়েছে যেখানে, শব্দটা সেই স্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মেজর ফিসফিস করে বললেন, "এই কলমে টর্চের মতো একটা সুইচ আছে দেখতে পাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ।"

"এবার ওই পাতাগুলোর দিকে টিপ করে সুইচটা টিপলাম।" কথা বলা মাত্র মেজরের আঙুল সুইচটাকে সরাতেই পাতাগুলোয় আগুন জ্বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড়সড় গিরগিটি লাফিয়ে উঠেই পড়ে গেল আগুনে।

মেজর বললেন, "স্যরি। আমি সাপ ভেবেছিলাম।"

পাতাগুলো জ্বলছিল। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেটাকে নেভাবার চেষ্টা করল। মেজর এসে পা লাগাতে আগুন নিভে গেল। এখন উৎকট ধোঁয়া

চারপাশে ছড়াচ্ছে। অর্জুন বলল, "সাঙ্ঘাতিক জিনিস তো!"

"হ্যাঁ হে। আমার বন্ধু মাইকেল এটা উপহার দিয়েছে। এর রেঞ্জ কম-সে-কম কুড়ি মিটার। পুরো টিপলে একটা হাতির শরীরের অনেকটা জ্বলে যাবে। অথচ পকেটে রাখলে কেউ বুঝতেই পারবে না এটা কী বস্তু। একবার ট্রাই করবে নাকি?"

"না। দেখলাম তো। চলুন, আলো পড়ে আসছে।"

ওরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলছিল। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ কানে এল। তারপরেই বোঝা গেল ওটা গাড়ি নয়, মোটর বাইক। বেশ জোরে বাইকটা ছুটে গেল পাশ দিয়ে। যেহেতু ওরা জঙ্গলের খানিকটা ভেতরে দাঁড়িয়েছিল, তাই মোটরবাইকের আরোহীর নজরে পড়েনি। আবার একইভাবে লোকটির পরিষ্কার চেহারা তাদেরও নজরে আসেনি।

মেজর বললেন, "জঙ্গলের ভেতর এমন উৎকট শব্দ করে বাইক চালাচ্ছে, ওর পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। ননসেন্স।"

কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা গাছ-ভাঙার শব্দ পেল। এবং তারপরেই ক্যানেস্তারা বাজার আওয়াজ। বেশ কিছু লোক একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। অর্জুন মেজরের হাত ধরল, "ফিরে চলুন।"

"কেন?"

"মনে হচ্ছে কোনও বন্যজন্তু এদিকে এসে পড়েছে। আর না এগোনোই ভাল।"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় পা বাড়ালেন। শব্দটা ওদিকে হচ্ছে খুব। এবার পটকা ফাটতে লাগল। আর তার পরেই অর্জুন দেখতে পেল ওদের। গোটা তিনেক হাতি জঙ্গল ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে রেঞ্জারের অফিসে যাওয়ার পথে। অন্তত একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে একরোখা ভঙ্গিতে।

মেজর বললেন, "বিউটিফুল। কী অহঙ্কারী ভঙ্গি। ক্যামেরা আনা উচিত ছিল।"

আর তখনই একটা লোক পাশের গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছিটকে রাস্তায় উঠে চিৎকার করে বলল, "পালাও, পালাও, হাতি বেরিয়েছে।"

লোকটাকে বাংলোর দিকে ছুটতে দেখে ওরাও দৌড়ল। মেজর ভারী শরীর নিয়ে তাল রাখতে পারছিলেন না। সামনে, ছোটা লোকটাকে ছুটতে ছুটতে অর্জুন লক্ষ করছিল। ওর শার্ট ছিঁড়ে গেছে। পায়ে জুতো রয়েছে একপাটি। পাম্প-শু্য গোছের। ডান হাত থেকে রক্ত পড়ছে। নির্ঘাত লোকটার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

বাংলোর কাছাকাছি পৌঁছে ধপ্ করে বসে পড়ল লোকটা। অর্জুন দৌড় থামিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"মরে গিয়েছিলাম। জোর বেঁচে গিয়েছি আজ। ওরে বাবা, সাক্ষাৎ যম।" হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল লোকটা।

"আপনি হাতিদের সামনে গেলেন কেন?"

"কী করে জানব ওরা বাঁকের আড়ালে আছে? উঃ, কী যন্ত্রণা হচ্ছে হাতটায়। বাইকে স্পিড ছিল, ব্রেক কষতে কষতে একেবারে ওদের সামনে আছড়ে পড়েছি। একটা শুঁড় দিয়ে মারতে আমি ছিটকে প্রাণ নিয়ে দৌড়ালাম জঙ্গলের ভেতরে। বাইকটা শেষ হয়ে গিয়েছে। ওরে বাবা!" লোকটা কাতরাতে লাগল।

অর্জুন ওকে বাংলোয় তুলে নিয়ে এল। সঙ্গে ফার্স্ট এইড বক্স সব সময় রাখেন অমল সোম। লোকটিকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে দিতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মেজর কোথায়?"

অর্জুনের মনে পড়ল। সতি তো! মেজর তো তার পেছনে ছুটে আসছিলেন। কোথায় গেলেন তিনি? বুকের ভেতর হাতুড়ির শব্দ শুরু হয়ে গেল অর্জুনের।

॥ নয় ॥

অদ্ভুত শব্দটা কানে আসতেই মেজর দাঁড়িয়ে গেলেন। শব্দটা অনেকটা শিস্-এর মতো। একটানা কিছুক্ষণ বেজে থেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক জঙ্গলে মেজর ঘুরেছেন। সে-তুলনায় ডুয়ার্সের এই জঙ্গল কিছুই নয়। গাছগুলো তেমন ঘন নয়, হিংস্র প্রাণী নেই বললেই চলে। নেহাত কপালে লেখা না থাকলে বুড়ো বাঘ বা গণ্ডারের দর্শন পাওয়া যায় না। অর্জুনের সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন হাত পা ভেঙেছে। কিছুই হয়নি টের পেয়ে মনে হল জঙ্গলটা একবার দেখে নেওয়া যাক। এই জঙ্গলের কোনও এক বিশেষ জায়গায় সেই বিষফুল ফোটে। অর্জুন বা অমল সোমের আগে যদি তিনি সেটা আবিষ্কার করতে পারেন, তা হলে তাঁর খ্যাতি বাড়বে। জঙ্গলের ভেতর গাড়ি চলার পথ ধরে দুর্বৃত্তরা এখন যতই ছোটাছুটি করুক, তার নাগাল পাবে না।

শিসের আওয়াজ লক্ষ করে মেজর এগোলেন। শব্দটা বাড়ছে, স্পষ্ট হচ্ছে, অর্থাৎ কাছাকাছি শব্দের উৎস আছে। মেজর সতর্ক হলেন। পায়ের তলায় বুনো ঘাস আর শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। যেন তাকে দেখতে পেয়েই থামল। মেজর স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ঝটপট শব্দ হল। একটা ছোট হরিণ ছুটতে-ছুটতে গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। মেজরের মাত্র হাত-আটেক দূরে দাঁড়িয়ে সে অবাক চোখে তাকাল। বড় মায়া হল ওকে দেখে। একটা কালো গাছের গুঁড়ির পাশে হরিণটা দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে।

মেজর জিভে শব্দ করতেই হরিণটা গাছের দিকে সরে গেল। এবং তখনই ঘটনাটা ঘটে গেল। গাছের শরীর আচমকা চওড়া হয়ে হরিণটাকে ঢেকে ফেলল। ছোট্ট প্রাণীটির শরীর মুহূর্তেই কালো হয়ে গেল। একটু ঝটপটানির সময় বিচ্ছিন্ন হল গাছ কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য, আবার তা জোড়া লেগে গেল গাছের গায়ে। শুধু গুঁড়ির কাছটা ফুলে রইল হরিণের শরীরের জন্য। এরকম বিস্ময়কর ব্যাপার এই জঙ্গলে ঘটতে পারে, মেজর কল্পনাও করেননি। শুধু এই জঙ্গল কেন, পৃথিবীর কোথাও কোনও গাছ শরীর বাড়িয়ে হরিণের বাচ্চাকে খেয়ে নিতে পারে তা কেউ কি কখনও বিশ্বাস করবে ? ঝটপটানির সময় গাছ যখন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তখন অংশটিকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নড়তে দেখেছিলেন তিনি। এখনও মনে হচ্ছে জায়গাটা নড়ছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে তাঁর চোখ চড়ক গাছ হয়ে গেল। গাছ নয়। গুঁড়িটার অনেকটা জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল কালো পিঁপড়ে। গায়ে গায়ে এমন চাপ বেঁধে রয়েছে, সামান্য দূর থেকেও তাদের আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। মাংসখেকো পিঁপড়ে। এদেরই এক স্বজাতি আফ্রিকার জঙ্গলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা হাতির বাচ্চাকে সাবাড় করে দিতে পারে। কিন্তু তারা থাকে ঢিবির মধ্যে লুকিয়ে। এভাবে গাছের শরীরে লেপ্টে ঝুলে থেকে শিকারের জন্য অপেক্ষা করার বুদ্ধি তাদের নেই। যত ছোটই হোক হরিণটা পিঁপড়েগুলোকে নিয়ে ছুটে দূরে চলে যেতে পারল না। অর্থাৎ চটজলদি মেরে ফেলার কায়দা পিঁপড়েগুলো জানে। এখন দল বেঁধে হরিণটাকে খেয়ে নিচ্ছে ওরা। হয়তো আগামী কাল কিছু হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে ওখানে। মেজর গাছটার আশপাশে কোনও পুরনো হাড় দেখতে পেলেন না। তিনি রুমালে মুখ মুছলেন। হরিণটার বদলে তিনি যদি গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতেন ? পিঁপড়ের বিষ যদি তাঁকে অসাড় করে দিত, তা হলে তিনি কিছুই করতে পারতেন না। অর্জুনরা হাড়গোড় দেখে কি তাকে চিনতে পারত !

সন্তর্পণে জায়গাটা এড়ালেন তিনি। এমন তো হতেই পারে, পিঁপড়েগুলো এক জায়গায় রোজ থাকে না। খানিকটা যাওয়ার পর একটা পরিষ্কার গাছের গোড়ায় কিছু হাড় পড়ে থাকতে দেখে তাঁর ধারণা সত্যি বলে প্রমাণ পেলেন। তিনি ঠিক করলেন, কাল সকালে ক্যামেরা নিয়ে এসে ছবি তুলবেন এবং একটা শিশিতে কয়েকটা জ্যান্ত পিঁপড়ে ধরে নিয়ে যাবেন প্রমাণ হিসেবে।

বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলে অন্ধকার খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মেজর বুঝলেন এবার তাঁকে ফিরতে হবে। যত হালকা জঙ্গলই হোক না কেন, রাত নামলে তার চেহারা বদলে যায়। কিন্তু কিছুটা পথ হাঁটার পর তাঁর মনে হল, বাংলোর দিকে তিনি যাচ্ছেন না। তখন কোন পথে এদিকে চলে এসেছেন তা যেন ঠাওর করতে পারছেন না। এবং তখনই তিনি ডালপালা ভাঙার শব্দ পেলেন। দিনের আলো তখন নিভু-নিভু। অভিজ্ঞতা থেকে মেজর বুঝলেন,

ওই শব্দ হাতি কিংবা বাইসন ছাড়া কেউ করতে পারে না। এই জঙ্গলে গণ্ডার আছে কি না জানা নেই, তবে তাদের চরিত্র তাঁর জানা নেই। তিনি দৌড়াতে লাগলেন।

ভারী শরীর নিয়ে কিছুক্ষণ ছোটার পর দম নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন মেজর। এই জঙ্গলে দ্রুত ছোটাও সম্ভব নয়। কিন্তু এতেই তাকে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে হচ্ছিল। সেটা স্বাভাবিক হতে-না-হতেই অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। সঙ্গে-সঙ্গে মেজরের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। শরীরে সেই ভাবটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মেজর দ্রুত পিছু হটতে লাগলেন। যখন গন্ধটা আর নাকে নেই, তখন উবু হয়ে বসে পড়লেন তিনি।

এখন চারপাশে পাখির চিৎকার ছাড়া কোনও শব্দ নেই। ধাতস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে মেজর উত্তেজিত হলেন। তাঁর মনে হল তিনি পেয়ে গেছেন। যে-খবর বিদেশি কাগজে ছাপা হয়েছিল, তা মিথ্যে নয়। ওই গন্ধের বৃত্ত থেকে তিনি যদি সরে না আসতেন, তা হলে তাঁর মৃতদেহ আজ রাত্রেই জানোয়ারের খাবার হয়ে যেত। ওই বিষফুল অবশ্যই ওখানে আছে। তিনি জায়গাটা চেনার চেষ্টা করলেন। অন্ধকার এখন বেশ জমাট। তবু একটা পত্রহীন গাছকে তিনি চিহ্ন হিসেবে ঠিক করলেন। কাল দিনের আলো ফুটলেই এদিকে চলে আসতে হবে। মেজর পা বাড়ালেন।

রেঞ্জার ততক্ষণে লোকজন জোগাড় করে ফেলেছেন। আহত লোকটিকে ইতিমধ্যে ফরেস্ট অফিসে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা। রেঞ্জার স্বীকার করলেন মাঝে-মাঝেই দুর্বৃত্তরা জঙ্গলে হানা দেয়। তাদের হাতে এত আধুনিক অস্ত্র থাকে যে বাধা দেওয়ার সাহস তাঁরা পান না। আর এই লোকগুলোর পেছনে এদিকের কিছু ক্ষমতাবান মানুষ আছেন বলেই পুলিশও তেমন সক্রিয় নয়।

কিন্তু মেজরের সন্ধানে তখনই একটা অভিযান সংগঠিত করতে তৎপর হয়েছেন রেঞ্জার। জঙ্গলে ভয়াবহ ঘটনা যে ঘটবে না, তা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। অর্জুন খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সন্ধে নামতেই। রাত্রে মেজরের পক্ষে পথ চিনে আসা আরও দুরূহ হবে। অমল সোম গম্ভীর হয়ে বেতের চেয়ারে বসেছিলেন, আহত লোকটিকে অনেক জেরা করেও তিনি জানতে পারেননি মোটর সাইকেল আরোহীর পরিচয় কী। কেন এসেছিল। লোকটা ঠোঁট টিপে যন্ত্রণার ভান করে গিয়েছে। অমল সোম বুঝেছেন ওটা ভানই, কারণ লোকটা খুব বেশি আহত হয়নি। এখানে এসেই নীল চ্যাটার্জির সঙ্গে বিরোধে যেতে হবে তিনি ভাবেননি। এই সব ফালতু ঝামেলা তাঁকে আসল কাজ করতে দেবে না।

তিনি রেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করলেন, "নিম টি এস্টেট এখান থেকে কতদূর?"

"মাইল দশেক।"

"আগামীকাল সকালে সেখানে যাওয়া যাবে ?"

"নিশ্চয়ই। কাউকে খবর পাঠাতে হবে ?"

"পাঠানো ভদ্রতা। মিসেস ব্যানার্জি নামে এক ভদ্রমহিলা বোধ হয় ওই চা-বাগানের মালিক। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"—অমল সোম বললেন।

ঠিক এইসময় জঙ্গলের ভেতর গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সন্ধে নেমে গেলে শুধু সরকারি অফিসার ছাড়া গাড়ি নিয়ে জঙ্গলে কেউ আসেন না। ঢোকার ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে। রেঞ্জার উৎসুক হয়ে তাকালেন। ডি এফ ও সাহেব আসতে পারেন।

কিন্তু বাঁক ঘুরে যে গাড়িদুটোকে আসতে দেখা গেল, তার প্রথমটা নীল জিপসি। গাড়ি দুটো দাঁড়িয়ে গেল বাংলোর সামনে। দরজা খুলে ড্রাইভার চিৎকার করে উঠল, "অ্যাই, কে আছিস ? সামনে আয়।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াচ্ছিল, তাকে ইশারায় বসতে বলে রেঞ্জার এগিয়ে গেলেন, "বলুন।"

"ও তুমি এখানে। তা চাঁদু, হঠাৎ ডানা গজাল কেন ?"

"আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বোঝাব। যে লোকগুলো আজ এসেছে, তারা কোথায় ?"

"ওঁরা আমাদের বড় সাহেবের গেস্ট।"

"ঘোস্ট করে ছেড়ে দেব।" নীল চ্যাটার্জি চিৎকার করল, "অ্যাই ! বেরিয়ে আয়।"

অমল সোম উঠে রেলিংয়ের পাশে দাঁড়ালেন।

"শোন ! এই এলাকা আমার। এখানে থাকতে হলে আমার কথা শুনে চলতে হবে। নতুন লোকদের প্রথমবার আমি একটা সুযোগ দিই। এর পর কেউ যদি আমার কোন লোককে অপমান করে, তা হলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে, বাছাধন উঠে দাঁড়াতে পারবে না। কান খাড়া করে শুনে নে তোরা। অ্যাই রেঞ্জার, আমার লোকটা কোথায় ?

"তাকে ফরেস্ট অফিসে রাখা হয়েছে।"

নীল চ্যাটার্জি ইশারা করতে পেছনের গাড়িটা বেরিয়ে গেল। ওই গাড়ি যে জলপাইগুড়ির বরেন ঘোষালের ছোট ভাই চালাচ্ছে, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। এবার নীল জিজ্ঞেস করল, "এখানে কেন আসা হয়েছে ?"

সম্বোধন তুই থেকে তুমিতে উঠল। অমল সোম কোনও জবাব দিলেন না। রেঞ্জার বললেন, "বেড়াতে। বললাম তো বড়সাহেবের গেস্ট ওঁরা।"

"বেড়ানোর আর জায়গা পেল না। আমার সঙ্গে যারা লাগে, তাদের প্রথমবার সতর্ক করি। দ্বিতীয়বারে ঠাকুর্দার নাম ভুলিয়ে দিই। তৃতীয়বারে

বাবার নাম আর চতুর্থবার নিজের। প্রথমবার হয়ে গেল আজ।" গাড়িতে উঠে বসল নীল চ্যাটার্জি। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে যেমন এসেছিল তেমন বেরিয়ে গেল।

রেঞ্জার উঠে এল ওপরে, "সরি স্যর। বুঝতেই পারছেন কী অবস্থায় আছি।"

অমল সোম বললেন, "ছেলেটা আপনার সঙ্গে ওইরকম ব্যবহার করল, আপনি কিছু বলতে সাহস পেলেন না। একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আপনি কি কিছুই করতে পারেন না?"

"আমি বড়সাহেবকে বলেছি। থানায় জানানো হয়েছে। কিন্তু থানা যদি অ্যাকশন না নেয়, তা হলে তো আমরা অসহায়। শুধু-শুধু আপনাকেও অপমান করে গেল, বড়সাহেব জানলে আমার মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।" রেঞ্জারকে দুঃখিত দেখাচ্ছিল।

এবার অর্জুন কথা বলল, "অমলদা, আপনি কেন চুপ করে রইলেন?"

"কথা বলার সময় তখন ছিল না, অর্জুন। উন্মাদের হাতে অস্ত্র থাকলে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যাক, ওরা যে-জন্যে এসেছিল তা সফল হল।" অমলদার দৃষ্টি লক্ষ করে ওরা দেখল দ্বিতীয় গাড়িটা বাংলোর সামনে দিয়ে দ্রুত চলে গেল। অর্জুন বলল, "লোকটাকে নিয়ে গেল?"

"সেটাই তো স্বাভাবিক।" অমল সোম বললেন।

"সার, আপনি নিম টি-এস্টেটে যেতে চাইছিলেন, ওখানেই নীলবাবু থাকেন।"

"ঠিকই। সেজন্যেই যাচ্ছি।" অমল সোম বললেন, "আর দেরি করবেন না, বেরিয়ে পড়ুন।"

বাংলোর বাইরে এখন ঘন অন্ধকার। গোটাদুয়েক টর্চ, চারজন বনকর্মী, যাদের হাতে অস্ত্র বলতে লাঠি, জঙ্গলে ঢুকল। অর্জুন রেঞ্জারের সঙ্গে হাঁটছিল।

অর্জুন বলল, "লোকটা ওই রকম অসভ্য ব্যবহার সবার সঙ্গে করে?"

"হ্যাঁ। তবে যেখানে স্বার্থ থাকে, সেখানে যথেষ্ট ভদ্রলোক। আসলে কী করে জানি না ও' কয়েক বছরের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাবশালী হয়ে পড়েছে। কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। চাকরির জন্যে আমি এই বনবাদাড়ে পড়ে আছি। ও ইচ্ছে করলে আমার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।"

"নীল চ্যাটার্জি কি শুধু চায়ের ব্যবসাই করে?"

"ওর যে কীসের ব্যবসা নেই, সেটাই বোঝা মুশকিল।"

রেঞ্জারের নির্দেশে কর্মীরা চিৎকার করতে লাগল। টর্চের আলো গাছেদের গায়ে-গায়ে ধাক্কা খাচ্ছিল। অর্জুন চিৎকার করল, "মেজর! মেজর! শুনছেন?"

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না।

হঠাৎই গাছের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। টর্চের আলো তার ওপর পড়তেই লোকটা চট করে আড়ালে চলে গেল। রেঞ্জার চিৎকার করলেন, "কে ওখানে ?"

গলা ভেসে এল, "আপনারা যাকে খুঁজছেন, তিনি বোধ হয় ওপাশের গর্তে পড়ে আছেন।"

"তুমি কে ?" রেঞ্জার ধমকে উঠলেন।

কোনও উত্তর এল না। বেঞ্জার কর্মীদের হুকুম দিলেন, "ধরো তো লোকটাকে।"

কিন্তু টর্চের আলোয় লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রাতের অন্ধকারে কাছাকাছি গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেও হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। লোকটা জঙ্গলে আনাড়ি নয়।

রেঞ্জার বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার! অন্ধকারে চিনতে পারলাম না, কিন্তু রাত-বিরেতে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর মতো লোক তো এই অঞ্চলে নেই।"

অর্জুনের মাথায় তখন মেজরের চিন্তা। সে রেঞ্জারকে বলতেই মেজরকে খুঁজে বের করতে আর সময় লাগল না। শুকনো পাতায় ভর্তি একটা গর্তে মেজর পাশ ফিরে শুয়ে আছেন, টর্চের আলোয় মনে হচ্ছিল আরামে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু তিনি যে অজ্ঞান হয়ে আছেন, সেটা টের পেতে দেরি হল না। বনকর্মীরা ধরাধরি করে ওঁকে বের কবে নিয়ে এলেন। অর্জুন মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বুঝল নিঃশ্বাস পড়ছে।

বিস্তর ডাকাডাকির পর মেজর চোখ খুললেন। কিন্তু তাঁর কথা বলার সামর্থ্য ছিল না। বনকর্মীদের সাহায্যে ওঁকে জঙ্গল থেকে বের করে নিয়ে আসা হল। বাংলোর বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পর অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখানে ডাক্তার পাওয়া যাবে না ?"

রেঞ্জার বললেন, "আশেপাশের প্রতিটি চা-বাগানে একজন করে ডাক্তার আছেন, কিন্তু এই রাত্রে তাঁরা কেউই আসবেন না। আপনি যদি চান, তা হলে গাড়ি বের করে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি। শরীরে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই, কিছু হলে হার্টের ব্যাপার হতে পারে।"

অমল সোম বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "একটু দেখি!"

তিনি ওঁর নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "খুব দুর্বল লাগছে ?"

মেজর কোনওমতে শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন, "হুঁ!"

অমল সোম অর্জুনকে বললেন, "একটু গরম দুধ খাইয়ে দিলে কাজ হতে পারে।"

গরম দুধ পেতে অসুবিধা হল না। বাবুর্চি সেটা এনে দিতে অর্জুন একটু একটু করে মেজরকে খাইয়ে দিল। অমল সোম বললেন, "ওকে এবার ঘুমোতে দাও।"

একজনকে অপেক্ষা করতে বলে রেঞ্জার বাকি বনকর্মীদের ছেড়ে দিলেন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেঞ্জার বললেন, "অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে আজ। ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন আর সেই খবরটা দিয়ে গেল ভূতের মতো একজন। না হয় বুঝলাম চুরিটুরির ধান্দায় লোকটা জঙ্গলে ঢুকেছিল। কিন্তু আমাদের খবর দেওয়ার গরজ তো হওয়া উচিত নয়।"

অমল সোম বললেন, "হ্যাঁ। এই ব্যাপারটা অদ্ভুত। তবে অপরাধীদের মনেও মাঝে মাঝে বিবেক জেগে ওঠে। জেল পালানো অথবা গ্রেপ্তার এড়ানো অপরাধীদের কাছে এই জঙ্গল তো লুকিয়ে থাকার পক্ষে দারুণ।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু মেজর তো অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো ভীরু নন।"

"সেটা উনি জেগে না উঠলে বোঝা যাবে না। যাক, আজ অনেক হয়েছে। এবার খেয়ে নাও। রেঞ্জারসাহেব, আপনিও এখানে খেয়ে নেবেন নাকি ?"

রেঞ্জার আপত্তি জানালেন, "না, না,। আমি এবার চলি। বাবুর্চি, সাহেবদের খানা লাগাও।" বাবুর্চি বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল, আদেশ পাওয়া মাত্র নীচে নেমে গেল।

রেঞ্জার বললেন, "কাল সকাল আটটায় গাড়ি পাঠাব ?"

"বেশ।" অমল সোম মাথা নাড়লেন।

ঠিক তখনই চিৎকার শোনা গেল। বাবুর্চি চেঁচাচ্ছে। রেঞ্জারের পেছন পেছন ছুটে গেল অর্জুন। কিচেনের দরজা খোলা। বাবুর্চি তাদের দেখে হাউমাউ করে বলল, "কোই আদমি খানা চুরি কিয়া সাব। সবজি আউর রোটি লে লিয়া।"

কিচেনের পেছন দিকের জানলা খোলা। রেঞ্জার জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলতে কাউকে দেখা গেল না। একচিলতে মাঠ, মাঠের পর জঙ্গল।

বাবুর্চি যে পাত্রে রুটি রেখেছিল, তার ঢাকনা একপাশে পড়ে আছে। অর্ধেক রুটি নেই, সঙ্গে নেই সবজির বড় বাটি। অথচ চিকেনে হাত দেয়নি চোর।

রেঞ্জার বললেন, "কেউ যদি খাবার চুরি করতে আসে, তা হলে আগে চিকেন নেবে। এ কী ধরনের চোর ? তুমি দরজা বন্ধ করে যাওনি ?"

"হ্যাঁ সাব। তালা নেহি দিয়া।"

"ঠিক আছে। যা আছে তাই সাহেবদের দিও।" রেঞ্জার বেরিয়ে এলেন।

অর্জুন বলল, "এই চোর দেখছি নিরামিষ খেতে অভ্যস্ত।"

খাওয়াদাওয়ার শেষে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে অর্জুনের মনে পড়ে গেল। সুন্দর এখন জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পার্বতী বড়ুয়া

বলেছিলেন যে, এদিকের জঙ্গলে ফল নেই, মাটি খুঁড়ে কিছু অবশ্য পাওয়া যায়। সুন্দরকে খাদ্য সমস্যায় পড়তে হবে। এই চোর সুন্দর নয় তো ? সে কণ্ঠস্বর মনে করার চেষ্টা করল। একদিন সুন্দর তার সঙ্গে কথা বলেছে, স্বর মনে রাখা তাই সম্ভব নয়। কিন্তু সুন্দর কি অত দূর থেকে এখানে চলে এসেছে পায়ে হেঁটে ? আর এই এলাকাটা তো নীল চ্যাটার্জির বাগানের কাছে। সুন্দরের পক্ষে তো দূরত্ব বাড়ানোই স্বাভাবিক, নীলের কাছাকাছি জঙ্গলে থাকবে কেন ?

এই সময় মেজর পাশের খাটে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিছু বললেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবেন ?"

"মাথা ! মাথায় মেরেছে। আঃ।" মেজর আবার নাক ডাকা শুরু করলেন।

মেজরের মাথায় কে মারল ? সুন্দর ? কেন ?

॥ দশ ॥

মেজরের মাথার ঠিক পেছনে যেন আধখানা আলু বসানো হয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই তিনি তাঁর ব্যাগ খুলে দু-তিনটে ক্যাপসুল খেয়ে নিয়েছেন। খেয়ে বললেন, "কারও ভাল করতে নেই, বুঝলে ?" অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। এখন সদ্য ভোর। জঙ্গলে হাজার পাখির ডাক। সূর্যদেব উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীটা বড় শান্ত।

অমল সোম দরজায় এসে বললেন, "গুড মর্নিং।"

মেজর বললেন, "মর্নিং।"

"আপনি সুস্থ ?"

"আমার মাথা বলে আঘাতটা হজম করেছে, একটু ফুলে উঠেছে, এই যা।"

"আঘাতটা করল কে ?"

"অন্ধকারে মুখ দেখিনি। শুনুন, আমি পেয়ে গেছি। বিষফুল আর মাংসখাদক পিঁপড়ে পেয়ে গেছি। আমাদের এক্ষুনি যাওয়া দরকার। ক্যামেরাটা—।"

"আমরা আপনার আঘাত নিয়ে কথা বলছিলাম।"

"ও। বিশ্বাস হল না বুঝি। কী ভাবেন বলুন তো ? আমি আপনার চেয়ে গোয়েন্দাগিরি কম বুঝি ? এই ক' বছর ইংরেজি সাহিত্যের সব গোয়েন্দা বই তো শেষ করেছি, তার ওপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পাঠ্যপুস্তকও নাড়াচাড়া করেছি। গত বছর...।" মেজর উত্তেজিত গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু তাকে হাত তুলে থামতে বললেন অমল সোম, "আমি গোয়েন্দাগিরি করি না।"

"অ।" মেজর থতমত হয়ে গেলেন।

"অন্ধকারে মুখ দেখেননি বললেন, তাই না ?"

"হ্যাঁ। টর্চ সঙ্গে ছিল না তো! প্রথমে মাংসখাদক পিঁপড়ে তারপর বিষ ফুলের গন্ধ আবিষ্কার করে আমি আপনাদের জানাতে ছুটে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে, নিবছে। একটা জোনাকি। তারপরেই বুঝতে পারলাম ওটা বিড়ির আগুন। কাছে গিয়ে লোকটার হাত শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেস করলুম, "এই তুই কে ? এখানে কী করছিস ?' লোকটা বলল, 'বিড়ি খাচ্ছি। হাত ছাড়ো।' বলার ভঙ্গিতে মনে হল অ্যান্টি সোশ্যাল। হয়তো চোরা শিকারিদের কেউ। বললাম, 'রেঞ্জারের কাছে চল।' বলল, 'ঠিক আছে কিন্তু আমার ইয়ে পেয়েছে। করে নিই আগে।' বিশ্বাস করলাম। করতেই বিড়ির আগুন নিবে গেল। তারপরেই মাথার পেছনে আঘাত। আমার আর কিছু মনে নেই।" মেজর গড়গড় করে বলে গেলেন। বলতে বলতে তাঁর হাত উঠে স্পর্শ করল ফোলা জায়গাটা।

অর্জুন বলল, "আমরা আপনাকে খুঁজতে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। তখন ওই লোকটাই হঠাৎ সামনে এসে হদিস দিয়েই আবার উধাও হয়ে গেল।"

"তাই নাকি! লোকটা কিন্তু ক্রিমিন্যাল।" মেজর বললেন।

অমল সোম বললেন, "হ্যাঁ। এখানে দেখছি ক্রিমিন্যালদের সংখ্যা কম নয়। যাক, এখনও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে গাড়ি আসার। আমি একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি।"

মেজর তাঁকে সতর্ক করলেন, "জঙ্গলে গেলে কোনও গাছের গা ধরে হাঁটবেন না।"

"কেন ? গাছ আমার ক্ষতি করবে নাকি ?"

মেজর তখন তাঁর দেখা মাংসখাদৎ পিঁপড়ের কাহিনী শোনালেন। অমল সোম বললেন, "পিঁপড়েগুলোকে দেখাতে পারবেন ?"

"অফ কোর্স।"

অতএব তিনজনেই রওনা হল। অর্জুন এর আগে পিরান্‌হা মাছের গল্প শুনেছে। সেই ছোট্ট মাছ অবলীলায় একটা মানুষকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। আর এক ধরনের পিঁপড়ে নাকি হাতির মৃতদেহ খেয়ে নিতে পারে কয়েক দিনে। কিন্তু একটা জ্যান্ত হরিণের বাচ্চাকে পিঁপড়েরা যা করেছে বলে মেজর বললেন, সেটা পৃথিবীর কেউ শুনেছে কিনা তার জানা নেই। মিনিট পনের হাঁটাহাঁটি হল। মেজর কিছুতেই জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যদিও এই হাঁটাহাঁটি খুব আরামপ্রদ নয়, তবুও কৌতূহলের কারণে কেউ আপত্তি করছিল না। শেষ পর্যন্ত মেজরই জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে কোথায় খুঁজে পেয়েছিলে বলো তো ?"

অর্জুন আরও খানিকটা ডান দিকে হেঁটে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। গর্তের মধ্যে শুকনো পাতা মেজরের দেহের চাপে বসে গেছে অনেকটা। মিনিট

পাঁচেক হাঁটাহাঁটির পর মেজর চিৎকার করে উঠলেন, "ইউরেকা !"

মেজরকে ছুটে যেতে দেখে ওরাও পা চালালো। একটা গাছের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মেজর। গাছটার নিচে পরিষ্কার ধবধবে কয়েকটা হাড় পড়ে আছে। কিন্তু গাছের গুঁড়ির কোনও অংশেই একটাও পিঁপড়ে নেই।

মেজর উত্তেজিত গলায় বললেন, "এইখানে পিঁপড়েগুলো ছিল মিস্টার সোম। ওই দেখুন, হরিণটার হাড় পড়ে আছে।"

অর্জুন বলল, "হরিণটার মাথার খুলি, পা কোথায় ?"

অমল সোম এগিয়ে গিয়ে একটা হাড় তুলে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "উনি ঠিকই বলছেন। কয়েক ঘণ্টা আগে এটা কোনও জন্তুর শরীরে ছিল। মাংস মজ্জা খেয়ে নিয়ে, মেজরের দেখা যদি ঠিক হয়, পিঁপড়েরা চলে গেছে। আর জঙ্গলে তো শেয়াল-হায়েনার অভাব নেই, খুলিটুলিগুলো তারাই নিয়ে গেছে।"

একটা হালকা দাগ গাছের গুঁড়িতে ছিল। বোঝাই যাচ্ছে ওখানে কিছু চেপে ছিল অনেকক্ষণ। অমল সোম বললেন, "আপনি বলছিলেন পিঁপড়ের চাকের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এই জায়গাটা, তাই কালো দেখাচ্ছিল। তা হলে তো হাজার হাজার পিঁপড়ে থাকার কথা। একসঙ্গে ওগুলো গেল কোথায় ?"

মেজর বললেন, "নিশ্চয়ই কাছাকাছি আবার ফাঁদ পেতেছে।"

"না। জন্তুজানোয়ার থেকে পাখি পর্যন্ত খিদে না পেলে খাবার খোঁজে না। এখন ওদের পেট ভর্তি। যতক্ষণ না খিদে পাবে, ততক্ষণ ওরা ফাঁদ পাতবে না। মানুষের সঙ্গে এটাই পার্থক্য।"

অর্জুন আশেপাশে পিঁপড়ে খুঁজল। "না কোথাও নেই।"

"আপনার বিষফুল কোথায় ?" অমল সোম প্রশ্ন করলেন।

মেজর আবার উৎসাহে এগিয়ে গেলেন, "অন্ধকার ছিল, তবু আমি একটা পাতাঝরা গাছকে চিহ্ন হিসেবে রেখে এসেছি।"

ন্যাড়া গাছটাকে খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। হাত বাড়িয়ে ওদের দেখতে বললেন, "একটু এগিয়ে গেলেই গন্ধ পাওয়া যাবে। সাবধান !"

অর্জুন চারপাশে তাকাল। সকালের জঙ্গলে পাখিদের ব্যস্ততা থাকে। চার পাশেই তারা চেঁচামেচি করছে। কয়েকটা বাঁদর গাছের ডাল ধরে ওপাশে চলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোন দিকে গন্ধ পেয়েছিলেন ?"

"ওই দিকে।"

"কিন্তু ওদিকে যদি বিষফুল থাকে, তাহলে পাখি বা বানরের কিছু হচ্ছে না কেন ?"

অমল সোম বললেন, "ঠিক কথা। মেজর, আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে।"

"অসম্ভব। ওই গন্ধ নাকে ঢোকামাত্রই আমার শরীর ঝিমঝিম করছিল।" মেজর প্রতিবাদ জানিয়ে একপা একপা করে এগোতে লাগলেন।

অর্জুন স্বচ্ছন্দে হাঁটতে লাগল তাঁকে ডিঙ্গিয়ে। তারপরেই ওরা হাসনুহানার ঝোপটাকে দেখতে পেল। সকালেও সেই ফুলের গন্ধ বাতাস জুড়ে রয়েছে। মেজর অর্জুনের হাত ধরে টানলেন, "খবরদার। আর এগিও না।"

গন্ধ নাকে লাগলেও শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। অর্জুন ফুলটাকে লক্ষ করছিল। জলপাইগুড়িতে এ রকম হাসনুহানা গাছ সে অনেক দেখেছে। তার ফুলের সঙ্গে এর কোনও পার্থক্য নেই। হাসনুহানার গন্ধে সাপ আসে বলে প্রচার আছে। এ ছাড়া আর কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। অমল সোম শব্দ করে হাসলেন, "জঙ্গলে ঢুকে গন্ধ পেয়েই ভাবলেন, বিষ ফুলের গন্ধ ?" তিনি এগিয়ে গিয়ে ফুলের ঘ্রাণ নিলেন। "সত্যিই কড়া গন্ধ। কিন্তু দেখুন, আমি ঠিকই আছি। কাল রাত্রে আপনি মানসিকভাবে গোলমেলে ছিলেন।"

মেজর ততক্ষণে বুঝেছেন তিনি ভুল করেছেন।

অমল সোম এবার ফিরলেন। তাঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে মেজর বললেন, "হতে পারে। হতে পারে কেন, ভুল নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু পিঁপড়েদের ব্যাপারটা একশো ভাগ সত্যি।

"ঠিক। ওই হাড়গুলো তো মিথ্যে নয়। তবে জঙ্গলের এত কাছাকাছি যদি আপনার বিষফুল থাকত, তাহলে রেঞ্জার খবর পেয়ে যেতেন।" অমল সোম এগিয়ে চললেন।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ না হতেই গাড়ি এসে গেল। অমল সোম বললেন, "তা হলে আপনারা চারপাশে ঘোরাঘুরি করুন।"

মেজর বললেন, "তার মানে ? আমাদের তো নিম টি এস্টেটে যাওয়ার কথা।"

"আপনারা যেতে চান ?"

"হ্যাঁ, আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না।"

অমল সোম হাসলেন, মুখে কিছু বললেন না।

ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে গতকালের সেই রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর চা বাগানের গায়ে নিম টি এস্টেটের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। অমল সোম বললেন, "মনে হচ্ছে বাগানটা বেশ বড়। বাঙালি মালিকের বাগান তো এখন হাতে গোনা।"

এখানে আসার পথে যে ক'টা চায়ের বাগান নজরে পড়েছে, তার সাইনবোর্ডে হয় বিদেশি নামের কোম্পানি নয় অবাঙালি নাম চোখে পড়েছে। এসব নিয়ে অর্জুন কখনও মাথা ঘামায়নি। এককালে জলপাইগুড়ির এস পি রায় এবং বীরেন ঘোষ অনেক চা-বাগানের মালিক ছিলেন। ওঁদের মৃত্যুর পর এস পি রায়ের ছেলেরা খুব ভালভাবে ব্যবসা করলেও বীরেন ঘোষ মশাই-এর ছেলে তাদের চা-বাগান বিক্রি করে দিয়েছেন। এই নিয়ে জলপাইগুড়ির পুরনো

মানুষেরা আফসোস করেন। অমল সোমের কথা শুনে মনে হল তাঁরও আফসোস ওই কারণে।

গাড়ি বাগানের গেট পেরিয়ে সরু রাস্তায় ঢুকে পড়ল। সাদা নুড়ি পাথরের রাস্তা। ওপাশে ফ্যাক্টরির শেড দেখা যাচ্ছে। এপাশে অফিস। বেশ নির্জন জায়গা। গাড়ি থেকে নেমে ওরা এপাশ ওপাশে তাকাতেই একজন মঙ্গোলিয়ান যুবক এগিয়ে এসে নমস্কার করল। অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, "মিসেস ব্যানার্জি আছেন ?"

"মেমসাহেব বড়া বাংলোতে আছেন।"

"বড়া বাংলো ?"

"হ্যাঁ। ওই ওপাশে বড়া বাংলো, আর ডানদিকে ছোটা বাংলো।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার হরপ্রসাদ সেন কি এখানে আছেন ?"

"হ্যাঁ। আসুন আমার সঙ্গে।" ছেলেটি এগোল।

অমল সোম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এঁকে চিনলেন কী করে ?"

অর্জুন জবাব দিল, "জলঢাকার কাছে আলাপ হয়েছিল। উনি নীল চ্যাটার্জির পেছন পেছন আসছিলেন। ওই যে ঝামেলাটা।"

"বুঝেছি।" অমল সোম মাথা নাড়লেন।

অফিসটি ছিমছাম। ছেলেটি জানাতেই তাদের ভেতরে নিয়ে আসতে বললেন হরপ্রসাদ সেন। মেজরকে দেখে বৃদ্ধের কপালে ভাঁজ পড়ল, "কোথায় যেন—ওহো, কী ব্যাপার ?"

"চিনতে পারছেন ?" মেজর গম্ভীর গলায় বললেন।

"বিলক্ষণ।"

"ইনি অমল সোম। সত্যসন্ধানী।"

অমল সোম নমস্কার করলেন, "ওসব কিছু নয়। আমি এই বাগানের মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিছু ব্যক্তিগত কথা বলব।"

হরপ্রসাদ সেন ঘড়ি দেখলেন, "ওঁর অফিসে আসার সময় হয়ে গিয়েছে। যদিও 'ব্যক্তিগত কথা' বললেন, তবু জানতে পারি প্রসঙ্গটি আমাদের ছোট সাহেবকে নিয়ে কি ?"

"আপনার অনুমান ঠিক।"

"তা হলে বলব, কথা বলে কোনও লাভ হবে না। উনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, ছোট সাহেবের কোনও ব্যাপারে থাকবেন না।"

"সেটা আপনাদের বলেছেন। আমি নিজের কানে শুনে যেতে চাই।"

হরপ্রসাদ সেন দরজার দিকে তাকালেন। মঙ্গোলিয়ান ছেলেটি ওদের এই ঘরে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। হরপ্রসাদবাবু গলা নামালেন, "নতুন কোনও ঘটনা ঘটেছে ?"

অমল সোম বললেন, "অনুমান করছি আপনি স্বর্গত অশ্বিনী ব্যানার্জীর

আমলের লোক।"

"ঠিক তাই। এসব দেখে শুনে আমি ছুটি চেয়েছিলাম কিন্তু মিসেস ব্যানার্জি আমাকে ছাড়তে চান না। বয়েসও হয়েছে, মানাতে পারছি না তাই।" কথা বলতে বলতে কান খাড়া করলেন হরপ্রসাদ সেন, "ওই যে, মেমসাহেব এসে গেছেন। আপনারা বসুন।"

হরপ্রসাদ সেন তড়িঘড়ি উঠে গেলেন। ততক্ষণে একটা গাড়ি এসে থেমেছে অফিসে। বড়া বাংলো পাথর ছোঁড়া দূরত্বে হলেও মিসেস ব্যানার্জি গাড়িতেই অফিসে আসেন। তাঁকে এই ঘর থেকে দেখা যাচ্ছিল না।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি ওই বদমাসটার বিরুদ্ধে নালিশ করতে চান ?"

"তাতে কি কোনও লাভ হবে ? শুনলেন তো ভাইয়ের ব্যাপারে উনি থাকেন না।"

বারান্দায় শব্দ হল। তারপরই হরপ্রসাদ সেনের গলা, "আসুন, আসুন।"

গটগট করে ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। অমলদাকে অনুসরণ করে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। মিসেস ব্যানার্জির বয়স পঞ্চাশের কাছে, মাথার সামনের দিকের চুল ইন্দিরা গান্ধীর মতো সাদা। সাদা জামা আর শাড়িতে বেশ ব্যক্তিত্বময়ী বলেই মনে হচ্ছে।

অমল সোম নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিলেন।

অর্জুন লক্ষ করল, বাগানের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা হরপ্রসাদ সেনের চেয়ারে না বসে পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন, "বসুন মিস্টার সেন। বসুন আপনারা। হ্যাঁ, কী ব্যাপার ? আমি তো ভাবতেই পারছি না, আপনাদের মতো নামী লো- অকারণে আমার বাগানে সময় নষ্ট করতে আসবেন।

হরপ্রসাদ সেন নিচু গলায় বললেন, "মিস্টার সোম আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলতে চান। বিষয়টা আমাকে বলেননি।"

অমল সোম বললেন, "মিসেস ব্যানার্জি, আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। কোনও এক সময় আমি আপনার স্বর্গত স্বামীকে চিনতাম। অশ্বিনীবাবু মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আপনি যেভাবে এই বাগান চালাচ্ছেন, তা প্রশংসনীয়।"

"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু যেভাবে চালানো উচিত তা পেরে উঠছি না। মডার্ন মেশিনারি ব্যবহার করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। আপনি কি আলাদা কথা বলতে চান ?" আচমকা গলার স্বর বদলে গেল।

"দরকার নেই। শুনেছি আপনার ভাই নীল চ্যাটার্জি আপনাদের সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। অতএব তাঁর আচার-আচরণ সম্পর্কে আপনার দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। তিনি এই এলাকায় যেভাবে রাজত্ব করছেন, তা মাফিয়া ডনেরাই

করে থাকে। আপনার স্বামী বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সহ্য করতেন না। আমার একমাত্র প্রশ্ন, আপনি কী করে আপনার ভাইয়ের গুণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন ?" অমল সোম খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন। অর্জুন ভাবছিল এসব শুনে মিসেস ব্যানার্জি খুব চটে যাবেন। কিন্তু নিঃশব্দে হাসলেন মাত্র, "আর কিছু ?"

"না।"

"আপনি নিশ্চয়ই তার গুণ্ডামির প্রমাণ পেয়েছেন, নইলে আমাকে বলতে আসতেন না। আপনি বললেন, আমি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। ভাল কথা। কিন্তু একই সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ, সরকারী সংস্থাগুলো, জেলার এস পি, স্থানীয় মানুষজন তাকে কি প্রশ্রয় দিচ্ছে না ? কোনও এক ব্যক্তির কতখানি ক্ষমতা থাকতে পারে যে, সবাইকে সে হাতের মুঠোয় রাখতে পারে ?"

"আমার প্রশ্নের এটা উত্তর হল না।"

"মিস্টার সোম, আমি কীভাবে ক্ষতিপূরণ করতে পারি, বলুন ?"

"ক্ষতিপূরণ ?"

"নিশ্চয়ই সে আপনাকে অপমান করেছে ?"

"করেছে। কিন্তু কুৎসিত গালাগাল আর হুমকির ক্ষতিপূরণ কিসে হওয়া সম্ভব ?"

"আমি জানি না।"

"বেশ। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে এসেছিলাম। নিশ্চয়ই আপনি ভাই সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু এই কারণ আপনার স্বামীর ব্যবসায় বদনাম তৈরি করছে। আচ্ছা, আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে আমি দুঃখিত। নমস্কার !" অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন।

এইসময় বাইরের নুড়ি পাথর ছিটকে ব্রেক কষে গাড়ি থামার আওয়াজ এল। হরপ্রসাদ সেন চাপা গলায় বলে উঠলেন, "ছোট সাহেব এসেছেন।"

অমল সোম এবং অর্জুন ততক্ষণে বাইরের বারান্দায় পা রেখেছে। মেজর পেছনে। গাড়ি থেকে নেমে নীল চ্যাটার্জি ওদের দেখতে পেয়ে বেশ অবাক হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। দ্রুত পা ফেলে কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী ব্যাপার ? আপনারা তো ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন ?"

অমল সোম বললেন, "কাল 'তুমি' 'তুই' শুনেছিলাম, আজ 'আপনি'। এসো অর্জুন।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওরকম চালিয়াতের মতো আমার সঙ্গে কথা বলার সাহস হল কী করে ? এটা আমার বাগান, ফরেস্ট বাংলো নয়।" চিৎকার করে উঠল নীল।

"বাগানটা এখনও মিসেস ব্যানার্জির। উনি মরে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরই।" অমল সোম এগিয়ে গেলেন গাড়ির দিকে।

নীল চ্যাটার্জি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বারান্দা থেকে মিসেস ব্যানার্জির গলা ভেসে এল, "নীল !"

নীল পেছন ফিরে তাকাল।

"আর একটা কথাও আমি শুনতে চাই না। এদিকে এসো।"

ওরা গাড়িতে উঠল। গাড়িটা যখন বাগান ছাড়াতে যাচ্ছে, তখন ওপাশ থেকে মারুতিটা বাঁক নিল। দুটো গাড়ি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। ওপাশের গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে আছে জলপাইগুড়ির বরেন ঘোষালের ছোট ভাই।

॥ এগারো ॥

হঠাৎ ডান হাতটা বাইরে বেরিয়ে এল, তার মুঠোয় রিভলভার।

বরেন ঘোষালের ভাই চিৎকার করে উঠল, "তিন গুনব, এর মধ্যে কথা না শুনলে গুলি চালাতে বাধ্য হব। ওয়ান—।"

মেজর হকচকিয়ে গেলেন। চাপা গলায় বললেন, "এ দেখছি উন্মাদ। কী হবে ?"

অমল সোম বললেন, "গুলি করে সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে না। যে বেঁচে থাকবে, সে থানায় যাবে। তোমার নির্ঘাত ফাঁসি হবে।"

মেজর বললেন, "আশ্চর্য ! আপনি এখনও ঠাণ্ডা মাথায় আছেন ?"

অর্জুনের মাথায় একটা মতলব খেলে গেল, "আপনার কলমটা দিন তো !"

"কী করবে ?"

"দিন না।" ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়াতেই বরেন ঘোষালের ভাই চিৎকার করল, 'টু' !"

তড়িঘড়ি কলমটা দিয়ে দিলেন মেজর। অর্জুন সেটা নিয়ে নীচে নামল। তারপর দুটো হাত মাথার ওপর তুলে এগোতে লাগল। ছেলেটা চিৎকার করল, "গৌর-নিতাই হয়ে কোনও লাভ নেই, গাড়ি হঠাও, নইলে তিন বললেই গুলি চালাব।"

"ক'জনকে মারবে ?" একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল অর্জুন।

"সবক'টাকে। আমাকে তো চেনো না !"

"কিন্তু তার আগে যদি তোমার শার্টে আগুন ধরে যায় ?"

"আমার শার্টে ? হ্যা হ্যা হ্যা। আমার গায়ে আগুন দেবে এমন কেউ জন্মায়নি রে ! আমি এবার থ্রি বলছি।" রিভলভারটাকে অর্জুনের বুক লক্ষ করে ধরল সে।

কথা বলার সময় হাত মাথার ওপর রেখেই পেনটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল অর্জুন। এবার বলল, "এক মিনিট। আমি ম্যাজিক জানি। সেটা কী রকম একটু দ্যাখো।"

তক্ষুণি বোতাম টিপল সে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির হুডটা জ্বলে উঠল। প্রাণপণে লাফ দিল বরেন ঘোষালের ভাই। ব্যালান্স রাখতে না পেরে চা-গাছের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই রিভলভার ছিটকে গেল হাত থেকে। অর্জুন দ্রুত সেটা তুলে নিল। ততক্ষণে গাড়ির নরম হুডটা পুড়ে ছাই। বরেন ঘোষালের ভাই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখে বলে উঠল, "আই বাপ !"

এবার বীরদর্পে মেজর নেমে এলেন। সোজা ছেলেটার পাশে পৌঁছে ওর কান টেনে ধরলেন, "সেদিনের ছেলে, গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছ। মেরে হাড় ভেঙে দেব বানর ! যা, তাড়াতাড়ি গাড়ি ব্যাক কর, নইলে তোকে পুড়িয়ে মারা হবে।"

ওপরের কভার পুড়িয়ে আগুন নিভে গিয়েছিল। অমল সোম ডাকলেন, "শোনো, ওকে এই গাড়িতে নিয়ে এসো। মেজর, আপনি গাড়িটা চালাতে পারবেন ?"

মেজর বললেন, "আমার আবার গিয়ার-ছাড়া গাড়ি চালানো অভ্যেস। বুঝলে অর্জুন, আমেরিকায় গাড়িতে গিয়ার থাকে না।"

অর্জুন গাড়িটা পরিষ্কার করে উঠে বসল। বাইক চালানো অভ্যেস, গাড়ির হাত খুবই কাঁচা। মেজর বললেন, "ওটা দাও। সঙ্গে রাখা ভাল। চলো হে।"

টর্চ সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন বরেন ঘোষালের ভাইয়ের হাত ধরে। যে ছেলেটা এতক্ষণ বীরদর্পে তড়পাচ্ছিল, সে হঠাৎ ভেজা মুড়ির মতো মিইয়ে গেছে। বারংবার ঘুরে ঘুরে দেখছে অর্জুনকে।

বেশ সজাগ হয়ে অমল সোমদের অনুসরণ করে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এল অর্জুন। সামনের গাড়ির ড্রাইভার সোজা থানার সামনে দাঁড়িয়ে গেলে সেও ব্রেক চাপল। থানার বাইরে দু'জন সেপাই দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ডাকলেন অমল সোম, "বড়বাবু আছেন ?"

"হ্যাঁ সার।"

"তা হলে একে নিয়ে ওঁর কাছে চলুন।"

সেপাইটি বরেন ঘোষালের ভাইকে দেখে হকচকিয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে সে চিনতে পেরেছে। তাকে ইতস্তত করতে দেখে অমল সোম ধমকালেন, "যা বলছি তাই করুন।"

সেপাইটি নিতান্ত অনিচ্ছায় আদেশ পালন করল। হয়তো সে অমল সোমকে বড় অফিসার মনে করেছিল। অর্জুন রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে ওদের অনুসরণ করল।

থানার বড়বাবুর বয়স হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় রিটায়ার করার মুখে এসে পৌঁছেছেন। হঠাৎ এইসব ব্যাপার দেখেশুনে খুবই অস্বস্তিতে পড়লেন। অমল সোম বললেন, "এই ছেলেটির শিক্ষা হওয়া দরকার। আমার বক্তব্য

রেকর্ড করে ওকে হাজতে পুরুন।"

বরেন ঘোষালের ভাই ততক্ষণে একটু সাহস ফিরে পেয়েছে। চাপা গলায় বলল, "আপনারা ঝামেলা বাড়াবেন না। সেই হ্যামিলটনের কেসটা মনে আছে তো!"

বড়বাবু সোজা হয়ে বসলেন, "অল্পবয়সী ছেলের ব্যাপার, হঠাৎ মাথা গরম করে ফেলেছিল। এটা নিয়ে আর না এগোলেই তো ভাল।"

"অল্পবয়সী ছেলে যখন গালাগাল দিয়ে রিভলভার থেকে গুলি চালাবার চেষ্টা করে, তখন তার শাস্তির জন্যে এগোতে হয়। আপনি ডায়েরি নিন। আপনার অসুবিধে থাকলে এস পি.কে ফোন করে বলুন জলপাইগুড়ির অমল সোম ইনসিস্ট করছেন, কিন্তু আপনি ডায়েরি নিচ্ছেন না। কী করবেন ভেবে দেখুন।" অমল সোমের কথা শেষ হওয়ামাত্র কাজ শুরু হয়ে গেল। বরেন ঘোষালের ভাইকে পুলিশের হেফাজতে দিতে সে চিৎকার করে উঠল, "আমিও ডায়েরি করব। আমার গাড়িতে এরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।"

বড়বাবু বললেন, "সে কী!"

"হ্যাঁ। বাইরে চলুন, দেখাচ্ছি।"

বড়বাবু যেন উৎসাহিত হয়েই বাইরে এলেন। ছেলেটি দেখাল, "ওই যে, কভার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছি আমি!"

"আপনারা আগুন লাগিয়েছেন?" বড়বাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে জিজ্ঞেস করুন আগুন যদি লাগানো হয়ে থাকে, তা হলে কী দিয়ে লাগানো হয়েছে?"

"মাজিক, ম্যাজিক করে আগুন ধরিয়েছে ও।" অর্জুনকে দেখিয়ে দিল ছেলেটা।

"ম্যাজিক? ম্যাজিকের আগুন আসল হয় নাকি! লোকে বিশ্বাস করবে?"

গাড়িতে উঠে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের অস্ত্রটি একবার দেখতে পারি?"

মেজর সোৎসাহে এগিয়ে দিলেন। চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন অমল সোম। মেজর বললেন, "আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তা হলে রেখে দিতে পারেন।"

অমল সোম কলমটা ফিরিয়ে দিলেন, "সঙ্গে অস্ত্র রাখা আমি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটার কী হবে মনে হয়?"

"কী আর হবে? আধঘণ্টা বাদেই জামিন নিয়ে যাবে। কষ্ট করে কোর্টে তুলবে বলে মনে হয় না। তবে থানার রেকর্ডে ঘটনাটা লেখা থাকল, এইটেই লাভ।"

ওরা ফিরে এল জঙ্গলের ভেতর। আকাশে মেঘ জমছে। ডুয়ার্সের বৃষ্টি একবার শুরু হলে ক'দিন ধরে চলে। মেজর গম্ভীর হয়ে বললেন, "সমস্যা হয়ে গেল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কীরকম?"

"বৃষ্টি নামলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিষফুলের গন্ধ টের পাওয়া যাবে না। খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কী মনে হয়, বৃষ্টি হবে?"

অর্জুন তাকাল। বৃষ্টি আসবে, কিন্তু সেটা যে প্রবল হবে এমন মনে হচ্ছে না।

অমল সোম বললেন, "আচ্ছা মেজর, বৃষ্টি হবে কিনা তা ভবিষ্যতের ব্যাপার, আপনারা কেউ ওই লোকটাকে নিয়ে চিন্তা করছেন না কেন, যে আপনাকে জঙ্গলের ভেতর আঘাত করেছিল?"

"আমি ভাবিনি, তা কে বলল? ভেবেছি। এই সব জঙ্গলে প্রচুর বন্যজন্তু-শিকারি লুকিয়ে আছে। তাদের কেউ আমাকে দেখে ভয় পেয়ে আঘাত করেছে।"

"এটা হওয়া সম্ভব। কিন্তু যারা গোপনে জঙ্গলে শিকার করে, তারা বাংলোর কিচেন থেকে খাবার চুরি করে খাবে বলে মনে হয় না।"

"ও, খাবার চুরির ঘটনাটা একদম আলাদা। আমি বাবুর্চির সঙ্গে কথা বলেছি। এদিকে এমন ঘটনা না ঘটলেও ঘটা অসম্ভব নয়। পাঁচ-ছ' কিলোমিটার দূরে গরিব মানুষের গ্রাম আছে। ওদের কেউ আসতে পারে।" মেজর বললেন।

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "তা ঠিক। তবে সেরকম হলে দিনের বেলায় খাবার চুরি যেত। সন্ধে নামলে কেউ জঙ্গলের ভেতর ঢুকবে না। চুরি করা খাবারের চেয়ে নিজের কাছে জীবন অনেক মূল্যবান।"

দুপুরের খাওয়ার পর মেজর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। এরকম মেঘলা দুপুরে ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। এখানে এসে কয়েকটা ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া ছাড়া তেমন কিছুই ঘটল না। অর্জুনের মনে হচ্ছিল অমল সোম তাঁর স্বভাব অনুযায়ী কোনও কথাই বলতে চাইছেন না। অর্জুন বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। চারধার খুব বেশি চুপচাপ। আকাশে মেঘ জমলে পাখিরাও বোবা হয়ে যায়? গতকাল যেদিক দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল তার বিপরীত দিকে ঢুকল সে। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। কলমটা মেজরের কাছে রয়ে গেছে। অবশ্য দিনের বেলায় অস্ত্রের তেমন প্রয়োজন হবে না। কিছুটা হাঁটতে চমৎকার গন্ধ নাকে এল। মিষ্টি গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করছে না। অর্জুন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বিষফুল যদি হয়, তা হলে আর দেখতে হবে না। মিনিট দুয়েকেও যখন শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না, তখন সে পা বাড়াল।

হঠাৎ সামনের বুনো ঝোপের ভেতর ঝটপটানি শুরু হল। তারপরই একটা শেয়াল দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে অর্জুনের দিকে তাকাল। এরকম ভয়-পাওয়া বোকা-বোকা চাহনি দেখে মজা লাগল অর্জুনের। সে কপট ধমক দিল, "ভাগ।"

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উধাও হল জন্তুটা। অর্জুন বুঝতে পারল, গন্ধটা আসছে ওই ঝোপের মধ্যে থেকে। শেয়ালটা যখন ওখান থেকে বের হল, তখন বোঝাই যাচ্ছে গন্ধটা বিষ ফুলের নয়। সে ঝোপটার ভেতর উঁকি মারার চেষ্টা করল। ডালপালা সরিয়ে এগিয়ে যেতে দৃশ্যটা দেখতে পেল অর্জুন, গোটাদুয়েক শেয়ালের বাচ্চা হতভম্ব হয়ে তাকে দেখছে। বাচ্চাগুলো দিন সাতেকের বেশি নয়। কুকুরের বাচ্চার মতোই আদুরে দেখতে। আর তাদের পাশে মাটি খানিকটা খোঁড়া রয়েছে। সেখানেই গন্ধের উৎস। কাজটা মা-শেয়ালের, গর্ত খুঁড়ে বাচ্চাদের নিয়ে খাওয়া শুরু করেছিল সে। মাটির তলায় কোনও ফল বড় হয়ে পেকে উঠেছিল, নিজস্ব ঘ্রাণশক্তিতে শেয়াল তার খবর পেয়ে গিয়েছিল। জলপাইগুড়ির বাড়িতে একটা কাঁঠালগাছ আছে। যার ফল মাটির নীচে হয়। সেই কাঁঠাল পেকে যাওয়ার সময় ওপরের মাটিতে চিড় ধরে, তার ফাঁক দিয়ে গন্ধ বের হয়। এটা কী ধরনের ফল, বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ধরনটা ওইরকমের।

এই সময় পেছনে পাতার শব্দ হতে চোখ ফেরাল অর্জুন। এবং তাকে অবাক করে দিয়ে সুন্দর এগিয়ে এল, "নমস্কার বাবু।"

সুন্দরের মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পোশাকও ময়লা।

"তুমি এখানে ?"

"কাল থেকে এদিকেই আছি বাবু।" সুন্দর হাসল, "বাচ্চাগুলোকে খেতে দিন বাবু। পুরোটা খেতে পারবে না, বাকিটা আমি খাব। আসলে এই জঙ্গলে তেমন ফলমূল তো নেই। জন্তুগুলোর খুব অসুবিধে হয়।"

"তুমি গতকাল মেজরের মাথায় আঘাত করেছিলে ?"

"আজ্ঞে! তিনি কে ?"

"ওঃ, মোটাসোটা মানুষ। পাতার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন।"

"ও হ্যাঁ। নাহলে আমাকে ধরে ফেলতেন। পরে যখন আপনারা আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন, তখন আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম উনি কোথায় শুয়ে আছেন।"

"বাংলোর রান্নাঘর থেকে তুমিই খাবার চুরি করেছিলে ?"

"হ্যাঁ বাবু। এত খিদে পেয়েছিল যে, নিজেকে সামলাতে পারিনি। তা ছাড়া আপনি ওদের মধ্যে আছেন দেখে ভরসা হল। অন্যায়টা মাফ করে দেবেন।"

"তুমি এই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছ কেন ?"

"আমার কথা থাক। আপনি শহরের মানুষ, আপনি কি বেড়াতে

এসেছেন ?”

“কাজও আছে। শোনো সুন্দর, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমি জানি, তুমি নীল চ্যাটার্জির ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ।” অর্জুন জানিয়ে দিল।

সুন্দরের চোখ ছোট হল। সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি নীলবাবুকে চেনেন ?”

“চিনতাম না। এখানে এসে চিনতে বাধ্য হয়েছি।”

“এই জায়গা রাস্তা থেকে বেশি দূরে নয়। ওপাশে একটা ভাল জায়গা আছে। আসুন আমার সঙ্গে।” সুন্দর হাঁটতে আরম্ভ করল। ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে হাঁটা মুশকিল। বুনো ঝোপ আর লতাপাতা সরিয়ে রাস্তা করতে হচ্ছে। মিনিট দশেক হাঁটার পর ওরা একটা অদ্ভুত জায়গায় পৌঁছল। গোটাদশেক মোটা-মোটা শালগাছ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের জায়গাটা একদম ন্যাড়া। যেন গাছেরা দেওয়াল হয়ে ঘর তুলেছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে সুন্দর বলল, “অল্প বৃষ্টি হলে এখানে জল পড়ে না। দেখুন মাথার ওপর পাতার ছাউনি কী ভাল। আকাশ দেখা যায় না।”

কথাটা ঠিক। আর সেই কারণেই জায়গাটা ছায়ায় ভরা। সূর্য ডোবার আগেই অন্ধকার হযে যাবে। সুন্দর বলল, “এখানে কথা বললে কেউ টের পাবে না।”

“শোনো, তোমার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি ঠিক করে খবর দিতে গিয়েছিলাম। পার্বতী বড়ুয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সেখানেই জানতে পারলাম, তুমি জঙ্গলে লুকিয়ে আছ।”

“অ। দিদি তো জানবেনই। বউ তো ওঁকেই প্রথমে বলবে।”

“কিন্তু সেই জঙ্গল তো অনেক দূরে। এখানে এলে কী করে ?”

“হেঁটে। জঙ্গলে জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।”

“কী হয়েছিল বলো তো ?”

“বাবু, এ-সবই পাপের শাস্তি। চাকরিবাকরি নেই, খেতজমি নেই অথচ সংসার চালাতে গেলে টাকার দরকার হয়। পাখি ধরা শুরু করলাম। প্রথমে ঘুঘু, বনমুরগি ধরতাম, ভাত না জুটুক মাংস খেতে পেত বউ ছেলে। তারপর ময়না, টিয়া ধরতে লাগলাম। সেগুলো বিক্রি করে দুটো পয়সা হত। সেই পাখি ধরার ধান্দায় জঙ্গলগুলো ঘুরতে হত। হঠাৎ একদিন একটা লোক এসে বলল আমি যদি আরও বেশি টাকা রোজগার করতে চাই, তা হলে সে হদিস দিতে পারে। যা পাচ্ছিলাম তাতে আমার চলছিল না। লোভ হল। গেলাম তার সঙ্গে। যার কাছে নিয়ে গেল সে নীলবাবুর লোক। এই এলাকায় সবাই চেনে। লোকটা বলল, “ময়না টিয়া ধরা বন্ধ কর। নইলে পুলিশ তোকে ধরবে। ওই সব পাখি ধরা আইনের চোখে অপরাধ। তুই এখন থেকে এই সব

পাখি ধরবি।" আমাকে ছবি দেখাল লোকটা। ওই রকম পাখি আমি জঙ্গলে দেখেছি। তবে বেশি নয়। কথা বলে না আর মাংসও খাওয়া যায় না বলে কোনওদিন ধরার চেষ্টা করিনি। লোকটা বলল, 'অন্তত গোটা কুড়ি পাখি তোকে ধরতে হবে। সেই পাখি নিয়ে জলপাইগুড়ির স্টেশনের কাছে তোকে যেতে হবে। পাখি নিয়ে যাওয়ার আগে আমাকে দেখিয়ে যাবি। কুড়িটা পাখি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আড়াইশো করে টাকা পাবি। কি রে, খুশি তো?'

"খুশি আমি হয়েছিলাম। আড়াইশো করে সপ্তাহে হলে মাসে হাজার টাকা। এর সঙ্গে ঘুঘু আর মুরগি ধরলে অসুবিধে নেই। কিন্তু লোকটা যে ছবি দেখিয়েছিল, সেই জাতের পাখি চাইলেই পাওয়া যায় না। সারাদিন ঘুরে হয়তো একটারও দর্শন পেলাম না, আবার একদিনেই আট-দশটা জুটে গেল। ফরেস্ট ডিপার্টের লোকদের আর আমি কেয়ার করতাম না। ওরা জেনে গিয়েছিল আমি নীলবাবুর লোক। ভয়ে আমাকে কিছু বলত না। এদিকের বাসে পুলিশ কিছু বলবে না জানি, মুশকিল হত জলপাইগুড়ির দিকে। তবু আমি এই ব্যবসা চালাচ্ছিলাম। রোজগারও হচ্ছিল মন্দ নয়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমার কৌতূহল হচ্ছিল না, ওই সব পাখি কী জন্যে ধরা হচ্ছে?"

"হয়নি যে তা বলব না। তবে আমি গরিব মানুষ, যে যা ইচ্ছে করুক আমি আর মাথা ঘামাইনি। পাখি দিতাম টাকা নিতাম। লোকটা বসে থাকত স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে। আমি গেলেই টাকা ধরিয়ে দিয়ে পাখি নিয়ে চলে যেত।"

"তা, এমন সুন্দর ব্যবসা বন্ধ করলে কী জন্যে?"

"আপনি আমাকে লোভ দেখালেন। ভালভাবে বাঁচার লোভ। পাখিগুলোকে দেখে বউ বলত, 'আহা কী নিরীহ বেচারা, তোমার পাপ হচ্ছে, সেইসঙ্গে আমাদেরও।'

"আমি ধমক দিতাম, 'পাপ-পাপ করিস না। আমি পাপ না করলে না খেয়ে মরতিস।'

"বুঝতে পারি বউ কথাগুলো পার্বতীদিদিকে বলেছে। পার্বতীদিদি আমাকে ডেকে খুব ধমকাল। বলল আর পাখি ধরলে পুলিশের হাতে তুলে দেবে আমাকে। তা পার্বতীদিদির ক্ষমতা আছে। বড়-বড় অফিসাররা আসেন তার কাছে। কিন্তু পার্বতীদিদির তো চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। হাতির কাজ আমি জানি না। ছেলেটার সঙ্গে হাতিদের বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু আমাকে দেখলে ওরা এমন রেগে যায় যে, ভয়ে ওদিকে যেতাম না। এই সময় আপনি লোভ দেখালেন। ফেরার সময় বাসে বসে ঠিক করলাম, আপনি যদি সত্যি কথা বলেন তা হলে জীবনে আর পাপ করব না। বাবু, লোকে মুখে অনেক উপকার করবে বলে আশা দেয়, কিন্তু কাজের বেলায় কথা রাখে না। তাই ভয়ও

ছিল।”

“তারপর ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“ফিরে আসার পরই নীলবাবুর লোক আমাকে ডেকে পাঠালেন। গেলাম। তিনি বললেন, ‘তোকে আর পাখি ধরতে হবে না।’

“আমি অবাক হলাম। এভাবে নিষ্কৃতি পাব, কল্পনা করিনি।

“তিনি বললেন, ‘তোকে একটা নতুন কাজ দিচ্ছি। এখন থেকে ভুটানের পাহাড়ের দিকে যে জঙ্গল আছে সেখানে থাকবি। সেখানে গিয়ে থর খুঁজবি। থর দেখেছিস ?’

“বললাম, ‘দু’বার দেখেছি।’

“ ‘ব্যস! তোর আর চিন্তা নেই। থর দেখতে পেলেই আমাদের খবর দিবি। কী করে ফাঁদ পেতে ওদের ধরতে হয়, শিখিয়ে দেওয়া হবে তোকে।’

“বাবু, থর হল ছাগলের মতো দেখতে, কিন্তু ছাগল নয়। নেপালিরা ওদের থর বলে ডাকে। এদিকে দেখা যায় না বড় একটা। কেউ-কেউ অবশ্য ওদের জংলা ছাগল বলে। সহজে ধরা দেয় না ওরা।”

“তুমি কী করলে ?”

“আমি আর পাপের পথে যাব না বলে ঠিক করলাম।”

৷৷ বারো ৷৷

অর্জুনের মনে পড়ল, এই থর বা পাহাড়ি ছাগলের কথা অমল সোমের মুখে সে এর আগে শুনেছে। অমল সোম ওর ভাল নামটিও বলেছিলেন। অর্জুন মনে করার চেষ্টা করল।

সুন্দর বলল, “কী ভাবছেন বাবু ?”

“ভাবছিলাম জন্তুটার আসল নাম কী ? যাকগে, তুমি ওদের বলতে পারতে আর কোনও অবৈধ কাজ করবে না। তা না বলে জঙ্গলে পালিয়ে এলে কেন ?”

“বললে ওরা কথা শুনত না। এ অঞ্চলে নীলবাবু যা বলবেন, সেটাই আইন। কথা না শুনলে ওরা আমার সর্বনাশ করে দিত।”

“কিন্তু জঙ্গলে খাবার নেই, বৃষ্টি-বাদল আছে, বন্য জন্তু আক্রমণ করতে পারে, এভাবে তুমি কতদিন পালিয়ে থাকবে ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“যে ক’দিন পারি! আমি শহরের দিকে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু তা হলে যে আমার ছেলে-বউকে দেখতে পাব না। জঙ্গলে থাকলে ওদের কাছাকাছি থাকব আমি। এই ক’দিনে অবশ্য একটা অন্যায় করেছি। বনমুরগি ধরে ছাড়িয়ে খেয়েছি। এই যা!”

“কী হল ?”

"মাটির নীচের ওই ফলটার কথা খেয়ালই ছিল না। বাচ্চাগুলোর পর মা-শেয়ালটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাকিটা খেয়ে গেছে।" হতাশ গলায় বলল সুন্দর।

"তুমি এক কাজ করো। আমার সঙ্গে চলো। বাংলোয় গিয়ে খাবে।"

"অসম্ভব ! ওখানে গেলে নীলবাবু ঠিক খবর পেয়ে যাবে।"

"সে জানবে কী করে ?"

"ওই বাংলোর কর্মচারীদের মধ্যে যে ওর লোক নেই, তা জানব কী করে ?"

"ঠিক আছে। তুমি রাত হলে এসো। আমি জেগে থাকব।"

সুন্দর অর্জুনকে জঙ্গলের ধারে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। এই সময় টুপ টুপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। অর্জুন দৌড়ে বাংলোয় ফিরে এল। বিকেল হয়ে আসছে। আকাশে জমাট মেঘ। রাত্রে ভারী বৃষ্টি হবে।

ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। সন্ধের মুখ থেকে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সুন্দরের জন্য চিন্তা হচ্ছিল অর্জুনের। বেচারা ভিজে যাবে একদম, অসুখ হওয়া বিচিত্র নয়। পাশের বেতের চেয়ারে বসে মেজর আফ্রিকান ভাষায় একটা বর্ষার গান গাইছিলেন গুন্‌গুন করে। একটু আগে তিনি বলেছেন ফরেস্টে বৃষ্টি দেখলেই তাঁর আফ্রিকার কথা মনে পড়ে। হয়তো কোনও গল্পের ভূমিকা ছিল সেটা, কিন্তু কেউ প্রশ্ন না করায় গানে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

হঠাৎ অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মেজর, এই গানের কবির নাম কী ?"

"খনাতিক মোজাম্বা। যে নৌকোয় চড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতাম, তার মাঝি ছিল লোকটা। অথচ কবিতা লি[illegible]ল নির্ঘাত নোবেল পেয়ে যেত অ্যাদ্দিনে। লাইনটা শুনুন, 'হে বৃষ্টি, মেঘ না থাকলে তোমার অস্তিত্ব নেই যেমন, আমার দুঃখগুলোরও কোনও মূল্য নেই আমি না থাকলে।' বিউটিফুল। কী বলেন ?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"সত্যিই ভাল। কিন্তু বৃষ্টির জন্যই বারান্দায় পোকা বাড়ছে। আমরা যদি তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি, তা হলে কারও অসুবিধে আছে ?" অমল সোম জানতে চাইলেন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে।

"শুয়ে পড়ব। সবাই মিলে ?" মেজর অবাক !

"হ্যাঁ। কেন ?"

"আমাদের সতর্ক থাকা উচিত নয় কি ? নীল চ্যাটার্জি তার বন্ধুর হেনস্থার বদলা নিতে এখানে আসবে না ? যা ফেরোসাস লোক !" মেজর কথা শেষ করেই কানখাড়া করলেন। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসছে। তারপরেই দূরে হেডলাইটের আলো দেখা গেল, আবছা।

মেজর উঠে দাঁড়ালেন, "আমার অস্ত্রটা নিয়ে আসি।" তিনি দ্রুত ঘরে ঢুকে

গেলেন।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়িটা একেবারে বাংলোর গায়ে এসে থামল। দরজা খুলে কে ভেতরে ঢুকে গেল, ওপর থেকে বোঝা গেল না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হল। ওরা দেখল চৌকিদার দৌড়ে উঠে এসেছে, "সাব, নীলবাবু এসেছেন, দেখা করতে চান।"

অমল সোম বললেন, "নিয়ে এসো।"

চৌকিদার নেমে গেলে অমল সোম বললেন, "ছেলেটা মোটেই মাথামোটা নয়।"

নীল উঠে এল। বৃষ্টির জল তার জ্যাকেটে লেগেছে। ওপরে এসে হাতজোড় করে বলল, "নমস্কার। আপনাদের কি বিরক্ত করলাম?"

অমল সোম বললেন, "মোটেই নয়। বসুন।"

চেয়ার টেনে পা ছড়িয়ে বসল নীল, "আরে, আপনারা নিজেদের পরিচয় দেবেন তো, কীরকম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেল বলুন তো! আপনি তো অর্জুন? আমি আপনার ফ্যান। সেই লাইটারের আমল থেকে। আপনার বাংলাদেশে গিয়ে রহস্য উদ্ধারের শেষটা অবশ্য আমাকে টানেনি। যাকগে, আমি এলাম অনেকটা দিদির চাপে। যা হয়েছে সব ভুলে যান। এনজয় ইওর ট্রিপ।"

"অনেক ধন্যবাদ।"

"শুনলাম আপনারা নাকি একটা ফুলের খোঁজে এসেছেন, যা বিষের গন্ধ ছড়ায়। ইন্টারেস্টিং। এ-ব্যাপারে যদি আমার সাহায্য দরকার হয়, তা হলে বলবেন।"

"নিশ্চয়ই বলব।" অমল সোম শান্ত গলায় বললেন।

"তা হলে আজ চলি। আপনারা গল্প করুন। নমস্কার।" হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল নীল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেসা করল, "আপনি যে ম্যাজিক জানেন, তা কখনও পড়িনি তো! আমার নির্বোধ বন্ধু যা করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন আপনি। হাত নেড়ে আগুন জ্বালাতে এদেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা এককালে পারতেন। অবশ্য আমেরিকানরা বোতাম টিপে সেটা করতে পারে। নমস্কার।"

দ্রুত চলে গেল নীল। তারপরেই গাড়িটা পাক খেয়ে ফিরে গেল। সে উঠে এসেছিল গাড়ির হেডলাইট না নিভিয়ে। জায়গার অন্ধকার আরও বেড়ে গেল।

অমল সোম হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বুঝতে পারলে অর্জুন?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। এ যে দেখছি একদম উলটো ব্যবহার।"

"হ্যাঁ। আমি যা ভেবেছিলাম, নীলবাবু তার অনেক বেশি বুদ্ধিমান। উনি এসে এই বৃষ্টির মধ্যে জানিয়ে গেলেন আমাদের সম্পর্কে সমস্ত খবর ওঁর নেওয়া

হয়ে গিয়েছে।”

মেজর বেরিয়ে এলেন, “আমার মনে হয় ছেলেটা ভয় পেয়েছে। বন্ধুকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি দেখে বুঝতে পেরেছে ওরও ওই একই অবস্থা করব আমরা।”

অমল সোম উঠে পড়লেন, “ভয় পেয়েছে কিনা জানি না, তবে অর্জুন যে বোতাম টিপে আগুন জ্বালিয়েছিল, সেটা ধরতে পেরেছে নীলবাবু। আর আপনি যে আমেরিকায় থাকেন, সেই খবর নিশ্চয়ই ওর জানা হয়ে গেছে।”

সন্ধের পরই রাতের খাবার দেওয়া হল। কিন্তু অর্জুন খেল না। সে বলল, “এখন আমার একটুও খিদে পাচ্ছে না, আপনারা খেয়ে নিন, আমি পরে খাব।”

মেজর তাই শুনে খাওয়ার সময়টা পিছিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু অমল সোম সেটা করতে দিলেন না। ওঁরা যখন নীচের খাবার ঘরে যাচ্ছেন, তখন দোতলার বারান্দায় বসে অর্জুন বৃষ্টি দেখছিল। যদিও তার মন পড়ে ছিল জঙ্গলের মধ্যে। শালগাছ-ঘেরা জায়গাটায় নিশ্চয়ই এখন বৃষ্টির জল ঢুকে পড়েছে। বেচারা সুন্দর! অন্যায়ের সঙ্গে হাত মেলাবে না বলে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে ওকে। নীল চ্যাটার্জি যখন তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল, তখন সে সুন্দরের কথা ওকে বলতে পারত। অর্জুনের অনুরোধ হয়তো নীল রাখত। কিন্তু—। না, তাতে সুন্দরেরই ক্ষতি বাড়ত। ওর মুখে থর শিকারের কাহিনী অর্জুনরা জেনে গিয়েছে, তা বোঝার পর নীল আর পিছিয়ে যেত না। বরং সুন্দর যে এ অঞ্চলে আছে তা জেনে যেত।

সুন্দরকে সে রাত্রে এখানে আসতে বলেছে। সেই কারণে অমল সোম বলা সত্ত্বেও রাতের খাবার খেল না। এমন বৃষ্টির রাত্রে চৌকিদার বাবুর্চি বেশিক্ষণ জেগে থাকবে না। তখন সুন্দর এলে খাবারটা ওর সঙ্গে ভাগ করে খেতে পারবে। অর্জুন দেখল বাবুর্চি ওর খাবার ওপরে নিয়ে আসছে। শোওয়ার ঘরের টেবিলে যত্ন করে ঢেকে রেখে নেমে গেল।

অমল সোম এবং মেজর খাওয়া শেষ করে ওপরে উঠে এলেন। মেজর বললেন, “ ‘খেতে পেলেই শুতে চায়,’ কথাটা আমার ক্ষেত্রে খুব খাটে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।”

“শুয়ে পড়ুন।” অর্জুন বলল।

“আফ্রিকাতেও তাই করতেন?” অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

“আফ্রিকা নয়। গ্রিনল্যান্ড থেকে একশো কিলোমিটার উত্তরে বরফের ওপর তাঁবু খাটিয়ে তিন রাত ছিলাম। তখন শুধুই রাত। সময় বুঝতে হলে ঘড়ি দেখতে হত। বিকেল পাঁচটার সময় খেয়েদেয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে যেতাম। আমার সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, স্ট্যানলি স্টিভেনসন। স্ট্যানলির ঘুম আসত না। সে জেগে জেগে হাওয়ার শব্দ শুনত। হাওয়াদের

নাকি নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে।”

“থাকতে পারে। আমি চললাম।” অমল সোম নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

সেদিকে তাকিয়ে মেজর বললেন, “অমলবাবুর বয়স হয়ে যাচ্ছে, অল্পতেই টায়ার্ড হয়ে পড়েন। যাই, আমিও যাই।” হাই তুলতে তুলতে নিজের ঘরে চলে গেলেন মেজর।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে এল। মেজর ঘুমাচ্ছেন।

সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ বৃষ্টির তেজ আরও বাড়ল। পোকার জন্য আলো নিভিয়ে দিয়েছিল অর্জুন। জঙ্গলে বাতাসের তুমুল লড়াই চলছে। তার আওয়াজ অবশ্য মেজরের নাসিকাগর্জনের ওপরে। নীচের আলোগুলো নিভে গেল। তার মানে বাবুর্চি, চৌকিদার তাদের কাজ শেষ করে শুয়ে পড়ল।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য গাছপালা নেগেটিভ ছবি হয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে।

“বাবু।” চাপা গলায় ডাকটা ভেসে এল।

চমকে মুখ ফেরাতেই অন্ধকারে ঝাপসা শরীরটা নজরে এল।

“সুন্দর !” ফিসফিস করল অর্জুন।

“হ্যাঁ বাবু।”

অর্জুন তাজ্জব ! কখন নিঃসাড়ে লোকটা খুঁটি বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে এসেছে, তা সে টের পায়নি। অথচ সে সুন্দর কোন পথে আসবে তাই অনুমান করার চেষ্টা করছিল।

“তুমি তো ভিজে গেছ ?”

“হ্যাঁ বাবু।”

“এসো।”

প্রায় নিঃশব্দে ওরা ঘরে ঢুকল। আলো জ্বালল না প্রথমে। মেজরের নাক ডাকছে। বড় তোয়ালেটা অর্জুন সুন্দরের হাতে দিয়ে বলল, “ওটা বাথরুম। ওখানে ঢুকে এটা পরো।”

সুন্দরের হাতে একটা প্যাকেট ছিল। প্যাকেটটা প্লাসটিকের। সেটা টেবিলের ওপর রেখে যখন তোয়ালে নিল, তখন বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল। অর্জুন দেখল তার শরীর পুরো জলে ভেজা।

“ওটা কী ?”

“আমার জামা। বৃষ্টির জন্য।”

“ও, যাও।”

সুন্দর বেরিয়ে এল চটপট। অর্জুন খাবার খুলল। তারপর নিজে যতটা সম্ভব কম নিয়ে বাকিটা সুন্দরকে দিয়ে দিল। বুভুক্ষু মানুষ কীভাবে খায় তা

অনুমান করল অর্জুন। খাওয়া শেষ করে জল খেয়ে সুন্দর ফিসফিস করল, "কে ইনি ?"

"মেজর। তোমার কোনও চিন্তা নেই।"

"জঙ্গলে একটা বুড়ো বাঘ আছে, ঘুমিয়ে পড়লে ওইভাবে নাক ডাকে।"

অর্জুনের হাসি পেল। মেজর শুনতে পেলে সুন্দরকে মেরে ফেলতেন। খাওয়ার পর ওরা বাইরে এসে বসল। সুন্দরের কোমর থেকে তোয়ালে অন্ধকারেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রঙের ঔজ্জ্বল্যের জন্য। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "খুব ভিজেছ ?"

"না। গাছের ঘরে তেমন জল পড়েনি। এখানে আসতে গিয়ে ভিজে গেলাম।"

"তোমার নীলবাবু এসেছিল এখানে।"

"অ্যাঁ ? নীলবাবু !" চমকে উঠে দাঁড়াল সুন্দর।

"অর্জুন, ওকে বলো ভয়ের কোনও কারণ নেই।" পেছন থেকে নিচু গলা ভেসে এল। তারপরই অমল সোম এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন, "ব'সো। তোমার নাম সুন্দর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

অর্জুন বলল, "সুন্দর, ইনি আমার দাদা।"

"অ।"

অমল সোম বললেন, "তুমি নীলবাবুকে এত ভয় পাচ্ছ কেন ?"

"কথার অমান্য করেছি, উনি মেরে ফেলবেন।"

"সে কী ! এর আগে কখনও মেরেছেন ?"

"হ্যাঁ। জঙ্গলে লাশ পাওয়া যায়।"

"খুন ?"

"ঠিক বলতে পারব না। শরীরে কোনও চিহ্ন থাকে না। রক্ত বের হয় না।"

"কতজন এভাবে মারা গিয়েছে ?"

"অন্তত পাঁচজন।"

"থানা থেকে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ?"

"না। পুলিশ বলে প্রমাণ নেই কে মেরেছে !"

"হুঁ। তুমি তো পাখি শিকার করো ?"

"করতাম বাবু, এখন ছেড়ে দিয়েছি।"

"ও। তা জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র তো জানো ?"

"তা জানি।"

"সেরাও-এর নাম শুনেছ ?"

"সেরাও ?"

তখনই অর্জুনের মনে পড়ে গেল। সে উত্তেজিত গলায় বলল, "সুন্দর, বিকেলে তুমি যাকে থর বলছিলে, তারই ভাল নাম সেরাও।"

সুন্দর বলল, "হ্যাঁ চিনি।"

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "কী কারণে এই প্রসঙ্গ উঠেছিল অর্জুন ?"

অর্জুন জবাব দিল, "নীলবাবু ওকে থর শিকার করতে বলেছে, অন্তত থর কোথায় আছে তার খবর দিতে হবে। সুন্দর রাজি হয়নি বলে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে।"

অমল সোম বললেন, "গুড। সুন্দর, সেরাও কোন অঞ্চলে থাকে ?"

"পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গায় ওদের দেখেছি।"

"আমি জানি বক্সার পাহাড় থেকে এদিকের ভুটানের পাহাড় পর্যন্ত ওদের দেখা যায়। ওরা কখনওই পাহাড়ের বেশি ওপরে ওঠে না, আবার জঙ্গলের গভীরে ঢোকে না। তাই ?"

"আমি অতটা জানি না বাবু।"

"সুন্দর, তুমি আমাকে থর খুঁজতে সাহায্য করবে ?"

"আমি ? না বাবু, আমি আর পাপ করব না।"

"তোমাকে কোনও পাপ করতে বলছি না। আমি কখনওই পশুপাখি মারি না। আমরা শুধু ওদের লক্ষ করব, ছবি তুলব, ব্যস! এর জন্যে তুমি টাকা পাবে।"

"কিন্তু নীলবাবু ?"

"সে যাতে জানতে না পারে, সেই ব্যবস্থা আমরা করব।"

সুন্দর এবার অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি সঙ্গে থাকবেন তো বাবু ?"

অর্জুন বলল, "নিশ্চয়ই।"

"ঠিক আছে। কিন্তু আপনাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।"

"কতটা ?"

"তা এখান থেকে তিনপোয়া বেলা।"

"হাঁটব। মনে হচ্ছে বৃষ্টি মাঝরাত্রেই থেমে যাবে। ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তে পারি।"

"কিন্তু—এখন জঙ্গল ভেজা থাকবে। পাতায়-পাতায় জোঁক বের হবে।"

" তা হলে ?"

"একদিন রোদ উঠুক। গাছপালা ঠিক হোক, তারপর—"

"তোমার কি এখানে একদিন থাকার ইচ্ছে আছে ?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"মিথ্যে কথা বলব না বাবু। নীলবাবুর বন্ধু আমার বউকে শাসিয়ে এসেছে। আমি তার বদলা নেব বলে এই জঙ্গলে এসেছি। উনি একা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে ভালবাসেন। আমি এমন শাস্তি দেব... !" কথা শেষ করল না

সুন্দর।

"সে এখন থানায়। তাকে কোথায় পাবে?"

"থানায়?"

"হ্যাঁ। আমরাই ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।"

"হা ভগবান!"

"আফসোস কোরো না। তা ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া আইনের কাজ, তোমার নয়। তুমি আর পাপ করতে চাও না, ওটা করলে পাপ হবে।"

"বেশ, তা হলে ভোরেই চলুন।"

অমল সোম একটু চিন্তা করলেন, "না। কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে হবে। আমরা এগারোটা নাগাদ বের হব। তুমি রাতটা এখানেই ঘুমিয়ে নাও। জঙ্গলে ঢুকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে বলো। অন্ধকার চলে গেলে সেখানে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।"

"গাছবাড়ির কাছে পৌঁছতে পারবেন বাবু?" অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল সুন্দর।

"গাছবাড়ি? তার চেয়ে শেয়াল যেখানে ছিল, সেই জায়গাটায় যাওয়া সহজ।" অর্জুন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বলল, "তাই হবে। ওখানেই থাকব আমি। তবে এখন আমি চললাম। এখানে থাকতে সাহস হচ্ছে না বাবু।" সে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর নিজের ভেজা খাটো প্যান্টটা পরে প্যাকেটটা নিয়ে যেভাবে এসেছিল, সেইভাবেই নেমে গেল বাংলো থেকে।

॥ তেরো ॥

ডুয়ার্সের বৃষ্টি সম্পর্কে পণ্ডিতরাও কোনও পূর্বাভাস দিতে পারেন না। ওরা যখন আজ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল, তখন আকাশ পরিষ্কার। গাছপালা এখনও ভেজা, কিন্তু পায়ের তলায় জল জমেনি। সুন্দর আগে-আগে যাচ্ছিল।

বাংলো থেকে ওরা একসঙ্গে জঙ্গলে ঢোকেনি। মেজর এবং অর্জুন যেমন বেড়াতে যায় তেমনই একটু আগেভাগে বেরিয়েছিল। নুড়ির রাস্তাটা ধরে কিছুটা এগিয়ে ওরা জঙ্গলে পা রেখেছিল। অমল সোম এসেছিলেন মিনিট দশেক পরে। প্রত্যেকেই সঙ্গে একটা ব্যাগ অথবা প্যাকেট নিয়ে এসেছে। তাতে দু-একদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে। মেজর বেশ উত্তেজিত। সুন্দরের কথা তিনি জানতেন না। একটু আগে অর্জুনের মুখে সব শুনে মাথা নাড়লেন, "মুশকিলে ফেললে আমাকে!"

"কেন?" অর্জুন বুঝতে পারল না।

"যেভাবেই হোক একবার না একবার ওই সুন্দরের মাথায় মারতে হবে

আমাকে। মার খেয়ে হজম করে যাচ্ছিলাম কে মেরেছে জানি না বলে। জানার পর বদলা না নিলে নিজেকেই অসম্মান করব।"

"অসম্মান ?"

"হ্যাঁ, মনে হবে আমি খুব ফালতু, শক্তিহীন, মুখ বুজে মার খেয়ে যাই।"

"কিন্তু সুন্দর তো জেনেশুনে আপনাকে মারেনি। অন্ধকার জঙ্গলে আপনাকে শত্রু ভেবে সে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। পরে আপনার জ্ঞানহীন শরীরটাকে পাহারা দিয়েছে। আমরা আপনাকে খুঁজতে গেলে সে-ই জায়গাটা চিনিয়ে দিয়েছে। এটা ভাবুন।"

মাথা নাড়লেন মেজর, "সব ঠিক, কিন্তু...দেখি !"

শেষ পর্যন্ত বিকেল হয়ে এল। মাঝে মাঝে জঙ্গল এত ঘন যে, চলতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবে ভুটানের পাহাড় কাছে এসে পড়েছে, চোখেই দেখা যাচ্ছে। অমল সোম সুন্দরের সঙ্গে তাল রেখে চলছিলেন। অর্জুন তাদের পায়ে-পায়ে, মেজব মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ছেন। তাঁর পিছিয়ে পড়ার কারণ নাকি বুটজোড়া। ওটা তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন। আজ জঙ্গলে অভিযান জেনে পায়ে গলিয়েছিলেন কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে আফ্রিকার জিনিস অচল, তা জানতেন না।

অর্জুন লক্ষ করছিল এতটা দূর জঙ্গল ভেঙে আসতে তেমন কোনও বন্য প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়নি। কয়েকটা বনমুরগি, খরগোশ এবং দুটো শেয়াল ছাড়া কেউ ওদের সামনে আসেনি। গতকালের বৃষ্টির জন্য আজ ওরা যে-যার ডেরায় লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে ! কিন্তু উলটোটাই তো হওয়া উচিত।

অমল সোম বললেন, "দিন শেষ হওয়ার আগে আমরা যতটা সম্ভব পাহাড়ের কাছাকাছি চলে যেতে চাই। এসব জায়গায় রাত কাটানো মোটেই আরামদায়ক হবে না।"

সুন্দর বলল, "সাহেব ঠিক বলেছেন ! তা ছাড়া রাত্রে বৃষ্টিতে ভেজা খুব কষ্টের।"

মেজর চোখ বড় করলেন, "আকাশ দেখে মনে হচ্ছে না তিন দিনের মধ্যে বৃষ্টি হবে। তবে আপনি যখন বলছেন মিস্টার সোম, তখন আমাদের হাঁটতে হবেই।"

"আপনি কি টায়ার্ড ?"

"টায়ার্ড আমি কখনও হই না, একটু খিদে-খিদে ভাব হয়েছে এই যা।"

অমল সোম তাঁর ব্যাগে হাত ঢোকালেন। ব্যাগটা বেশ ভারী। তা থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিলেন, "খেয়ে নিন।"

"আমি একা খাব কি !" মেজর লজ্জিত হলেন।

"যার-যার খিদে পেয়েছে, খাবে। জঙ্গলে সঙ্কোচের কোনও মূল্য নেই। নিজেকে সুস্থ রাখাই বড় কথা।" বিস্কুটের প্যাকেটের মুখ খুলে নিজে একটা

নিয়ে মেজরের হাতে ধরিয়ে দিলেন। দেখা গেল খিদে কারও কম পায়নি।

খানিকটা এগোতেই গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সম্ভবত ট্রাক চলছে। অমল সোম তাকালেন সুন্দরের দিকে, "এদিকে মোটরের রাস্তা আছে নাকি?"

"মাটির রাস্তা। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লরি চলে।"

"কতদূর গিয়েছে?"

"আমি দেখিনি।"

"চলো, একবার দেখা যাক, ট্রাকে কী যাচ্ছে?"

শর্টকাট পথ করে ওরা মিনিট পাঁচেক যেতেই রাস্তাটাকে দেখতে পেল। বোঝাই যাচ্ছে, ওই রাস্তা সচরাচর ব্যবহার করা হয় না। তারপরেই ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। দেখা গেল একটা খালি ট্রাক ফিরে যাচ্ছে। ড্রাইভার এবং খালাসি ছাড়া গাড়িতে কেউ নেই।

অমল সোম নিচু স্বরে বললেন, "খালি ট্রাক ফিরে যাচ্ছে। ওদের তো কাঠ বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার কথা। এমনি বেড়াতে নিশ্চয়ই আসেনি।"

অর্জুন বলল, "কোনও জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল হয়তো!"

"হ্যাঁ। কোথায় গিয়েছিল?"

"দৌড়ে গেলে ট্রাকটাকে ধরা যায়।"

"নাঃ। তাতে কিছু লাভ হবে না। উলটে আমাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেওয়া হবে। চলো।"

মেজর চুপচাপ শুনছিলেন, "আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না।"

"কী?" অমল সোম তাকালেন।

"এইরকম একটা রাস্তা থাকতে আমরা এত কষ্ট করে জঙ্গল ভেঙে এলাম কেন? একটা ট্রাক বা জিপ ভা়া করে অনেক কম সময়ে চলে আসতে পারতাম।"

"পারতাম, যদি রাস্তাটার কথা জানা থাকত। জঙ্গলের ম্যাপে এই রাস্তাটার কোনও হদিস নেই। ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং। অবশ্য থাকলেও ওই রাস্তা না ব্যবহার করে আমরা ভাল করেছি। মেজর, কষ্ট করলেও তো কেষ্ট মেলে। চলুন।"

একটু আগেও ওরা খোলা মনে হাঁটছিল। অর্জুন গুনগুন করে গানও গেয়েছে। কিন্তু ওরা এখন নিঃশব্দে সতর্ক-পায়ে হাঁটছিল। ভুটানের পাহাড়ের প্রায় গায়ে পৌঁছাতেই অন্ধকার নেমে এল জঙ্গলে। সুন্দর চটপট তল্লাশি করে একটা জায়গা বাছল। সমতল থেকে জঙ্গল উঠে গেছে পাহাড়ে। ভুটান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও দেওয়াল বা কাঁটাতারের বেড়া নেই। এ-দেশের মানুষ ওদেশে চলে যাচ্ছে পাসপোর্ট ছাড়াই। পাহাড়ের নীচে একটা চওড়া পাথর পড়ে ছিল। পাথরটার ওপরের দিক বেশ মসৃণ। ফুট-দশেক হবে পাথরটা। মাথার ওপর একটা ঝাঁকড়া গাছ আছে।

অমল সোমেরও পছন্দ হল পাথরটা। রাত্রিবাসের পক্ষে ভালই। অল্প বৃষ্টি হলে গাছ তাদের রক্ষা করবে, আবার মাটিতে ঘোরা জীবজন্তু সহজে নাগাল পাবে না। তিনি মেজরকে বললেন, "প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে উঠে পড়ুন ওপরে।"

মেজর বললেন, "আগে জানলে তাঁবু সঙ্গে আনতাম।"

অর্জুন বলল, "সেটা আনলে মন্দ হত না। তাঁবুতে থাকা একটা দারুণ ব্যাপার!"

মেজর বললেন, "তোমাকে নিয়ে একবার আফ্রিকায় যাব। দেখবে কী থ্রিল।"

ওপরে উঠতে মেজরের একটু কষ্ট হল। ভারী শরীরটাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে তুলতে অর্জুনের সাহায্য নিতে হল। ওঠার পর হাত-পায়ের জড়তা ছাড়াতে কয়েকবার শূন্যে ছুঁড়ে বললেন, "ফ্যান্টাস্টিক। শুধু যদি চাঁদ উঠত আজ রাত্রে।"

অর্জুন দেখল আকাশের নীল এখন হারিয়ে যাচ্ছে। পাতলা মেঘের আস্তরণ ছড়াতে শুরু করেছে। বৃষ্টি যতক্ষণ না থামছে ততক্ষণ এই পাথরের বিছানা বেশ আরামদায়ক। নীচে একটা আড়াল দেখে আগুন জ্বালিয়েছে সুন্দর। অমল সোমের সঙ্গে তর্ক চলছে তার। অর্জুন পাথরের ধারে এসে কান পাতল। সুন্দর বলছে, "সাহেব, আপনি আমাকে আধঘণ্টা সময় দিন, আমি চারটে মুরগি ধরে আনছি। এই মুরগিগুলো রাত্রে ভাল দেখতে পায় না। এদিকে মানুষজন আসে না বলে ওদের পেতে অসুবিধে হবে না।"

অমল সোম বললেন, "কোনও দরকার নেই। আমার সঙ্গে ড্রাই ফুডের কৌটো রয়েছে। টিন-ফিশের কৌটো খুলে একটু গরম করে নিলে দিব্যি চলে যাবে। সঙ্গে একটু কফি করে নেওয়া যাক।"

অর্জুন বলল, "অমলদা, ও যখন বলছে ধরে আনতে পারবে, তখন টিন-ফিশগুলো কালকের জন্যে থাকলে মন্দ হয় না!"

অমল সোম ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রাণী-হত্যা করতে চাও?"

"বাংলোয় বসেও তো আমরা মুরগি খেয়েছি।"

"ঠিক আছে। একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক।"

অমলদার ব্যাগে যে কফি বানাবার সরঞ্জাম ছিল, অর্জুন জানত না। প্লাস্টিকের গ্লাসে লাল গরম কফি খুব ভাল লাগল। আগুন নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঝোলা নিয়ে সুন্দর ঢুকে গেল জঙ্গলে। অমল সোম পাথরের ওপরে উঠে এলেন, "জায়গাটা দেখছি ভালই।"

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা ফেলে দিতে গিয়ে সামলে নিলেন মেজর। পাশে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ঠিক কীসের অভিযানে এসেছি মিস্টার সোম?"

"এটাকে কি অভিযান বলা যায় !"

"তো কী ? জঙ্গলে রাত কাটানো, মাইলের পর মাইল হাঁটা। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি কিন্তু বিষাক্ত ফুল খুঁজতে আমাকে সাহায্য করছেন না।"

"কীভাবে করব সেটাই তো বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা, এখানে কেউ বলল না ওরকম ফুলের কথা আগে শুনেছে। জঙ্গলে তো অনেক ঘোরাঘুরি হল, সেই রকম ফুলের অস্তিত্ব নজরে পড়ল না। আমার মনে হয় কেউ মনগড়া গল্প প্রচার করেছে।"

"তার কী লাভ ?" মেজর প্রতিবাদ করলেন।

"গুজব যারা ছড়ায়, তারা কি সব সময় নিজের লাভের কথা চিন্তা করে ?"

"আমি কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না। সমস্ত পৃথিবীর লোক ভগবান ভগবান করে মরছে, ভগবানকে কেউ চোখে দ্যাখেনি বলে সেটাকে মিথ্যে বলে বাদ দিচ্ছে না তো !"

"ভয়ে।"

"ভয়ে, মানে ?"

"ভগবান না থাকলে মানুষের আর কিছুই থাকবে না।"

মেজর গুম মেরে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা ক' দিন জঙ্গলে থাকব ?"

"কালই ফিরে যেতে পারি। আমি একটা সেরাও ধরতে চাই।"

"সেরাও ?" মেজর অবাক হলেন।

"হ্যাঁ। পাহাড়ি ছাগল। খুব বিরল প্রজাতির। ওর আঞ্চলিক নাম থর। যেহেতু ওরা আমাদের বনাঞ্চলে কম আসে, তাই বনবিভাগ সরাসরি কিছু করতে পারছে না। ওরা সাধারণত ভুটানের পাহাড়ের নীচের দিকে ঘোরাফেরা করে। হঠাৎ এই নিরীহ প্রাণীটির চাহিদা পশ্চিমের বাজারে বেড়ে গিয়েছে। ফলে আমাদের দেশের লোভী মানুষেরা আরও বড়লোক হওয়ার নেশায় মেতে উঠেছে। ভুটানের রাজাও চাইছেন ওদের রক্ষা করতে। কিন্তু ওদের সংখ্যা কত, ঠিক কোথায় থাকে, তাও কারও জানা নেই। আর জায়গাটা যেহেতু দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চল, তাই বিধিনিষেধের বেড়া টপকানো মুশকিল হয়ে গিয়েছে। আমি, যদি কপালে থাকে, একটা সেরাও ধরব। তারপর তাদের দলের সন্ধান পেতে অসুবিধে হবে না।" অমল সোম বললেন।

অর্জুন বলল, "ওদের তো অনেক দল থাকতে পারে।"

"অনেক হলে তো সংখ্যায় ভারী হবে। দল কত তা জানা যাচ্ছে না।"

"আপনাকে কী করতে হবে ?"

"একটা রিপোর্ট দিতে হবে। সেরাওদের কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং চোরাশিকারিদের হাত থেকে বাঁচানোর উপায় কী, তা জানাতে হবে

সরকারকে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা যখন সরকারি, তখন তো আপনি প্রকাশ্যে দলবল নিয়ে আসতে পারতেন। এই রিপোর্ট দুটোর জন্যে গোপনীয়তার কোনও দরকার ছিল কী ?"

"ছিল। প্রথমত..." অমল সোম থেমে গেলেন। জঙ্গলে তখন গভীর অন্ধকার নেমে গেছে। কিন্তু তার মধ্যেই অজস্র জোনাকি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। পাখিরাও চুপ করে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু মাঝে মাঝেই অদ্ভুত ডাক ভেসে আসছে। এই ডাক কোনও পরিচিত জানোয়ারের নয়। কী রকম গা ছমছমে হয়ে উঠছিল পরিবেশ।

হঠাৎ মেজর ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "ল্যাঙ্গো।"

"সেটা কী জিনিস ?" অর্জুন জানতে চাইল।

"অদ্ভুত জীব। একে আমি দেখেছি ব্রাজিলে। ডুয়ার্সে এ এল কী করে ?"

"কী রকম দেখতে ?"

"শেয়াল, হায়েনা, নেকড়ে পাঞ্চ করলে যেমন দাঁড়ায়, মুখটা কিছুটা বুলডগের মতো।"

"বুনো কুকুর ?"

"তা বলতে পারো। খুব হিংস্র হয়। বড় দলে থাকলে বাঘও ওদের এড়িয়ে চলে। চোয়াল খুব শক্ত। এই পাথরের ওপর লাফিয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।"

অমল সোম বললেন, "আপনার কলমটাকে হাতের কাছে রাখুন। দরকার হলে পুড়িয়ে দেবেন। একটা পুড়লে আর কেউ আসবে না।"

ল্যাঙ্গো ডেকে যাচ্ছিল। বেশ করুণ ডাক। সম্ভবত সঙ্গীদের সন্ধান করছে। অর্জুনের মনে হল রাত না নামলে জঙ্গল রহস্যময় হয় না। কিন্তু সুন্দর তো এখনও ফেরেনি। সে যদি ওই ল্যাঙ্গোর সামনে পড়ে ? তার মনে অস্বস্তি ঢুকল।

অমল সোম বললেন, "হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। প্রথমত, সরকারি দল আমাকে ইচ্ছেমতন সেরাও দেখাতে পারত না। ওরা জনপদ এড়িয়ে চলে। দুই, চোরাশিকারিরা আমাদের অস্তিত্ব জেনে যেতই এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখত। তাই আমি এখানে এসে একজন লোকাল লোকের খোঁজ করছিলাম, যে কখনও সেরাও দেখেছে। ডি এফ ও বলেছিলেন হদিস দেবেন। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত সে রকম কারও সন্ধান তিনি পাননি। তখন ভাবলাম, নিজেরাই জঙ্গলে ঘুরব। এই সময় তোমার সুন্দরবাবুর খবর পেলাম।"

"এই চোরাশিকারিদের, যারা সেরাও এক্সপোর্ট করতে পারে, তাদের সন্ধান পেয়েছেন ?"

"না। অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমি কখনও সিদ্ধান্ত নিইনি।"

"তা হলে সুন্দরকে পেয়ে আমাদের লাভ হয়েছে, বলুন।"

"অবশ্যই।"

"সুন্দর পাখি ধরত, বিক্রি করত। আমার কথা শোনার পর লোকটার মধ্যে সত্যিই পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু নীলবাবু ওকে অন্য একটি কাজের দায়িত্ব দিলেন। ওকে সেরাও ধরতে হবে। বুঝতেই পারছেন বিদেশে সেরাও এক্সপোর্ট করা নীলবাবুর পক্ষে সম্ভব।"

"এসব হয়তো সত্যি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না। সুন্দর যে বানিয়ে বলছে না, তারই বা প্রমাণ কী ? কোনও অন্যায় করে ও হয়তো জঙ্গলে লুকিয়ে আছে।"

"কার কাছে অন্যায় করবে ?"

"আমি জানি না। শুধু বলতে চাইছি প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছু, কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না।" অমল সোম চুপ করতেই পাতার শব্দ হল। মেজর হাত উঁচু করলেন। অন্ধকারেও বোঝা গেল সেই হাতের মুঠোয় কলমটি ধরা রয়েছে।

"কে, সুন্দর ?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, সাহেব। দুটো ধরেছি। বেশ বড়সড়, চারজনের হয়ে যাবে।"

"কোথায় পেলে ?"

"ওই পাহাড়ের খাঁজে। সিকি মাইল দূরে। কিন্তু সাহেব, আপনারা আস্তে কথা বলুন। আমি দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম।"

"কেন ?"

"জঙ্গলে লোক ঢুকেছিল। এখনও আছে কিনা জানি না, আমি এই প্যাকেটটা কুড়িয়ে পেয়েছি পাহাড়ের গায়ে। খেয়ে দেখুন, একেবারে টাটকা। হয়তো কারও পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে।" সুন্দর প্যাকেটটা ওপরে ছুঁড়ে দিল। অর্জুন কোনওমতে ধরে ফেলল। যত অন্ধকারই হোক আকাশ একটু চোরা আলো পাঠায়। মেজর চাপা গলায় বললেন, "শাবাশ।"

প্যাকেটটা দেখে অর্জুন বলল, "ডানহিল। অর্ধেকের বেশি সিগারেট আছে।"

অমল সোম বললেন, "হুঁ। এদিকের লোকের ডানহিল পাওয়ার কথা নয়।"

ওদিকে সুন্দর বসে গিয়েছে মুরগি নিয়ে। অত দ্রুত মুরগি ছাড়িয়ে কাউকে আগুন জ্বালাতে দেখেনি সে। দুটো লম্বা কাঠির মধ্যে একটা কাঠি আড়াআড়ি পেতে তার তলায় আগুন জ্বালিয়ে দিল সুন্দর। তারপর মুরগি দুটোকে আড়াআড়ি কাঠির মধ্যে কায়দা করে ঝুলিয়ে দিল। দিয়ে বলল, "বড্ড জোঁক হয়েছে জঙ্গলে। কাল জল হওয়ায় ওদের বাড় বেড়েছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা তিনজন নিজেদের প্যান্ট-শার্ট-জুতো পরীক্ষা করতে লাগল। না, জোঁক কারও শরীরে হানা দেয়নি। নিবিষ্ট হয়ে মুরগি ঝলসাচ্ছিল সুন্দর। বেশ পাকা হাতের কাজ। মিনিট কুড়ি লাগল। তারপর এক-একটা মুরগি দু'টুকরো করে ওপরে চালান করে দিয়ে বলল, "নুন কম লাগবে। তা আর কী হবে!"

অমল সোম বললেন, "আমার সঙ্গে নুন আছে। যার যেমন ইচ্ছে মাখিয়ে নাও।"

সুন্দর ওপরে উঠে এল। প্রায় পাঁচশো গ্রাম ঝলসানো মুরগির মাংসে কামড় দিয়ে অর্জুনের মনে হল, এর চেয়ে ভাল রোস্টেড চিকেন সে কখনও খায়নি।

ঠিক তখনই কয়েক হাত দূরে বীভৎস ডাকটা আচমকা শোনা গেল।

॥ চোদ্দো ॥

চারজনের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন অন্ধকারে নড়াচড়া করতে দেখল প্রাণীটাকে। এই তা হলে ল্যাঙ্গো। পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়ে চলে এসেছে।

অমল সোম বললেন, "একাধিক দেখছি। ওপরে উঠে আসবে না তো!"

সুন্দর বলল, "অ্যাই! হ্যাট! ভাগ এখান থেকে। মুরগি খাবে! আমি কষ্ট করে ধরে আনলাম তোদের খাওয়াব বলে?"

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এদের আগে দেখেছ?"

"কুকুর। বনে থাকে এই যা। খুব বদমাশ।"

"ওপরে উঠে আসবে না তো?"

"এতটা লাফাতে পারবে না। মাংস খেয়ে হাড়গুলো ফেলে দিন, তাতেই খুশি হবে।"

ল্যাঙ্গোগুলো সম্ভবত নীচে বসে পড়েছে। এভাবে কোনও ভাল খাবারও আরাম করে খাওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে যখন হাড় ছুড়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন সেটার জন্য ওরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। চিৎকার, কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হতে অর্জুন বুঝল পেট দারুণ ভরে গিয়েছে। এভাবে কোনও দিন সে শুধু ঝলসানো মাংস দিয়ে ডিনার করেনি। অমল সোমের ওয়াটার বটল থেকে সকলে তিন ঢোক জল রেশন হিসেবে পেল। অর্জুন তার ব্যাগ থেকে চাদর বের করে পাথরের ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পাশে-বসা মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "এই অবস্থায় তোমার ঘুম আসবে?"

"আমরা তো বেশ নিরাপদেই আছি।"

"চোখ বন্ধ করলেই ওরা ওপরে উঠে এসে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।"

"তখন ঠিক জেগে যাব।"

বাতাস বইছিল। মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য অর্জুন মুড়ি দিয়ে শুল। ভগবান যদি আজকের রাতটায় বৃষ্টি না দেন, তা হলে বাঁচোয়া।

ঘুম ভেঙে যাওয়া মাত্র মনে হল, আর রক্ষে নেই। কুকুরগুলো ওপরে উঠে এসেছে। গজরাচ্ছে আক্রোশে, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেও যখন কিছু হল না, তখন খেয়াল হল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পাশে তাকাতেই বুঝল, ওটা মেজরের নাসিকাগর্জন। অঘোরে ঘুমোচ্ছেন ভদ্রলোক। ডান হাত থেকে কলমটা খসে পড়েছে পাশে। ওটা তুলে নিল অর্জুন।

ওপাশে অমল সোম এবং সুন্দর শুয়ে আছে। বিচিত্র সব আওয়াজ ভেসে আসছে জঙ্গল থেকে। এইসব শব্দাবলীর কোনও উৎস তার জানা নেই। সে নীচের দিকে তাকাল। ল্যাঙ্গোগুলো সম্ভবত হতাশ হয়ে চলে গিয়েছে। আকাশ এখন তেমনই ছাইরঙা মেঘে ছাওয়া। অর্জুন বাবু হয়ে বসল। তার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অমলদার সামনে সে সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। যদিও উনি এখন ঘুমোচ্ছেন, টের পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবুও। একবার মনে হল নীচে নেমে একটু আড়ালে গিয়ে সেবন করে আসে। কিন্তু এই রাত্রে সে-সাহস হল না। হঠাৎ তার চোখ পড়ল পাথরের প্রান্তে। কালোমতো কিছু নড়ছে। ধীরে-ধীরে উঠে আসছে ওপরে। ওটা যে একটা সাপ সেটা বুঝতে সময় লাগল। সাপটা এগিয়ে যাচ্ছে সুন্দরের দিকে। একটুও দেরি না করে সে মেজরের কলমের বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে সাপটার মাথায় আগুনের শিখা আছড়ে পড়ল। পড়ামাত্র সাপটা মোচড় খেয়ে ঝটপটিয়ে নীচে পড়ে গেল।

"কী হয়েছে?" অমল সোমের গলা শোনা গেল।

"সাপ উঠে আসছিল।" অর্জুন তখন পাথরের কিনারে চলে গিয়ে নীচে তাকাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে কলমটা আবার সক্রিয় করল নীচের দিকে তাক করে। ঘাস এবং আগাছায় আগুন পড়ল এবং তারই আলোয় সে সাপটাকে দেখতে পেল। তখনও শরীর নড়ছে। এত মোটা এবং লম্বা সাপ সচরাচর দেখা যায় না। সে কলমের বোতাম অফ করা সত্ত্বেও আগাছার আগুন নিভতে সময় লাগল। ভাগ্যিস গতকালের বৃষ্টি মারাত্মক হয়েছিল, নইলে আগুন ছড়িয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না। সে ফিরে তাকাল। আকাশ একটু-একটু করে মেঘমুক্ত হচ্ছে। যদিও খুব উঁচু করলে গাছের পাতার আড়াল, তবু চারপাশের আকাশ দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওপাশে পাহাড় উঠে গেছে। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, পাহাড়ের গায়ে কিছু নড়ছে। সে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ঘন-ছায়া মাখা বলে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু সে নিঃসন্দেহে কিছু নড়তে দেখেছে ওখানে। বড়জোর একশো গজ দূরত্ব

হবে। অর্জুন চুপচাপ তাকিয়ে রইল। মিনিট দেড়েক বাদে একটা জন্তু উঠে দাঁড়াল পাহাড়ের গায়ে গেঁথে থাকা পাথরের ওপর। এখন তাকে অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। জানোয়ারটা খুব চঞ্চল স্বভাবের। ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছে, মাঝে-মাঝেই লাফাচ্ছে।

প্রথমে মনে হয়েছিল হরিণ, কিন্তু তারপরেই খেয়াল হল, সেরাও নয় তো। সে নিঃশব্দে অমল সোমের কাছে পৌঁছে গিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল। অমল সোম জেগেই ছিলেন, চুপচাপ উঠে বসলেন। অর্জুন তাঁকে আঙুল তুলে দেখাতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে একটা দূরবিন বের করে চোখে লাগালেন। এই অল্প আলোয় দূরবিন কাজ করে কিনা অর্জুন জানে না। কিন্তু অমল সোম চাপা গলায় বললেন, "ইয়েস। সেরাও। দ্যাখো।"

অর্জুন দূরবিনটা নিল। জানোয়ারটা তখনও ফোটোগ্রাফারকে পোজ দেওয়ার ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরবিনটা কিছুটা ঘুরিয়ে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যাওয়ামাত্র অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পেল। ওর মন নিশ্চয়ই খুব ভাবুক প্রকৃতির, নইলে আকাশের দিকে মুখ করে কী দেখছে দু'-চোখ ভরে। পাথর, গাছ ইত্যাদি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যদিও একটা নীলের আস্তরণ সামনে ছড়ানো। এই দূরবিনটা তা হলে সাধারণ নয়। হঠাৎ কানের কাছে ক্লিক শব্দ হতে অর্জুন মুখ ফেরাল। ক্লিক ক্লিক ক্লিক। অমল সোম ছবি তুলে যাচ্ছেন। হঠাৎ লাফ দিয়ে উধাও হয়ে গেল সেরাও।

"যাবেন ?"

"পাগল ! এই অন্ধকারে কোথাও খুঁজে পাবে না ওদের।"

"কিন্তু আলো নেই, আপনি ছবি তুললেন কেন ?"

"এই ক্যামেরায় তোলা যায়। প্রিন্ট করার পর দেখাব। যাক, সুন্দর আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে। ও যখন ফিরে এসে বলল, এদিকে মানুষের আনাগোনা হয়েছে, তখনই মনে হয়েছিল লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি। নাও, শুয়ে পড়ো।"

অর্জুন শুয়ে পড়ল। পাশে মেজর তখনও প্রবল বিক্রমে নাক ডেকে যাচ্ছেন। ওপাশে সুন্দর মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। ওরা দু'জনেই জানল না এখন কী হয়ে গেল। অর্জুন পাশ ফিরে শুয়ে কলমটা হাতের মুঠোয় লাগাল। বলা যায় না, পোড়া সাপটার যদি কোনও সঙ্গী থাকে, সতর্ক থাকাই ভাল। হঠাৎ তার কানে অনেক ল্যাঙ্গোর ডাক ভেসে এল। ওরা ডাকছে পাহাড়ের গায়ে। কে জানে, সেরাওটাকে ওরা দেখতে পেয়েছে কিনা। কিন্তু এই সেরাও একা কেন ? ওরা তো দল বেঁধে থাকে। দূরবিনে দেখে তার মনে হয়েছে ওরা খুব নিরীহ এবং অবলা। ঠিক ছাগলের মতো। ওর যে চাহিদা, তা কে বিশ্বাস করবে। বিদেশিরা কি ছাগল এবং সেরাও আলাদা করতে পারছে ? নিশ্চয়ই পারে, নইলে এত দাম হয় কী করে ?

ঠিক গালের মাঝখানে একটা বড় জলের ফোঁটা পড়ামাত্র অর্জুন উঠে বসল। বসে দেখতে পেল বৃষ্টি নেমে গেছে। যেহেতু ওরা একটা পাতায় ছাওয়া ঝাঁকড়া গাছের নীচে শুয়ে ছিল, তাই এতক্ষণ জল পড়েনি এখানে। কিন্তু বাকিরা উঠে পড়েছে আগেই।

মেজর বললেন, "ওঃ, তোমার ঘুম বটে ! বৃষ্টি পড়ছে টেরই পেলে না।"

অর্জুন অবাক হয়ে তাকাল। তার ঘুম ? মেজরই তো সারা রাত নাক ডেকে গেলেন।

অমল সোম বললেন, "বয়স অল্প, একটু ঘুম তো হবেই। কিন্তু আমরা এখন কী করব ?"

সুন্দর বলল, "এরকম বৃষ্টি হলে এখানেও জল পড়বে।"

অর্জুন মুখ ফেরাল। ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে। বসে ভেজা ছাড়া কোনও উপায় নেই। অথচ মাঝরাত্রেও আকাশ দেখে মনে হচ্ছিল মেঘ সরে গেছে। বৃষ্টির জলের ফোঁটাগুলো খুব ঠাণ্ডা, শীত-শীত করছিল।

সুন্দর বলল, "বাবু, আপনার চাদরটা দিন।"

"কী করবে ?"

"মাথার ওপর তুলে ধরি, তাতে কিছুটা রক্ষে হবে।"

"এখানে কোনও আড়াল পাওয়া যাবে না ?"

"সেটা পেতে গেলে পাহাড়ে যেতে হবে। যাওয়ার আগেই ভিজে যাবেন। তা ছাড়া এখন ভোরের সময়। জানোয়াররা এখন জলটল খেতে বের হয়।"

মেজর বললেন, "ঠিক আছে। দাও তো হে চাদরটা। হ্যাঁ, চারজনে চার কোণে ধরো। ঠিক চাঁদোয়ার মতো হবে ব্যাপারটা। চারটে লাঠি থাকলে অবশ্য হাত দিয়ে ধরে থাকতে হ- না। বাঃ, গুড। আর জল পড়ছে না গায়ে। কী জিনিস কোন কাজে লেগে যায় কে বলতে পারে। এই যাঃ। আমার কলম ?" ককিয়ে উঠলেন মেজর। পকেট দেখতে গিয়ে চাদর ছেড়ে দিলেন অজান্তে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর শরীরটা চাদরে ঢেকে গেল।

অর্জুন বলল, "আপনার কলম আমার কাছে আছে।"

"ওঃ, বাঁচালে ! কিন্তু কী করে গেল ?"

"আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন সাপ এসেছিল।"

"মাই গড। তবে জানো তো, সাপ মানেই বিষধর বা হিংস্র নয়। বেশির ভাগ সাপ আক্রমণ করে ভয় পেয়ে। সাপের কোনও স্মৃতিশক্তি নেই। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে সাপ সম্পর্কে যেমন 'মিথ' চালু হয়েছিল, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। একবার অতলান্তিকের নীচে ডুবোজাহাজে যেতে-যেতে সাপ দেখেছিলাম। সে সাপ যদি তুমি দেখতে !" মেজর থামলেন। অর্জুন জানে এই থামার কারণ তিনি প্রশ্ন আশা করছেন। শ্রোতা প্রশ্ন করলেই গড়গড়িয়ে সেই সামুদ্রিক সাপের কাহিনী শোনাবেন। সে গম্ভীর

গলায় বলল, "আপনার মাথার ওপর থেকে চাদর পড়ে গেছে।"

"জানি হে। মনে হচ্ছে এইটে মোর কমফরটেব্‌ল। গায়ে তো জল পড়ছে না, দিব্যি মুড়ি দিয়ে বসে আছি।" মেজর খুকখুক করে হাসলেন।

চাদরটা ভিজে সপসপ করছে। সুন্দর মাঝে-মাঝে সেটা চিপে জল বের করে আবার মাথার ওপর ধরছে। হাত টনটন করলেও এখন এ ছাড়া উপায় নেই।

বৃষ্টি থামল সকাল সাতটায়। তখনও জঙ্গলে পাতলা অন্ধকার মাখামাখি। ভিজে গিয়েছে চারজনেই। চাদরে মাথা মুছে অমল সোম বললেন, "এবার একটু চা হোক। আমার ব্যাগটাকে বাঁচাতে পেরেছি। ওহে, সুন্দর, আগুন জ্বালো।"

এখন জঙ্গলে শুকনো কাঠকুটো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ভেজা ডালে আগুন জ্বলবে না। সুন্দর তবু নেমে গেল পাথর থেকে। মেজর বললেন, "মুশকিল।"

"কী হল?" অমল সোম জানতে চাইলেন।

"ভোরবেলায় চা খেলেই আমাকে প্রকৃতি ডাকে। এখানে সেটা কী করে সম্ভব হবে, বুঝতে পারছি না।"

"কেন? এখানে সারি সারি গাছের আড়াল, অসুবিধে হওয়ার কোনও কারণ নেই। আফ্রিকার জঙ্গলে কী করতেন?"

"ওখানে টেন্ট ছিল। টেন্টের মধ্যে আলাদা টয়লেট।"

"এখানে গাছের পাতাকে টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করুন।"

"জোঁক আছে যে। ডেঞ্জারাস জিনিস।"

"জিনিস নয়, পোকামাকড়।" অর্জুন হাসল।

"তোমার হাসি পাচ্ছে অর্জুন?" করুণ গলায় বললেন মেজর।

অর্জুন বলল, "এসব সমস্যা কখনও আটকে থাকে না। প্রাকৃতিক ডাক এলে দেখবেন ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারছেন। কাল রাত্রে ওখানে সেরাও দেখেছি।"

সব ভুলে গেলেন মেজর, "সেরাও? ওখানে? কখন?"

"মাঝরাত্রে।"

"আঃ! আমাকে ডাকোনি কেন?"

"আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। অমলদা বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছেন।"

"কীরকম দেখতে?"

"ঠিক ছাগলের মতো।"

"ছাগল। তা হলে সেরাও বলে মনে হল কেন? ওটা ছাগলও হতে পারে।"

"এই বনে ছাগল চরে বেড়ায় না।"

"ও। খুব মিস করেছি দেখছি। কেন যে ঘুমিয়ে পড়লাম!"

অর্জুন নীচে নামল। সাপটা আছে এখনও। একটা ডাল ভেঙে সেটাকে তুলতে চেষ্টা করল সে। এত ভারী যে, ডালটা বেঁকে যাচ্ছিল। ওপর থেকে অমল সোম বললেন, "সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। থ্যাঙ্ক ইউ অর্জুন।"

মেজর বললেন, "আমি ভেবেছিলাম জঙ্গলটা খুব নিরীহ, এখন দেখছি তা নয়! খুব ইন্টারেস্টিং। ল্যাঙ্গোগুলো মনে হয় ধারেকাছে নেই।"

সুন্দরের ক্ষমতা অসাধারণ। এরই মধ্যে আধশুকনো কিছু ডালপালা জোগাড় করে এনে চা বানিয়ে ফেলল। মেজরকে দেখা গেল তার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে। চা খেয়েই তিনি সুন্দরকে নিয়ে ছুটলেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি পাহাড়ে উঠব?"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "না। ওই ডানহিলের প্যাকেটটা যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে একবার যাব। সকালেই যাওয়া উচিত।"

পাততাড়ি গুটিয়ে রওনা হতে আরও মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগল। এখন আলো স্পষ্ট, কিন্তু সূর্য ওঠেনি। জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল। অমল সোম এবং সুন্দর আগে যাচ্ছিলেন। মেজর তার পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "সকালের কাজটা যদি ভালভাবে সারা যায়, তা হলে তার মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই। কিন্তু তোমার দাদা এত বড় অভিযানে বেরিয়েছেন আমাদের কিছু না জানিয়ে, এটা ঠিক হয়নি। সঙ্গে খাবার, জল, বিছানা কিছুই আনা হয়নি। তোমার খিদে পাচ্ছে না?"

"এখনও পায়নি।"

"পেলে কী করবে?"

"দেখা যাক।"

মেজরের কথায় অর্জুনেরও মনে হল, ওদের তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল। এখনই যদি বাংলোয় ফিরে যাওয়া হত, তা হলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু কে জানে, আজকের রাতও এখানে কাটাতে হবে কি না!

অমল সোম হাত তুলে ইশারা করলেন। অর্জুন এবং মেজর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। সামনের কিছুটা জায়গায় জঙ্গল ফাঁকা। গাছের আড়াল থেকে ওরা জায়গাটা দেখল। একটা সরু পথ ওপাশ থেকে এসে ফাঁকা জায়গায় শেষ হয়েছে। মিনিট পাঁচেক আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকার পর সুন্দর ঘাড় নাড়ল। অমল সোম বললেন, "অর্জুন, একবার গিয়ে দেখে এসো তো জায়গাটা। জঙ্গল কেটে জায়গাটা ন্যাড়া করা হয়েছে। সাবধান।"

অর্জুন এগোল। পাশে সুন্দর। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ওরা প্রথমে সরু রাস্তাটাকে দেখল। সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ল না। ফাঁকা জায়গার একধারে পাহাড়ের শুরু। সুন্দর অর্জুনকে আঙুল দিয়ে মাটি দেখাল। সেখানে জুতোর ছাপ স্পষ্ট। আর এই জুতোর দাগ বৃষ্টির আগে পড়েনি। পড়লে তার

ওপর জল থাকত। বৃষ্টি শেষ হওয়ার পর কেউ এখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। একজোড়া জুতো নয়, দুটো জুতোর ছাপ দেখতে পেল সে। সোজা পাহাড়ের দিকে এগিয়েছে। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে সে ছাপগুলোকে খুঁজে পেল না। পাথরের ওপর কোনও চিহ্ন পড়েনি।

ওরা ফিরে এল। সব শুনে অমল সোম নিচু গলায় বললেন, "তা হলে ওরা একটু আগেই এখানে এসেছিল। এত ভোরে ওই গাড়ির রাস্তায় কেউ এলে আমরা ইঞ্জিনের শব্দ পেতাম। ওরা এখানেই কোথাও রাত্রে থেকেছে। আমাদের খুব কাছাকাছি ওরা রয়েছে।" হঠাৎ অমল সোম চুপ করে গেলেন।

দুটো লোক বড়-বড় বাস্কেট আর ক্যান বয়ে নিয়ে এল সরু পথটা দিয়ে। এই লোকগুলো স্থানীয় মানুষ, কর্মচারী গোছের। ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে ওরা পাহাড়ের খাঁজে পা রেখে-রেখে ওপরে উঠে মিলিয়ে গেল।

অমল সোম বললেন, "সাহেবদের ব্রেকফাস্ট এল মনে হচ্ছে। তার মানে সরু রাস্তাটার ওপাশে ওরা বেস ক্যাম্প করেছে। জঙ্গলের আড়াল রেখে আগে চলো, ক্যাম্পটাই দেখে আসি।"

॥ পনেরো ॥

জঙ্গলের আড়ালে শরীর রেখে ওরা খানিকটা এগিয়ে যেতেই চিৎকারটা কানে এল।

চিৎকারটা যে কোনও বন্দি জন্তুর, তাতে সন্দেহ নেই। ডালপালা সরাতেই ওরা দেখতে পেল, দুটো তাঁবু পড়েছে ফাঁকা জমিতে। তাঁবুর একপাশে একটা লাল জিপসি দাঁড়িয়ে, ওপাশে একটা বড় খাঁচা।

চিৎকারটা ভেসে আসছে তাঁবুর আড়াল থেকে। খাঁচাটা শূন্য।

একটু পরেই একজন ষণ্ডামার্কা লোক কুচকুচে কালো একটা প্রাণীকে টানতে-টানতে এনে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রাণীটা দৌড়ে খাঁচার দেওয়াল ভাঙার চেষ্টা করে বিফল হল। তার খাঁজকাটা শিং খাঁচার লোহার শিকে আটকে যাওয়ায় সে আবার আর্তনাদ করল। লোকটা দাঁড়িয়ে যেন মজার দৃশ্য দেখছিল, এবার হেসে তাঁবুর ওপাশে চলে গেল।

অমল সোম তাঁর দূরবিন বের করলেন। কিছুক্ষণ দেখে নিচু-গলায় বললেন, "গায়ের রং এখনও কাঁচা রয়েছে। পাকা হাতের কাজ নয়।"

"রং?" অর্জুন অবাক হল।

"ওই জন্তুটার নাম সারাও, নেপালিরা একেই থর বলে।"

মেজর বললেন, "কিন্তু দেখতে তো ছাগলের মতো।"

"সেইজন্যেই ওরা রং করে দিল। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন, মাথাটা অনেক বড়। গাধা আর ছাগলের মিশ্রণ। কানও বড়, চোয়ালের পাশের চুল বেঢপ

লম্বা। পায়ের মরচে পড়া লাল অংশটা কিন্তু লোকটা কালো রং ঢেলে আড়াল করতে পারেনি।"

"এই সারাও ধরা তো ক্রাইম।" মেজর উত্তেজিত হলেন।

"যে-কোনও বন্যজন্তু ধরাই অপরাধ। ওই প্রাণীটির কদর বিদেশে খুব বেড়েছে। আর সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে না পারে তাই রং করা হয়েছে।"

"মনে হচ্ছে লোকটা এখন একাই আছে। এগিয়ে যাব?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"না, আসল অপরাধীরা ওপরে গিয়েছে। বেস ক্যাম্প করে রয়েছে এরা। ওরা ওপরে কী করছে, তা একবার দেখে আসা দরকার। এ তো পালিয়ে যাচ্ছে না।" অমল সোম ঘুরে দাঁড়ালেন, "সুন্দর, তুমি সাবধানে বাঁ দিক দিয়ে ওপরে উঠে যাও। কিছুতেই ওদের চোখে যেন না পড়ে যাও, খেয়াল রাখবে। দেখা পেলেই আমাকে জানাবে। কীভাবে জানাবে?"

সুন্দর মাটি থেকে একটা কাঠি তুলে দু' টুকরো করে জিভের নীচে ফেলে আওয়াজ করল।

"চমৎকার! তুমি দেখছি বেশ গুণী লোক। মেজর, আপনি ফোর্ট আগলান।"

"ফোর্ট মানে?" মেজর হতভম্ব।

অমল সোম বললেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ফোর্ট আগলানো। আমরা ফিরে না এলে অথবা কোনও ঝামেলা হলে আপনি সোজা থানায় চলে যাবেন। কিন্তু তার আগে যতটা সম্ভব নিজেকে আড়ালে রাখুন। চলো অর্জুন।" অমল সোম পা বাড়ালেন।

সুন্দর খুব দ্রুত কাঁচা জায়গা পেরিয়ে বানরের মতো পাহাড়ের সঙ্গে মিশে গেল। একা থাকা যে পছন্দ নয়, তা মেজরের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু কিছু করার নেই তাঁর।

অর্জুন হাত বাড়াল, "আপনার কলমটা আমাকে দেবেন?"

একটু দোনোমনা করে কলমটি হস্তান্তর করলেন মেজর। একা থাকতে হবে বলে যতটা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি তাঁর খারাপ লাগছিল অভিযানে অংশ নিতে না পেরে।

গাছের আড়ালে ওরা ডান দিকে সরে এল অনেকটা। এবার সামনে ফাঁকা জমি, তারপর পাহাড়। এই পাহাড়ের গায়ে ছোট-ছোট বুনো ঝোপ, লতানো গাছ। লম্বা গাছেরা রয়েছে অনেক ওপরে। মাঝে মাঝে ন্যাড়া পাথর। একটু আগে যে-পথ দিয়ে লোকদুটো ওপরে উঠে গিয়েছিল, সেই পথ তৈরি হয়েছে চলতে-চলতেই। পাহাড়ের এই দিকটায় মানুষজন আসে না বলে রাস্তা তৈরির দরকার হয়নি। অর্জুন খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জলের শব্দ শুনতে পেল। খুব আস্তে, তিরতির শব্দ। সে বলল, "মনে হচ্ছে, কাছাকাছি ঝরনা

আছে।”

শব্দটা অমল সোমও শুনতে পেয়েছিলেন। মাথা নেড়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেন তিনি। তাঁবুর কাছ থেকে ওরা অনেকটা সরে এসেছে। এবার ঝরনা চোখে পড়ল। বৃষ্টি না হলে এই ঝরনা শুকিয়েই থাকে। কিন্তু জল পড়ায় পাথর ক্ষয়ে গেছে। অমল সোম বললেন, “ওখানে চলো। প্রকৃতি আমাদের জন্যে সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছে।”

দৌড়ে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে পাথরের আড়ালে খানিকক্ষণ দাঁড়াল ওরা। ছুটে আসার সময় কারও নজরে পড়েছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। অমল সোম পাথরগুলো দেখতে লাগলেন। বিশাল আয়তনের পাথর এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে।

যাকে সিঁড়ি বলে মনে হয়েছিল তা হঠাৎ দেওয়াল হয়ে গেল। খাঁজে পা দিয়ে কিছুটা উঠতেই আর কোনও অবলম্বন পাওয়া গেল না। তার ওপর জলে ভিজে ভিজে শ্যাওলাও পড়ে গিয়েছে মাঝে মাঝে। অমল সোম ইশারায় অর্জুনকে তাঁর কাঁধে পা রেখে উঠতে বললেন। এখন আর কোনও বিকল্প নেই। সঙ্কোচ কাটিয়ে অর্জুন ওপরে উঠে পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে অমল সোমকে টেনে তুলল সে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ওঠার পব ওবা একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। এখন পায়ের তলায় জঙ্গলের মাথা। কালচে-সবুজ কার্পেট যেন দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে। পাথরের খাঁজে-খাঁজে বুনো ঝোপ এখন বেশ ঘন। ওরা নিজেদের আড়ালে রেখে সরে আসতে লাগল। আর তখনই গুলিব শব্দ ভেসে এল। শব্দটা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভয়ঙ্কর শোনাল। পাখিরা ভয়ে চিৎকার করে উড়ে গেল নীচের জঙ্গলের দিকে। অর্জুনের মনে হল সুন্দরের কথা। লোকটা ওদের চোখে পড়ে যায়নি তো!

অমল সোম দ্রুত এগোচ্ছিলেন। এই বয়সেও তিনি এত চটপটে কীভাবে আছেন, তা অর্জুন বুঝতে পারছিল না। পাহাড ভাঙতে গিয়ে সে বেশ হাঁপিয়ে উঠেছে, কিন্তু অমল সোমকে দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না।

“হোয়াট ইজ দিস! গুলি করলে কেন?” চিৎকারটা শুনতে পেল ওরা।

সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেলেন অমল সোম। ইশারায় অর্জুনকে নিঃশব্দে এগোতে বললেন। দ্বিতীয় গলা কানে এল, “গুলি না কবলে সাপটা আমাকে মেরে ফেলত।”

“মেরে ফেলত! ওকে ডিস্টার্ব না করলে ও তোমার কিছুই করত না। ননসেন্স।”

“বকাঝকা ক'রো না।”

“তোমার বুদ্ধি কম, এ-কথা স্বীকার করতে পারছ না কেন? তোমার ওই গুলির আওয়াজে ওরা কেউ আর কাছাকাছি থাকবে বলে ভেবেছ? সব হাওয়া

হয়ে গেছে। দিলে সব বিগড়ে।"

এবার ওরা দেখতে পেল। নীল চ্যাটার্জি ধমকে যাচ্ছে বরেন ঘোষালের ভাইকে।

বরেন ঘোষালের ভাই সাপটাকে তুলতে যাচ্ছিল একটা ডাল দিয়ে, কিন্তু তার হাত ধরে টানল নীল, "ছেড়ে দাও। যত ফালতু সময় নষ্ট।"

ওরা চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

ওদের অনুসরণ করতে গিয়ে অমল সোম দাঁড়িয়ে গেলেন। একটা মোটাসোটা বনমুরগি কঁক-কঁক করতে করতে বুনো ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। তাকে তাড়া করে আসছে আর-একটা মোরগ। হঠাৎ মুরগিটা শূন্যে লাফিয়েই স্থির হয়ে গেল এক লহমার জন্য, তার পরেই ডানা ঝাপটে চিৎকার করতে লাগল। ওর শরীর নীচে পড়ছে না কিন্তু কাছাকাছি কোথাও একটানা শব্দ বাজতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের পায়ের আওয়াজ এদিকে দ্রুত এগিয়ে এল। মোরগটা খুব ঘাবড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে বুনো ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। অমল সোম আবার পাথরের আড়ালে সরে এলেন।

দু'জন কর্মচারীকে নিয়ে নীল এবং বরেন ঘোষালের ভাই দৌড়ে এল। ঝুলন্ত মুরগিটাকে দেখে নীল খুব হতাশ হলেও বরেন ঘোষালের ভাই হেসে বলল, "চমৎকার। বনমুরগির রোস্ট খাওয়া যাবে আজ।"

কথাটা শোনামাত্র নীল এগিয়ে মুরগিটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে। কঁক-কঁক করতে করতে সেটা প্রাণ নিয়ে উধাও হল। বরেন ঘোষালের ভাই চিৎকার করে উঠল, "এটা কী হল ? ছেড়ে দিলে কেন ?"

"আমি এখানে মুরগি খেতে আসিনি। যা ধরতে এসেছি তা না ধরে কী করে মুরগি দেখে তোমার জিভে জল আসে, তা আমার মাথায় ঢোকে না।"

"যা ধরতে এসেছি তা ধরবই, তাই বলে ফাউ পেতে দোষ কী ?"

নীল জবাব না দিয়ে আবার ফিরে গেল। তার দুই কর্মচারী তাকে অনুসরণ করল। বরেন ঘোষালের ভাই মুরগিটা যেদিকে ঢুকেছে, সেদিকে কয়েক পা এগিয়ে মাথা নাড়ল। তাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেও ফিরে গেল।

অমল সোম বললেন, "সাবধানে এগোতে হবে। ওরা জঙ্গলে নেট টাঙিয়েছে।"

"চোখে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু।" অর্জুন বলল।

"তৈরি হয়েই এসেছে। তবে নিশ্চিত থাকো, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সারাও এদিকে আর আসবে না। যতক্ষণ সারাও না আসে, আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।"

"কেন ?"

"এখন পর্যন্ত নীচের রং-করা জন্তুটা ছাড়া ওদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও

অভিযোগ নেই। থাকলেও কোনও আদালতে সেটা প্রমাণ করা যাবে না।"

অর্জুনের মনে হল ওদের অভিযুক্ত করার জন্য ওই একটা সারাও তো যথেষ্ট। অমলদার কথামতো অপেক্ষা করতে হলে হয়তো অনন্তকাল এখানে বসে থাকতে হবে। এত বড় পাহাড় ছেড়ে সারাও যে এখানে আসবেই, তা কেউ জোর করে বলতে পারে?

এই সময় মৃদু আওয়াজ ভেসে এল। ওটা সুন্দরের পাঠানো সঙ্কেত, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। অমল সোম বললেন, "এই আওয়াজ বেশিক্ষণ করলে ওরা সন্দেহ করতে পারে।"

অর্জুন বলল, "ওকে বলা হয়েছিল দেখতে পেলে যেন আওয়াজ করে।"

আওয়াজটা থামল। অর্জুন বলল, "আমার মনে হয় আর একটু এগিয়ে যাওয়া ভাল।"

অমল সোম কিছু বলার আগে মানুষের গলা শোনা গেল। ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। ওরা এবার এগোল। অমল সোম বললেন, "সাবধানে পা ফেলো। সারাও-এর জন্যে ওরা জাল পেতে রেখেছে।"

এবার ওদের দেখা পাওয়া গেল। নীল চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে দূরবিনে পাহাড় দেখছে খুঁটিয়ে। ওরা যেখানে চেয়ার পেতেছে, সেই জায়গাটা প্রায় পরিষ্কার। দুটো ফোল্ডিং চেয়ার আর টেবিল ওপরে তুলে নিয়ে এসেছে আরামের জন্য। তার একটাতে বসে আছে বরেন ঘোষালের ভাই। সে চোখ বন্ধ করে সিগারেট খাচ্ছে। টেবিলের ওপর বন্দুক জাতীয় একটি অস্ত্র পড়ে আছে, যা লম্বায় বেশি নয়। অর্জুন এ-জাতীয় অস্ত্র আগে দ্যাখেনি।

নীল চ্যাটার্জি বলল, "গুলি ছুড়ে তুমি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ।"

"এক কথা বারংবার শুনতে ইচ্ছে করছে না।"

দূরবিন থেকে চোখ সরিয়ে নীল তাকাল, "ঘোষাল, বিদেশে তোমার কানেকশনস না থাকলে তোমার কানে কথাটা আমি হাজারবার ঢোকাতাম।" সে আবার দূরবিনে চোখ রাখল।

বরেন ঘোষালের ভাই উঠে দাঁড়াল, "একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে পাহাড়টাকে সার্চ করলেই ঝামেলা মিটে যেত। এভাবে সময় নষ্ট হত না।"

"চমৎকার! সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে বলতে চাও আমরা এক মহা মূল্যবান প্রাণী ধরতে চলেছি, তোমরা দ্যাখো। ননসেন্স।" পাহাড় দেখতে লাগল নীল।

বরেন ঘোষালের ভাই অস্ত্রটায় হাত দিয়ে সরিয়ে নিল। তারপর উলটো দিকে হাঁটতে লাগল। কয়েক পা যাওয়ার পর তাকে বুনো ঝোপ সরাতে হচ্ছিল। নীল চেঁচিয়ে ডাকল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"বোর লাগছে, ঘুরে আসি।" জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বরেন ঘোষালের ভাই। বোঝা যাচ্ছিল, ওর ব্যবহারে নীল বেশ বিরক্ত। সে নীচের

দিকে দূরবিন নামাল। খানিকক্ষণ দেখার পর হঠাৎ ওকে উত্তেজিত বলে মনে হল। দ্রুত আঙুলে ফোকাস ঠিক করছিল সে। তারপর ছুটে এল টেবিলের কাছে। অস্ত্রটাকে তুলে নিয়ে নীল নীচের দিকে দৌড়ে নেমে গেল। অমল সোম কিছু বলার আগেই সুন্দরকে দেখা গেল সামনে। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ওদের কাছে এসে সুন্দর বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেল। দাড়িওয়ালা মোটা সাহেবকে নীলবাবু দেখে ফেলেছে!"

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে বুঝলে?"

"আমি খালি চোখেই ওঁকে ঝাপসা দেখতে পাচ্ছিলাম যখন, তখন উনি তো দূরবিনে স্পষ্ট দেখতে পাবেন। ধরা পড়লে সাহেবের খুব বিপদ হবে।" সুন্দর হাঁপাচ্ছিল।

অমল সোম ঢালের দিকে সরে গিয়ে দূরবিনে চোখ রাখলেন, "ওঃ, এত করে বলে এলাম!"

অর্জুন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে মেজর একটা গাছের ডালে উঠে বসেছেন। তিনি চেষ্টা করছেন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে। তাঁর লক্ষ্যবস্তু কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। নীচ থেকে তাঁকে অবশ্যই দেখা যাবে না। কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে যে তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাবে, এটা ওঁর খেয়ালে নেই। চিৎকার করে ওঁকে সতর্ক করতে গেলে নিজেদের অস্তিত্ব আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। নীল চ্যাটার্জির হাতে মেজর ধরা পড়বেনই।

অমল সোম বললেন, "আমি নীচে যাচ্ছি। সঙ্গে না থাকলে মেজর অসহায় বোধ করবেন।"

অর্জুন আপত্তি করল, "আপনাকে একলা পেলে নীল কিছুতেই ছাড়বে না। যেতে হলে তিনজনেই যাব।"

"না। তোমরা বরং ওই ছোকরাকে আটকাও। তা হলে বারগেন করা যাবে।" অমল সোম দ্রুত নেমে গেলেন। অর্জুনের মনে হচ্ছিল, মেজরের জন্য সমস্ত ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল। সে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করতে সুন্দর বলল, "চলুন, আড়ালে যাই।"

মেজরের কী হাল হল, তা দেখার সুযোগ এখন নেই। বরেন ঘোষালের ভাই যদি বেরিয়ে আসে, তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাবে। ছেলেটার হাতে অস্ত্র আছে। ওরা দ্রুত জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। সুন্দর এগোচ্ছে নিঃশব্দে, অভ্যস্ত পায়ে। ওর সঙ্গে তাল রাখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। হঠাৎ শিস শুনতে পেল ওরা। সুন্দর অর্জুনকে ইশারা করল থামতে।

শিসটা বেজেই চলেছে। সুন্দর প্রায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। বরেন ঘোষালের ভাই দাঁড়িয়ে আছে রিভলভার হাতে। তার হাত-ছয়েক দূরে একটা ভুটানি কোবরা ফণা তুলে দুলছে। বরেন ঘোষালের ভাই যে শিস দিচ্ছে তা কোবরাটাকে স্থির রাখার

জন্য, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। হয়তো নীলের বকুনি খেয়ে ও গুলি ছুড়ছে না এখন, কিন্তু অর্জুন বুঝল ছেলেটার সাহস আছে। মাটি থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচুতে ফণা তুলেছে যে-সাপ, তার সামনে দাঁড়িয়ে শিস দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

হঠাৎ সাপটা ধীরে-ধীরে মাথা নামাল। তারপর ডান দিকে একটা পাথরের খাঁজে দ্রুত শরীরটা লুকিয়ে ফেলল। বরেন ঘোষালের ভাই পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। রিভলভারটা একবার ওপরে ছুঁড়ে আবার লুফে নিল। অর্জুন দেখল সুন্দর তার কোমরের গেঁজ থেকে একটা গুলতি বের করছে। সে চট করে ওর হাত চেপে ধরে ইশারায় নিষেধ করল। আর তখনই সাপটা যে-পাথরের খাঁজে লুকিয়ে ছিল, সেখানে হুটোপাটি শুরু হল। বরেন ঘোষালের ভাই রিভলভার হাতে দ্রুত এগিয়ে যেতেই একটা কালো গোলার মতো প্রাণী ছিটকে বেরিয়ে এল। তার ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ছেলেটা, রিভলভার চলে গেল ঝোপের মধ্যে। চিত হয়ে মাটিতে পড়েই উঠতে গিয়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল বরেন ঘোষালের ভাই। যে জন্তুটা বেরিয়েছিল সেটা যে সারাও, তা বোঝার সঙ্গে-সঙ্গেই অর্জুন আর তাকে দেখতে পেল না। কিন্তু সে সাপটাকে দেখতে পেল। খাঁজ থেকে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড আক্রোশে সে আবার ফণা তুলেছে। বরেন ঘোষালের ভাই মাটিতে পড়ে ছিল তখনও। মৃত্যুভয় এখন তার চোখে-মুখে। তবু ওই অবস্থায় সে একটা ছুরি বের করল।

এইসব দৃশ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুন্দর কখন যে তার গুলতিতে পাথর পুরেছে, লক্ষ করেনি অর্জুন, সাঁ শব্দে পাথরটা ছুটে গিয়ে সাপের মাথায় আঘাত করতেই সেটা নীচে লুটিয়ে পড়ল। ভুটানি কোবরার শরীরটা তখনও প্রচণ্ড আক্রোশে পাক খাচ্ছে, কিন্তু তার আর মাথা তোলার সামর্থ্য নেই।

অর্জুন এবার বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। যন্ত্রণা সামলাচ্ছিল বরেন ঘোষালের ভাই, সাপটাকে বিধ্বস্ত হতে দেখে সে যতটা অবাক হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি হল অর্জুনকে সামনে দেখে। কিন্তু তারপরেই নিজের স্বভাব ফিরে পেল সে, "আর এক-পা এগোলেই খুন করে ফেলব।"

সুন্দর বলল, "আমি না বাঁচালে তুমি এতক্ষণে যমের বাড়ি চলে যেতে, বাবু।"

"তুই ? তুই এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিস ?" গর্জে উঠল ছেলেটা।

অর্জুন বলল, "সুন্দর, আমি তিন গুনব। তার মধ্যে যদি ও ছুরিটা না ফেলে দেয়, তা হলে ওর কপাল লক্ষ করে গুলতি ছুঁড়বে।"

সুন্দর সঙ্গে-সঙ্গে তৈরি হয়ে গেল, "ঠিক আছে।"

অর্জুন 'এক' বলতেই ঘোষাল ছুরিটা সরিয়ে দিল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি উঠে দাঁড়াতে পারবে ?"

"না। মনে হচ্ছে হাড়টাড় ভেঙেছে। এত জোরে বেরিয়ে এল— !

শোনো, নীচে আমার লোকজন আছে, তাদের ডেকে আনো, জলদি।" হুকুম করল ঘোষাল।

"এত তাড়াহুড়োর কী আছে?"

"আমার যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"তা একটু হোক না! চিকিৎসা করার সময় অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।" অর্জুন ছুরিটাকে লাথি মেরে আরও দূরে সরিয়ে দিল। ঘোষালের মুখ ঘামে চকচক করছে। একটা পা ভাঁজ করতে পারছে না সে, দু' হাতের ওপর ভর দিয়ে বসার চেষ্টা করে যাচ্ছে এখন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ক'টা সারাও তোমরা এখন পর্যন্ত ধরেছ?"

"সারাও? সেটা আবার কী জিনিস?" খিঁচিয়ে উঠল ঘোষাল।

পকেট থেকে কলম বের করল অর্জুন, "এটা চেনো?"

এক পলক দেখে নিয়ে, আবার চোখ বন্ধ করল, "আমি ওসব কিছু জানি না। যা জিজ্ঞেস করার, নীলকে জিজ্ঞেস করো।" কথাটা শেষ করেই প্রচণ্ড জোরে সে চিৎকার করে উঠল, "নীল, নীল!" সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি বাজল, "নী—ল, নী—ল।"

॥ ষোলো ॥

মেজর দুলছিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল খুব, পা শিরশির করছিল। গাছের ডাল বেশ সরু হয়ে এসেছে, আর এগোলে তাঁর ভার রাখতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। অথচ ফুলটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। এত বড় গাছে মাত্র একটি সাদা ফুল ফুটে আছে।

অর্জুনরা চলে যাওয়ার পর কী করে সময় কাটাবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না মেজর। তার ওপর একমাত্র অস্ত্রটি ওকে দিয়ে দেওয়ার পর বেশ অসহায় লাগছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, ওপরে বেশ রুদ্ধশ্বাস নাটক হচ্ছে এবং তিনি তার সাক্ষী হতে পারলেন না। এই সব ভাবতে ভাবতে দেখতে পেলেন দুটো লোক পাহাড় থেকে নেমে আসছে গল্প করতে করতে। ওরা এখানে এসেও বেশ ব্রেকফাস্ট করছে ভাবার পর তাঁর খুব রাগ হল। তবু তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য জঙ্গলের ভেতরে চলে এলেন। খানিকটা হাঁটার পর তার চোখে পড়ল মাটিতে ঘাসের ওপর অনেক মৌমাছি মরে পড়ে আছে। খামোখা এত মৌমাছি দল বেঁধে এক জায়গায় মরতে গেল কেন, বোঝার চেষ্টা করতে তিনি পা মুড়ে বসলেন। আজ পর্যন্ত তিনি কখনওই শোনেননি মৌমাছিরা গণ-আত্মহত্যা করে। এই সব যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই তাঁর দাড়িতে কিছু একটা ওপর থেকে পড়ে আটকে গেল। হাত দিয়ে দাড়ির জঙ্গল থেকে যে

বস্তুটি টেনে বের করলেন, সেটি একটি মৌমাছির মৃতদেহ। সঙ্গে-সঙ্গে ওপরে তাকালেন তিনি। ঘন পাতা এবং অনেক ডালের ওপরে ঠিক কী আছে তা ঠাহর করতে পারলেন না নীচ থেকে। মৌমাছির চাক থেকে মধু শেষ হয়ে গেলে এ রকম হতেও পারে। কিন্তু মেজরের মনে হয়েছিল ব্যাপারটা দেখা উচিত। তাঁর শরীর ভারী, গাছ বেয়ে ওপরে ওঠায় বেশ ঝুঁকি আছে। তবু মেজর উঠতে লাগলেন। তাঁকে বেশ পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। প্রায় ঘোরের মধ্যে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মোটা ডাল সরু হচ্ছে যখন, তখন তিনি দেখতে পেলেন। বেশ বড় গ্ল্যাণ্ডিফ্লোরার মতো একটা সাদা ফুল ফুটে আছে অনেক ওপরে। ফুলটা একদম একা, এই গাছে দ্বিতীয় কোনও ফুল ফোটেনি। তারপর তিনি আবিষ্কার করলেন, ওই ডালের কাছাকাছি কোনও পাখি বসেনি, মৌমাছিদের দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। একটা সুন্দর তরতাজা সাদা ফুল, বেশ গম্ভীর ধরনের। হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ফুল সেই ফুল হয়তো, যার গল্প তিনি আমেরিকায় বসে শুনেছেন। হওয়া অসম্ভব নয়। মৌমাছিগুলো ঠিক ওর নীচে মাটিতে মরে পড়বে কেন ? নিশ্চয়ই ওই ফুলের গন্ধে বিষ আছে।

মেজর যখন উত্তেজনায় অস্থির, ঠিক তখনই গাছের নীচে এসে দাঁড়াল নীল চ্যাটার্জি। পাহাড়ের ওপর থেকে গাছের ডালে ঝোলা লোকটিকে খুঁজে পেতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। ওপরের দিকে তাকিয়ে মেজরকে তার ভাল্লুকের মতো মনে হল। হাতের অস্ত্রটি উঁচিয়ে সে চিৎকার করল, "অ্যাই ? কে তুই ?"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর স্থির হয়ে গেলেন। কোনও মতে মুখটা নীচের দিকে ফেরাতেই তিনি নীলকে দেখতে পেলেন। ওইটুকুনি একটা ছোকরা তাঁকে তুই বলে সম্বোধন করছে শুনেও নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল, সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, অমল সোম বলেছিলেন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে, সেটা ব্যর্থ হল।

মেজরের মুখ দেখামাত্র নীল তাঁকে চিনতে পারল। সে চিৎকার করল, "ঝটপট নেমে এসো, নইলে গুলি চালাব।" অজান্তেই তুই থেকে তুমিতে সরে এল সে।

মেজর বুঝলেন তাঁর আর কিছু করার নেই। ফুলটির দিকে তাকালেন তিনি। এখনও অনেকটা দূরত্বে রয়েছে সেটা। একটা আঁকশি থাকলে টেনে আনা যেত। তিনি ওই অবস্থায় বললেন, "নেমে এলে ফুলটাকে পাওয়া যাবে না।"

"ফুল মানে ? কী ফুল ?" নীচ থেকে নীল চ্যাটার্জি চেঁচাল।

"মনে হচ্ছে ওটা বিষফুল !"

"নেমে না এলে ওই ফুল তোমাকে খাওয়াব চাঁদু।"

"অ্যাই, ওইভাবে কথা বলো না। তুমি আমার হাঁটুর বয়সী।"

সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাল নীল। একটাই গুলি। সেটা মেজরের ডান দিক

দিয়ে বেরিয়ে গেল। মেজরের শরীর কাঁপতে লাগল। ছেলেটা উন্মাদ। তিনি নামার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গাছ বেয়ে ওপরে ওঠা যত সহজ, নামা ঠিক ততই কঠিন। দু-দু'বার পডতে-পড়তে সামলে নিয়ে তিনি আর্তনাদ করলেন, "আমি নামতে পারছি না।"

"ওঠার সময় খেয়াল ছিল না? ট্রাই, ট্রাই এগেন।" নীল চিৎকার করতেই দুটো লোক ছুটে এল। ওরা গুলির আওয়াজ পেয়েই এসেছে। নীলের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপরের দিকে তাকাতেই দু'জনে হেসে উঠল। নীল বলল, "লোকটাকে নামিয়ে আনো। জলদি।"

অনেক কসরত করে ওরা মেজরকে মাটিতে নামাতে পারল। মেজর তখন থরথর করে কাঁপছিলেন। গাছে চড়া তাঁর অভ্যেস নেই। জামাকাপড়ের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে গেছে।

নীল সামনে এসে দাঁড়াল, "এখানে কেন এসেছ?"

মেজর হঠাৎ স্মার্ট হয়ে গেলেন, "ফুল, ফুল খুঁজতে।"

"কী ফুল?"

"বিষফুল।"

প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত এসে পড়ল মেজরের গালে। তিনি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলেন, লোকদুটো ধরে ফেলল।

নীল আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার সেই দুই গোয়েন্দাসঙ্গী কোথায়?'

মার খাওয়ামাত্র মেজর তাঁর স্বভাব ফিরে পেলেন। প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল তাঁর। তিনি চিৎকার করলেন, "মেরে হাড় ভেঙে দেব বদমাশ ছোকরা। আমার গায়ে হাত তুলেছ? পাজি, বদমাশ, উল্লুক। বন্দুকটা রেখে খালি হাতে এসো।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুসির ঝড় উঠল। মেজর কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর জামার কলার ধরে টেনে তুলল নীল, "লোকদুটো কোথায়?"

মেজর কোনও রকমে বললেন, "জানি না।" তাঁর দাড়ি ততক্ষণে রক্তে ভিজে জবজব করছিল।

"জানো না? আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে!" সে ক্ষিপ্ত হতেই মেজর মিনতি করলেন, "বিশ্বাস করো, আমি ফুলের সন্ধানে এসেছি।"

এবার কী মনে হতে মেজরকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওপরে তাকাল নীল। তারপর সঙ্গীদের বলল, "লোকটাকে খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখো। হাত পা বেঁধে রাখবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে লোকদুটো ওঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল।

গাছের ডালগুলো লক্ষ করতে করতে নীল মরা মৌমাছিদের কাছে চলে এসেছিল। ঠিক তখনই ওপর থেকে একটা মৌমাছির মৃত শরীর নীচে নেমে এল। সে মাটিতে তাকাতেই আগের মৃত মৌমাছিদের দেখতে পেল।

এতক্ষণে সে অবাক হল। এক লাফে নীচের ডালটা ধরে বন্দুক নিয়ে সে কিছুটা ওপরে উঠতেই পায়ের শব্দ কানে গেল। শব্দটা আচমকা নেমে গেল। গাছের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ওপর থেকে লক্ষ করতে লাগল নীল। তারপর মনে হল ঘোষাল হয়তো নীচে নেমে এসেছে গুলির আওয়াজ শুনে।

অমল সোম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওপর থেকেই তাঁর কানে গুলির আওয়াজ পৌঁছেছিল। কিন্তু নীচের জঙ্গলে এসে মেজর যে গাছটিতে উঠেছিলেন, সেই গাছটিকে তিনি চট করে খুঁজে পেলেন না। যখন মনে হল কেউ কাছাকাছি নেই, তখন গাছের আড়াল ছেড়ে পা বাড়ালেন। কিছুটা হেঁটে চাপা গলায় ডাকলেন, "মেজর!"

ডাকটা নীলের কানে পৌঁছল। সে বন্দুক সতর্ক হাতে ধরল। ওপর থেকে অমল সোমকে সে দেখতে পেল। এখন গুলি চালালে লোকটা ঘায়েল হবে। কিন্তু! নীল যা খবর পেয়েছে তাতে অমল সোমকে ভারত এবং ভুটান সরকার পাঠিয়েছেন সারাওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। এই রকম দায়িত্বশীল লোক মারা গেলে তোলপাড় হবে। মিছিমিছি ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবে না। সে দেখল, অমল সোম নিচু হয়ে কিছু কুড়োচ্ছেন। তারপর বোতামটাকে দেখতে পেল। লোকটাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে বোতাম নিয়ে। ওটা মেজরের হতে পারে। মার খাওয়াব সময় জামা থেকে ছিঁড়ে যেতে পারে।

অমল সোম এগোচ্ছেন। তারপর চোখের বাইরে চলে গেলেন।

নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে পড়ল নীল। তারপর দ্রুত জঙ্গল পার হয়ে চলে এল তার ডেরায়। মেজরকে তখন খাঁচায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করছে তার লোক। সে হুকুম করল, "কালো কাপড়টা দিয়ে খাঁচাটাকে ঢেকে দাও।"

আদেশ মান্য করল ওরা।

একটা ফোল্ডিং চেয়ারে আরাম করে বসল নীল। সে ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। তিন-তিনটে মানুষকে মেরে ফেলা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়, কিন্তু ব্যাপারটা কত দিন চাপা থাকবে সেইটে ভাবার বিষয়। হঠাৎ তার সারাও ধরার ফাঁদটার কথা মনে এল। ওই পাহাড়ের ঠিক নীচে অন্তত কুড়ি ফুট গভীর গর্ত করে ওপরে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। প্রথমবার একটা সারাও ওই গর্তে পড়েছিল। কিন্তু সে-সময় তারা এখানে ছিল না। কয়েকদিন পরে এসে পচা গন্ধ পেয়েছিল। ওপর থেকে নীচে পড়ে ঘাড় মটকে মরে গিয়েছিল জন্তুটা। মরে পচে গিয়েছিল শরীর। ওটা আর কোনও কাজে লাগেনি, আর তারপর থেকে সারাওগুলো যেন ফাঁদটার কথা জেনে গিয়েছিল।

হঠাৎ সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক করে একটু তুলে বলল, "মিস্টার সোম, আমি জানি আপনি কাছাকাছি আছেন। আপনার সঙ্গে তো আমার কোনও শত্রুতা নেই। চলে আসুন, কথা বলা যাক।"

অমল সোম প্রায় সেই মুহূর্তেই ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। নীলকে অত স্বাভাবিক গলায় তাঁর উদ্দেশে কথা বলতে শুনে তিনি খুব অবাক হলেন। ওই অল্পবয়সী ছেলেটি এত বুদ্ধিমান ?

নীল আবার বলল, "আপনাকে ভাল কফি খাওয়াব। বিদেশি কফি। কই, চলে আসুন। সময় নষ্ট করবেন না। আমি চাইলে আপনার ক্ষতি করতে পারতাম। এই জঙ্গলটাকে আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি।"

অমল সোম কথাটাকে মেনে নিলেন। তিনি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে নীল তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, "আসুন, আসুন।"

অমল সোমকে একটা চেয়ার দেওয়া হল। নীল বলল, "কী ব্যাপার ? আপনারা সবাই দল বেঁধে এখানে চলে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ। আপনি এখানে ?"

"পিকনিক করতে। টানা কাজ করে করে ক্লান্ত। একটু রিল্যাক্স করতে না পারলে আর চলছিল না।" নীল হাসল, "কিন্তু এখানে এলেন কীভাবে ?"

"হেঁটে।"

"মাই গড। এতটা পথ হেঁটেছেন ?"

"প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয়।"

"মিস্টার সোম, আপনার প্রয়োজন কি আমার পেছনে লাগা ?" হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল নীল। তার গলার স্বর শক্ত হয়ে গেল।

"আমি আমার কাজ নিয়ে এসেছি। সেটা যদি আপনার ক্ষতি করে তা হলে আমার কোনও উপায় নেই। মেজর কোথায় ?"

"কে মেজর ?"

"যাঁকে গাছে উঠতে দেখে আপনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন।"

"আচ্ছা ! দেখুন গিয়ে, গাছে-গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"আমি উত্তরটা আশা করছি।"

"মিস্টার সোম, আশা তো প্রত্যেক মানুষই করে। আশা পূর্ণ হয় কতজনের ? আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, এখনই এই জঙ্গল থেকে চলে যান। আপনাদের যাওয়ার ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।"

"তাই ? না ভাই, আগে সারাওদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি, তারপর ফিরে যাওয়ার কথা ভাবব। ওই নিরীহ প্রাণীগুলোকে বিদেশের বাজারে পাঠিয়ে যারা মুনাফা লুটবে, তাদের ছেড়ে দিই কী করে বলুন ? মেজর কোথায় ?"

প্রায় কুড়ি সেকেন্ড অমল সোমের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে নীল জবাব দিল, "উনি বিষফুল খুঁজতে গিয়েছেন। বিষফুল বলে কিছু আছে বলে বিশ্বাস করেন ?"

"আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে কিছু এসে যায় না। কিন্তু মেজরকে আমি এখানকার কোনও গাছে উঠতে দেখেছি। এত তাড়াতাড়ি তিনি কোথাও যেতে

পারেন না।"

"আপনি যখন সবই জেনে বসে আছেন, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

অমল সোম চারপাশে তাকালেন। তাঁর চোখ সেই খাঁচার দিকে গেল, যেটা কালো কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। তিনি হেসে বললেন, "কালো কাপড়ে ঢাকলেই কি আর আড়ালে রাখতে পারবেন নীলবাবু?"

"চেষ্টা করতে দোষ কী!" নীল উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। সঙ্গে-সঙ্গে দুটো লোক সামনে এসে দাঁড়াল। নীল জিজ্ঞেস করল, "সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে এসেছ?"

"জি সাব।"

"ঠিক আছে, যাও।" নীল ঘুরে দাঁড়াল, "সময় যদি নষ্ট করতে না চান, তা হলে আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন।"

অমল সোম কালো কাপড়ে ঢাকা খাঁচাটার দিকে তাকালেন। এদের পক্ষে জন্তুটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা সহজ, কিন্তু নীল নির্দেশ না দিলে নিশ্চয়ই সেটা করবে না। তাই আগে মেজরের দেখা পাওয়া দরকার। তিনি মাথা নাড়লেন, "বেশ, চলুন।"

নীল বন্দুক হাতেই এগোচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, "আপনি ওই পথ ধরে আগে চলুন। বুঝতেই পারছেন, এই মুহূর্তে আপনাকে আমি শত্রু ভাবছি। শত্রুকে কেউ পেছনে রাখে না।"

অমল সোম হাসলেন এবং এগিয়ে চললেন।

সরু পথ। এখানে অবশ্যই আগে কোনও পথ ছিল না। হাঁটাহাঁটি করে সরু পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। অমল সোম ভাবছিলেন, হঠাৎ এই পথ দিয়ে ওরা যাওয়া-আসা করছে কেন?

নীল বলল, "বিষফুল আছে বলে আপনার বন্ধু এদিকে এসেছেন, আপনি ওঁকে বিশ্বাস করেন? ওঁর আসার পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো?"

অমল সোম বললেন, "থাকলে সেটা ভবিষ্যতে জানা যাবে।"

কথাটা বলেই অমল সোম দাঁড়িয়ে গেলেন। পথটা নেই। পায়ের দাগ মিলিয়ে গিয়েছে অথচ মরা ঘাস রয়েছে সামনে। এবং তখনই তিনি পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। নিজেকে সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে চলে গেলেন সামনে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘাসের গালিচা দুলতে লাগল। দু'হাতে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন তিনি। তাঁর শরীরটা সরাসরি নীচে নেমে যেতে লাগল।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। কোমর এবং গোড়ালিতে আঘাত লাগায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু অনেক ওপরে তাঁর পড়ে যাওয়ার গর্ত দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। নীল

চ্যাটার্জির গলা শুনতে পেলেন তিনি, "এখন কয়েক দিন ওখানেই থাকুন। বাতাস যাতে পান, তাই ফাঁকটা বন্ধ করছি না। কিন্তু কোনও সারাও যদি আপনার সঙ্গী হয়, তা হলে তার থেকে দূরে থাকবেন।"

অমল সোম জবাব দিলেন না। নীলের গলা আর শোনা গেল না। তিনি বুঝতে পারলেন এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল সারাও ধরার জন্য। গর্তটা গভীর। একটু নড়াচড়া করতে বুঝতে পারলেন চওড়া বেশি নয়। হাত লাগাতেই মাটি খসে পড়ল কিছুটা। এই দেওয়াল বেয়ে কী করে ওপরে ওঠা যায়! একবার ভাবলেন, চিৎকার করবেন। জোরে চিৎকার করলে নিশ্চয়ই সেটা অর্জুনদের কানে পৌঁছবে। যদি না পৌঁছয়, তা হলে খামোখা পরিশ্রম হবে।

খাঁচার মধ্যে তেমন অন্ধকার ছিল না। বাইরের কালো কাপড়ের আড়াল ঘন ছায়া ফেলেছিল মাত্র। হাঁটু মুড়ে পড়েছিলেন মেজর। জ্ঞান হওয়ামাত্র উঠে বসতে গেলেন। সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা শুরু হতেই বুঝলেন তাঁর হাত-পা এখন বাঁধা। তিনি চিৎকার করলেন, "অ্যাই, কে আছ এখানে? চটপট চলে এসো। আমাকে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে রাখার মানে কী? হ্যাঁ! অ্যাই!"

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বরং খটখট আওয়াজ কানে এল। তিনি মুখ ফেরাতেই জন্তুটিকে দেখতে পেলেন। খাঁচার অন্য কোণে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা তাঁর দিকে ফেরানো। নিজের দুর্দশায় আর-একটি প্রাণীকে পড়তে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছে। মেজর কিছুক্ষণ তাকানোর পর যখন বুঝতে পারলেন প্রাণীটি সারাও, তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বিদেশে এর দাম এখন অনেক। যদিও প্রাণীটির শরীর এখনও বঙে ভেজা, তবু ওর গায়ে হাত বোলাতে খুব ইচ্ছে হল তাঁর। একটু এগোতেই যেভাবে ওটা মাথা নামিয়ে শিং খাড়া করল, তাতে সাহস পেলেন না তিনি।

মেজর জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলেন। সেটা শোনামাত্র সারাও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। একটু অপমানিত হয়ে চোখ বন্ধ করতেই আচমকা ফুলটার কথা মনে এল। বিষফুল। এখনও ফুটে রয়েছে। ওটা নির্ঘাত বিষফুল, নইলে মৌমাছিরা মরবে কেন? ওই গাছে দ্বিতীয় কোনও ফুল ফোটেনি। বৃষ্টি বা ঝড়ে যদি ফুলটা পড়ে যায়, তা হলে মহামূল্যবান জিনিস তিনি হারাবেন। তা ছাড়া ওই ফুলের আয়ু কতক্ষণ, তাও তো তাঁর জানা নেই।

মেজর চিৎকার শুরু করলেন। দু'বারের পর একটা লোক কাপড় সরিয়ে উঁকি মারল, "অ্যাই চোপ্। পাঁঠার মতো চেঁচাচ্ছে। অথচ পাঁঠাটা চুপ করে আছে।"

কাপড় আবার ঠিক হয়ে গেল। মেজর এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে. কয়েক সেকেন্ড তাঁর চিন্তাশক্তিও অসাড় হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁর কানে গাড়ির শব্দ ঢুকতে তিনি নিজেকে ফিরে পেলেন। গাড়িটা এসে থামল একেবারে

কাছে। দরজা খোলার শব্দ হল। তারপর একটা মহিলাকণ্ঠ কানে এল, "নীল কোথায় ?"

॥ সতেরো ॥

গলা শুনে মেজর চমকে গেলেন। এই ঘন জঙ্গলে মহিলা কী করে আসবেন ? যদি কোনও সাহসিনী জঙ্গল দেখতে গাড়িতে চেপে আসেনও, তিনি ওই নীল চ্যাটার্জিদের হাতে পড়ে বিপদ ডেকে আনবেন। মেজরের মনে হল, ভদ্রমহিলাকে সতর্ক করে দেওয়া তাঁর কর্তব্য।

তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই খাঁচায় মাথা ঠুকে গেল। বেশ ব্যথা পেলেন। সেটা একটু সামলে উঠে খেয়াল করলেন আর মহিলার গলা শুনতে পাচ্ছেন না। অর্থাৎ এ-তল্লাটে উনি নেই। তিনি যে খাঁচায় বসে আছেন সেটা কেন যে খেয়ালে ছিল না, থাকলে ওই মহিলাকে তিনি বাঁচাতে পারতেন। আর তখনই সারাওটাকে তীব্র গতিতে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখলেন তিনি। ওর মাথা নিচু করা, শিং তাঁর দিকে সোজাসুজি।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করলেন মেজর, "এই, কী হচ্ছে ? অ্যাঁ। পাজি, ছুঁচো, বদমাশ। আমাকে ঢুঁস মারতে আসা হচ্ছে ? মেরে বাঁ পায়ের হাড় ভেঙে দেব তোমার।" সম্ভবত সেই চিৎকার শুনে একেবারে তাঁর গায়ের কাছে এসে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সারাও। বিপুল বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে।

মেজর চিৎকার করল, "অ্যাই, কে আছ ? কাম হিয়ার, জলদি।"

এবার কালো কাপড় তুলে একটা মুণ্ডু উঁকি মারল। তার মুখে কৌতুক।

"অ্যাই। হয় ওকে, নয় আমাকে এখান থেকে বের করে দাও, কুইক !"

"কেন ?"

"কেন ! একটা মানুষকে খাঁচায় বন্দি করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কেন ? রাস্কেল।"

"গালি দেবেন না বলে দিলাম।"

"আলবৎ দেব, একশোবার দেব। তোর থেকে ওই সারাওটা বেশি বুদ্ধিমান।"

"তা হলে থাকুন ওর সঙ্গে।" লোকটা কালো কাপড় ফেলে চলে গেল।

মেজর হতাশ হলেন। আপাতত তাঁর কিছুই করার নেই। অর্জুন অথবা অমল সোম নিশ্চয়ই তাঁকে এক সময় উদ্ধার করবে। ততক্ষণ বসে না থেকে শুয়ে পড়াই ভাল। মেজর পা ছড়িয়ে পাশ ফিরে শুলেন ডান হাতের কনুইয়ে মাথা রেখে। সারাওটা একমনে তাকে দেখে যাচ্ছিল। জন্তুরা সম্ভবত মানবচরিত্র ভাল বোঝে। একটু পরে সেও শুয়ে পড়ল মেজরের কোল ঘেঁষে। মেজর মনে মনে বললেন, "গুড বয়।"

অর্জুন দ্বিতীয়বার চিৎকার করতে দেয়নি ঘোষালকে। একবার গলা ফাটানোর পরই সে তার মুখে রুমাল গুঁজে দিয়েছিল, বাঁধার কাজটা সুন্দর করেছিল। ওরা আশঙ্কা করেছিল ঘোষালের চিৎকার শুনে নীল ওপরে ছুটে আসবে। কিছুক্ষণ প্রস্তুত হয়ে থেকেও যখন তেমন কিছু হল না, তখন ওরা সামনের দিকে এগোল। ঘোষালকে দুটো পাথরের খাঁজে এমনভাবে ফেলে রাখল, যাতে সে কোনওভাবে বেরিয়ে আসতে না পারে।

ঢালের কাছে গাছের আড়ালে পৌঁছবার আগেই গাড়ির আওয়াজ কানে এল। ওরা অবাক হয়ে ওপর থেকে দেখল, দামি গাড়িটা তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়াল। নীল, অমল সোম বা মেজরকে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির দরজা ড্রাইভার খুলে দিলে ওরা চমকে উঠল।

নিম টি এস্টেটের মিসেস ব্যানার্জি এরকম জায়গায় কেন এলেন। তিনি কি তাঁর ভাইয়ের এই সব কারবারের কথা জানতে পেয়ে বাধা দিতে এসেছেন? ভদ্রমহিলা গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাওয়ামাত্র সুন্দর বলল, "উনি হলেন মেমসাব। নীল সাহেবের দিদি।"

অর্জুন বলল, "এবার আমাদের নীচে যাওয়া উচিত। চলো।"

ওরা আর-একটু নীচে নেমে এল। এবার সেই ন্যাড়া জায়গাটা পেরিয়ে যেতে হবে। আর সেটা করতে গেলে ওদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। অর্জুন সুন্দরকে বলল, "একসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি ওই দিক দিয়ে ঘুরে যাও। অমলদাব কাছাকাছি থেকে সঙ্কেতে জানিয়ে দিয়ো সেটা। যাও।" সুন্দর দ্রুত সরে গেল।

এক দৌড়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হতেই অর্জুন দেখতে পেল মিসেস ব্যানার্জি সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখে খুব অবাক হয়েছেন মহিলা। কিন্তু মুখে কিছু না বলে তাকিয়ে আছেন দেখে অর্জুনই প্রথম কথা বলল, "আপনি এখানে?"

"প্রশ্নটা আমিই করছি। আপনি সেদিন ডিটেকটিভ অমল সোমের সঙ্গে আমার বাগানে গিয়েছিলেন, তাই তো? কিন্তু এখানে কী করছেন? ওটা তো ইন্ডিয়া নয়, ভুটান। পাহাড় থেকে দৌড়ে নামলেন, কিছু হয়েছে কি?" মিসেস ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

"নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। নইলে আমরা এখানে আসব কেন? আপনার ভাই...।" অর্জুন এবার নীলকে আসতে দেখল। এখনও একটু দূরে রয়েছে সে।

"হ্যাঁ বলুন, আমার ভাই কী করেছে?"

"উনি খুব মূল্যবান এবং নিষিদ্ধ প্রাণী এখান থেকে ধরে চালান দিচ্ছেন বিদেশে। এটা গুরুতর অপরাধ।" অর্জুন বলল।

"তাই নাকি? ঠিক আছে, ও যাতে কাজটা না করে, সেটা আমি দেখব। ও

এখানে এসেছে খবর পেয়েই আমি চলে এলাম। এবার আপনারা ফিরে যেতে পারেন।" মিসেস ব্যানার্জির কথা শেষ হওয়ামাত্র নীল পাশে এসে দাঁড়াল, "এই লোকগুলো আমার পেছনে লেগেছে দিদি, এদের চলে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না।"

মিসেস ব্যানার্জির গলা ওপরে উঠল, "তোমার সাহস খুব বেড়ে গেছে নীল। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। যাও, এই ছেলেটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো।"

নীল বাধ্য হল মেনে নিতে, "ঠিক আছে, চলুন।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন—" অর্জুন আপত্তি করল।

"তারা ওদিকেই আছে। আসুন।" নীল কঠিন মুখে বলল।

মিসেস ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, "নীল, তোমার বন্ধু কোথায় ?"

"ওপরে আছে। ইডিয়টটার জন্যেই ঝামেলা বাড়ল।" নীল ইশারা করতে অর্জুন হাঁটতে লাগল। দিদির কথা নীল নিশ্চয়ই মান্য করবে। পেছনে নীল আসছে এবং ওর সঙ্গে অস্ত্র আছে। সে ঠিক করল নীল তাকে কোথায় নিয়ে যায়, দেখবে। পাহাড়ি পথ ধরে হাঁটছিল ওরা। মাঝে-মাঝে বুনো ঝোপ। হঠাৎই সে ফাঁদটাকে দেখতে পেল। গাছপাতায় গর্তের মুখ কখনও ঢেকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু এখন তার খানিকটা সরে যাওয়ায় ফাঁদ বলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সে দাঁড়াতেই পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। ব্যালান্স রাখতে পারল না অর্জুন। টলমলিয়ে শুকনো ডালপালায় পা পড়তে শরীর নীচের দিকে নেমে গেল। অন্ধকারে অনেকটা যাওয়ার পর সে আছাড় খেয়ে পড়তেই গলা শুনতে পেল, "হাড়গোড় ভাঙেনি তো ?" অমল সোমের গলা।

"অমলদা !"

"হ্যাঁ। আমার মতো তোমাকেও ট্র্যাপে ফেলেছে ওরা। বাইরের সাহায্য ছাড়া ওপরে ওঠার কোনও সুযোগ নেই।"

মিসেস ব্যানার্জি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীল ফিরে আসামাত্র বললেন, "এসব আমার ভাল লাগছে না। ওরা এখানে আসছে জানতে পারলে..."

"জানতে পারলে কী করতাম ? কালকের মধ্যেই এক লট পাঠাতে হবে।"

"অ্যাট লিস্ট ওদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে ম্যানেজ করা যেত।" মিসেস ব্যানার্জি মাথা নাড়লেন, "ক'জন এসেছে ?"

"তিনজন। তিনটেকেই কবজা করেছি। আমেরিকায় যেটা থাকে, সেটাকে খাঁচায় রাখা আছে। ওকে বের করে ওই গর্তে ফেলতে পারলে চিন্তা থাকবে না। এ-জীবনে আর বের হতে পারবে না ওপরে। হাজার চিৎকার করলেও সাড়া দিতে কেউ আসবে না এখানে।"

"তোমার বন্ধু কোথায় ?"

প্রশ্ন শুনে নীলের খেয়াল হল। সে চিৎকার করে ডাকল। তিনবারেও ওপর থেকে সাড়া এল না। নীল বিরক্ত হয়ে বলল, "ওকে আমি ঠিক ম্যানেজ করতে পারছি না। হয়তো পাহাড়ের ভেতরে কোথাও চলে গিয়েছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন।"

"ওকে ছাড়া তো চলবে না। যাও, খুঁজে নিয়ে এসো।"

নীল বাধ্য হয়েই পাহাড়ে উঠতে লাগল। তার হাতে অস্ত্র। মনে-মনে সে ঘোষালকে গালাগাল দিচ্ছিল। এবার কাজটা হয়ে গেলে ঘোষালকে কাটাতে হবে। সে ওপরে উঠে এল। অনেকবার ডাকাডাকি করার পরও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন সে রিভলভারের ট্রিগার টিপল। পাহাড় কেঁপে গেল আওয়াজে, পাখিরা উড়ল কিন্তু ঘোষালের সাড়া পাওয়া গেল না। পাথরের খাঁজে পড়ে-থাকা ঘোষাল নিজের নাম এবং গুলির শব্দ শুনতে পেয়েও সাড়া দিতে পারছিল না মুখ বন্ধ থাকায়। নীল তার খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। সে প্রবলভাবে নড়াচড়া করতেই পায়ের যন্ত্রণা বেড়ে গেল।

ঝটপট শব্দ কানে গিয়েছিল নীলের। সে সতর্ক চোখে চারপাশে দেখতে লাগল। ঠিক তখনই কিছু একটা তীব্র গতিতে ছুটে এসে তার কপালে আঘাত করল। চেষ্টা করেও মাথা সরাতে পারল না নীল। মুহূর্তেই পৃথিবীটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। দু' হাতে মাথা চেপে হাঁটু মুড়ে বসে পড়তেই আর একটা পাথরের টুকরো তার কানের ওপর আঘাত করল। সে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। রিভলভার পড়ে গেল একপাশে। নীল জ্ঞান হারাল।

সুন্দর দ্রুত দৌড়ে এল কাছে। তার খুব আনন্দ হচ্ছিল। নীলের পরনের জামা ছিঁড়ে ফেলে তাই দিয়ে দুটো হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল সে। পা দুটোও বাদ দিল না। তারপর রিভলভার তুলে নিল। এটা কী করে ব্যবহার করতে হয় সে জানে না। একটু ভেবে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল সেটা।

এত সব কাণ্ড ঘটে গেল ওপরে, কিন্তু ক্যাম্পের কাছে থাকা নীলের কর্মচারীরা তা টের পায়নি। তারা মেজরের কাণ্ডকারখানা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। সুন্দর নীচে নেমে আড়ালে থেকে তাদের দেখল। সে অমল সোম বা অর্জুনকে খুঁজে পাচ্ছিল না। ওঁদের খবরটা দিলে এখনই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সে চিৎকার করে ডাকবে কি না ভাবছিল, ঠিক তখনই নাক ডাকার আওয়াজ পেল। যে খাঁচাটার কাছে সে দাঁড়িয়ে ছিল, শব্দ বের হচ্ছে সেখান থেকেই। ওটা যে নাক ডাকার শব্দ তা, প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি সুন্দর। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলে কাপড়টা তুলতেই দেখল, পা ছড়িয়ে বসে মেজর ঘুমোচ্ছেন। তাঁর কোল ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে সেই রং-করা পাহাড়ি ছাগলটা।

সুন্দর খোঁচা মারতেই মেজর হকচকিয়ে সোজা হলেন। ঠোঁটে আঙুল চেপে

তাঁকে শব্দ করতে নিষেধ করল সুন্দর। তারপর কাপড়ের আড়ালে-আড়ালে খাঁচার মুখটায় চলে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মেজর দ্রুত বেরিয়ে এসে বললেন, "ধন্যবাদ।"

"কথা বলবেন না। লোকজন কাছেই আছে।"

মেজর ওকে অনুসরণ করে কিছুটা দূরে চলে আসামাত্র সেই ফুলটার কথা মনে করতে পারলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওই গাছটার কাছে যাওয়ার জন্য। তিনি বললেন, "তুমি বুঝতে পারছ না সুন্দর। ওই ফুলটার রহস্য আছে। ওটা আমাকে পেতেই হবে। এই রকম রহস্যের জন্যে পৃথিবী তোলপাড় করি আমি।"

যে মানুষটা একটু আগে খাঁচায় বসে নাক ডাকছিল, সে পৃথিবী কী করে তোলপাড় করে, বুঝতে পারল না সুন্দর। সে জিজ্ঞেসা করল, "ফুল কোন গাছে আছে?"

"ওই ওপাশে। অত বড় গাছে মাত্র একটাই ফুল। কিন্তু এত উঁচুতে আর ডাল খুব সরু বলে আমি উঠতে পারিনি। বাট আই মাস্ট ট্রাই এগেইন।"

মেজরকে অনুসরণ করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা যেতেই মেজর দাঁড়িয়ে পড়লেন, "হু ইজ শি? মিসেস ব্যানার্জি বলে মনে হচ্ছে, উনি এখানে কেন?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে কাছে না যাওয়াই ভাল।"

"কিন্তু উনি তো খুব বিদুষী মহিলা। ভাইয়ের অন্যায় সমর্থন করেন না।"

"সমর্থন না করলে ভাই এত অন্যায় করার সাহস পায় কী করে?"

"ঠিক। কিন্তু উনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি গাছটার কাছে যেতে পারব না। মুশকিল হয়ে গেল! ওই যে গাছটা দেখছ, ওর মগডালে ফুল ফুটেছে।"

মেজরের কথা শুনে সুন্দর এ-পাশ ও-পাশে ঘুরে ঘুরে ফুলটাকে দেখার চেষ্টা করে বিফল হয়ে কাছাকাছি একটা গাছে উঠে গেল। বেশ কিছুটা ওঠার পর দূরের গাছের মগডালে ফুলটাকে দুলতে দেখল। এমন ফুল সে কোনও দিন দেখেনি। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা খেলল। সে গুলতি বের করে টিপ করল। সাঁ করে ছুটে গেল ছোট্ট পাথরটা। বোঁটার একটু ওপরে আঘাত করতেই ফুলটা টুক করে খসে পড়ল নীচে।

মিসেস ব্যানার্জি উদ্বিগ্ন হয়ে নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন গাছের ওপর থেকে একটা ফুল খসে পড়ল নীচে। বেশ বড়সড় এবং নধর ফুল, যা তিনি কখনও আগে দেখেননি। ফুলটা এত টাটকা যে, বোঁটা খসে পড়ার কোনও কারণ নেই। তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে ওটাকে তুললেন। তারপর মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করলেন।

সুন্দর ঘাবড়ে গেল। মেমসাহেব যে ফুলটা কুড়িয়ে নিতে পারেন, তা ওর মাথায় আসেনি। এখন যদি তিনি ফুলটা না দেন, তা হলে মেজর তাকে...। সে দ্রুত গাছ থেকে নেমে এল, "আমি ফুলটাকে পেড়ে ফেলেছি।"

"পেড়ে ফেলেছ ? কোথায় ?" মেজর উত্তেজিত।
"মেমসাব তুলে নিয়েছেন। ওঁর সামনে পড়েছিল।"
"সর্বনাশ!" মেজর আর দাঁড়ালেন না। সুন্দর আপত্তি করছে জেনেও দৌড়ে গেলেন সামনে। মিসেস ব্যানার্জি ফুল হাতে দাঁড়িয়ে দেখলেন দাড়িওয়ালা মোটাসোটা একটি মানুষ তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে।
"এক্সকিউজ মি ম্যাডাম।"
"আপনি ?"
"আমি আপনার বাগানে মিস্টার সোমের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমি একজন অভিযাত্রী। আপনার হাতে যে ফুলটা রয়েছে, তার সন্ধানে এখানে এসেছি। অনুগ্রহ করে ফুলটা আমাকে দিন।" হাত বাড়ালেন মেজর।
"এটা কী ফুল ?"
"আমি নাম জানি না।"
"আপনি এখানে ফুলের সন্ধানে এসেছেন ?"
"হ্যাঁ।"
"আপনার সঙ্গীরা ?"
"ওদের আসার উদ্দেশ্য আলাদা। দিন।"
"আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?"
"খাঁচায়। আপনার ভাই আমাকে বন্দি করে রেখেছিল। ক্রিমিন্যাল অফেন্স।"
"কী করে বেরিয়ে এলেন ?"
"সেটা বলা যাবে না। দিন ফুলটা।"
"আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমার ভাই এখনই ফিরে আসবে।"
"আপনার ভাই একজন ক্রিমিন্যাল। আপনি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন ?" মেজর চিৎকার করলেন, "আপনার স্বামী খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন।"
"তাঁর সঙ্গে আমার ভাইয়ের কোনও রক্তের সম্পর্ক ছিল না।" বেশ অহঙ্কারী গলায় বললেন মিসেস ব্যানার্জি। মেজর ফাঁপরে পড়লেন। একজন মহিলার ওপর জোর খাটানো যায় না। হঠাৎ তাঁর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, "মিসেস ব্যানার্জি। এটা একটা অসাধারণ ফুল, প্যারিসের একটি বিখ্যাত 'পারফিউম' ওই ফুল থেকে তৈরি হয়। দশ আউন্সের দাম দেড়শো ডলার। দারুণ গন্ধ।"
মিসেস ব্যানার্জি ফুলটার দিকে তাকালেন। তারপর সেটাকে নাকের নীচে নিয়ে এসে ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয়বারেই তাঁর চোখ বন্ধ হল। মেজর লক্ষ করলেন ওঁর পা টলছে। মাটিতে পড়ার আগেই তাঁকে ধরে ফেললেন মেজর। ধীরে-ধীরে ঘাসের ওপর বসে পড়ে দু' হাতে মাথা চেপে ধরলেন মহিলা। আর ঠিক তখনই পেছনে হই-হই আওয়াজ উঠল। মেজর

চমকে পেছনে তাকালেন। কালো গোলার মতো কিছু ছুটে আসছে। কোনওমতে তিনি সরে দাঁড়াতেই সেটা মিসেস ব্যানার্জির শরীর ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আর্তনাদ করে উঠলেন মেজর। ছুটে যাওয়া সারাওয়ের পায়ের চাপে ফুলটা থেঁতলে গিয়েছে পুরোপুরি। ঘাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বলা যায়। কোনও মতেই তাকে আর ফুল বলা যায় না।

পেছন-পেছন যারা ছুটে আসছিল, তারা এবার মেজর এবং সুন্দরকে দেখে থমকে গেল। মেজর চিৎকার করলেন, "কে ওকে তাড়া করেছিল ? কে ? এগিয়ে এসো। আমি ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলব। শয়তানের দল সব।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো উলটো দিকে দৌড়াল। রুমাল পেতে মেজর ফুলের অবশিষ্টাংশ তোলার চেষ্টা করলেন। আর তখনই চিৎকার ভেসে এল। চাপা অস্পষ্ট মানুষের গলা। একাধিক। সুন্দর ছুটল।

ফরেস্ট বাংলোয় বসে কথা হচ্ছিল। ডি এফ ও সাহেব, থানার বড়বাবু, রেঞ্জারও আছেন সঙ্গে। ঘোষাল স্বীকার করেছে। নীল মুখ খোলেনি, কিন্তু ঘোষালের স্টেটমেন্ট তাকে বাঁচাতে পারবে না। অমল সোম বলছিলেন, "সবচেয়ে অবাক হয়েছি মিসেস ব্যানার্জির ভূমিকা দেখে। তিনি যে ভাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, আমি কল্পনা করিনি। তবে এবারে আমরা শেষ পর্যন্ত কী করতে পারতাম, তাতে সন্দেহ আছে। যা কিছু কৃতিত্ব, তা সুন্দরের। কী বলো অর্জুন ?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। ও না থাকলে আমরা হয়তো আর ফিরতাম না।"

ডি এফ ও জিজ্ঞেস করলেন, "সে কোথায় ? আমি তাকে ফরেস্টে চাকরি দিতে চাই। ওর মতো লোক আমাদের দরকার।"

অর্জুন বলল, "সে এখন বুক ফুলিয়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। কিন্তু অমলদা, আপনি লক্ষ করেছেন, জঙ্গল থেকে ফেরার পর মেজর একদম চুপ করে গিয়েছেন। একটাও কথা বলছেন না।"

একটু দূরে বসা মেজর শব্দ করে নিশ্বাস ফেললেন, "পরশমণি পেয়েও যে হারায়, তার দুঃখ তোমরা বুঝবে না হে। তবে মিসেস ব্যানার্জির কথা বলছিল মিস্টার সোম, ফুলেও যে বিষের গন্ধ থাকে, সেটা আর একবার প্রমাণিত হল, তাই না ?"

গ্রন্থ-পরিচয়

কালাপাহাড় । মণ্ডল বুক হাউস ।
প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৯৮ । তৃতীয় মুদ্রণ—চৈত্র ১৩৯৯ ।
পৃ. ১৬৭, মূল্য ৩০·০০ ।
উৎসর্গ : এই বিশ্বের কিশোর গোষ্ঠীকে
প্রচ্ছদ . গণেশ বসু ।
অলংকরণ : রুচিরা মজুমদার ।

অর্জুন বেড়িয়ে এলো । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।
প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৯৩ । দ্বিতীয় মুদ্রণ—মার্চ ১৯৯৬
পৃ ১৪৪, মূল্য ৩৫·০০ ।
প্রচ্ছদ : অনুপ রায় ।
সূচি : অর্জুন বেড়িয়ে এলো, কার্ভালোর বাক্স ।

রত্নগর্ভা । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।
প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১ ৯৪ ।
পৃ ১১১, মূল্য ২৫·০০ ।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অনুপ রায় ।

ম্যাকসাহেবের নাতনি । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।
প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৯৫ ।
পৃ ১৪৯, মূল্য ৩৫·০০ ।
উৎসর্গ : অর্ণব মিত্র স্নেহাস্পদেষু ।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : বিমল দাস ।

ফুলে বিষের গন্ধ । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।
প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৯৬ ।
পৃ ১৯৫, মূল্য ৫০·০০ ।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : দেবাশিস দেব ।